‘বাংলা উপন্যাসে ধর্ম : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ’

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত
পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক
মহুয়া ভট্টাচার্য্য

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপিকা রুবী সাঁই

সমাজতত্ত্ব বিভাগ, ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২২

Certified That the Thesis Entitled

'বাংলা উপন্যাসে ধর্ম : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of **Dr. Ruby Sain, Professor, Department of Sociology, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India.** And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Ruby Sain — Mahua Bhattacharya

Countersigned by the supervisor — Candidate

Dated : 12.01.2022 — Dated: 12.01.2022

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি (সমাজতত্ত্ব) উপাধি প্রাপ্ত হওয়ার কারণে প্রস্তুত এই গবেষণাপত্র রচনার জন্য আমি একাধিক ব্যক্তি ও গ্রন্থাগারের প্রতি কৃতজ্ঞ।

যাঁর কথা সর্বাগ্রে স্মরণ করা প্রয়োজন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে, তিনি হলেন আমার এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক তথা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের মাননীয়া অধ্যাপিকা ড. রুবী সাঁই। তাঁর প্রতিনিয়ত আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণা সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না।

আমি বিশেষভাবে যাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, সেই বন্ধুপ্রতীম সুহৃদ ড. পার্থপ্রতীম বিশ্বাস, যিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক, তিনিই এই গবেষণার কাজে বিশেষভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁর উৎসাহেই আমি এই গবেষণার কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছিলাম।

এই গবেষণায় প্রতিনিয়ত যাঁদের উৎসাহ ও সহযোগিতা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, তাঁরা হলেন – আমার বাবা শ্রী বিশ্বনাথ মজুমদার, আমার মা শ্রীমতি নীলিমা মজুমদার, শ্রী অসীম কুমার বন্দোপাধ্যায়, শ্রী দুর্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার পারিবারিক সদস্য শ্রী বিজন কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতি শ্রেয়শী ভট্টাচার্য্য, স্বরূপ হরিশ, সুনিষ্কা স্বরূপ। গবেষণাকার্য চলাকালীন এঁদের সাহায্য ও উৎসাহ আমাকে গবেষণার কার্যে অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ করেছে। এঁদের সকলের কাছে আমি বিনম্রচিত্তে কৃতজ্ঞ।

আমার এই গবেষণাকার্য মূলত গ্রন্থাগার নির্ভর। তাই গবেষণার স্বার্থে আমাকে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। গবেষণা চলাকালীন যেসব গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আমার গবেষণা সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের নাম হ’ল – যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার কলকাতা, দ্যা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গোলপার্ক, অদ্বৈত আশ্রম গ্রন্থাগার কলকাতা, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার কলকাতা, শ্রীশ্রী সারদামণি রুরাল লাইব্রেরী নবগ্রাম, উদয়ন মেমোরিয়াল স্পোর্টস লাইব্রেরী শিলিগুড়ি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহাকুমা গ্রন্থাগার শিলিগুড়ি ও হানিফা লাইব্রেরি কোন্নগর। এই গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবায় আমি অত্যন্ত মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ।

আমার এই গবেষণাপত্রের সার্থক রূপায়ণে যে গ্রন্থাগারের অবদান, প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে, সেই গ্রন্থাগারের নাম হ'ল – মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী রিষড়া। এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মী যাঁদের নাম অশোক কুমার রায়, বাদল ভট্টাচার্য্য, সুখরঞ্জন দে ও মধুমিতা মুখার্জি – এঁদের প্রতি আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞ। এঁদের সপ্রতিভ সাহায্য ও সহযোগীতা আমি কোনদিনও বিস্মৃত হবো না।

আমার এই গবেষণাপত্রটির মুদ্রণে সনির্বন্ধ সহায়তা করেছেন আমার বন্ধুপ্রতীম শ্রী দুর্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

এঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। এঁদের উৎসাহী সহযোগিতায় আমি চিরকৃতজ্ঞ।

মহুয়া ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

পৃষ্ঠাসংখ্যা

শংসাপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা ০১

দ্বিতীয় অধ্যায় : ঐতিহাসিকপ্রেক্ষাপট ১৩

তৃতীয় অধ্যায় : সাহিত্য পর্যালোচনা ২৮

চতুর্থ অধ্যায় : গবেষণার উদ্দেশ্য ৪০

পঞ্চম অধ্যায় : গবেষণা পদ্ধতি ৪২

ষষ্ঠ অধ্যায় : গবেষণা বিশ্লেষণ ৪৭

প্রথম পর্ব (১৯৯১-২০০০) : ৪৯

দ্বিতীয় পর্ব (২০০১-২০১০) : ১০৯

তৃতীয় পর্ব (২০১১-২০১৭) : ১৯১

সপ্তম অধ্যায় : সারসংক্ষেপ ও উপসংহার ২৩৭

গ্রন্থপঞ্জী ২৯২

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ভূমিকা

বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়,
ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস রচনায়,
ধর্মের প্রভাব, সামাজিক পটভূমিকায়,
ধর্মসংকট, ধর্ম দ্বন্দ্ব মুক্তির অপেক্ষায়,
সঠিক ধর্মপথ অন্বেষণে,
পথ চলা শুরু এই গবেষণায়।

ভূমিকা

বর্তমান গবেষণার শিরোনাম হ'ল, **'বাংলা উপন্যাসে ধর্ম : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'**। এই শিরোনামের যথার্থতা প্রকাশ করার জন্যেই সাহিত্যের ইতিহাস জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ধর্মের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের আলোচনায়, মানুষের ভাবনার বিবর্তনের ইতিহাস ও ধর্ম অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ধর্মের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট দ্বারা শুধুমাত্র ধর্মের ইতিহাস নয়, প্রকৃত ধর্মের চরিত্র ও নীতির বিবর্তন প্রকাশিত হয়ে ওঠে। ধর্মের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে ধর্ম কখনো গ্রহণযোগ্য আবার কখনো ব্রাত্য হয়ে ওঠে। তাই যেকোনো বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। উপন্যাস আধুনিক সমাজ জীবনের মহাকাব্য। প্রত্যেক উপন্যাস ভাবনাই, কাহিনী সমুজ্জ্বল সীমাবদ্ধতায়, উপন্যাসের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রসঙ্গকে কৌতূহলোদ্দীপক করে তোলে। তাই কাহিনীকে আশ্রয় করে কোন বিশেষ শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের জীবনগাঁথায় উঠে আসে, সেই সমাজস্থ মানুষের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, ধর্ম-কর্ম, জীবনসমস্যা, সামাজিকসমস্যা, অনেক ক্ষেত্রে তার সমাধান বা সুরাহা। তাই অনেক সময়েই এক একটি উপন্যাস হয়ে ওঠে এক একটি গবেষণাপত্রের সমান।

সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে 'সহিত' শব্দ থেকে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেকেই বিশ্বাস করেন, শব্দের সঙ্গে অর্থ মিলিত হচ্ছে, আবার অনেকে বলে থাকেন, সাহিত্যিকের হৃদয়ের সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ের মিলনই হচ্ছে সাহিত্য। বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, মানুষের সহিত মানুষ মিলেছে, তাই এই সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য।

মানব সমাজের ইতিহাসে একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধর্মের স্থান সর্বজনবিদিত। এই বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে বৌদ্ধিক চেতনাসম্পন্ন চিন্তক ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস রচনার সারস্বত প্রয়াসে যে সমস্ত কালজয়ী উপন্যাস রচিত হয়েছে, তা থেকে ধর্ম ও সমাজের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে মানুষের মেধা ও মনন আরো বেশি সুসংস্কৃত ও সুউন্নত হয়েছে। বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে, এইসব উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে, মানুষের জীবনের নানান দিকের ছবি অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ও সুচারুভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। মানুষের জীবনের সাথে ধর্ম ও সমাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উপন্যাস মানুষের জীবন কাহিনী। জীবনের প্রকৃত ধর্ম হ'ল – ভাগ্য, ঈশ্বর ও

বিধিলিপির সাহায্য ছাড়াই সময়ের যাত্রাকে লঙ্ঘন করা। প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজেই নিজের ঈশ্বর। মানুষের সাথে মানুষের স্বার্থ, লোভ ও হিংসার ভিত্তিতে ভেদাভেদ করার ভাবনাই হ'ল, 'মানুষকে, মানুষের অসম্মান করা'। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, একেই 'পাপ' এবং মানুষের 'দুর্বলতা' বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তাই আত্মবিশ্বাসের সাথে, শৃঙ্খলাবোধের মাধ্যমে, মানুষ অতি সহজেই এক শুভবুদ্ধির পৃথিবী উপহার দিতে সক্ষম হতে পারে, যার কাছে হয়ত ঈশ্বরবাদও ক্ষীণ হয়ে হার মানতে পারে।

বর্তমান গবেষক বিষয়ভিত্তিকভাবে, গবেষণাকালকে বিভক্তিকরণ করেননি। গবেষণার আলোচনার সুবিধার্থে অত্যন্ত সচেতনভাবে এই বিভক্তিকরণ করা হয়েছে। সেই কারণে সম্পূর্ণ গবেষণাকালকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে – প্রথম পর্ব (১৯৯১-২০০০), দ্বিতীয় পর্ব (২০০১-২০১০) এবং তৃতীয় পর্ব (২০১১-২০১৭)। এই গবেষণায় মূলত গুণগত পদ্ধতি (Qualitative Study) অনুসরণ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় কাজের সুসংহত অগ্রগতির কারণে যে বিশেষ পদ্ধতিকে সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, সেই পদ্ধতিটি হ'ল – বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতি। ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের সূচনাকাল অর্থাৎ ১৯৯১ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের ঔপন্যাসিকদের সাহিত্য রচনার মধ্যে সামাজিক পটভূমিকায় ধর্মের প্রভাব এবং সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা, সমাজ ও ধর্মকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রূপে চিহ্নিত করেছে। বর্তমান গবেষণার শিরোনাম হ'ল, **'বাংলা উপন্যাসে ধর্ম : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'**। গবেষণার প্রকৃত যুক্তিবোধ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, প্রথমতঃ – বর্তমান গবেষণায় গৃহীত বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিক ও ধর্মীয় প্রভাব, কিভাবে সমগ্র সমাজব্যবস্থায়, মানবজীবনকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণ করে – তার বৃত্তান্ত অত্যন্ত সুন্দরভাবে ঔপন্যাসিকেরা পাঠকের সমক্ষে তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয়তঃ – বাংলা উপন্যাসের প্রভাব বর্তমান সমাজকে কতখানি সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজ করে গড়ে তুলতে পারে সেই বিষয়ে লক্ষ্য দেওয়া। তৃতীয়তঃ – যেহেতু প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত পাঠকের কাছে সাহিত্য পাঠ, বিনোদনের সমতুল্য, তাই যেকোনো বয়ঃক্রমে বিভিন্ন উপন্যাস পাঠের মাধ্যমে বিভিন্ন জীবনপরিস্থিতি ও একইসঙ্গে সমাজস্থ বিভিন্ন ধর্মগুলির সঙ্গেও পাঠক পরিচিত হতে সক্ষম হয়, যা তার জীবনবোধের শিক্ষক হয়ে ওঠে।

প্রতিটি উপন্যাসই ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির দর্শন। প্রতিটি মানুষই এক একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। প্রতিটি মানুষেরই স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান। গত ছাব্বিশ বছরের উপন্যাস প্রাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যাচ্ছে, সেই নানা জাতি, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান। এর বাইরে কিন্তু ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি যাচ্ছে না। আবার সাহিত্য একটা অন্য পথের সন্ধানও দিচ্ছে। বহুবিধ ও বৈচিত্র্যের কথাই উপন্যাসগুলি বলছে। হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, জরাথ্রুস্ট প্রতিটি ধর্মের ক্ষেত্রেই, বেশিরভাগ উপন্যাসই এমন একটা ধর্মের কথা বলছে, যা মানবতার ধর্মকেই সমর্থন করেছে, যা মনুষ্যত্বের ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে। সমাজ কিন্তু সব সময় এর সাথে একমত নয়। বর্তমান গবেষক যে সমাজকে দেখতে পাচ্ছে তা হয়তো সদর্থক, যদিও এই দেখা মানুষের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির আঙ্গিকে পৃথক হতেই পারে। তা হ'ল – এই সমাজেরই অনেক মানুষ, ধর্মের অজুহাতে বিধর্মীকে খুন করতেও দ্বিধা করেননা। অর্থাৎ সমাজ কখনই সরলরৈখিক নয়। তার বিভিন্ন আঙ্গিক বর্তমান। তার বিভিন্ন দশা বর্তমান। বিভিন্ন স্তর বর্তমান। তাই মানুষের প্রাত্যহিক জীবন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর এই প্রাত্যহিক জীবনযাপনের নানান আঙ্গিক, দশা, স্তরের অবস্থান ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। সেই কারণেই বর্তমান গবেষণায় গৃহীত উপন্যাসগুলির অস্তিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বর্তমান গবেষণার শিরোনাম হ'ল, **'বাংলা উপন্যাসে ধর্ম : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'**। ধর্মের প্রসঙ্গের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে 'বিশ্বায়ন' একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়। কারণ বর্তমান গবেষণার সময়কাল হিসেবে বিশ্বায়নের পরবর্তী সময় অর্থাৎ ১৯৯১-২০১৭ সালের সময়কেই গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ বিশ্বায়ন হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে, বিশ্বের কোন বিষয় যখন সারাবিশ্বের সকল মানুষের স্বার্থে, বিশ্বের সকল প্রান্তে, অত্যন্ত দ্রুতভাবে সম্প্রচারিত ও সম্প্রসারিত হয়ে, এক বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে ও বিশ্বব্যাপী এক সামাজিক সম্পর্ককে, এমনভাবে সম্পর্কিত করে, যেখানে বিশ্বের প্রতিটি এলাকা পরস্পর পরস্পরের ওপর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকে দৃঢ় করে ও স্বীকৃতি দান করে। বিশ্বায়নের এই ধারণা বিশ্বব্যাপী এক সমভাবাপন্ন ধর্মীয় ধারণার গুরুত্বকেও সমানভাবে সারা বিশ্বের কাছে বিশ্বজনীন করে তুলতে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে উঠতে সক্ষম হতে পারে, যাতে সারা বিশ্বময় এক বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারনার প্রভাব সমগ্র বিশ্বকে এক মানবিক ধর্মসূত্রে গ্রথিত করতে সক্ষম হতে পারে। নির্মূল হতে পারে দ্বন্দ্ব, নির্মল হতে পারে অসাম্প্রদায়িকতা। 'বিশ্বায়ন' শব্দটিকে সমাজবিজ্ঞানী রোনাল্ড রবার্টসন প্রথম আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেন ও ব্যবহার করেন। বিশ্বায়নের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় ইতিহাসের নানান স্তরে বিভিন্ন দেশ ও সাম্রাজ্য বিশ্বায়নকে অগ্রসর করেছে। প্রাচীনকালে

বিশ্বায়নের সূচনার মূলে রয়েছে মানুষের ভ্রমণ ইপ্সা। এই ভ্রমণেচ্ছাই মানুষকে সারাবিশ্বের যোগাযোগ, অর্থনীতি, বাণিজ্য, শিল্প, পরিবহন, আমদানি-রপ্তানি, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল বিষয়েই উৎসাহিত করে তুলেছিল। ফলে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সাধারণনীতি ব্যতিরেকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করত। কারণ হাজার বছর আগেই মধ্যযুগে রেশমপথ ধরে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বিস্তৃত হয়েছিল। এই রেশমপথ ধরেই পর্যটক ও ধর্মপ্রচারকদের বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের ভ্রমণকে, সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত সহজ করে তুলেছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরা যাযাবর জাতির ছিলেন। এই যাযাবর জাতির মধ্যে কৃষিভাবনা ও কৃষির উন্নয়নভাবনা তাদের এক নির্দিষ্ট স্থানে বসতি স্থাপনে উদ্যোগী করে, এক সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনধারণে উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু তখন মানুষের মধ্যে প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না থাকার কারণে বিশ্বায়নের ভাবনা তেমনভাবে দ্রুততর পদ্ধতিতে বিস্তারিত হতে সক্ষম হয়নি। তাই এই অবস্থাকে প্রাচীন বিশ্বায়নের যুগ বলে ধার্য করা যেতেই পারে। প্রাচীন বিশ্বায়নের পরবর্তী স্তরকে ‘প্রারম্ভিক বিশ্বায়ন’ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগিজ, স্পেন, ওলন্দাজ,ব্রিটিশ নামে কতগুলি ইউরোপীয় সামুদ্রিক বণিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। এই বণিকসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত বাণিজ্যধারণা বিশ্বায়নের উন্নতিতে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে। এভাবেই ইউরোপীয় নাবিকদের কাছে বিশ্বায়নের দৌলতে কোথায় কোথায় কি পরিবর্তন আসছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন – এখন হিন্দু-মুসলিম বিবাহ অনেক স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। পূর্বে হিন্দুরা বিদেশে গিয়ে বিয়ে করলে, সবাই মেম-বৌ দেখতে আসতো। কিন্তু ভারতবর্ষে সাধারণভাবে হিন্দু-মুসলিমের বিয়ে ব্রাত্য ছিলো। এখনো কিন্তু বিশ্বায়নের পরবর্তীকালেও, উত্তর ভারতে সম্মান-মৃত্যুর প্রচলন আছে। ধর্মে বিশ্বায়নের ভাবনায় বাহাই মন্দির তৈরি হয়েছে। যেখানে সকল ধর্মের লোকই একসাথে বসে স্ব-স্ব আরাধ্যকে আরাধনা করতে পারে। বাহাই মন্দির দিল্লিতে অবস্থিত। এই বাহাই মন্দিরে সন্ধ্যাবেলা এক-এক দিন, এক-এক ধর্মের ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়। কোনোদিন বাইবেল, কোনোদিন কোরান, কোনোদিন গীতা, কোনোদিন গ্রন্থসাহেব থেকে ধর্মপাঠ করা হয়। সমস্ত ধর্মের মানুষেরা, সেই মন্দিরে একসাথে বসে, সেই ধর্মপাঠ আত্মস্থ করেন। এভাবে ধর্মেও বিশ্বায়ন স্পর্শ করেছে। এর শুরু হয়েছিল বাহাই নামে এক উপজাতির হাত ধরে। এছাড়া অক্ষরধাম মন্দিরও হয়েছে, যেখানে সমস্ত ধর্মের

মানুষেরাই একসাথে যাচ্ছে। অক্ষরধাম মন্দির শুধুমাত্র দিল্লিতে নয়, গুজরাটেও অবস্থিত।

স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বিবেকানন্দের দর্শন নিয়ে বই লিখেছিলেন। সেই পুস্তকের নাম, 'স্বামী বিবেকানন্দ'। তিনি লিখেছেন,

"একেশ্বরবাদ পুনরুত্থানের জন্য জনসাধারণের মধ্যে খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বলে যে বিলাপ তা যথার্থ নয়! ধর্মবিশ্বাস শুধুমাত্র একটা বিশ্বাস নয়। মূর্তিপূজার মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং অর্থনৈতিক দিকও রয়েছে। তথাকথিত হিন্দুরাও খ্রিস্টিয় ৪০০ অব্দের পূর্বে মূর্তি উপাসক ছিল না। পরবর্তীকালে শাসকশ্রেণীই মূর্তিপূজায় উৎসাহ দান করে।" (দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ, ২০১৯)

স্বামী বিবেকানন্দ সারা মানবসমাজকে এক এমন লক্ষ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, যেখানে বেদ নেই, বাইবেল নেই, কোরানও নেই। মানবসমাজকে তিনি এই শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে, প্রত্যেকটি ধর্মই হ'ল, একই ধর্মের নানাবিধ প্রকাশ, যা প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব ইচ্ছানুযায়ী পালন করে থাকে। তিনি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দের, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সমন্বয়সাধন করতে চেয়েছিলেন। তিনি এক 'গতিশীল ধর্ম' – কে প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন।

উনবিংশ শতকের লেখায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের মধ্যে একটা বিরাট বিভাজন বর্তমান। মানুষ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে যতই অন্তর্দ্বন্দ্বের ও ধর্মদ্বন্দ্বের মধ্যে অবস্থান করুক না কেন, মানুষের মধ্যে 'মৈত্রী' বিষয়টাকে কিন্তু ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের লেখায় সর্বদাই প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ তাঁরা হয়তো এই দ্বন্দ্বকে মেটানোর চেতনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এই বিষয়টা যে সর্বদা তাঁরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে করেছেন তা হয়তো নয়, কারণ যেকোন লেখা একটা শিল্পমাধ্যম রূপে গণ্য হয়। এই শিল্পমাধ্যমের দ্বারা এমন এক ভাষা বা মৈত্রীস্বর উঠে আসছে, যা ঔপন্যাসিকদের নিজেদের অন্তর্দর্শন। ঔপন্যাসিকেরা কথকের ভূমিকায় থেকে সমাজকে দেখছেন ও নিজস্ব কলমস্বরের মাধ্যমে যা বলছেন, তা জ্ঞানযোগরূপ পরাবিদ্যাকে ও প্রকৃতিরূপ অপরাবিদ্যাকে, অবলম্বন করে কর্মযোগরূপ ঐশ্বরিক দিব্যচেতনায় রূপান্তরিত হচ্ছে, যে কর্মযোগ, প্রকৃত ধর্মের এক অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কিন্তু পরমপ্রেম অথবা ভক্তির পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে হলে, সাধককে স্বমতের ওপর আগ্রহান্বিত হলে শুধু হবে না, আবার অন্যের মতকে খণ্ডন বা নিন্দা করতেও পারবেন না। অর্থাৎ এর দ্বারা সকল মতকেই প্রাধান্য দিতে হবে, পরম

প্রেমের মাধ্যমে। তাহলে স্বভাবতই মানুষের প্রতি মানুষের কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের মাধ্যমে, সাম্যের মানবাধিকার রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। সম্পর্ক সমৃদ্ধ হবে।

সাহিত্য হ'ল সমাজ দর্পণ। উপন্যাস থেকেই বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজের স্বাভাবিক ধার্মিক ও সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব। বিভিন্ন উপন্যাসে ঔপন্যাসিকদের লেখনীতে গুহামানবদের সময় থেকে, বর্তমান সময়ের সমাজ ও ধর্মকে দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে। সমাজের নানান স্তরের মানুষের, নানান বাস্তবিক পরিস্থিতিতে অবস্থান, বিচ্যুতি, কর্মক্লান্তি, প্রেম, বিশ্বাস, আনন্দ ও সুখহীন জীবনের উদয়াস্ত, বাস্তব কাঠিন্যের দাঁড়িপাল্লায় সততা, স্বচ্ছতা, সহজ সরলতার বাটখারায় একদম সঠিক মাপের চিত্রাঙ্কন, সাহিত্যিকেরাই বারবার অঙ্কন করতে সমর্থ হয়েছেন। আত্মদর্শন ও সমাজদর্শন একত্রে যে শিল্পকর্মটি সমাধান করে থাকে, সেই শিল্পকর্মটি উৎকর্ষতায় যখন শিল্পোত্তীর্ণ হয়, তখন জন্ম হয় প্রকৃত সাহিত্যের। আর এই সাহিত্যের জন্মদাতা হলেন প্রকৃত সাহিত্যিক। বঙ্গভাষী পাঠকেরা বিভিন্ন যুগ ও সেই যুগের ধর্ম ও সমাজকে উপন্যাস পাঠের মাধ্যমে সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়ে ও বর্তমান সমাজোপযোগী ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে সমাজে ঘটিত অবিচার, অত্যাচার, শোষণ ও ধর্ম থেকে সমাজকে যাতে মুক্ত করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই উপন্যাসগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দিতা থেকেই, ধর্মে ধর্মে যে উত্তাপ জন্মায় এবং যে দ্বন্দ্ব-বিরোধের জন্ম হয়, তাকেই 'ধর্মসংকট' বলা যেতে পারে। পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মদ্বন্দ্ব এবং কোন বিশেষ ধর্মের আভ্যন্তরীণ ধর্ম সংকট, এই দুই ধরনের ধর্মসংকট দেখতে পাওয়া যায়। এই ধর্ম সংকটের বাস্তব চিত্রায়ন ঔপন্যাসিকেরা সাবলীলতার সঙ্গে উপন্যাসের মাধ্যমে পাঠকের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করেন যা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে সমাজকে অগ্রসর করার পথের পাথেয় রূপে গণ্য হয়। সমস্ত ধর্মের মধ্যেই কিছু সাদৃশ্য ও গভীর বৈসাদৃশ্যও সমানভাবে বর্তমান। নানান দুর্মূল্য উপন্যাস, এই সমস্ত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য যুক্ত ধর্মের ধারণার চিত্র সুস্পষ্ট করে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করে। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বসবাস। যেমন – হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান ইত্যাদি। প্রতিটি ধর্মের ধর্মস্রষ্টা বর্তমান। যেমন – খ্রীষ্টধর্মে মুসা ও যীশু, জৈনধর্মে মহাবীর, বৌদ্ধধর্মে তথাগত বা ভগবান বুদ্ধ, ইসলামধর্মে মহম্মদ ও হিন্দুধর্মে শ্রীচৈতন্যদেব, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মস্রষ্টারূপে অগ্রগণ্য। অথচ এঁরা কেউই ধর্মের সৃষ্টি করেননি, প্রচলিত ধর্মের উন্নতি সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন মাত্র। কারণ খ্রীষ্টধর্ম খ্রীষ্টের আগে যে ইহুদিধর্ম ছিল, তাকে কেন্দ্র করে

গড়ে উঠেছে। মহম্মদের আগের আরবধর্ম ও ইহুদিধর্মের উপর ভর করে গড়ে উঠেছে বর্তমান ইসলামধর্ম। হিন্দুধর্ম সনাতন বৈদিক ধর্ম। আর বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্ম-বৈষ্ণব এগুলো সব হিন্দুধর্মেরই নব সংস্করণ। এছাড়া ইহুদীদের জুডা ধর্ম, শিখ ধর্ম, জাপানের শিন্টো ধর্ম, ইরানের জরাথ্রুস্ট ধর্ম, চীনের কনফুসীয় ধর্ম প্রভৃতি অনেক ধর্ম আছে। **'ভূমিপুত্র'** (২০১০) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক নজরুল ইসলাম তাঁর উপন্যাসের চরিত্র কামাল সম্পর্কে বলেছেন –

"আরও একটু বড় হয়ে উপরের ক্লাসে উঠে কামাল এগুলো জেনেছিল। জেনেছিল, ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ছাড়াও খ্রিস্ট ধর্ম, ইহুদিদের জুডা ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, শিখ ধর্ম, জাপানের শিন্টো ধর্ম, ইরানের জরাথুস্ট ধর্ম, চিনের কনফুশীয় ধর্ম প্রভৃতি অনেক ধর্ম আছে। কামালের আশ্চর্য লাগে, পৃথিবীতে পাঁচটি মহাদেশ থাকলেও সব ধর্মগুলো এই এশিয়া মহাদেশেই উৎপত্তি হয়েছে। এগুলির মধ্যে আবার হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ – এই চারটি ধর্ম ভারতবর্ষে জন্মেছে।....হিন্দু ধর্ম সেই অর্থে কোন নির্দিষ্ট ধর্ম প্রচারক প্রচার করেননি। প্রাচীন কাল থেকে এ দেশে প্রচলিত বিভিন্ন আচারআচরণ, রীতি-নীতির সমষ্টিই কালে হিন্দু ধর্ম বলে পরিচিত হয়েছে।....একজন লোক শিব ভক্ত হয়ে হিন্দু হতে পারে, শিব বিদ্বেষী হয়ে হিন্দু হতে পারে, এমনকি নাস্তিক হয়েও হিন্দু থাকতে পারে। কিন্তু খ্রিস্টান বা মুসলমানদের এরকমটা হওয়া শক্ত।"

দার্শনিক স্পিনোজা বলেছেন, ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যই হ'ল ধর্ম। মার্ক্স বলেছেন, বিচ্ছিন্ন মানুষের ইচ্ছাপূরণ – কল্পনা আফিং জাতীয় নেশার বস্তু হ'ল ধর্ম। কান্ট বলেছেন, নীতি বা মরালিটি অবধারিতভাবে মানুষকে যে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেয় তাই হ'ল ধর্ম। ফ্রয়েড বলেছেন, একটা যৌথ স্নায়বিক বিকার, মরীচিকার ছলনা ও কাল্পনিক আশ্বাস হ'ল ধর্ম। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক টিলিশ বলেছেন, মানুষের নিজেকে অতিক্রম করে পরমের দিকে যাত্রাই হচ্ছে ধর্ম। রুডলফ অটো বলেছেন, ধর্ম হ'ল এক হোলিট্রুথ বা উপলব্ধি যা একইসঙ্গে পবিত্র প্রবলতায় ভয়ংকর, দুর্জ্ঞেয়তায় রহস্যময় এবং সৌন্দর্যে মনোহরণ। ঔপন্যাসিক কল্পনা রায়ের **'সেই সময় পেরিয়ে'** (২০১২) উপন্যাসে তাঁর উপন্যাসের চরিত্র ডেভিড স্কট তাঁর বন্ধু ডাক্তার বিডনকে বলছেন –

"ধর্ম শব্দটি সংস্কৃত 'ধৃ' থেকে এসেছে। যেমন Religion শব্দটি ল্যাটিন Religard শব্দ থেকে। ইংরেজি রিলিজিয়ান কথাটির প্রতিশব্দ ধর্ম। বিডনকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে স্কট বললেন Religion relays psychophysical co-ordinating strength of the people and makes then interested. মানসিক ও শারীরিক অবস্থিতি একই সঙ্গে....কিন্তু সেই Religion এর বাংলা এসেছে 'ধৃ' ধাতু থেকে। যার মানে, ধরে থাকা 'Hold'।....যে বিধান, যে

নীতি অস্তিত্বকে ধরে রাখে তাই ধর্ম।....উপনিষদেও বলা আছে, মূর্খরাই অনুষ্ঠানকে ধর্ম বলে বিবেচনা করে অথচ এদেশে এই আনুষ্ঠানিক ধর্মেরই বাড়াবাড়ি।”

অর্থহীন কুসংস্কার, লোকাচার, আনুষ্ঠানিক পুজো আচ্চায় ধর্মকে বিকৃত করে রেখেছে। হিন্দুধর্ম কোনও একক মানব প্রচারিত ধর্ম নয়, অগণ্য ঋষিদের বহুধা বিভক্ত অনুভব আর জ্ঞানের সমষ্টিগত রূপ হিন্দুধর্ম। সকল মানুষের বাঁচার অধিকার এখানে স্বীকৃত। একালের বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক এস.জি.এফ. ব্রেন্ডন বলেছেন, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মানুষই মৃত্যু সচেতন। মানুষই জানে সময় মানেই মৃত্যু। মানুষের শঙ্কিত মৃত্যু চেতনার প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে ধর্ম। মানুষ চেষ্টা করে, ধর্ম দিয়ে, সময়ের হৃদয়হরণ করতে। এই পরিচয়পত্রগুলির কোনটির থেকেই ধর্মের সঠিক পরিচয় ফুটে ওঠে না। ধর্মে ধর্মে কেন যে এমন বিরোধ তার কারণ সঠিকভাবে জানা যায় না। বিখ্যাত দার্শনিক উইটগেনস্তাইন বলেছেন, ধর্মের ক্ষেত্রে সংজ্ঞা অসম্ভব।

“ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ দুর্কহাইমের মতে সকল ধর্ম বিশ্বাসের মূলে একটি ধারনাই আছে, একটি রহস্যময় নৈব্যক্তিক শক্তির ধারণা যা মানব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই শক্তির ধারণার মূলে আছে ব্যক্তির উপর সামাজিক কর্তৃত্বের বাস্তবতা।” (ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্রনাথ, ২০১৫)

ধর্ম কথাটার আর একটা প্রয়োগ হ'ল ধার্মিকতা। প্রাতিষ্ঠানিক বা সাম্প্রদায়িক ধর্মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্ম-পরিবার অর্থে ধর্ম যেমন ঠিক তেমনি ধার্মিকতা অর্থে ধর্ম একইভাবে অভিধাবর্জিত নির্বিশেষ ধর্ম। এই নির্বিশেষ ধর্ম সম্পূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক, অনুষ্ঠান বর্জিত, অপ্রাতিষ্ঠানিক। এই কারণে ধার্মিকতা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম থেকে একেবারে আলাদা। এই ধর্ম অধর্মের সরাসরি বিপরীত। কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নয়। এ হ'ল সেই ধর্ম যা সকলের জন্যই ধর্ম। সকলের ধর্ম কিন্তু কোন বিশেষ ধর্ম নয়। সর্বসাধারণের মানবিক ধর্ম। মানুষের ক্ষতি সাধন অধর্ম। মিথ্যাচার, হিংসা, স্বার্থপরতা, শঠতা এগুলি সবই অধর্মাচারণ। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ এগুলি সুনীতির নয়, ধর্মনীতির লংঘন। প্রেম, অহিংসা, মৈত্রী, করুণা এরা ধর্মেরই অঙ্গ। সত্য, কল্যান, সৌন্দর্য এরা সর্বোচ্চ মূল্যবোধ। এরাই ধর্ম। কিন্তু কোনো বিশেষ ধর্ম নয়। এর কোন মন্দির, মসজিদ, গির্জা, শাস্ত্রগ্রন্থ, আচারঅনুষ্ঠান নেই। এর কোন দীক্ষাদাতা, গুরু-পুরোহিত, মৌলবী, পাদ্রী নেই। এর অধিষ্ঠান ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতিতে, উপলব্ধিতে, হৃদয়ে। সকলের, কিন্তু যৌথভাবে নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরা নিজের মতো করে এই ধর্মকে গ্রহণ করে থাকেন। মনস্তত্ত্ববিদ দার্শনিক উইলিয়াম

জেমস একে ব্যক্তিগত ধর্ম বা পার্সোনাল রিলিজিয়ান আখ্যা দিয়েছেন। এই ধর্মের সাথে, ব্যক্তি যখন মুখোমুখি হয়, তখন সে একা। সব মানুষেরই সত্তার কেন্দ্রের কাছে একটা একাকিত্বের এলাকা আছে। ব্যক্তিগত ধর্ম কোন গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে, এর শক্তি সঞ্চয় বা প্রভাব বিস্তারের কোন প্রয়োজন পড়ে না। ফলে ব্যক্তিগত ধর্ম মানব সংসারে কোন বড় আকারের সংকট ঘটাতে পারে না। তাই সমাজে ধর্মে ধর্মে বিরোধে ব্যক্তিগত ধর্মকে দায়ী করা যায় না। দায়ী করা যায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে ধার্মিকতার থেকে প্রতিষ্ঠানকেই বড় করে দেখা হয়। তাই যে ধর্ম বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়, সমাজের মানুষের কাছে স্বাভাবিক জীবন যাপনের প্রয়োজনে তা অনভিপ্রেত। এই ধর্মবিদ্বেষ সুস্থ মানুষের জীবন কিভাবে কতটা প্রভাবিত করে থাকে তা উপন্যাসগুলির মাধ্যমে ঔপন্যাসিকেরা পাঠকের সামনে পরিবেশন করে থাকেন। প্রতিটি ধর্মের কৃষ্টি, সমাজব্যবস্থাকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করে থাকে। যার সামাজিক ভূমিকা সর্বদাই প্রতিক্রিয়াশীল।

ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও রাজনীতির অর্থ ধর্মকে ত্যাগ করা নয়। অর্থাৎ যে কোন ভারতীয়ের ধর্মীয় পরিচিতির উপরেই, তা সে যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন, ভারতীয় নাগরিক হিসেবে তার প্রাথমিক পরিচিতিকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই পরিচিতির সঙ্গে আসা নাগরিকত্বের অধিকারকে, প্রত্যেক নাগরিকের জন্য, রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কারণ এই পরিচিতি মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এই পরিচিতিকে সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, ধর্মনিরপেক্ষ রীতি-নিয়মের শাসনাধীন করতে হবে। দুই প্রকারে এই সূচনার আরম্ভ হতে পারে। প্রথমত, শিক্ষার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্যই আইনকে ধর্মনিরপেক্ষ করে তোলা। অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের সমস্ত শাখায় ভারতীয় নাগরিকদের বিভাজন ব্যতিরেকে প্রবেশাধিকার। গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের স্বার্থে, নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে মিলনের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান প্রদান করা। **'কথা'** (২০০৬) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের এক চরিত্র পীরসাহেব উপন্যাসের আরেক চরিত্র খন্দকারের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলেন –

"ঈশ্বরকে ভালোবেসে পুজো করার জন্য যুগে যুগে মানুষ অনেক রকম নাম দিয়ে অনেকগুলো ধর্মের আবিষ্কার করেছে কিন্তু মানুষকে ভালোবাসার জন্য ঈশ্বরের কাছে একটাই মাত্র ধর্ম আছে যে ধর্মের নাম মনুষ্যত্ব।"

মনুষ্যত্বই যখন সবচেয়ে বড় ধর্ম, তাহলে সমাজ কোন প্রশিক্ষনে প্রশিক্ষিত হচ্ছে?! কারণ অজস্র মানুষের মস্তিষ্কে এমন ভাবনাই প্রবাহিত হচ্ছে যে – যে আমার ধর্মের নয় সে বিধর্মী। এই মনোভাব প্রায় সব ধর্মেই বর্তমান। সে যে পক্ষেরই হোক না কেন। প্রতিটি উপন্যাসই ঔপন্যাসিকের নিজস্ব কণ্ঠস্বর। তিনি হয়তো ধর্ম দ্বন্দ্বকে তুলে ধরলেও, কখনোই ধর্মবিদ্বেষকে সমর্থন করেন না। অর্থাৎ তিনি সমাজের এক সত্যকে তুলে ধরছেন। তিনি এই সত্যের কারণে হয়তো ব্যথাতুর, তবুও উপন্যাস সমাজদর্পণ হওয়ার কারণে, তিনি বিষয়টিকে উপন্যাসের মাধ্যমে উপস্থাপন করে, পাঠককে বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাত হতে সহায়কের ভূমিকা পালন করছেন। কিন্তু সমাজের এই ধর্ম বিদ্বেষের রূপটাকে অগ্রাহ্য করতে পারছেন না। সমাজ বহুস্তরীয় এক ব্যবস্থা। এই সমাজ বহু প্রাচীনকাল থেকে নানা পরিবর্তন ও প্রচলিত ধারণার হাত ধরেই এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে সমাজে ধর্মের নানান মত, তা সে সদর্থক বা নঙর্থক যাই হোক না কেন, তা বিতর্কের সৃষ্টি করে বা বিতর্কের অবতারণা করে থাকে। যদিও এই সমস্ত মতই ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস রচনার মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসগুলো যাঁরা লিখছেন, তাঁরা সমাজের সমস্থানীয় নন, তাঁদের নিজস্ব অবস্থান ভিন্ন, তাঁদের রুচি পছন্দ ভিন্ন, তাঁদের আদর্শ ভিন্ন। তা সত্বেও তাঁরা উপন্যাস রচনার মাধ্যমে, ধর্মের যে রূপ তুলে ধরেছেন তা সমাজের নানান আঙ্গিকে ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা করছে কিনা তা গবেষণার বিষয়। কারণ তাঁদের মতামত কখনো এক হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনো মতানৈক্যও হচ্ছে। অর্থাৎ এই ছাব্বিশ বছরের উপন্যাসগুলিতে, ঔপন্যাসিকেরা ধর্মকে কিভাবে তুলে ধরেছেন তাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বর্তমান গবেষক লক্ষ্য করেছেন – ধর্মটাকে কখনোই একই ভাবে তুলে ধরা হয়নি। কোন কোন ধর্ম হচ্ছে প্রথানির্ভর ধর্ম। কোথাও কোথাও সেই প্রথানির্ভর ধর্মকেই সমর্থন করা হচ্ছে, বা সমর্থন না করলেও, কোথাও কোথাও চিরন্তন ধর্মবোধকেই সমর্থন করা হচ্ছে। প্রত্যেক ঔপন্যাসিকের ধর্মের বিশ্লেষণ পৃথক পৃথক। সমাজে ধর্ম কিভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে – তা উপন্যাসে, ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরাই বর্তমান গবেষকের অন্বেষণের বিষয়বস্তু।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

গবেষণার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ধর্মের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আলোকপাত করলে দেখা যাবে যে মানুষের ভাবনার বিবর্তনের ইতিহাসে ধর্ম অত্যন্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানব সৃষ্টির সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের জীবনে ধর্ম এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সর্ব ব্যাপক প্রভাব রূপে বিরাজিত। ধর্মের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হিসেবে ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, জীবজন্তু ইত্যাদি ভৌগোলিক পরিস্থিতির বিবরণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কারণ মানুষের ধর্মের ইতিহাস, প্রকৃতির প্রভাব নির্ভর। ধর্মের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট শুধুমাত্র ধর্মের ইতিহাস জ্ঞাত হওয়ার উপায় নয়, প্রকৃত ধর্মের চরিত্র ও নীতির বিবর্তন প্রকাশিত হয়ে ওঠে। কারণ মানুষের অজ্ঞানতা, অসহায়তা কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতাকেই উত্তম নীতি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রাচীন ধর্মের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটই আধুনিককালের ধর্মের ইতিহাসের প্রত্যক্ষ অবলম্বন হয়ে ওঠে। ধর্মের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসই সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ধর্মকে কখনো গ্রহণযোগ্য আবার কখনো ব্রাত্য করে তোলে। তাই যেকোনো বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। ঐতিহাসিক উপাদানের পরিচিতি, দুর্বলতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিষয়কে স্বচ্ছতা দান করে। ধর্মের উদ্ভবের ও সক্রিয়তার ইতিহাস পর্যালোচনায় একটা বিষয় স্পষ্ট হয় যে, ধর্ম নির্ভরতার মূলে, মানুষের দৌর্বল্যবোধ ও জীবনযুদ্ধে নিজের 'অস্তিত্ব বাঁচানোর প্রচেষ্টা' যা পরবর্তীকালে 'সমৃদ্ধ জীবন লাভের প্রত্যাশা'য় পরিণত হয়। মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতিতেই এই 'অস্তিত্ব বাঁচানোর প্রবল প্রচেষ্টা' ও 'সমৃদ্ধ জীবন লাভের প্রত্যাশা' লুকিয়ে থাকে। মানুষের এই প্রকৃতিগত প্রচেষ্টা ও প্রত্যাশার কারণেই মানুষ তার পারিপার্শ্বিক পার্থিবজীবনে এক অতিমানবীয় শক্তির কল্পনাকে প্রাধান্য দিয়ে সেই অনুসারে জীবন কাটাতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এভাবেই মানব সমাজের ইতিহাসে একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্মের স্থান সর্বজনবিদিত।

ধর্মকে জানতে গেলে মানুষের আদিম পরিস্থিতি জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত জরুরী। মানুষের আদিম পরিস্থিতি সম্পর্কে, **'কাশ্যপেয়'** (১৯৯০) উপন্যাসের ঔপন্যাসিক ডঃ দীপক চন্দ্র উপন্যাসস্থিত প্রধান চরিত্র কশ্যপের অতীতচারনের বিবরণে লিখেছেন যে –

"আদি পুরুষের নাম ছিল পরশুরাম। প্রথমে কি নাম ছিল কেউ জানে না। পরে ওই নামে পরিচিত হয়েছিল।....খোলা আকাশের তলায় বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে, বন্য পশুর সঙ্গে লড়াই করে শরীরটা হয়েছিল ইস্পাতের মত। পশুর মত বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে জীবন কাটাতে তার পছন্দ নয়। মনে তার প্রশ্ন, একটা ছোট্ট পাখিও গাছের কোটরে গর্ত করে তার

নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করো....ইতর প্রাণীও মাটি খুঁড়ে তাদের নিরাপদ আশ্রয় গড়ে তোলে। তাহলে মানুষই-বা পারবেনা কেন, তার নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করতে? কেন? এই প্রশ্নে আকুল হল তার মন। একদিন উঁচু পাহাড়ের সমতল স্থানে গাছের ডাল পাতা দিয়ে তৈরি করল তার প্রথম কুঁড়ো। মানুষের সেই আদি বাসগৃহ নির্মাণের কৌশল তাকে গোষ্ঠীর অধিপতি করেছিল। পরশুরাম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ।....একদিন উপলব্ধি করলো তার বুদ্ধি আর কৌশল গ্রহণের শক্তিকে।"

এভাবে ঔপন্যাসিক ডঃ দীপক চন্দ্রের উপন্যাস **'কাশ্যপেয়'** (১৯৯০) থেকে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তা থেকে বলা যেতে পারে – আদি পুরুষ পরশুরাম মানুষের মধ্যে পশুর চেয়ে অতিরিক্ত এক শক্তিকে উপলব্ধি করেছিলেন। সেই শক্তির নাম বুদ্ধি ও কৌশল গ্রহণ। পরশুরামের একাদশ পুরুষ হলেন মনু। এই মনুর সময়ে মানুষের যাযাবর জীবনের অবসান হয়েছিল। মানুষ পরিবার, বাসগৃহ, বাসভূমি, কৃষিকাজ, পশুপালন ইত্যাদির দ্বারা সমাজ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছিল। এই সময় প্রতিপালক প্রকৃতিকে কৃতজ্ঞতা অর্পণের জন্য প্রকৃতিকে, মানুষ দেবজ্ঞানে পুজো করতো। গোষ্ঠী বা পরিবারের প্রধানকে 'মনু' বলা হত। অর্থাৎ গোষ্ঠী অধিপতি বা পরিবারের প্রধানের উপাধি ছিল মনু। এই মনুগণ তৈরি করেছে নানাবিধ প্রথা এবং রীতিনীতি। মানুষের সমাজ এভাবে বিস্তৃত হলো। রীতিনীতি নির্ধারিত হল। সমাজের প্রথম নেতা হলেন মনু। এই মনুকে কৃতজ্ঞতা জানাতে মানুষের পূর্বপুরুষ, মনুর নামানুসারে নিজেদের পরিচয় দিল 'মনুষ্য' বলে। মনু থেকেই সমাজ ও সভ্যতার পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তাই তারা হ'ল মানব। এই সময়ে মানুষ, নিজেদের মধ্যেকার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কুসংস্কার, বিশ্বাসকেই তার নিজের জীবনের অনিষ্টের হেতু বলে মনে করত। প্রত্যেক মানুষ সাম্যে বিশ্বাসী ছিল। মানুষ আত্মশক্তিতে শক্তিমান ছিল। মানুষের কর্মেই মানুষের পরিচয় প্রকাশিত হতো। কর্মের দ্বারা আত্মজাগরণ ঘটে থাকে, ফলে সমস্ত সমাজের প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি মানুষকে সুখী করার শ্রেষ্ঠ সুখে নিজেকে রত রাখতো। এই বোধই মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব, অমরত্ব প্রদান করে। কর্তব্যচ্যুতিকে অপরাধ বলে গণ্য করা হতো। এই অনুভূতির পূর্ণতায় মানুষ নিজেই নিজেকে দেবতারূপে প্রতিষ্টিত করতে বদ্ধপরিকর ছিল।

পুরাণ মানব সভ্যতার প্রাচীনতম ঘটনাবলীর বিবরণ। পুরাণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। পুরাণে মানুষের ইতিবৃত্তান্ত, মানুষের পরিচয়, কথা ও কাহিনীর উপকরণ সন ও তারিখের ভিত্তিতে লেখা হয়নি। কিন্তু পুরাণ ইতিহাসের উপাদানের যোগান দিয়েছে যা প্রাচীন সভ্যতার পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ঐতিহাসিক

কাঠামোয় পুরাণ কাহিনী মানব সভ্যতার প্রাচীনতম যোগসূত্রকে প্রতীকী চিত্র রূপে তুলে ধরেছে যা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এক অসাধারণ দলিল হয়ে উঠেছে।

ঔপন্যাসিক রমাপতি বসুর উপন্যাস **'মেমবোষ্টমী'**-তে (১৯৮৮) তাঁর উপন্যাসস্থিত চরিত্র প্রখ্যাত পন্ডিত গৌরিনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ 'বিষ্ণু – বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস' শীর্ষক আলোচনা সভায় বলছেন –

"খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে ঋগ্বেদে বিষ্ণুদেবতার সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও ঋগ্বেদের সঠিক কাল নির্ণয় নিয়ে বিতর্কের অবতারণা দেখা গেছে, তবু একথা সত্য যে সাম্প্রতিক কালে কতকগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার আমাদের এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসতে সহায়তা করেছে। প্রথমতঃ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর নগর সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে আর্য জাতির ভারতে আগমনের পূর্বে সিন্ধুনদের অববাহিকায় এক স্বতন্ত্র নগরভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। তার বিকাশকাল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ বলে নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় সহস্রাব্দের ওদিকে ঋগ্বেদকে স্থাপন করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে হিসাইট নামে এক জাতি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রারম্ভে মেসোপটেমিয়াতে আধিপত্য বিস্তার করে। এই রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে অর্থাৎ উত্তর সিরিয়াতে মিট্টানি নামে আরেক জাতির রাজ্য ছিল। উভয় জাতিই প্রাচীন ভারত – ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করত। এই পরিবেশে একটি দলিল আবিষ্কৃত হয়েছে – যার কাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৮০। এটি একটি সন্ধিপত্র। এই সন্ধিপত্রে দেখা যায় এক পক্ষে ছিলেন হিসাইটদের রাজা সুবিলুলিয়াজু ও অপর পক্ষে ছিলেন রাজা দসরভের পুত্র মত্তিয়ুয়াজা। এই সন্ধিপত্রে কয়েকজন দেবতার নাম স্মরণ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র এবং নাসতা ভাতৃদ্বয়। এঁরা সকলেই ঋকবেদে উল্লেখিত দেবতাগণ। সুতরাং একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলের মানুষ ঋগ্বেদের দেবতাদের নামের সহিত পরিচিত ছিল। সুতরাং ঋগ্বেদের কাল যুক্তিসঙ্গতভাবে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্থাপন করা যায়।"

ভারতের সনাতন সাহিত্যের ইতিহাসে দীর্ঘদিন ধরে বৌদ্ধিক চেতনাসম্পন্ন মনীষী ও গবেষক ঋষিকুলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বেদ, উপনিষদ, পুরাণ রচিত হয়েছিল।

"সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের মধ্য দিয়েই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার সূচনা ঘটে। ভারতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সংস্কৃতের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। শুধু বৈদিক বা পৌরাণিক হিন্দু ধর্মই নয়, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের মতো বেদপ্রামাণ্যবিরোধী ভাবধারাসমূহ, গোড়ার দিকে ভিন্নপথাবলম্বী হলেও, শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষাকেই নিজেদের বক্তব্য প্রচারের উপযুক্ত বলে গ্রহণ করেছিল।" (ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্রনাথ, ২০১৫)

ভারতবর্ষের বেশিরভাগ ধর্ম ও মত বৈদিক ধর্ম ও দর্শনের আভাস অবলম্বনে সৃষ্ট হয়েছে। বেদ হল অমোঘ শাশ্বত সত্য। প্রকৃতির প্রকৃতরূপ সঠিকভাবে বেদে ব্যক্ত হয়েছে। দশ ইন্দ্রিয় যা সহজ-সরলভাবে অনুভব করতে সক্ষম তা সবই বেদে স্পষ্টভাবে সংযুক্ত হয়েছে। কথিত আছে, ব্রহ্মার মুখ থেকেই বেদের সৃষ্টি।

"ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বলে কোন ধর্ম কোন দিনই ছিল না, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণদের প্রভাব ছিল অপরিসীম....বেদপ্রামাণ্যবিরোধী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব ব্রাহ্মণদের হাতেই স্বাভাবিকভাবে চলে এসেছিল।....বৌদ্ধ আচার্যগনও ছিলেন প্রধানত ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শনের বিকাশ প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণদের হাতেই হয়েছিল। এই কারণেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ব্যাখ্যামূলক ও দার্শনিক সাহিত্য কালক্রমে পালি ও প্রাকৃতের পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হয়।" (ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্রনাথ, ২০১৫)

কিন্তু উপনিষদ হ'ল সংবেদনশীল বা ভাবগ্রাহ্যিক। বেদের প্রতিটি বিষয়কে সঠিক মনোভাবের দ্বারা, সুপরামর্শের দ্বারা, অতি সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির দ্বারা অনুভব করানোই উপনিষদের তাৎপর্য বা গূঢ় অর্থ। ঈশ্বরের মূল্যায়ন উপনিষদেই বর্তমান।

"উপনিষদ তিন ভাগে বিভক্ত – ঈশোপনিষদ, কঠোপনিষদ ও কেনোপনিষদ।.... চারটি বেদ – ঋগ্, সাম্, যজু ও অথর্ব বেদ।" (শ্রীজিতেন্দ্রমোহন, ১৯৬৫)

জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋকবেদে দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য নানারকম স্তুতিগান বর্তমান। বিভিন্ন মন্ত্র ও ছন্দ যোগে গানের পরামর্শ দেয় সামবেদ। পূজা ক্রিয়াদির বিবিধ অনুশাসন যজুর্বেদে বর্তমান। অথর্ব বেদে বশীকরণ, উচাটন, স্তম্ভন এইরকম নানান নিকৃষ্ট কাজের পদ্ধতির উল্লেখ আছে। তাই অথর্ববেদকে এই কারণে অনেকে বেদ পদবাচ্য বলে মনে করেন না। তন্ত্রশাস্ত্রকে 'পঞ্চম বেদ' নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। চারটি উপবেদ – আয়ু, গন্ধর্ব, দণ্ডনীতি, ধনুর্বেদ। ছটি বেদাঙ্গ – শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরন, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। শিক্ষা থেকে বৈদিক সুক্ত উচ্চারণ করে স্বরসংযোগে গান করার শিক্ষালাভ হয়। কল্প হ'ল বেদের সূত্রগ্রন্থ। বৈদিক সাহিত্যের পরিচয় বহন করে ব্যাকরন। বৈদিক শব্দের ও বাক্যের অর্থ স্থিরীকৃত, গ্রন্থ নিরুক্ত। ছন্দ সাত প্রকার। গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুভ, বৃহতি, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ ও জগতি। এদের সাহায্যেই বেদের তাৎপর্য অতিশয় সুন্দরভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। আর আছে পুরান, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র। ছয়টি দর্শনশাস্ত্র – বেদান্ত, যোগ, সন্ধ্যা, মীমাংসা, বিশেষ ও ন্যায়। ভারতবর্ষ বহু প্রাচীন সভ্যতার এক নিদর্শন, যার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম, শাস্ত্র বর্তমান। শঙ্করাচার্যের 'সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ' সারাবিশ্বে এক অসাধারণ ঐশ্বর্যরূপে গণ্য হয়। কর্মশক্তির দ্বারা, ভক্তির

দ্বারা একজন মানুষ যা করতে পারে, তা একসাথে বহু মানুষের দ্বারা সম্ভব। কর্ম কঠিনতম হলেও, পরীক্ষা কষ্টকর হলেও মানুষের পক্ষে তাকে উত্তীর্ণ করা নিশ্চিত ভাবে সম্ভব – এই বিশ্বাস জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষেরই অভীষ্ঠ। সমাজস্থ মানুষের মধ্যে শঙ্করাচার্যের এই বেদান্ত ধারণা, মানুষকে জীবনের যেকোনো বিষয়ে জয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে, ফলে মানুষ কখনোই কর্মবিমুখ হতে হয়তো চাইবে না। মানুষের মন সমস্ত ভূতের উৎস। মানুষের ইচ্ছাশক্তির উপর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় প্রতিষ্টিত। পাশ্চাত্যের বিবর্তনবাদও এই ইচ্ছা শক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টিতত্ত্ব ইচ্ছাময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় যাই হোক না এই সমস্ত তত্ত্বই শাস্ত্র সমর্থিত। তাই সমজস্থ মানুষের মানসিক ও আত্মিক ইচ্ছাশক্তি সমাজের মঙ্গলার্থে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

"ঋগ্বেদের যুগের শেষ পর্যায়ে যখন পশুপালনমূলক অর্থনীতির পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রসার হয়, প্রাক্-বৈদিক মাতৃদেবী ও তৎসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠানাদি বৈদিক সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবেই স্থান করে নেয়। এক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে বৈদিক সাহিত্য রচিত হতে সময় লেগেছিল ছয় শত বৎসর, এবং এই সাহিত্য কোন একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী বা ভাষাগোষ্ঠীর দ্বারা রচিত নয়। কোন একটি সংস্কৃতির কথা এখানে বলা হয়নি, বহু সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ এখানে ঘটেছে।" (ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্রনাথ, ২০১৫)

কর্মচক্রের ব্যাখ্যায় জানা যায় বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিই ব্রহ্ম। আনন্দই ব্রহ্ম। কর্মচক্রে সমস্ত কর্ম আনন্দের অন্তর্গত সেই কারণে সকল কর্ম একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত ও একে অপরের উৎস। কর্মচক্রে কোথাও থেমে যাওয়ার নির্দেশ নেই এবং তা সম্ভবও নয়। কর্ম দুই প্রকার। জাগতিক কর্ম ও পারমার্থিক কর্ম। বেদোপনিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মানুষকে এই কর্মচক্রের শিক্ষায় প্রকৃত শিক্ষিত করে তোলা।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস ও সংস্কৃতি হলো পুরাণ। প্রাচীন ভারতের সাধনার পথ হ'ল মোক্ষের পথ, যা অমৃতের সন্ধানরত। পুরাণের প্রতি পৃষ্ঠায় তার নানান আখ্যান লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, চেতনার চিন্তন রয়েছে এই আখ্যানগুলিতে। কিন্তু তার বিচার বিবেচনার ধারায় জটিলতা রয়েছে। এই জটিলতা কাটিয়ে শাশ্বতসত্য অন্বেষণ করলে, প্রাচীন ভারতের এক আশ্চর্য, সুন্দর, উন্নত সভ্যতার অসাধারণ উপলব্ধির এবং অনুভূতির প্রাপ্তি সম্ভব হবে।

"পুরাণ প্রাচীন আখ্যায়িকা সম্বলিত গ্রন্থ। বৈদিক সাহিত্য অনুসারে পুরাণ ও ইতিহাস এক জিনিস। বেদের পরবর্তী যুগের আখ্যায়িকা ধর্মীয় আলোচনা, দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, মনুষ্যাদির বৃত্তান্ত নিয়ে এই পুরাণ। পুরাণ আঠারোটি। ব্রহ্ম পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, শিব

পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, নারদ পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, ভবিষ্যৎ পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, বরাহ পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, বামন পুরাণ, কুর্ম পুরাণ, গরুড় পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।" (চন্দ্র, দীপক, ১৯৮৩)

অষ্টাদশ পুরাণ ভারতীয় সনাতন সাহিত্যে এক অনন্য সাধারণ ও অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য বলা যেতে পারে। এরপর বহু বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সমৃদ্ধ জীবনলাভের প্রত্যাশায়, জীবনযুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার আশায়, মানুষের মানসিক কাতরতায় ও মানসিক অসুস্থতায় জীবন হয়ে উঠেছে উশৃংখল। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে প্রয়োজন – পুরাণাশ্রিত জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর যা প্রকৃতপক্ষে কল্পকাহিনীর আশ্রয়ে আধ্যাত্বিক গবেষণার উন্মেষণ। এই পুরাণকথিত দার্শনিক অভিজ্ঞান সাধারণ মানুষের 'অস্তিত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা' ও 'সমৃদ্ধ জীবন লাভের প্রত্যাশা' প্রাপ্তিতে জীবনযাত্রার মান ও নৈতিকতার উন্নয়নে আধ্যাত্বিক পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কারণ এই পুরাণগুলির ভিতরের সাহিত্যতত্ত্ব মূল্যায়ন করতে গেলে এই অনুধাবন হয় যে, দীর্ঘ সময় ধরে অসাধারণ পথপ্রদর্শক পন্ডিতবর্গের সাহায্যে পুরাণগুলি রচিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতার সামগ্রিক মূল্যায়নই দর্শন। দর্শনের লক্ষ্য হল সমগ্র জাগতিক অখন্ড সত্যকে জ্ঞাত হওয়া। সত্য কখনোই খন্ডে অবস্থান করে না, তা সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত থাকে। আদিম-অসহায় মানুষের, সর্বক্ষণ জীবনযুদ্ধে রত থেকে দার্শনিকতত্ত্ব চিন্তা করার অবকাশ ও অবসর কোনটাই থাকত না। কারণ খাদ্য, বাসস্থান ও নিরাপত্তার সমস্যাতে মানুষের জীবন ছিল উদ্বেগময়। মানুষের জীবন কিছুটা সমাজবদ্ধ হয়ে সুসংহত হওয়ার পরে যে অবসরপ্রাপ্তি মানুষের ঘটলো তার থেকেই মানুষ জীবনঅভিজ্ঞতা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা শুরু করলো। এভাবে পরবর্তীকালে মননশীল মানুষের জীবনে অতি ধীর পদক্ষেপে জীবনদর্শন ভাবনার সূচনা হলো। অর্থাৎ মানুষের, দর্শনচিন্তার পূর্বেই মানুষের মধ্যে অসহায়তার থেকে মুক্তি পাওয়ার কারণে, মানুষ এক কাল্পনিক অতিমানবীয় শক্তি 'ঈশ্বর'এর কল্পনা করল। এরপরে মানুষের মননে দার্শনিকভাবনার আগমন হয়। ধর্মৎপত্তির মূলে হলো মানুষেরই মন। বিবর্তন ধারায় অপ্রকাশিত ক্রমশই প্রকাশিত হয়েছে। অনগ্রসর ক্রমশ অগ্রসর হয়েছে। বিবর্তনের এই ধারা মানুষের মনোজগতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আদিম মানুষের 'জড়বোধসম্পন্ন' মনই ক্রমবিবর্তনের ফলস্বরূপ বর্তমানের 'উন্নতবোধসম্পন্ন' মনে পরিণত হয়েছে। তাই বলা যেতে পারে – জড়বোধ, জড়বস্তুর ধারণা নির্মাণ করতে পারলেও, বিমুর্ত ধর্মীয় ধারণা নির্মাণে পটু হতে পারে না। আসলে আদিম মানুষের ধর্মচেতনার ধারণা থাকা সম্ভব নয়, কারণ ধর্মীয়চেতনাকে অনুভব করার জন্যেও

মানুষকে কিছুটা মানসিকভাবে অনুভূতিসম্পন্ন হতে হয়েছে এবং এর জন্য মানুষকে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করতে হয়েছে।

এর পরবর্তী সময়ে, ভারতবর্ষের সাধনা, সংকল্পের ইতিহাস দুটি মহাকাব্যের মাধ্যমে ভারতের চিন্তা, চেতনাকে বিস্তৃত করেছে এক মহাকাব্যিক পরিবেশনায়। তবে রামায়ণ ও মহাভারত কাব্য দুটির রূপ পরিবেশনের ক্ষেত্রে কিছু স্বরবৈষম্য বা অনৈক্য বর্তমান। মহাভারত প্রধানত মহাপুরাণ – ভারতপুরাণ আখ্যান। মহাভারত ভারতের ভাবনা-অনুভূতির অনুরণন। মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেব। 'ব্যাস' কথাটির অর্থই বিস্তৃতি বা বিশালতা। মহাভারতের রচনার ইতিহাসে দেখা যায় – ব্যাসদেব বলছেন, গণদেবতা লিখে চলেছেন। এই গণদেবতা অর্থাৎ বহু যুগ ধরে নানান জনের মননের প্রতিচ্ছবি, এই মহাকাব্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তাই মহাভারত কাব্যে ভারতবর্ষের প্রাচীন, মধ্যবর্তী ও বর্তমান কালের সামগ্রিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ফলাফলের এক বিন্যাস ধরা পড়ে। তাই মহাভারত শুধুমাত্র মহাকাব্য নয়, এক মহাবিস্ময়কর গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। কিন্তু রামায়ণ প্রধানত মহাকাব্য হিসেবেই গ্রাহ্য হয়। বাল্মিকী রামায়ণের একক কবি। রামায়ণের আবেদন মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। রামায়ণ আদর্শ ও মূল্যবোধের অমৃতবাণী পরিবেশন করেছে যা মানুষের মঙ্গলচেতনাকে জাগ্রত করতে সাহায্য করেছে। তাই দুটি মহাকাব্যই মহৎ বা মহান সম্পর্কিত মন্ত্রের ধারক। দুটি মহাকাব্যেরই রচনাকাল নিরূপণ করা সঠিক ভাবে সম্ভব হয়নি।

"রামায়ণ-মহাভারতের পৌর্বাপর্যনির্ণয় প্রায় অসম্ভব বললেও চলে। মহাগ্রন্থ দুটির কোন একটির রচনাকাল নির্ণীত হলে তারই আলোকে অন্যটির সময় নিরূপনের চেষ্টা করা যেত কিন্তু দুটির রচনাকালই অনিশ্চিত বলে তা সম্ভব হয়নি।....মহাভারতে 'রামোপাখ্যানে'র সংক্ষিপ্তসার আছে বলে এবং অন্যত্রও রামকথার আরও উল্লেখ আছে বলে রামায়ণকেই পূর্ববর্তী রচনা বলেছেন অনেকে। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় বলে মনে হয় না। কারণ রামায়ণে মহাভারতের বহু চরিত্র ও উপাখ্যানেরই উল্লেখ আছে। অর্জুন, বাসুদেব, জনমেজয়, রাধেয়, পাঞ্চজন্য, নহুষোপাখ্যান, ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান, নল-দময়ন্তী উপাখ্যান, পুরূরবা-উর্বশী উপাখ্যান ইত্যাদির উল্লেখ আদৌ উপেক্ষা করা চলে না। তাছাড়া রামায়ণের 'কচ্চিৎ সর্গটি' মহাভারত থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে করা হয়।" (চাকী, ২০১১)

রামায়ণকে আদিকাব্য বলা হয় কারণ রামায়ণের রচনা, মহাভারত রচনার বহুপূর্বে, বাল্মীকির পূর্বপুরুষ মহর্ষি চ্যবনের দ্বারা শুরু হয়েছিল। তবে তিনি তা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। পরে চ্যবনের বংশের উত্তরপুরুষ বাল্মিকী সেই গ্রন্থ শেষ

করেন। চ্যবন ও বাল্মীকি দুজনাই তপস্যার সময়ে বাল্মীকে আচ্ছাদিত হন। এইটি এক বিস্ময়কর পুনরাবৃত্তি। রামায়ণে আর্য ও আর্যেতর দুটি সভ্যতাই দৃশ্য হয়। আর্যেতর সভ্যতার একটি হলো বানর সভ্যতা, অপরটি রাক্ষস সভ্যতা। মহাভারতেও রাক্ষস সভ্যতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভীমের পত্নী হিড়িম্বা রাক্ষস সম্প্রদায়ের কন্যা ছিলেন। ভীম এবং রাক্ষসী হিড়িম্বার পুত্রের নাম ছিল ঘটোৎকচ। রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যের – আদর্শ, রাজনৈতিক নীতি, সামাজিক নীতি, ধর্মীয় নীতি এগুলি সবই নিজস্ব ক্ষেত্রে পৃথক সত্বায় অবস্থিত। একটির সূচকে অন্যটিকে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই দুটি মহাকাব্যই সমাজস্থ মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যাল লিখিত **'প্রসঙ্গঃ নরক / দান্তে অনুসরণে'** (১৯৯৭) উপন্যাসে লেখক কথকের বয়ানে বলছেন –

"বিশ্বসাহিত্যে অনুবাদ গ্রন্থের প্রভাব যে কী প্রচণ্ড তা আমরা সচরাচর খেয়াল করে দেখি না – অনেকটা যেমন সচেতনভাবে টের পাই না, বাতাসে অক্সিজেনের অস্তিত্ব অথবা সূর্যালোকে প্রাণদায়ী জীবনীশক্তির বিদ্যমানতা। চর্যাপদ ব্যতিরেকে বঙ্গভাষায় প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি অনুবাদিত মহাকাব্য : কৃত্তিবাসী রামায়ণ। সমগ্র উত্তর ভারতে যে গ্রন্থটি সর্বাধিক পঠিত, সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, তা তুলসীদাসজীর 'রামচরিতমানস'। এবং বর্তমানের এই ইলেকট্রনিক যুগে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় টি.ভি. সিরিয়ালের শ্রেষ্ঠ কাহিনীকারকে পুরস্কৃত করতে হলে আমাদের কয়েক হাজার বছর পিছিয়ে গিয়ে খুঁজতে হবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে।"

এই কারণেই 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' এই দুটি মহাকাব্যই দূরদর্শনে ধারাবাহিক পর্বরূপে দর্শকের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল। প্রথমত রামায়ণ শুরু হয়েছিল ২৫ শে জানুয়ারি ১৯৮৭ সালে। সমাপ্ত হয়েছিল ৩১ শে জুলাই ১৯৮৮ সালে। ৭৮টি ধারাবাহিক পর্বে রামায়ণ মহাকাব্যকে দর্শকরূপ সমাজের মানুষেরা দেখেছিলেন। ডিডি ন্যাশনালে প্রতি রবিবার সকাল সাড়ে ন'টা থেকে দশটা অবধি দেখানো হতো এই রামায়ণ ধারাবাহিকভাবে। পরিচালক ছিলেন রামানন্দ সাগর। এই রামায়ণকে অতিমারীর সময়ে পুনরায় দেখানো শুরু হয়। ২৮ শে মার্চ ২০২০ থেকে প্রতিদিন এক ঘন্টা করে সকাল ন'টা থেকে দশটা পর্যন্ত ডিডি ন্যাশনালে দেখানো হতো। আর মহাভারত দেখানো শুরু হয়েছিল ২ রা অক্টোবর ১৯৮৮। শেষ হয়েছিল ২৪ শে জুন ১৯৯০। পরিচালক ছিলেন বি.আর. চোপড়া। ৯৪ টা ধারাবাহিক পর্ব ছিল। ডিডি ন্যাশনালেই দেখানো হতো প্রতি রবিবার সকাল ১০ টা থেকে ১১ টা অবধি। অতিমারীর সময়ে মহাভারত পুনরায় দেখানো শুরু হয় ২৮ শে মার্চ ২০২০।

প্রতিদিন, ডিডি ভারতীতে, সকাল ন'টা থেকে দশটা আবার রাত ন'টা থেকে দশটা পরবর্তী ধারাবাহিক পর্ব দেখানো হতো। আসলে অতিমারীর সময়ে, মানুষ দীর্ঘদিন ধরে, একপ্রকার বন্দিজীবনের মুখোমুখি হওয়ার কারণে যে বিষণ্ণতার শিকার হয়েছিল, তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই হয়তো এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। কারণ ওই সময়ে মানুষের বন্দী কর্মবিরতির জীবন মানুষকে চরম বিষণ্ণতার মুখোমুখি করেছিল। ফলতঃ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা প্রভাবিত হওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে যে বিষন্নতার মেঘ পুঞ্জিভূত হয়েছিল, তা তাকে অনেক সময় আত্মহত্যা অথবা হিংস্রতাতে উদ্বুদ্ধ করছিল। এই অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার কারণেই হয়ত অতিমারীর সময়ে এই দুই মহাকাব্যের আদর্শ ও ধর্মীয় বাতাবরণকে সমাজের মানুষের মধ্যে পুনরায় প্রদর্শিত করা হয়, যাতে মানুষের মানসিক স্থিরতা ও সুস্থতা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃত শ্রীমদ্ভগবদগীতা বিশ্বসাহিত্যে এক সর্বজনীন ও সর্বকালীন আবেদন। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মেরই নিজস্ব পবিত্র গ্রন্থ বর্তমান। হিন্দু ধর্মের অবলম্বনকারীদের কাছে শ্রীমদ্ভগবদগীতা এক ঐতিহাসিক আদর্শ, ধর্মভাবযুক্ত ঘটনাপ্রবাহ ও আধ্যাত্মিক যোগবিজ্ঞান রূপে গণ্য হয়। এটিই বেদের অন্তভাগস্বরূপ উপনিষদ। দেশ-কাল-বর্ণ-ধর্ম-সম্প্রদায়-পরিস্থিতি সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে, এই অদ্বিতীয় সনাতন ধর্মগ্রন্থ কল্যাণকর সাধনার বর্ণনা, সর্বজনের মঙ্গলকামনায় তুলে ধরেছে।

"সমস্ত দর্শন গীতায় অন্তর্গত। কিন্তু গীতা কোন দর্শনের অন্তর্গত নয়। দর্শন শাস্ত্রে জগৎ কী, জীব কী এবং ব্রহ্ম কী – এসব পঠিত হয়। কিন্তু গীতা পাঠ করায় না, অনুভব করায়। গীতা কোন মতের প্রতি আগ্রহ উৎপন্ন করে না, তার আগ্রহ কেবল জীবের কল্যাণসাধন।" (রামসুখদাস, ১৯০২)

গীতার মূল বক্তব্য সকল জীবের মঙ্গলসাধন। গীতায় সমগ্রের সাথে দর্শন হয়। কারণ সমস্ত কিছুর মধ্যেই পরমাত্মার অবস্থান অর্থাৎ পরমাত্মাই একমাত্র সত্য। গীতা এই ভাবই, সর্বাংশে প্রকাশ করে। সব কিছুই পরমাত্মা – এটি উন্মুক্ত নয়নের পরম ধ্যান। সংসারে প্রতিটি বস্তু ও ব্যক্তির সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সম্পর্ক বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি মমত্ব জাগ্রত করে ও কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করে। গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ যেকোনো একটি যোগকে অবলম্বন করলেই, তিনটি যোগেরই প্রাপ্তি ঘটে। কারণ পরা এবং অপরা দুটি প্রকৃতিই ঈশ্বরের। জ্ঞানযোগ পরাকে অবলম্বন করে আর অপরা প্রকৃতিকে অবলম্বন করে কর্মযোগ। কিন্তু

পরমপ্রেম অথবা ভক্তির পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার শর্ত হলো, সাধক স্বমতের ওপর আগ্রহান্বিত হতে পারবেন না আবার অন্যের মতকে খণ্ডন বা নিন্দা করতেও পারবেন না। অর্থাৎ পরম প্রেমের মাধ্যমে সকল মতকেই প্রাধান্য দিতে হবে। তাহলে স্বভাবতই মানুষের প্রতি মানুষের কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধিকার রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। সম্পর্ক সমৃদ্ধ হবে।

"গীতা অনুযায়ী শুধু আত্মসমর্পণই নয়, আত্মজ্ঞান এবং আত্মোপলব্ধিও একই সঙ্গে প্রয়োজনীয়। ভাগবতপুরাণ নিঃসন্দেহে বৈষ্ণব গ্রন্থ। মধ্যযুগের যাবতীয় ভক্তি আন্দোলনের প্রেরণা এই গ্রন্থ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মধ্যযুগ থেকেই ভারতের নানা প্রান্তে স্থানীয় ভাষায় আঞ্চলিক সাহিত্য রচিত হতে শুরু করে। এই রচনাকার্যে মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের প্রবক্তারা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন ভাগবত পুরাণের অনুবাদ দিয়েই।" (ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্রনাথ, ২০১৫)

মধ্যযুগের এই রচনাকার্যের মধ্যেই চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ইত্যাদি কাব্যগুলি স্থান পেয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যে সামুদ্রিকবাণিজ্য সমৃদ্ধির যে চিত্র উঠে এসেছে এবং চাঁদ সওদাগরের সাথে মনসার যে বিবাদকাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তা শত শত বছর আগে বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত ছিল বলেই সাম্প্রতিককালের উপন্যাসগুলিতে ধরা পড়েছে অর্থাৎ পুরনো কাঠামোয় যেন মধ্যযুগের নতুন মাটির প্রলেপে চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল জাতীয় ধর্মকাব্যপ্রতিমা নির্মিত হয়েছে। এই মধ্যযুগের ইতিহাস প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্যের উপন্যাস **'অন্তপ্রহর'**-এ (২০১১) ঔপন্যাসিক কথকের ভূমিকায় বলেছেন –

"লক্ষ্মণসেনের রাজসভাতেও জাঁকজমকের অভাব নেই।....ইনিও বেশি বয়সে সিংহাসনে বসেছেন বলেই সম্ভবত যুদ্ধবিগ্রহের চেয়ে নৃত্যগীত, কাব্যচর্চায় অধিক সময় ব্যয় করেন। তাঁর রাজসভায় সুকবি ও সুপণ্ডিতদের মেলা বসে যায়। জয়দেব, গোবর্ধন এবং ধোয়ীর মতো কবি তাঁর সভা অলংকৃত করেন। জয়দেব ইতিমধ্যেই গীতগোবিন্দম্ বলে একটি কাব্য রচনা করেছেন। ধোয়ী কবির পবনদূত তো দেশবিখ্যাত। মহাপণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র রাজ্যের ধর্মাধিকারী নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও সুবিদিত। বহু গ্রন্থের রচয়িতা হলায়ুধ মৎস্যসুক্ত বলে যে গ্রন্থটি রচনা করছেন তার উদ্দেশ্য হল মানুষের ধর্মজীবনে শৃঙ্খলা আনয়ন করা। তান্ত্রিক কদাচার তাঁর পছন্দ নয়। আবার গৌড় থেকে তন্ত্রচর্চা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় তাও তিনি চান না। বস্তুত তিনি লক্ষ্মণসেনের পরামর্শেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধবজা তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। শৈব ও বিষ্ণুপূজকদের মধ্যেও তিনি সমন্বয়ের চেষ্টা করছেন তাই বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব, বিষ্ণুসর্ব্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থরচনা করেছেন। বুদ্ধপূজকদের প্রভাব নিশ্চিহ্ন করার জন্য এগুলির বড় প্রয়োজন ছিল বলেই তিনি মনে করেন। হলায়ুধের ভ্রাতারাও এ কর্মে তাঁর সহযোগী। এক ভ্রাতা পশুপতি মিশ্র সংস্কার-পদ্ধতি নামে এক স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেছেন।

অপর ভ্রাতা ঈশান লিখেছেন আহ্নিক-পদ্ধতি। এঁদের রচিত স্মৃতি ও মীমাংসাশাস্ত্রের গ্রন্থগুলি সমগ্র গৌড়দেশে অহরহ চর্চিত হয়।”

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে বৈদিক যুগের মতোই মধ্যযুগও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যুগেও যে বিশাল সাহিত্য সম্ভার রচিত হয়েছে এবং তা হতে ধর্মীয় ও দার্শনিক ভাবনার যে সমস্ত ইতিহাস রচিত হয়েছে, পরবর্তীসময়ে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে তার প্রভাব অনস্বীকার্য। হরি বর্মা, বল্লাল সেন, লক্ষণ সেনের সহায়তায় মধ্যযুগের বেশিরভাগ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাঁদের সময়ে যে সমাজ দেখতে পাওয়া যায় তা সামন্ততন্ত্রের অর্থাৎ স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের হাতে ধীরে ধীরে প্রভাবহীন হতে শুরু করে। ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ধর্ম নানা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট পথে প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যেই বৈষ্ণব ধর্ম মানুষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে বাংলাদেশের বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব আছে। ঔপন্যাসিক রমাপতি বসুর উপন্যাস **‘মেমবোষ্টমী’**-তে (১৯৮৮) তাঁর উপন্যাসস্থিত চরিত্র প্রখ্যাত পন্ডিত গৌরিনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ‘বিষ্ণু – বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বলছেন –

“ভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান শ্রী, মধু, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক। এর কোনোটাই কিন্তু বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম নয়। বাংলাদেশের বৈষ্ণব সমাজে নতুন করে জোয়ার আনেন শ্রীচৈতন্যদেব।”

বৈষ্ণব সমাজের স্বরূপ প্রকাশ পায় তার কৃষ্ণভাবনায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ একদিকে, অপরদিকে সহজিয়া, কর্তাভজা ও বাউল সম্প্রদায়। সকলেরই আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণ, তবু তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পর্ব ইত্যাদির মধ্যে কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ সকলেই কৃষ্ণ নামে মাতোয়ারা। কিন্তু ধর্মভাবনার মধ্যে পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পুরাণ কাহিনী অনুসারে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর সম্প্রদায়ের দেবদেবীর সঙ্গে আরো বিভিন্ন দেবদেবীর সন্ধান পাওয়া গেছে, যাঁদের কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণার কল্পনামূর্তি বলে বিবেচনা করা যায় না। এঁদের বেশিরভাগই লোকায়ত ধর্মের নির্মাণ। তবে পরে ধীরে ধীরে এঁদের ব্রাহ্মণ্যধর্মে গ্রহণ করা হয়েছিল। একটা সমাজব্যবস্থা যখন দারিদ্রগ্রস্থ হয়, তখনই ধর্ম দুর্বলতা প্রকট হয়। ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া আধিপত্যে, হিন্দু ধর্মের মানুষদের মধ্যে যখন এইরকম একটা পরিস্থিতির উদয় হয়েছিল, তখন সেই পরিস্থিতি নিবারণে যে নতুন মানুষটি অগ্রগামী হয়েছিলেন – তিনিই তথাগত বা গৌতম বুদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্মের সূচনার ইতিহাস

প্রসঙ্গে **'শরণাগত'** (১৯৮৬) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার কথকের ভূমিকায় বলেছেন যে –

"বুদ্ধের আগে বৈদিক ক্রিয়াকলাপে দেশ ত্রস্ত ছিল। যজ্ঞানুষ্ঠানের আধিক্য এবং ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে ধর্ম জনপ্রিয়তা হারিয়েছিল। ব্রাহ্মণেরা প্রচার করতেন সুষ্ঠু যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমেই ধনাগম হবে, স্বাস্থ্য তেজোময় এবং পরলোকের সুখ এবং শান্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু এই সব ক্রিয়াকান্ডে সাধারণ মানুষ কখনোই তৃপ্ত হয়নি। শেষ পর্যন্ত চার রকম আশ্রমে জীবন ভাগ করে মানুষের কার্যকলাপ একটা শৃঙ্খলে বাঁধবার চেষ্টা করা হল। কিন্তু শুদ্ররা রইল অবহেলিত। ব্রাহ্মণ এবং তাদের স্বার্থের কারণে ক্ষত্রিয়রা চালাল আধিপত্য। জাতিভেদ প্রথা এই সময় জন্মগত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মহিলাদের গার্হস্থ্য সম্পত্তি বলে বিবেচনা করা হত। এই অবস্থায় বুদ্ধের অমৃতবাক্য, যা শুধু হৃদয়কেই শান্ত করেনি, জীবনকেও সহজ করে দেয়, জনসাধারণের শ্রেয়তর বলে মনে হয়েছিল। ভারতবর্ষের মানুষ প্রথম নিজেদের সম্মানিত হতে দেখল। ফলে তিনি জীবিত থাকতে তো বটেই তাঁর মহাপরিনির্বাণের পর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রচারিত ধর্ম এবং বিনয় সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছিল।"

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধর্মের এই বিরোধ-বিবাদ বহুদিনের। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মনায়কদের তর্কবিতর্কের ইতিহাসই প্রাচীন ও মধ্যযুগের ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাস। যাকে এক কথায় ভারতীয় ধ্যান-ধারণার ইতিহাস বলা যেতে পারে। অষ্টম নবম শতকে মহাযানী, কালচক্রযানী, মন্ত্রযানী, বজ্রযানী, সহজযানী এইসব বৌদ্ধ আচার্যেরা দেবদেবীর সাধনমন্ত্র, স্তোত্র, সংগীতি, মন্ত্র, মন্ডল, মুদ্রা, যোগ, ধরণী, সমাধি নিয়ে পুঁথি লিখেছেন, তেমনি আবার অন্যদিকে যোগ ও দর্শন, হেতুবিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও শব্দবিদ্যা সম্বন্ধেও তাঁদের লেখা সুচিন্তিত গ্রন্থ আছে।

বৌদ্ধ ধর্মকে যেমন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবে গণ্য করা যায়, ঠিক সেই রকমই ইহুদি ধর্মের প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবে খ্রীষ্টধর্মকে মান্য করা হয়। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেন্টে একেশ্বরের কথা বলা হয়েছে এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের থেকে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু অন্তঃসারশূন্য, নিয়মতান্ত্রিক ইহুদিধর্ম ক্রমশই নীতিভ্রষ্ট ধর্মে পরিণত হয়। তখন এই নীতিভ্রষ্ট, আচারসর্বস্ব, অধঃপতিত ইহুদিধর্মের প্রতিবাদস্বরূপ খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাব হয় অর্থাৎ মহান ইহুদি ধর্মপ্রচারকদের নৈতিকতাকে অক্ষুন্ন রেখেই যীশুখ্রীষ্ট ইহুদি ধর্মের সংস্কারসাধন করে যে পরিমার্জিত নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেন, তার নাম খ্রীষ্টধর্ম। যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের অবতার হিসেবে নিউ টেস্টামেন্ট অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্মের পবিত্র গ্রন্থ বাইবেলের মাধ্যমে তাঁর শিষ্যদের জীবনকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ঔপন্যাসিক অরবিন্দ দে তাঁর লিখিত **'আমি স্বীকার করছি'** (১৯৮৬) উপন্যাসে কথকের ভূমিকায় খ্রীষ্টধর্মের পরিচিতি প্রসঙ্গে বলেছেন –

"খ্রীষ্টীয় ভাবধারামতে মানুষের যে স্থান নির্ধারিত হয়েছে – তা মানুষ ঈশ্বরেরেই সমগোত্রীয়। মানুষ ও ঈশ্বর খ্রীষ্টীয় সাহিত্যে একাকার হয়ে গেছে। খ্রীষ্টীয় অনুশাসন অনুযায়ী মানুষ কখনো ঈশ্বরের 'দাস' নয়, মানুষ ঈশ্বরের সহকর্মী।"

ইসলাম সম্পর্কিত ইতিহাস চর্চার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বহুমাত্রিক। এই বহুমাত্রিক ভাবনার আবর্তন ইসলাম ধর্মের আর্থ-সামাজিক সংকট, দেশান্তর ও রাজনৈতিক অসমন্বয়ের আবহে আবর্তিত হয়েছে তাই স্মৃতিচারণামূলক রচনা ও উপন্যাস সংখ্যালঘুদের ইতিহাসচর্চাকে সমৃদ্ধ করেছে। তথ্যের প্রাচুর্য, এই ইতিহাসচর্চার জগতের উজ্জ্বল গতি প্রবাহকে, মানবিক চিন্তা-চেতনা ও বিশ্লেষণের দ্বারা ব্যক্ত করেছে। এই ইতিহাসচর্চায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা ও হিংসার ইতিহাস উন্মোচনের মাধ্যমে, মানবাধিকার চর্চার ধারার সম্যক বৃদ্ধি হয়েছে।

"প্রাচীন সাহিত্যে খ্রীষ্টানের কথা নাই; কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ধর্ম সমান শ্রদ্ধার যোগ্য, ঈশ্বর হিন্দুকে ও মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখেন, পুরাণ ও কোরানের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য এক – এইরূপ উক্তি প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের অনেক স্থানে পাওয়া যায়।....বলাবাহুল্য এই উদারমনা প্রাচীন লেখকগণের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই আছেন। কারণ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে "পাকিস্তানি" ভাব ছিল না – ভাষায়ও না, ভাবেও না।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমেশচন্দ্র, ২০১৮)

এছাড়া ইসলাম ধর্মের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যে সমস্ত বিখ্যাত কবিদের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন বৈষ্ণব সাধু হরিদাস যিনি যবনকুল বা মুসলমানকুলে জন্মেও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন এবং চৈতন্য ভাগবত অনুযায়ী হরিদাস বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই 'যবন হরিদাস', 'ব্রহ্ম হরিদাস' নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি, 'সর্বধর্মে সমভাব' – তাঁর প্রতিটি কাব্য পংক্তিতে তুলে ধরেছেন। তিনি মুসলমান হয়েও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ছিলেন বলেই তাঁর প্রাণদণ্ডাদেশ পর্যন্ত হয়েছিল। এছাড়াও প্রচুর হিন্দুভাবাপন্ন মুসলমান কবি, যাঁদের রচনা পড়ার পর, রচয়িতার নাম জ্ঞাত না থাকলে কোনভাবেই বোঝার উপায় নেই যে তিনি অহিন্দু ছিলেন। অথচ এঁরা যে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই বলা যেতে পারে যে এই মুসলমান লেখকেরা স্ব-ধর্মের মতোই হিন্দুধর্মকেও সমান শ্রদ্ধা করতেন যা অবশ্যই ধর্ম সমন্বয়ের প্রশংসনীয় বার্তা বহন করে। এইরকম বিখ্যাত মুসলমান কবি হলেন আলওয়াল, যিনি 'পদ্মাবতী' কাব্যগ্রন্থ

সম্পূর্ণ আরবি অক্ষরের বাংলা ভাষায় লিখেছিলেন এবং এই সমগ্র কাব্যগ্রন্থটি সম্পূর্ণভাবে হিন্দুভাবাপন্ন ছিল। তবে বাংলা সাহিত্যে ধর্মসমন্বয়ের ভাব যেমন পাওয়া যায় তেমন ভাবেই তুর্কি আরব মোঘল জাতীয় সম্প্রদায়ের সম্বন্ধেও বিপরীত ভাবনাও দৃষ্ট হয়। তাই বিরাট বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রদায়িক মিলনের যে ইতিহাস প্রাপ্তি ঘটে, তা পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক মিলন ঘটাতে অপারগের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাসই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বর্তমান পৃথিবীতে বিশ্বায়নে পৃথিবীব্যাপী উদারীকরণের যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে ধর্মীয় দিকটিও সমান ভাবে প্রভাবিত হয়েছে কারণ 'বিশ্বায়ন' একটি আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া, যার মধ্যে দিয়ে যে কোন বিষয়, বিশ্বের সকল প্রান্তেই সম্প্রচারিত ও সম্প্রসারিত হয়ে, বিশ্বব্যাপী এক পরিচিতি লাভ করে। বিশ্বায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন রাষ্ট্রের, বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষকে এক পরিচিতিসূত্রে গ্রথিত করা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে, বর্তমান পৃথিবীতে যে উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরগুলি দৃশ্য হচ্ছে, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সমগ্র বিশ্ব যেমন প্রতিটি মানুষের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে, তেমনি আবার বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মধ্যে মানসিক দূরত্বের দিকটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। ধর্ম শুধুমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয় আর নয়, তা সম্প্রদায়গত পরিচিতি লাভ করেছে। এই সম্প্রদায়গত পরিচিতির ফলে, যে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে, তা অনেক সময়েই মানুষের ব্যক্তিগত ধর্মীয় পরিচয়কে অস্বীকার করার মতো, অমর্যাদাকর কার্য সাধন করছে, যা প্রকৃত সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবমাননাকর পরিস্থিতির আবাহন করছে। সর্বদা যে এই নঙর্থক দিকটিই প্রাধান্য পাচ্ছে, তা হয়তো নয়, কিন্তু নঙর্থক দিকের প্রভাব সমাজকে যে প্রভাবিত করছে তা সর্বজনস্বীকৃত।

তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্য পর্যালোচনা

সাহিত্য পর্যালোচনা

সভ্য মানবজাতির সভ্যতা ও ক্রমোন্নতির বাহন হ'ল সাহিত্য। লেখক ও পাঠক বা সমাজের মানুষের মধ্যে প্রধান যোগসুত্র হ'ল সাহিত্য। সাহিত্য চর্চা ছাড়া কোন জাতির পক্ষে উন্নতি সম্ভব নয়। সাহিত্যের একটি শাখা উপন্যাস। উপন্যাস মানবজাতির সামাজিক হিত-অহিত, লোকাচার, ধর্ম, নৈতিকতা ও কৃষ্টির দলিল। বাংলা উপন্যাস রচনার মাধ্যমে ঔপন্যাসিকেরা সমাজের সমকালীন ধার্মিক, সামাজিক ও কৃষ্টিগত পরিস্থিতিকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে তাই সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ। সাহিত্য মাত্রই জাতির গৌরব ও গর্বের প্রতীক। বাংলা উপন্যাসও সমাজের অতীত, ভাব-চিন্তা, কর্ম, জ্ঞান, মনীষা, আচরণ এবং সর্বোপরি ধর্মের স্মারক ও সাক্ষ্য। তাই বাংলা উপন্যাস পাঠের মাধ্যমে সমাজের মানুষের মন-মনন-স্বভাব সম্বন্ধেও কিছুটা ধারণা করা বুদ্ধিমান পাঠকের পক্ষে সম্ভব। এভাবেই নীতিবোধ, মূল্যবোধ, আদর্শ, চেতনায় ও জীবনবাসনায় পরিবর্তন ঘটে। কালান্তরে ন্যায়-নীতি-আদর্শবোধ-মূল্যবোধ বদলায়। তাই বিভিন্ন বাঙালি ঔপন্যাসিকদের দ্বারা রচিত বিভিন্ন বাংলা উপন্যাস এই গবেষণায় গ্রহণযোগ্য।

সাহিত্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল ধর্ম। ধর্মকে কেন্দ্র করেই মানুষের সমাজ জীবনে উঠে আসে নানান সমস্যা। সাহিত্য সমাজ দর্পণ ও দর্শন। তাই সমাজ দর্পণে প্রতিফলিত মানুষের সমস্ত পরিচয়ের দর্শন তুলে ধরে, সমাজের মানুষের মনে সমাজচেতনা, সমাজবোধ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মানুসন্ধান এগুলি হয়ে উঠেছে ঔপন্যাসিকদের আত্মকথন, যা পাঠকেরও আত্মদর্শন ঘটাতে সমর্থক। বর্তমান গবেষকের, বর্তমান গবেষণায় সাহিত্য পর্যালোচনার মূল উদ্দেশ্যগুলি হ'ল –

১) পূর্ববর্তী গবেষণার ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার পর্যালোচনা করা যা বর্তমান গবেষণার ভিত্তি নির্ণয়ে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে।
২) গৃহীত পূর্ববর্তী গবেষণাগুলি থেকে, বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের ধারণা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হতে পারে।
৩) পূর্ববর্তী গৃহীত গবেষণাগুলির তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতিগুলি অনুধাবন করে, বর্তমান গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি অনুসন্ধানের ধারণা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হতে পারে।
৪) পূর্ববর্তী গৃহীত বিভিন্ন গবেষণাপ্রাপ্ত রূপরেখার সাফল্যের মূল্যায়নে, বর্তমান গবেষণার রূপরেখা প্রস্তুত করার পথ অন্বেষণ করা সহজসাধ্য হতে পারে।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করার কারণে, পূর্ববর্তী গবেষণাগুলি, বর্তমান গবেষণার সাথে সম্পর্কিত বলে বিবেচিত হওয়ার জন্যে, নিম্নলিখিত বিভিন্ন পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিকে নিয়ে বর্তমান গবেষণায়, সাহিত্যের পর্যালোচনা অধ্যায়ে আলোচনা করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে বর্তমান গবেষণার নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো গঠন করে, উপরোক্ত ধারণাগুলির ভিত্তিতে এই সাহিত্যের পর্যালোচনা, বর্তমান গবেষণাকে সংজ্ঞায়িত করতে সহায়তা করবে, এই চিন্তা থেকেই এই সাহিত্য পর্যালোচনার অবতারণা।

সাহিত্য পর্যালোচনায় বর্তমান গবেষকের অগ্রগামী গুণীজনেদের গবেষণার কাজ, বর্তমান গবেষককে, তাঁর গবেষণার কাজে অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ করেছে। বর্তমান গবেষকের গবেষণার বিষয় হ'ল, **'বাংলা উপন্যাসে ধর্ম : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'** অর্থাৎ বর্তমান গবেষণার প্রধান উপপাদ্য হ'ল, বাংলা উপন্যাস, যার ওপর নির্ভর করে বর্তমান গবেষক, তাঁর গবেষণার মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন এবং সেই তথ্যনির্ভরতা গবেষণার কাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে। এই গবেষণায় উপন্যাসপ্রাপ্ত ধর্মের প্রসঙ্গ সম্বলিত তথ্যকে হাতিয়ার করেই, ধর্ম প্রসঙ্গে বর্তমান গবেষক অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে, ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের সূচনাকাল অর্থাৎ ১৯৯১ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত, ধর্মের রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন। উপন্যাসপ্রাপ্ত ধর্মতত্ত্বের মাধ্যমেই প্রাচীন ধর্মের ইতিহাস, মধ্যবর্তী সময়ে সেই ইতিহাসের হাত ধরে ধর্মের বিস্তৃতি ও বর্তমানে ধর্মের প্রভাব সমাজকে কতখানি ঋদ্ধ করেছে বা নিরুৎসাহ করেছে, তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরতে বর্তমান গবেষক আগ্রহান্বিত হয়েছেন। এই গবেষণার কাজের সাথে বর্তমান গবেষক তার প্রথম অগ্রগামী গুণীজন হিসেবে যাঁকে বেছে নিয়েছেন, তিনি হলেন –

মনন কুমার মন্ডল, (২০০৫), 'বাংলা উপন্যাস : ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানসের রূপায়ণ (১৯৪৭-১৯৬৭)', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, গবেষণালব্ধ ফলাফলে যা ব্যক্ত করেছেন তা হ'ল, বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের সার্বিক প্রতিফলন বাংলা উপন্যাসের দর্পণে ঘটে থাকে। তাঁর গবেষণায় তিনি বাংলা উপন্যাসের মূল প্রবণতাকে, ব্যষ্টির অন্তর্লীন সংকটের আবর্ত অথবা সমষ্টিবোধের উত্তরণের কাহিনী রূপে উপস্থাপিত করেছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশভাগের মর্মবিদারী ঘটনাতে, মনুষ্যত্বহানিকর ঘটনাস্রোত, দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতাকে স্পর্শ করে উপন্যাসে স্থান করে নিয়েছে মিছিল, জমায়েত এবং সমষ্টি জীবনের প্রতিবাদী

কণ্ঠস্বর। তাঁর গবেষণায়, আধুনিক বাংলা উপন্যাসে, ব্যষ্টির সাথে সমষ্টির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উঠে এসেছে যা মূলত মধ্যবিত্ত মানুষের দ্বিধাদ্বন্দ্ব, মূল্যবোধের সংকটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে। তাঁর গবেষণায় ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের মাধ্যমে ব্যষ্টি-সমষ্টির দ্বন্দ্ব উত্থাপিত হয়েছে সেখানে জটিলতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় মূল সুর হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। আবার অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিস্তারও এই সময়কালের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাংলা উপন্যাসের স্বাধীনোত্তর পরিপ্রেক্ষিত একটা এমন নিজস্বতাকে তুলে ধরতে চেয়েছে, যাতে বাংলা উপন্যাস ব্যষ্টি-সমষ্টির রূপায়নের ক্ষেত্রে সাবালকত্বের বহুমাত্রিকতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান গবেষকের গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে যে মূল উপাদান প্রাধান্য পেয়েছে তা হ'ল, উপন্যাস। ভারতবর্ষের বিশ্বায়ন পরবর্তী উপন্যাসে বর্তমান গবেষক যে বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন তা হ'ল, ধর্ম। গবেষক মনন কুমার মন্ডলের গবেষণালব্ধ উপসংহারপ্রাপ্ত সত্তর পরবর্তী উপন্যাসে সেই ধর্ম শৃঙ্খলিত পদধ্বনি যেন ধ্বনিত হচ্ছে। গবেষক মনন কুমার মন্ডলের গবেষণায় ব্যষ্টি-সমষ্টির দ্বন্দ্ব, দেশভাগের যন্ত্রণা, ভাষা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বিষয়গুলি অত্যন্ত প্রাধান্য পেয়েছে। বর্তমান গবেষকের গবেষণায় 'ধর্ম' প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিষয়গুলি যথেষ্ট প্রাধান্য পাবে বলেই বর্তমান গবেষকের বিশ্বাস।

সুস্মিতা ব্যানার্জি, (২০১৭), 'নব্বই-পরবর্তী (১৯৯০) বাংলা উপন্যাস : সাম্প্রতিক পাঁচজন লেখিকার কলমের নারীর পরিবর্তনশীল অবস্থান', কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফলে যা ব্যক্ত করেছেন তা হ'ল, বাংলা উপন্যাসে নারীর অবস্থান ও নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে উনিশ শতক থেকে যে পথ চলা শুরু হয়েছিল, নব্বই পরবর্তীকালে এবং একবিংশ শতকে এসে নারীর অবস্থান ও অধিকারের ভিত অনেকাংশেই পরিবর্তিত ও দৃঢ় হয়েছে এবং নারীশিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতায়, নারীর সমাজে অনেকটাই অগ্রগতি হয়েছে, একথা বলা যেতে পারে বলে গবেষক সুস্মিতা ব্যানার্জি মনে করেন। নারীর বিবাহ, পণপ্রথা, শিক্ষা, লিঙ্গ বৈষম্য, আর্থিক স্বনির্ভরতা, নারী-জীবনের সুরক্ষা, নারীর অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, বিবাহ বিচ্ছেদ, নারীর আত্মমর্যাদা ও আত্মস্বতন্ত্রতার পথ অন্বেষণ এমনকি সমকামিতার বিষয়টিও অত্যন্ত প্রাধান্য পেয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, নারীর ওপর যে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায়, একুশ শতকের দ্বারে দাঁড়িয়েও তা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। নারী অবদমনে গবেষক ধর্মকে একটি প্রাসঙ্গিক উপাদান বলেই দাবি করেছেন। তাই তাঁর মতে, নারীর ক্ষেত্রে ধর্ম অপেক্ষা ব্যক্তিগত লক্ষ্যে উপনীত

হওয়ার গুরুত্বকে, বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা যেতে পারে। তাঁর গবেষণায়, একদিকে নারীর নিজের শরীরের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রন যেমন গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনি অন্যদিকে নারীর আত্মঅন্বেষণও, নারীর আত্মসমীক্ষার মাধ্যমে উঠে এসেছে। সেই কারণেই বর্তমানে, বিবাহবিচ্ছেদের পর উপন্যাসগুলির নারীচরিত্রেরা পুনরায় বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আর দ্বিধা করেন না। ধর্ম অপেক্ষা নারীর ব্যক্তিগত লক্ষ্যে পৌঁছানোর বিষয়টি নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এক ভিন্ন মাত্রা উপস্থিত করে থাকে। বর্তমান গবেষকের গবেষণায়, ধর্মের সাথে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী স্বাধীনতা বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার কারণে, ধর্মীয় সংস্কারের গণ্ডি ভেঙে অভিযোজনীয় পরিবর্তনের সদর্থক ধ্বজা, নারীর ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য হয়ে উঠতে পারে বলে বর্তমান গবেষকের বিশ্বাস।

প্রসূন মাঝি, (২০০৮), 'বাংলা উপন্যাসে মিথ-পুরাণের ব্যবহার (১৯৪৭-১৯৯৭)', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফলে বাংলা উপন্যাসে মিথ-পুরাণের প্রয়োজনকে এক সম্পূর্ণ অভিনব এবং কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়রূপে উপস্থাপিত করেছেন। বাংলা উপন্যাসে যে সমস্ত ঔপন্যাসিকেরা মিথ-পুরাণের ব্যবহার করেছেন, তাঁরা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এই পুরাণের প্রসঙ্গগুলিকে, ঔপন্যাসিকের ভাবনা এবং বক্তব্য প্রকাশের সহায়করূপে প্রকাশ করেছেন। পৌরাণিক যুগের মিথ-পুরাণের ব্যবহার, বর্তমান উপন্যাসগুলিতে যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক তাৎপর্য সৃষ্টি করেছে তা পুরাণের ব্যবহারে এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। এর ফলে ঔপন্যাসিকের কলমে পুরাণের যে নবজন্ম ঘটেছে এবং আধুনিক জীবনের সমস্যার সাথে, সেই মিথ-পুরাণের সাহিত্যের একীভূত হয়ে যাওয়ার প্রাসঙ্গিকতা, অনেক ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। যা উপরোক্ত গবেষক মনে করেন দেশ-কাল-সমাজের প্রেক্ষিতে একদিন এই মিথ-পুরাণের ব্যবহার বাংলা উপন্যাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। বর্তমান গবেষকও তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রে, ধর্মের ইতিহাস অন্বেষণের কারণে, তাঁর গবেষণাতেও মিথ-পুরান সম্পর্কিত উপন্যাসগুলি প্রাধান্য পাবে বলেই মনে করেন। তাই সাহিত্য পর্যালোচনায় উপরোক্ত গবেষণাকে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করেন।

নমিতা চক্রবর্তী, (২০১৭), 'মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস : জীবনবোধ ও সমাজ ভাবনা' উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ। উপরোক্ত গবেষক তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফলে যে সত্য তুলে ধরেছেন তা হ'ল, মহাশ্বেতা দেবীর ইতিহাসের প্রতি, বিশেষ করে বিদ্রোহ এবং সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর বিশেষ আকর্ষণের কারণে,

তিনি তাঁর উপন্যাসে গণবৃত্তের ইতিহাসকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই বারবার তুলে ধরেছেন,এই বিষয়টি উপরোক্ত গবেষকের গবেষণায় বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে,দেশভাগের ফলে যে ভিটেমাটি ছাড়া উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তা মহাশ্বেতা দেবীর চিন্তা এবং চেতনাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই উদ্বাস্তু সমস্যার উৎস হিসেবে তিনি বর্গী আক্রমণের সময়কে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী এবং স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতবর্ষ মহাশ্বেতা দেবীর চেতনায় কোন পৃথক অবস্থান প্রাপ্ত হয় না। তিনি তাঁর 'আঁধারমানিক' উপন্যাসে বর্গী আক্রমণে বিপর্যস্ত বাংলাদেশের চালচিত্রকে তুলে ধরেছেন। উপরোক্ত গবেষণায় মহাশ্বেতা দেবীর আদিবাসী সমাজ এবং তাদের জীবন-ইতিহাস সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দৃশ্যায়ন, তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে উঠে এসেছে। 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী এমন এক কবির কথা তুলে ধরেছেন, যিনি নিজের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত জীবন ত্যাগ করে, অর্জিত জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে চান। সেই কারণে যদি কবিকে নিজের সমাজ ত্যাগ করতে হয়, তাতেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন না। এই জীবনবোধ কোথাও যেন এক সূক্ষ্ম সুতোর মতো ধর্মকে জড়িয়ে আছে। মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে নারীর সামাজিক অবস্থান,তাঁর উপন্যাসের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ হিসেবে গণ্য হতে পারে বলে উপরোক্ত গবেষক মনে করেন। নারীর সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে 'ধর্ম' বিষয়টি জড়িত। তিনি মানুষের জন্য সদর্থক কিছু কাজ করার মধ্যে দিয়েই বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন, যা প্রকৃত ধর্মবোধের স্পর্শ বলে মনে করা যেতে পারে বলে, বর্তমান গবেষক মনে করেন। তাই উপরোক্ত গবেষণাপত্রটি বর্তমান গবেষকের সাহিত্য পর্যালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ বলেই গণ্য হয়েছে।

ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়, (২০০৭), 'উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে বিবাহ : সামাজিক প্রেক্ষিত ও ঔপন্যাসিক দৃষ্টিকোণ', ভাষা ভবন, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ। উপরোক্ত গবেষক তাঁর গবেষণালব্ধ উপসংহারে বলেছেন, উনিশ শতকের উপন্যাসগুলিতে 'বিবাহ' বিষয়টিকে, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসানুযায়ী বলা হয়েছে যে, বিবাহই স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্মের সোপান। উপরোক্ত গবেষকের গবেষণায় উনিশ শতকের সমাজের নারীর অধিকারহীনতার ইতিহাস প্রাধান্য পেয়েছে। তাই তাঁর গবেষণায় উনিশ শতকের দেশাচার, লোকাচারের ভিত্তিতে, সমাজবিদরা নারীদের বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা, ইত্যাদির কারণে নারীর অবধারিত বৈধব্যকে বরণ করে নিয়ে, নারীর

ক্ষেত্রে এক সামাজিক অসম্মানের জীবনকে গ্রহণ করার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবৃত করেছেন৷ উনিশ শতকের প্রতিটি পত্রিকাতেই যেমন – 'সুলভ সমাচার', 'তমলুক পত্রিকা', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', 'সাধারণী', 'দীপিকা' ইত্যাদিতেও সেই সময়ের নারীর সামাজিক মূল্যায়ন করা হয়েছে৷ 'কুলীন পত্নী' অর্থে সংসারের 'ক্রীতদাসী' এবং 'বিধবা' অর্থে সংসারের 'পাচিকা' – এই ছিল উনিশ শতকের নারীর ভবিতব্য৷ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজ-সংস্কারকদের আন্তরিক উদ্যোগে যে বিভিন্ন নারীকেন্দ্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, তার মধ্যে সতীদাহ বিরোধী আন্দোলন, বিধবা বিবাহ আন্দোলন, কৌলিন্য প্রথা বিরোধী আন্দোলন, বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন, সহবাস সম্মতি আন্দোলন, ও পণপ্রথা বিরোধী আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য৷ উনিশ শতকের বিবাহে, বিধবা বিবাহ আন্দোলন যে সমাজজীবনে পরিবর্তন এনেছিল, তা উনিশ শতকের ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের উপন্যাস রচনার মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন৷ বাল্যবিধবা নারীর জীবনে, বিবাহই যে সর্বদা নিরাপত্তা নিয়ে আসবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না, বরং জোর করে দ্বিতীয়বার বিবাহ, ওইসব বিধবা নারীদের জীবনে, দ্বিতীয়বারের জন্য বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারার বিষয়টিকেও, ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের উপন্যাস রচনার মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন৷ উনিশ শতকের ঔপন্যাসিকেরা তাদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের উপন্যাসগুলিতে নারীমনের জাগরনের বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন৷ ফলস্বরূপ বাল্য বিবাহ নামক দেশাচার বন্ধ করার উদ্যোগ দেখা দিয়েছিল৷ বাল্যবৈধব্য নিবারণের কারণেই, বাল্যবিবাহের পরিবর্তে, নারীর পরিণত বয়সেই নারীকে বিবাহ দিতে হবে, এই বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছিল৷ এই সময়ের নারীর প্রতিবাদী রূপটিও উপন্যাসে ঔপন্যাসিকেরা যেমন তুলে ধরেছিলেন, তেমনি নারীর স্ব-অর্জিত নিজস্ব নিরাপত্তার বিষয়টিকেও প্রাধান্য দিয়েছিলেন৷ উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারকরা, সমাজকে পরিবর্তিত করতে ও সমাজকে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন৷ বর্তমান গবেষণায় সমাজে নারীর অবস্থা বিষয়টি ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে, উপরোক্ত গবেষণার গবেষণাপত্রটি বর্তমান গবেষণায় সাহিত্যের পর্যালোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে৷

পূর্বা সেনগুপ্ত, (২০০০), 'স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ভাবনা : সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বিশ্লেষণ', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ৷ এই গবেষণাপত্রে গবেষণালব্ধ উপসংহারে গবেষক যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন তা হ'ল, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মবোধ৷

সামাজিক-রাজনৈতিক যে কোন সংস্কার আন্দোলনের মূলে ধর্ম অবস্থান করতো। ধর্মের নানান আচারসর্বস্বতার মধ্যেই সমাজ তখন আবদ্ধ ছিল। তাই সমাজে গতি এবং স্থিতির মধ্যে এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ এই গতিরুদ্ধকারী শক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর মতে, মানুষের প্রয়োজনে সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই সুস্থ-সুন্দর মানবচরিত্র, একটি সুস্থ-সুন্দর সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি করতে সক্ষম। ধর্ম ও সমাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজে পরিচ্ছন্ন মানুষ গড়ে তোলাই ধর্মের উদ্দেশ্য, তাই প্রকৃত ধার্মিকের কাজ হ'ল, প্রকৃত মানুষ তৈরি করা। সাধারণত ধর্ম বলতে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতিনীতি চিহ্নিত করা হয়। সামাজিক নিয়মগুলিকে কেন্দ্র করে মানুষের সমাজজীবন পরিচালিত হয়। কিন্তু মানুষের ভেতরে অবস্থিত আধ্যাত্মিকতাবোধকে ধর্ম নয়, ধর্মবোধরূপে নামাঙ্কিত করা যেতে পারে। এই ধর্মবোধের মধ্য দিয়েই সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি নিজেকে নির্মল সুন্দর করে তুলে, একটি পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে পরিচিত হতে সক্ষম হতে পারে। তাই ব্যক্তি নিজে পরোক্ষভাবে সমাজের উন্নতি করে থাকে। সেই কারণেই বিবেকানন্দ মানুষের ধর্ম এবং ধর্মবোধকে পৃথক অস্তিত্বের অধিকারী বলে স্বীকার করেছেন। ধর্মের সঙ্গে সমাজসেবার বিষয়টিকে বেশিরভাগ ধর্মপ্রচারকেরাই সংযুক্ত করেছিলেন। ভারতীয় ধর্মীয় সাহিত্যের মধ্যেও এই সমাজ সচেতনতার বিষয়টি দৃশ্য হয়। শ্রী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা সনাতন হিন্দু ধর্মের মূল ধারাকে অস্বীকার করে, কোন প্রতিবাদী ধারার জন্মদান করেননি, তাঁরা মূলধারার ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেই, তাকে নতুন ভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে সর্বপ্রথম সমাজের সেবাকে, সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের উপর দণ্ডায়মান করেন। একদিকে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের অদ্বৈত বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত বৈদান্তিক রূপে নিজেকে তুলে ধরেছিলেন সমাজের কাছে আবার অপরদিকে তিনি সমাজ সংস্কারকের রূপকার, শূদ্র জাগরণ ও সামাজিক সাম্যের ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হিসেবে মানুষের মননে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ধর্মের সাথে সমাজ-ভাবনার প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা তাই কোনভাবেই অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। বর্তমান গবেষকের গবেষণায় ধর্মের সঙ্গে সমাজ ভাবনার এই মিলন উপরোক্ত গবেষণার হাত ধরেই হয়তো ধর্ম ও সমাজের প্রাসঙ্গিকতায় এক নির্দিষ্ট সদর্থক পথনির্দেশ পেতে পারে।

নিত্যানন্দ খাঁ, (২০১৮), 'বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে শিক্ষা সমাজ রাজনীতি : বিশ শতকের শেষার্ধ (১৯৫০-১৯৯৯)', বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, কলা অনুষদ। এই গবেষণাপত্রে গবেষণালব্ধ উপসংহারে উপরোক্ত গবেষক যে

বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন তা হ'ল, ভারতবর্ষে (১৯৫০-১৯৯৯) এই সময়পর্বটি অত্যন্ত ঘটনাবহুল সময়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের পুনর্গঠনের ফলে এইসময় সমাজ এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একাধিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা যেমন – মধ্যবিত্ত সমাজের বিবর্তন, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলন, রাজনৈতিক হত্যা, এর সাথেই সমাজ এবং রাজনীতির প্রতি মানুষের মিশ্র ধারণার সৃষ্টি করেছিল। তাই উপরোক্ত এই গবেষণায় এই সময়ের শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি, সমকালীন পরিস্থিতি, এই বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশ শতকের শেষার্ধে তাই মধ্যবিত্তের পরিবর্তনই সামাজিক পরিবর্তনের মাপকাঠি হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যাবতীয় ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সক্রিয়তা বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। তাই এই সময়কার সাহিত্য এবং সংস্কৃতি অনেক বেশি বাস্তবিক। এই সময়ের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে মানুষ অনেক কিছু হারালেও, তার ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তি, শিক্ষানুরাগ, সমাজবোধ, রাজনৈতিক চেতনা, সংস্কৃতিচর্চা বিস্মৃত হয়নি। ১৯৫০-১৯৯৯ সময়কালের শিক্ষাসংক্রান্ত বাংলা প্রবন্ধ বিশ শতকের শেষার্ধে রচিত হলেও এই সময়ে অধিকাংশ প্রবন্ধই তাই তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। বর্তমান গবেষকের গবেষণাকর্মে সমাজে ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কারণ জাতিভেদ ও বর্ণবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বিষয়গুলির সঙ্গে ধর্মও ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যা সমাজের ধর্মীয় দিককেও একইভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম। তাই বর্তমান গবেষকের কাছে, উপরোক্ত গবেষণাপত্রটি, বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়েছে। তাই এই গবেষণাপত্রটিকে বর্তমান গবেষক তাঁর সাহিত্য পর্যালোচনায় গ্রহণ করেছেন।

রাহুল শাহানা, (২০১৮), 'আফসার আহমেদের উপন্যাসের সমকালীন বাংলার জীবনচর্যা ও সামাজিক রীতিনীতি', বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি,ডিপার্টমেন্ট অফ বেঙ্গলি, ফাকাল্টি অফ আর্টস, এই গবেষণাপত্রে গবেষণালব্ধ উপসংহারে উপরোক্ত গবেষক যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন তা হ'ল, নিজের সমাজের কথা ভাবতে গিয়ে যাঁরা সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠেন না, তাঁদের একজন হলেন সাহিত্যিক আফসার আহমেদ। তাঁর সাহিত্যে মুসলমান সমাজের জীবন্ত ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর উপন্যাসগুলিতে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে, নিখুঁতভাবে মুসলমান সমাজের দোষ-ত্রুটিগুলিকে তুলে ধরেছেন। তাঁর উপন্যাসে, ধর্মের অপব্যাখ্যাতে উঠে

এসেছে, মুসলমান নারীদের শোষিত-লাঞ্ছিত হওয়ার ইতিহাস। ঔপন্যাসিক আফসার আহমেদ মুসলিম সমাজের নারীদের 'বিয়ে-সতীন-তালাক'-এর ভয়াবহরূপ বিভিন্ন নারী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তাঁর উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলে সমাজকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। মৌলবাদ, শরিয়ত আইন, ধর্মের জটিল বিধান, নারীসত্তার বিসর্জন, এই বিষয়গুলি তাঁর উপন্যাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে। নারীর অন্তপুরের জীবনকাহিনী, যা তাঁর উপন্যাসে কখনো নারীদের প্রতিবাদী করে তুলেছে, কোথাও নারী জয়ী হয়েছে, আবার কোথাও নারীর পরাজয় হয়েছে। এর মধ্যেও তাঁর উপন্যাসগুলিতে মানবতাবোধের দিকটি অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে সত্য মানুষের সন্ধান দিয়েছেন। একবিংশ শতাব্দীতেও সমাজের মানুষের ভেতর থেকে যে মানবতাবোধ হারিয়ে যায়নি, সেই বিষয়টি তাঁর উপন্যাসে তিনি গভীরভাবে তুলে ধরেছেন। এই বিষয়টি বর্তমান গবেষকের গবেষণার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ মানবতাবোধের প্রাসঙ্গিকতায় ধর্মবোধের প্রাসঙ্গিকতাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আক্রাম হোসেন, (২০১৯), 'সমাজ বাস্তবতায় আবুল বাশারের উপন্যাস', গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ (কলা), এই গবেষণাপত্রে গবেষণালব্ধ উপসংহারে উপরোক্ত গবেষক যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন তা হ'ল – আবুল বাশারের উপন্যাসগুলিতে মুসলিম জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে উঠে এসেছে। মুসলিম সমাজের তালাক, খালাস, রক্তের সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের সমস্যা, পর্দা প্রথা, বর্ণভেদ প্রথা প্রভৃতি সমস্যাগুলি উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলিতে শ্রেণীবৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য এগুলির দ্বারা সমাজের শোষণ, অত্যাচার প্রায় সমানভাবেই চলছে। কারণ তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিতে অতীতের সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল এবং বর্তমান সমাজে এই সমস্যাগুলোর অবস্থান কেমন, তার সুন্দর ব্যাখ্যা, তিনি নানান উপন্যাসে নানানভাবে দিয়েছেন। তিনি মুসলিম সমাজের নবজাগরণ চেয়েছেন। মুসলিম সমাজজীবনকে উপন্যাসে আঁকতে গিয়ে, ঔপন্যাসিক অত্যন্ত নিরপেক্ষতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে ধর্মের ভয় দেখিয়ে, নারীদের দমন করে রেখে, তাদের ভোগ করার দিকটিকেও তিনি অসাধারণ বুননে বুনেছেন। সমাজে নারীর 'মন' বলে বস্তুটিকে কখনোই কোনো মূল্য দেওয়া হয়নি, এই বিষয়টি তাঁর উপন্যাসে বারবার উঠে এসেছে। তাঁর উপন্যাসগুলিতে নারীরা এই সামাজিক শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার

জন্য, কখনো কখনো প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, তা হল – সরকারের পরিবর্তন ঘটেছে, রাজনৈতিক দলের পরিবর্তন ঘটেছে, নেতার পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু সাধারণ মানুষের ওপর হওয়া শোষণ অত্যাচারের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সমাজের ধর্মের নামে সাধারণ মানুষ ও নারীদের ওপর হওয়া শোষণ অত্যাচার তাঁর উপন্যাসে তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্তমান গবেষকের গবেষণার বিষয়টিতে, ধর্মের আঙ্গিকে সমাজের সাধারণ মানুষ এবং নারীদের শোষণের দিকটি হয়তো একটি বিশেষ দিক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে বলে বর্তমান গবেষক মনে করেন। তাই তিনি উপরোক্ত গবেষণাপত্রটিকে তাঁর গবেষণার সাহিত্য পর্যালোচনায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন।

উপরোক্ত গবেষণাপত্রগুলি থেকে যে গবেষণালব্ধ উপসংহার প্রাপ্ত হওয়া গেছে তা থেকে বলা যেতে পারে যে –

প্রথমতঃ, উপরোক্ত গবেষণাপত্রগুলিতে বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়ের উপন্যাসগুলি নিয়ে কোনো গবেষণা করা হয়নি। পূর্বোক্ত গবেষণাগুলির গবেষক নিত্যানন্দ খাঁ-এর বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়ের প্রবন্ধ সাহিত্য (১৯৫০-১৯৯৯) নিয়ে গবেষণাকার্য হয়েছে। গবেষক প্রসূন মাঝি, তাঁর গবেষণায় উপন্যাসে মিথ-পুরাণের (১৯৪৭-১৯৯৭) ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কিন্তু তা ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত, এমন উল্লেখ করেননি। গবেষক স্বীকার করেছেন যে, বাংলা উপন্যাসে যাঁরা মিথ-পুরাণের ব্যবহার করেছেন, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই তার উল্লেখ করেছেন। তা পুরাণের নবজন্ম হয়তো ঘটিয়েছে, কিন্তু পুরাণের নবনির্মাণ সেখানে অনুপস্থিত। বর্তমান গবেষণায় বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়ের অর্থাৎ (১৯৯১ – ২০১৭) সময়কালের উপন্যাসগুলিই শুধুমাত্র প্রাধান্য পাবে বলে বর্তমান গবেষক মনে করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, উপরোক্ত গবেষণাগুলিতে সাধারণভাবে এক বা একাধিক ঔপন্যাসিকদের কাজ নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় বিভিন্ন ঔপন্যাসিকদের, নানান উপন্যাসগুলি নিয়ে বর্তমান গবেষক, তাঁর গবেষণাকর্মে উদ্যোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয়তঃ, উপরোক্ত গবেষণাপত্রগুলিতে, শুধুমাত্র উপন্যাসকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তা নয়। বাংলা প্রবন্ধ নিয়েও গবেষণাপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু

প্রবন্ধ নিয়ে করা গবেষণাপত্রে শিক্ষা-সমাজ-রাজনীতি প্রাধান্য পাওয়ার কারণে, গবেষণাপত্রটি বর্তমান গবেষণা কর্মে, গ্রহণযোগ্য বলে বর্তমান গবেষক মনে করেছেন। কারন সমাজের শিক্ষা ও রাজনীতিতে 'ধর্ম' অনেক সময়েই প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। তাই গবেষণাটি বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করলেও করতে পারে, বলে বর্তমান গবেষক মনে করেছেন।

চতুর্থতঃ, উপরোক্ত গবেষণাপত্রগুলিতে সমাজ, বিবাহ, মিথ-পুরাণ, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজবাস্তবতা, সামাজিক রীতিনীতি, সমাজ ভাবনা, সমাজে নারীর পরিবর্তনশীল অবস্থান, সমাজে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মানসিকতা, ইত্যাদিকে গবেষণায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমান গবেষকের অগ্রবর্তী গুণীজনেরা, বিভিন্ন উপন্যাসপ্রাপ্ত তথ্যগুলিতে শুধুমাত্র 'ধর্ম'-কে প্রাধান্য দিয়ে, তাঁদের গবেষণাপত্র প্রস্তুত করেননি। বিভিন্ন উপন্যাসপ্রাপ্ত 'ধর্ম' বিষয়টি সমাজকে প্রভাবিত করতে সক্ষম বলে মনে করার কারণে, 'ধর্ম' বিষয়টিকেই বর্তমান গবেষণায় প্রধান উপপাদ্য বিষয়রূপে শুধুমাত্র ধার্য করা হয়েছে।

পঞ্চমতঃ, উপরোক্ত গবেষণাপত্রগুলিতে 'ধর্ম' ছাড়া, বাকি যে সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে, তা কখনোই ধর্মকে প্রভাবিত করতে পারে বলে গবেষণাপত্রে তেমনভাবে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু বর্তমান গবেষকের গবেষণায়, সমাজে ধর্মের প্রাধান্যের বিষয়টি, ধর্মের সাথে সাথে, উপরোক্ত গবেষণার বিষয়গুলিকেও, গবেষণায় সম্পৃক্ত করতে পারে বলে বর্তমান গবেষক মনে করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রথমতঃ ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের সূচনাকাল অর্থাৎ ১৯৯১ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে ধর্ম ও সমাজ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের প্রভাব, কিভাবে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হয়, সেই বিষয়ে সম্যকজ্ঞান আহরণ করা।

দ্বিতীয়তঃ বাংলা উপন্যাসের প্রভাব বর্তমান সমাজকে কতখানি সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজ করে গড়ে তুলতে পারে সেই বিষয়ে লক্ষ্য দেওয়া।

তৃতীয়তঃ সাধারণ মানুষ ধর্মপুস্তকের পরিবর্তে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে উপন্যাস পাঠের দ্বারা ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে যখন জ্ঞাত হয়, তখন তা পাঠকের মধ্যে নীতিবোধ, মূল্যবোধের জন্ম দিতে সক্ষম হতে পারে। আর এই নীতিবোধ, মূল্যবোধই মানুষের মধ্যে ধর্মবোধের প্রতিচ্ছবি। যা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সদর্থক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। সেই কারণেই ধর্ম পুস্তক (যা কেবলমাত্র একটি বিশেষ বয়ঃক্রমের কাছে বেশি গ্রাহ্য) – এর পরিবর্তে উপন্যাসকেই গবেষক এই গবেষণার জন্য মনোনীত করেছেন। ধর্মজ্ঞান আহরণের আর এক মাধ্যম – উপন্যাস পাঠও হতে পারে, এই সত্যানুসন্ধান করার উদ্দেশ্যেই গবেষক এই গবেষণায় ব্রতী হয়েছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা পদ্ধতি

প্রতিটি গবেষণা একটা নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়। যে কোনো গবেষণার কাজে গবেষক একটা সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হলে, গবেষণা সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। একটি গবেষণার গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য গবেষণা পদ্ধতি (method) এবং গবেষণা তত্ত্ব (methodology) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেকোনো গবেষণায় গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণা তত্ত্ব তাই ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত এবং একটি অন্যের দ্বারা নির্ণীত ও নির্ধারিত (mutually constituted and overdetermined) হলেও বর্গ (category) ভিত্তিকভাবে দুটি পৃথক। গবেষণা পদ্ধতি (method) গবেষককে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করে। কিন্তু গবেষণা তত্ত্ব (methodology) কেবলমাত্র নিছক একটি গবেষণা কৌশল (technique) নয়, এটি একটি গবেষণা পদ্ধতির প্রেক্ষাপটে থাকা গবেষণার সুগভীর তাত্ত্বিক ভিত্তি। যে কোনো গবেষণা পদ্ধতির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল গবেষণা তত্ত্ব।

প্রত্যেক গবেষকই তার নিজস্ব গবেষণা কাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পথ গ্রহণ করেন, সেই পথ ধরেই অনুসন্ধানের কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। এই সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অগ্রসর হওয়াই গবেষণার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি গবেষণার নিজস্ব পদ্ধতির কারণে তারা একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র। বর্তমান গবেষণাও তার ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান গবেষণার শিরোনাম '**বাংলা উপন্যাসে ধর্ম : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ**' – এর আলোচনার পদ্ধতি হিসাবে বিভিন্ন বাঙালি ঔপন্যাসিকদের দ্বারা রচিত বাংলা উপন্যাস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই গবেষণায় মূলত গুণগত পদ্ধতি (Qualitative study) অনুসরণ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষক তাঁর গবেষণাকার্যের সুসংহত অগ্রগতির কারণে যে বিশেষ পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন, সেই পদ্ধতিটি হ'ল – **বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতি।**

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতি হ'ল – প্রণালীবদ্ধভাবে বিভিন্ন ধরনের নথি (যা মুদ্রিত অথবা দৃশ্যমান হতে পারে) এবং পাঠ্য বিশ্লেষণের একটি বিশেষ সুসংগঠিত পথ। এই পদ্ধতি খুব নমনীয় পদ্ধতি, যা বিভিন্ন মাধ্যমের নথি বা পাঠ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই পদ্ধতিটি কেবলমাত্র একটি গবেষণা পদ্ধতিই নয়, এর সাহায্যে গবেষণার স্বার্থে বিভিন্ন নথি এবং পাঠ্যগুলির বিশ্লেষণও সম্ভব। কিন্তু মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত

স্বতন্ত্র পদ্ধতি, তাই এটিকে সাধারণভাবে বিভক্তিকরণ পদ্ধতিতে তথ্য বিশ্লেষণের পথ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। সমাজবিজ্ঞান গবেষণায় গুণগত পদ্ধতির বিভিন্ন দিক থাকা সত্ত্বেও যেহেতু বর্তমান গবেষণার বিষয় কেবলমাত্র উপন্যাস নির্ভর, তাই শুধুমাত্র বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতিকেই এক্ষেত্রে বর্তমান গবেষক বেছে নিয়েছেন। সামাজিক গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে জটিল। এই পদ্ধতিতে মূলত মাধ্যমিক (secondary) উৎস (source) – এর ওপর নির্ভর করে গবেষণার কাজ করা হয়। এই পদ্ধতিতে মুখ্য হ'ল তথ্যভিত্তিক দলিলপত্র। এর ওপর ভিত্তি করে গবেষণা করা হয় বলে একে ডকুমেন্টারি মেথডও (Documentary Method) বলা হয়। এই পদ্ধতির আরেকটি নাম হল Unobstractive Method বা অনতিলক্ষ্য পদ্ধতি। যার অর্থ হ'ল যার সাহায্যে গবেষণা করা হচ্ছে তার সাথে কথা বলার প্রয়োজন হয় না।

বর্তমান গবেষক তাঁর গবেষণাকে সুপরিচালিত করার জন্য নানান ঔপন্যাসিকের রচিত বিভিন্ন উপন্যাসগুলিকে গবেষণার রসদ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এই সমস্ত সময়োপযোগী উপন্যাসগুলিকে নানান গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত অর্থ দ্বারা ক্রয় করে, তার থেকে গবেষণা উপযোগী তথ্যগুলিকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তারপরে উপযুক্ত প্রাপ্ত তথ্যগুলি গবেষণার স্বার্থে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহৃত হয়ে, গবেষণাকার্যে সঠিক পথের পথিক হয়ে উঠেছে।

বর্তমান গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতির (Content Analysis) পদক্ষেপসমূহ :

- ❖ **বিষয়বস্তু নির্বাচন (Content Selection) :** বর্তমান গবেষকের গবেষণার বিষয়টি হ'ল – **'বাংলা উপন্যাসে ধর্ম : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'**, যা সামাজবিজ্ঞানের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত ও সমাজস্থ মানুষের অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি বিষয় – যার নাম 'ধর্ম'।
- ❖ **তথ্যের উৎস নির্ধারণ (Determine the Source of Data) :** এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বিশ্বায়নের পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের লিখিত বিভিন্ন উপন্যাসগুলি থেকে। এই সমস্ত ঔপন্যাসিকদের ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে গভীর উপলব্ধি ও জ্ঞানের সমন্বয়ে তাঁদের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য যে প্রজ্ঞার আলো প্রদান করেছে, তার স্পর্শে বর্তমান গবেষকের গবেষণার কাজ অত্যন্ত উপকৃত ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

❖ **তথ্য সংগ্রহ (Data Collection) :** বর্তমান গবেষক তাঁর গবেষণার জন্য 'ধর্ম' বিষয়টিকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই সমাজের বিভিন্ন ধর্মের ওপর নির্ভর করে নমুনায়ন নির্ধারিত হয়েছে এবং সেই প্রক্রিয়াকরণে উপন্যাসের সাহায্য প্রাধান্য পেয়েছে।

❖ **বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis) :** এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া গবেষণার অন্যান্য প্রক্রিয়ার তুলনায় সামান্য পৃথক। বর্তমান গবেষক তথ্যের গভীরে গিয়ে বিষয়বস্তুকে সার্বিক ভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে, গবেষণার কাজ সম্পাদন করেছেন। বর্তমান গবেষণার কাজে এই পদ্ধতি অনেক সুবিধাজনক পদ্ধতি হয়ে উঠেছে। বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতির ধাপগুলি নিম্নে প্রদত্ত হল –

- ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের পরবর্তীকাল থেকে অর্থাৎ ১৯৯১ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ঔপন্যাসিকদের রচিত প্রচুর উপন্যাস, বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাগার থেকে বা ব্যক্তিগত অর্থানুকুল্যে গবেষক সংগ্রহ করেছেন।
- প্রতিটি উপন্যাসকে ব্যাপকভাবে অনুধাবনের মাধ্যমে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় তথ্য সমৃদ্ধ উপন্যাসগুলিকে বেছে নিয়েছেন।
- বর্তমান গবেষণায়, গবেষণাকার্যের সুবিধার্থে গবেষক গবেষণাকালকে অত্যন্ত সচেতনভাবেই পর্যায়ক্রমে তিনটি পর্বে বিভক্ত করেছেন। তবে এক্ষেত্রে গবেষণা কালকে বিষয়ভিত্তিকগতভাবে বিভক্তিকরণ করা হয়নি, কেবলমাত্র গবেষণাকার্যের সুবিধার্থে, সচেতনভাবেই, গবেষণাকালের নিরিখে, উপন্যাসগুলিকে তিনটি পর্বে বিভক্তিকরণ করা হয়েছে। পর্বগুলি হ'ল যথাক্রমে – প্রথম পর্ব (১৯৯১ – ২০০০), দ্বিতীয় পর্ব (২০০১ – ২০১০) ও তৃতীয় পর্ব (২০১১ – ২০১৭)।
- এবার এই তিনটি পর্বের, প্রতিটি পর্বকে, পাঁচটি অনুশীর্ষ (Sub Heading) – এ বিভক্ত করা হয়েছে। অনুশীর্ষগুলি যথাক্রমে – ইতিহাস, রাজনৈতিক দিক, সামাজিক দিক, সমাজে নারীর স্থান ও ধর্মীয় দিক।
- প্রতিটি পর্বের প্রতিটি অনুশীর্ষে, পর্বানুযায়ী প্রাপ্ত উপন্যাসগুলিকে গ্রহণ করে, সেই উপন্যাস প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- একই উপন্যাস একাধিক ধর্ম সম্বন্ধিত তথ্যসমৃদ্ধ হওয়ায় একাধিক ধর্মের ক্ষেত্রে তা ব্যবহৃত হয়েছে।

- একই ধর্মের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ঔপন্যাসিকদের রচিত উপন্যাস থেকে প্রাপ্ত, একই ধরনের তথ্য, গবেষণা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, বিষয়ভিত্তিক দৃঢ়তা প্রদান করেছে।
- উপন্যাসগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, বিভিন্ন ধর্মকে নানান আঙ্গিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে, সময়োপযোগী ও সমাজোপযোগী বিষয়ভিত্তিক সিদ্ধান্তের সদর্থকতায় প্রতিষ্ঠিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- গবেষণা কালের তিনটি পর্বে গৃহীত সকল উপন্যাস প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সমাজ ও ধর্ম কতখানি আঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তার একটি রূপরেখাচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।
- এই সমাজ ও ধর্মের রূপরেখাচিত্রটি সমাজ ব্যবস্থায় কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরা হয়েছে।
- এই সমাজ ও ধর্মের রূপরেখাচিত্রের গুরুত্ব বর্তমান সমাজ ও ধর্মকে কিভাবে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- সমাজ ও ধর্ম বিশ্লেষিত রূপরেখাচিত্রটি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে কিভাবে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজব্যবস্থা উপহার দিতে সক্ষম তার বিশ্লেষণও তুলে ধরা হয়েছে।
- উপন্যাসগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যে বিশ্লেষিত রূপরেখাচিত্র প্রাপ্ত হওয়া গেছে, তা ভবিষ্যৎ সমাজ ও প্রজন্মকে যেভাবে প্রভাবিত করতে পারে বা করবে সেই বিষয় ভিত্তিক আলোকপাতও তুলে ধরা হয়েছে।
- উপন্যাস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, বর্তমান গবেষণায় উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেও, গবেষণার বিভিন্ন ধাপে স্বীকৃতি দিয়ে, বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে উপন্যাসের তীব্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- বাংলা উপন্যাস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের নিরিখে গবেষণাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে তত্ত্বগতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- গবেষণার জন্য প্রচুর পরিমাণে উপন্যাস চয়ন করে, প্রয়োজনীয় ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ, শ্রমসাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষ হলেও, এই গবেষণাকে গবেষক সদর্থক ভাবে, আগ্রহের সঙ্গে সার্থক করে তুলতে চেয়েছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গবেষণা বিশ্লেষণ

গবেষণা বিশ্লেষণ

বর্তমান গবেষক তাঁর গবেষণা **'বাংলা উপন্যাসে ধর্ম : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'** – এর কাজের জন্য গবেষক তাঁর নেওয়া গবেষণার সমগ্র সময়কাল থেকে অর্থাৎ ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের পরবর্তী সময় অর্থাৎ ১৯৯১ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়কালটিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে নিয়েছেন। যার প্রথম পর্যায়টি ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল, দ্বিতীয় পর্যায়টি ২০০১ থেকে ২০১০ সাল ও তৃতীয় পর্যায়টি ২০১১ সাল থেকে ২০১৭ সাল অবধি। এই বিশেষ সময়কালগুলিতে লিখিত বিভিন্ন উপন্যাসগুলি যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা সমাজের সমস্থানীয় নন। তাঁদের নিজস্ব অবস্থান ভিন্ন, তাঁদের রুচি-পছন্দ ভিন্ন, সর্বোপরি তাঁদের আদর্শও ভিন্ন। তা সত্ত্বেও তাঁরা উপন্যাস রচনার মাধ্যমে, ধর্মের যে রূপ তুলে ধরেছেন এবং সমাজের নানান আঙ্গীকে ধর্মের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা পাঠকের কাছে সঠিক ব্যাখ্যা হয়ে উঠছে কিনা – তা বিচার্য বিষয়। তাঁদের মতামত কখনো কখনো এক হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনও কখনও তাঁদের মধ্যে মতবিরোধও পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়ে লিখিত এই সমস্ত বাংলা উপন্যাসগুলি থেকে অনুধাবন করা যেতে পারে যে, ধর্মীয় চেতনার ভাবাবেগ, জাতীয়স্বার্থ বা জাতির স্বার্থে সংরক্ষিত বিশেষ অবস্থা, যা সকল রাষ্ট্র অর্জন ও সংযোজন করতে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার সামঞ্জস্য বজায় রাখার স্বার্থে। বিশ্বায়নের দর্পণে উপন্যাসপ্রাপ্ত জাতীয়স্বার্থকে, সকল জাতির মূল্যবোধের সমন্বয় রূপে গণ্য করা যেতে পারে। তাই জনসাধারণের কল্যাণে, জাতীয়সত্তার স্বার্থ সংরক্ষিত করাকেই ঔপন্যাসিকেরা উপন্যাসগুলিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছেন। সর্বদা হয়ত তাঁদের এই মানসিকতা, তাঁরা নিজেরাও সমর্থন করেন না। তবু জাতীয় স্বার্থের কথা স্মরণে রেখে, উপন্যাসগুলিকে শুধুমাত্র নিজধর্মের আঙ্গীকে নয়, সমগ্র বিশ্বমানবিকতার ঐক্য রক্ষার ভাবনায় পুষ্ট করার চেষ্টা করেছেন, যা বিশ্বায়নের সদর্থকতাকেই দৃশ্য করে তুলেছে। কারণ উপন্যাসিকেরা শুধুমাত্র নিজের ধর্ম সম্বন্ধেই সচেতন নন, তাঁরা জাতীয়স্বার্থ রক্ষার্থে বা বিশ্বমানবিকধর্ম রক্ষার্থে, অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কেও সমান সচেতন ও সহনশীলতার প্রমাণ তাঁদের উপন্যাসে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গেই তুলে ধরেছেন। তাই এই ছাব্বিশ বছরের বাংলা উপন্যাসগুলিতে, ঔপন্যাসিকেরা ধর্মের প্রসঙ্গ কিভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন এবং ধর্মের সদর্থকতা ও নঙর্থকতাগুলিকে মানুষের মূল্যবোধের আয়নায় কিভাবে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন তা বর্তমান গবেষকের কাছে বিচার্য বিষয়। কারণ মানুষের মনন বিশ্বব্যাপী শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার নীতিকে গ্রহণ করার এক সদর্থক পদক্ষেপ।

প্রথম পর্ব (সময়কাল : ১৯৯১ – ২০০০)

ইতিহাস

বৃহৎ উপন্যাস বা মহান উপন্যাস বর্তমান গবেষকের কাছে অনেকটা ইতিহাসেরই নামান্তর। অতীত ও বর্তমানের মানুষের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় হচ্ছে ঐতিহাসিক জ্ঞান। এই ঐতিহাসিক জ্ঞানের আলোতেই, বর্তমান জ্ঞান হয়ে ওঠে সকল শক্তির উৎস। যে কোনো জ্ঞান বহুবিধ চর্চার দ্বারাই আয়ত্তাধীন হয়। বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টি রহস্যের বৈচিত্র্য, যখন মানুষ নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের ভিত্তিতে, কার্যকারণ সম্পর্ককে অনুসন্ধান করার কারণে, যে সমস্ত প্রতীকী কথা-কাহিনির নির্মাণ বা উদ্ভাবন করেছিল, পুরাকাহিনি বা পুরাণ তারই অভিব্যক্তি বা অতীতের ঐতিহাসিক জ্ঞান। একমাত্র ইতিহাসই মানুষের অতীত সম্পর্কে ভুল ধারণা ও বোধহীন দৃষ্টিশক্তিকে দূর করতে সক্ষম। সমগ্র পৃথিবীর শুভাশুভ সময়ের সাথে সৃষ্ট হচ্ছে, সময়েতেই লয়প্রাপ্ত হচ্ছে এবং আবার সময় থেকেই জাত হচ্ছে। সমস্ত জীবের নিদ্রাকালেও সময় কিন্তু জাগরিত থাকে। সময়কে অতিক্রম করা অসম্ভব। সময় অব্যর্থ রূপে সমস্ত বস্তু এবং সমগ্র জীবেতেই সমভাবে বিচরণ করছে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সকল কিছুই সময় দ্বারা নির্মিত। **‘পৃথা’** (১৯৯১) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কালকূট কথকের ভূমিকায় বলেছেন –

“সাধারণ মানুষ, সে দেবতা-অসুর-গন্ধর্ব যে জাতিরই হোক, নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের চেতনা ছিল না। অথচ ধর্ম বিষয়ে সকলেরই ছিল প্রগাঢ় বিশ্বাস। ধর্মকে কেন্দ্র করে সমস্ত কিছুকেই তারা শ্রদ্ধা করেছে। যে কোন বস্তুকে বংশানুক্রমে পুজো করেছে রক্ষা করেছে। সেই কারণেই পুরাণ বেদ ইত্যাদির রচয়িতারা সাধারণদের সেইসব রচনাকে ধর্মগ্রন্থরূপে চিহ্নিত করতেন এবং রক্ষা করতে বলতেন।....সংহিতার অভিধানগত অর্থ কী? সংগৃহীত রচনাসমূহ সংকলন গ্রন্থ বেদের মন্ত্রসমষ্টি, মন্ত্রাদিকৃত স্মৃতিশাস্ত্র, পবিত্র ও অবশ্য পালনীয় নির্দেশসমূহ বা গ্রন্থ, সংস্কৃত ব্যাকরনের সন্ধি। (সংসদ বাংলা অভিধান।) এই একই অভিধানের, ‘যুগ’-এর অর্থ দেখছি, সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চার পৌরাণিক কাল। কিন্তু সংহিতা যুগ বলে নির্দিষ্ট কোন যুগকে চিহ্নিত করা হয়নি। তবে সংহিতা বলতে ‘পবিত্র ও অবশ্যপালনীয় নির্দেশসমূহ বা গ্রন্থ’ – এই কথার সঙ্গে সঙ্গে সংহিতা যুগের একটা সম্পর্ক যেন পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে দ্বাপরের সঙ্গে সমসাময়িকতার নির্ধারণ আর করা যায় না। কারণ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, সংহিতা যুগেরও পরের কাল। সংহিতা আর পৌরাণিক কালকে পণ্ডিতরা আলাদা করে দেখিয়েছেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, পৌরাণিক কাল।....ব্রাহ্মণ কোনো বংশধারায় জন্মাতো না। প্রতিভা ও জ্ঞান, এবং তপবলের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা সম্ভব ছিল।”

ইতিহাসের এই সূত্র ধরেই বলা যায় যে, ভারতবর্ষের যে ইতিবৃত্ত পুরাণের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় তা ভারতবর্ষের প্রাচীনসত্তার জন্মদাতা ও তাদের ঐতিহাসিক প্রামানিক দলিল। ইতিহাসের পথ ধরে চলতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, পার্থিব যা কিছু অতীত ও বর্তমান তা সকলই নানা নামের জাতির মানুষেরই কীর্তি। ইতিহাস, অতীতের সংহিতা যুগকে মাতৃতান্ত্রিক সমাজরূপেই চিত্রিত করেছে। যেখানে মহিলাদের সতীত্ব, পদমর্যাদা, সমাজে প্রতিষ্ঠা সমস্ত কিছুই অম্লান ও অক্ষুন্ন ছিল। ইতিহাস সাক্ষী, সমাজে বর্ণপ্রথা সেভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। জন্ম দ্বারা বর্ণ অর্জন করা যেত না, তা প্রতিভার দ্বারা অর্জন করতে হতো। বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়গুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। অতীতের ইতিহাসের রেশ ধরে বলা যেতে পারে যে বর্তমান কালেও যদি মানুষের কীর্তি, মহিলাদের স্বাধীনতা (যা পরোক্ষভাবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রকাশ) ও বর্ণবিদ্বেষের উচ্ছেদ প্রাধান্য পায় তাহলেই অতীত সমাজ অনুযায়ী সঠিক সমাজ গড়া সম্ভব হতে পারে। যা লিঙ্গ, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সমদৃষ্টির প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতে সক্ষম হতে পারে, যাকে প্রকৃত সঠিক ধর্ম রূপে গণ্য করা যেতে পারে। ঔপন্যাসিক অসীম কুমার বসুর লেখা **'রানীর অন্তর্ধান'** (১৯৯৫) উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট চরিত্র এলিজার বয়ানে –

"এলিজা বলেছিল, ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র মূলত বেদ-বেদান্ত উপনিষদ আর গীতার বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত।....তাই তার ইচ্ছে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সেকাল আর একাল নিয়ে একটু বিশদ ভাবে জানা। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে আশ্রম কেন্দ্রিক শিক্ষা চালু ছিল। বলতে গেলে এই আশ্রম থেকেই সমাজশাসন আর সামাজিক প্রথার প্রচলন হয়। এখানেই সৃষ্টি হয়েছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র এই চতুর্বর্ণের। এটাকে কিন্তু অনেকে বর্ণবিদ্বেষবাদ বা বর্ণ বৈষম্য বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু যখন এই বর্ণাশ্রম চালু হয়েছিল তখন কিন্তু এর মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম – ভারতীয় সমাজকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানো। এই চারটি নাম থেকে বোঝা যায়, কার কি কর্তব্য নির্দিষ্ট ছিল। প্রতিটি নর-নারী কিন্তু জন্মসূত্রেই এই কার্যধারার অবলম্বন পেত। এই সময় কোনো ভাগ ছোট বা বড় বলে কেউ দাবী করতে পারত না। কাল ক্রমে কিছুকিছু মুনিঋষি বা পণ্ডিতের ভুল ব্যাখ্যার জন্য যত বিতর্কের সূচনা হয়েছে।....বর্তমান সময়ে বসে ঐ সময়ের বর্ণবিন্যাস বিচার করলে কিন্তু কেউ বড় কেউ ছোট একথা বলতে পারবে না। সবারই কাজ সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং সবাই একে অপরের উপর নির্ভরশীল।"

বহু শতাব্দী ধরেই ভারতীয় সমাজে জাতিভেদ প্রথা বা বর্ণভিত্তিক বিভাজন প্রথা এক জটিল সমস্যা রূপে স্থিত হয়ে আছে। বর্তমানে এই বর্ণভিত্তিক বিভাজন প্রথা ভারতবর্ষের এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশেও ভারতবর্ষের মতই বর্ণবিভাগ, বর্ণবৈষম্য ও বর্ণবিদ্বেষ বর্তমান। কিন্তু ভারতীয়

বর্ণভেদ প্রথা তার প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ও ধর্মাচরণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতবর্ষের শাস্ত্রমতে চতুর্বর্ণের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে বলা যেতে পারে একটা সুপ্রাচীন ও জটিল সভ্যতার সমন্বয়ের বিভিন্ন সামাজিক স্তর। ভারতবর্ষের একটা বিরাট জনসমষ্টি অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। ভারতবর্ষে প্রত্যেকটি প্রধান জাতির তিনটে সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১) বংশানুক্রমিতা (Heredity), ২) সমপাঙক্তেয়তা (Commensality), ৩) অন্তর্বিবাহ (Endogamy)। এছাড়া বেশির ভাগ জাতিই বৃত্তিভিত্তিক। যে সমস্ত জাতি বৃত্তিভিত্তিক, তাদের বৃত্তিও বংশানুক্রমিক। সমপাঙক্তেয়তার অর্থ হলো উচ্চ জাতি ও নিম্ন জাতির মানুষ এক পংক্তিতে বসে আহার করতে পারবে না। এই প্রথা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির জন্যই প্রযোজ্য। অন্তর্বিবাহের অর্থ কোন মানুষই ভিন্ন জাতিতে বিবাহ করতে পারবে না এবং এক গোত্রের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়। বর্ণ এবং জাতির মাধ্যমেই ধর্ম এবং কর্মের সমন্বয় সাধন করা হলে, তার দ্বারা যে কোন জাতির বা বর্ণের উচ্চ-নীচ ভেদভাবকে উপেক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই স্ববৃত্তি অনুযায়ী কর্তব্য পালন করলেই – তাই হবে প্রকৃত ধর্ম এবং এই ধর্মরূপ কর্মেই প্রকৃতপক্ষে মানুষের মুক্তি। জাতি এবং বর্ণের মধ্যে পার্থক্য হল, জাতি জন্মভিত্তিক এবং বর্ণ কর্মভিত্তিক। অর্থাৎ জাতি অপরিবর্তনীয় কিন্তু বর্ণ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত হলেও গুণানুসারে পরিবর্তনীয়। রক্ষণশীলতার সঙ্গে আধুনিকতার দ্বন্দ্ব চিরদিনের। বর্তমান সমাজ, বর্তমানে এমন এক ব্যবস্থা কায়েম করতে আগ্রহী যা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষেরই প্রতিভার বিচ্ছুরণে সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করবে। এই নবচেতনা এক নতুন আদর্শের সদর্থক পদক্ষেপ। ঔপন্যাসিক প্রতিভা বসু তাঁর **'সকালের সুর সায়াহ্নে'** (১৯৯৫) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র পূর্ণলক্ষ্মীর নাতনি বুলুর মৃত্যুতে বুলুর মা সুলক্ষণার সাথে শোকে আচ্ছন্ন অবস্থায় কেশবানন্দের 'গীতা'র সুবচন শুনে মনকে শান্ত করেছিলেন। কেশবানন্দ সন্ধ্যেবেলা ধ্যানস্থ হয়ে বলেন –

> **"আত্মা কখনো জাত বা মৃত হন না। কারণ পূর্বে না থেকে পরে বিদ্যমান হওয়ার নাম জন্ম, এবং পূর্বে থেকে পরে না থাকার নাম মৃত্যু; আত্মাতে এই দুই অবস্থার কোনোটিই নাই। অর্থাৎ আত্মা জন্ম ও মৃত্যু রহিত, অবক্ষয়হীন এবং বৃদ্ধিশূণ্য; শরীর নষ্ট হইলেও আত্মা বিনষ্ট হন না।....মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মা সেই রকম জীর্ণ শরীর ত্যাগ ক'রে অন্য নতুন শরীর গ্রহণ করে। কোন শাস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করতে পারে না। অগ্নি একে দহন করতে পারে না। জল একে আর্দ্র করতে পারে না এবং বায়ু একে শুষ্ক করতে পারে না।"**

উপরোক্ত শাশ্বত বাণী ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ ‘শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা’ থেকে গৃহীত হয়েছে। গীতা বস্তুত হিন্দুধর্মের এক আকর গ্রন্থ। এই গ্রন্থ হিন্দুধর্মের সারাৎসার। এই ধর্মগ্রন্থে যে ধর্ম-দর্শন ও যোগমার্গের কথা বলা হয়েছে তা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষকে নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মপথে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করে বলেই সকলের বিশ্বাস। এই ধর্মগ্রন্থের শিক্ষা সর্বকালীন ও সর্বজনীন। গীতা শুধুমাত্র সাধু-সন্তদের কাছেই নয়, গৃহী-সংসারী মানুষের কাছেও এক আদৃত গ্রন্থ। কারণ গীতায় সমস্ত বেদের সারসংগ্রহকে সুন্দর ও সরল ভাষায় পরিবেশন করা হয়েছে যা সকল মানুষের পক্ষেই অত্যন্ত সহজেই বোধগম্য হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতেই ‘শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা’-র বাণী মানুষকে আশ্বাস ও শান্তির দিশা প্রদান করে। যেমন ঔপন্যাসিক প্রতিভা বসুর **‘সকালের সুর সায়াহ্নে’** (১৯৯৫)উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র পূর্ণলক্ষ্মীর নাতনি বুলুর মৃত্যুতে, পূর্ণলক্ষ্মী ও বুলুর মা সুলক্ষণার শোকবিহ্বল অবস্থাতে, কেশবানন্দের ‘শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা’-র সুবচন তাদের মনকে শান্ত করেছিলো, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে লক্ষণীয়। বাংলা উপন্যাসে ঔপন্যাসিকেরা উপন্যাসস্থিত চরিত্রদের মানসিক স্থিতির প্রয়োজনে, তাই বারংবার শ্রীমদ্ভগবদগীতার বাণীকে ব্যবহার করে পাঠকের মধ্যে শান্তি ও শোকমুক্তির প্রেরণার সঞ্চার করেছেন। গীতার মূল বাণী – কর্মই ধর্ম। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সকল মানুষের প্রতি সমদৃষ্টি ও সকল মানুষকে এক বিশ্বভ্রাতৃত্বের পথে অগ্রগামী হতে প্রেরণা যোগায়। তাই বলা যেতে পারে, ‘শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা’ ধর্মীয় উপলব্ধির ক্ষেত্রে, বিশ্বায়নের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য এক প্রয়োজনীয় মার্গদর্শন। ঔপন্যাসিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস **‘স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান’**-এ (১৯৯৬) উপন্যাসস্থিত চরিত্র গঙ্গাধর ভট্টাচার্য বলছেন –

“তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলছে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। প্রয্যন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। অর্থাৎ কি না আনন্দ থেকে ভূতগণ – এই ভূত সেই ভূত নয় – জন্মগ্রহণ করে। আনন্দ দ্বারাই বাঁচে এবং শেষে আনন্দে প্রতিগমনপূর্বক প্রবেশ করে। কারণ আনন্দই ব্রহ্ম।....উপন্যাস স্থিত চরিত্র সানুর কথার উত্তরে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য আবার বলছেন, আনন্দ যে সত্যিই আনন্দ, বুঝবো কিসে? দুঃখটার খুব দরকার ছিল।....কারণ মানুষই শাস্ত্র রচনা করেছে এবং মানুষের মধ্যে গোলমাল আছে বলেই শাস্ত্রে তার খানিকটা ছাপ পড়েছে। আনন্দ থাকলে দুঃখের থাকা স্বতঃসিদ্ধ।....দুটোই রিয়্যালিটি।”

উপনিষদসমূহ সংহিতা ব্রাহ্মণ সাহিত্যের ধারক। উপ-নি-সদ কথাটির অর্থ ‘কারোর কাছে বসা’। অর্থাৎ গুরুর কাছে বসে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তা উপনিষদ

শব্দটির সাহায্যে সূচিত হয়েছে। যে কোন বস্তুর জন্মের উৎস আনন্দ। আনন্দের সহায়তায় বাঁচে এবং শেষে আনন্দের মধ্যেই সদানন্দে প্রবেশ করে। কারণ আনন্দই ব্রহ্ম। উপনিষদ কথিত ব্রহ্মবিদ্যার মূল কথা হল, ব্যক্তি-আত্মা ও বিশ্ব-আত্মা আসলে সমার্থক। ঔপন্যাসিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস **'স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান'**-এ (১৯৯৬) উপন্যাসস্থিত চরিত্র গঙ্গাধর ভট্টাচার্য সেই আনন্দকে উপলব্ধি করার জন্য দুঃখের উপস্থিতিকে আনন্দের সঙ্গেই মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ সদর্থক ধারণার সার্থক উপলব্ধির জন্য নঙর্থক ধারণার প্রয়োজন চিরন্তন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে জন্ম-মৃত্যু, সত্য-মিথ্যা, লাভ-ক্ষতি। এমনকি আস্তিক-নাস্তিক ধারণাও এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই আদর্শগত ভাবনার হাত ধরেই বলা যেতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের বিখ্যাত উক্তি – "তুমি অধম। তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?" বর্তমান গবেষক মনে করেন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষের সকল ধর্মমতের মানুষের মধ্যেই সহনশীলতার বীজ থাকা একান্ত প্রয়োজন। যা ভারতবর্ষকে সনাতনধর্মের ঐতিহ্যের বাহক হিসেবে সমগ্র বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করতে সক্ষম হতে পারে এবং পরোক্ষভাবে ধর্মীয় বিশ্বায়নে বিশ্বভাতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদারের **'কালাপাহাড়'** (১৯৯১) উপন্যাসের চরিত্র অর্জুন, তার ইতিহাসের শিক্ষক গৌরহরিবাবুর কাছে বাঙালির ইতিহাস সম্পর্কে যা জেনেছিল তা হল নিম্নরূপ –

"বাংলা নামটা এলো কোত্থেকে? আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরি বইয়ে বলেছেন বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল যুক্ত হয় বাঙ্গাল বা বাংলা হয়েছে। আল মানে একটা বাঁধ। জলের দেশে বাঁধ দরকার হয়। তাই বাংলা।....সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্ক এসে মুর্শিদাবাদ থেকে ওড়িশা পর্যন্ত একটা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের চেহারা দেন। শশাঙ্কের পর তিনটে জনপদ হলো। পুন্ড্রবর্ধন, গৌড় এবং বঙ্গ। পাল আর সেনরাজারা সমস্ত বাংলাদেশকে গৌড় নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। তা সম্ভব হয়নি। তিনটে কমে দুটোতে এসে ঠেকেছিল। গৌড় এবং বঙ্গ।....এমন কী কাশ্মীরের রাজা মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য পর্যন্ত গৌড় আক্রমণ করে বিজয়ী হন। শশাঙ্ক ছিলেন শৈব। বাংলার অন্যরা রাজারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী। শশাঙ্ক সম্ভবত হর্ষবর্ধনের জন্যই বৌদ্ধধর্মবিরোধী। এরপরে গোপালদেব এসে মাৎস্যন্যায় দূর করেন। শুরু হলো পাল বংশ। আজকের বাঙালি জাতির গোড়াপত্তন হয়েছে এই যুগেই। অর্থাৎ অষ্টম শতকে থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। সেই অর্থে বাঙালির ইতিহাস হাজার বছরের বেশি নয়।....পালেদের সময়ে দেশে বৌদ্ধরা এসেছিলেন।....সে-সময়ে হিন্দু থেকে মুসলমান অথবা বৌদ্ধ হওয়া খুব সহজ ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদের সংকীর্ণতা অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য হিন্দু-ধর্মে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে রেখেছিল।"

ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদারের **‘কালাপাহাড়’** উপন্যাসপ্রাপ্ত বাংলার ইতিহাস থেকে সেইসময়ের ধর্মসংক্রান্ত তথ্য অবগত হওয়া অত্যন্ত সহজ হয়েছে। যা এই গবেষণার অগ্রসরের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ইতিহাস যে কোন সভ্যতার বর্তমান বাস্তবায়নকে অনেক সহজ করে দেয়। তাই ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ঔপন্যাসিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লিখিত উপন্যাস **‘শাহজাদা দারাশুকো (দ্বিতীয় খন্ড)’** (১৯৯১) উপন্যাসে শাহজাহান-পুত্র শাহজাদা দারাশুকো স্বগতোক্তি করছেন যে –

“ইসলাম হিন্দুস্তানের সবচেয়ে আগে আসে দক্ষিনে। ওখানে হযরতের খুব প্রিয় মুরিদ তামিম আনসারির সমাধি রয়েছে। তিনি এসেছিলেন বড় দরিয়া পেরিয়ে। হয়তো কোনো ব্যাপারী-জাহাজে চড়ে। দক্ষিণ ইরান থেকে বালুচদের এলাকায় দরবেশরা আসেন। আসেন মাকরান পাহাড়ের দক্ষিণ দিয়ে সিন্ধুতে। খাইবারের পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে তুর্কিরা, আফগানরা হিন্দুস্থানে এসেছে। এসেছি আমরা। এসেছেন সুফিরা – দরবেশরা।....ইসলাম জায়গা দখল করে যতটা না পেরেছে – দিল জয় করে তার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছে। হিন্দুস্থানে এসে ইসলাম হিন্দুস্থানের বাইরের মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে এখানকার মাটিতে বসে – ইনসানের খুশবুতে অনেক – অনেক বেশি ধনী হয়ে উঠেছে। আর সে-কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন – এই সুফীরা – এই দরবেশরা।”

ইতিহাস প্রাপ্ত এ কথা সত্য যে ভারতবর্ষ বারংবার বিদেশী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে ও বিদেশি শক্তিরা ভারতবর্ষকে বারবার লুণ্ঠনও করেছে। বিদেশি শক্তিরা লুটতরাজ করার মানসিকতা নিয়েই এ দেশে এসেছিল কিন্তু তারা এদেশের সংস্কৃতির সাথে, মাটির সাথে, জনজীবনের সাথে মিশে যাওয়ার মতো কোন মানসিকতাকে কখনোই প্রাধান্য দেয়নি। অপরপক্ষে আরব, তুর্কি, আফগান, মোগল ইত্যাদি বিদেশি শক্তির প্রধান পরিচয় ‘আক্রমণকারী’ হিসেবে হলেও শেষ পর্যন্ত তারা এ দেশের শিল্প সংস্কৃতি ও মাটির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ‘ভারতীয়’ হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের শিল্প, সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মিলনে সমৃদ্ধ হয়েছে বর্তমান মহান ভারতীয় সংস্কৃতি। এদেশে ইসলাম ধর্মের ‘প্রথম প্রচার’ বলপূর্বক এবং রক্তপাতের মাধ্যমে সূচিত হয়নি। বরং মুসলমান সাধুসন্তদের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছিল। একদিকে এ দেশের সংস্কৃতির বিকাশে মুসলমান শাসকরা যেমন পৃষ্ঠপোষণা করেছিলেন, তেমনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মহান মানবধর্মের প্রচারের মাধ্যমে মুসলমান পীর, ফকির, দরবেশ, সুফি-সন্তেরা ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিল। আমাদের দেশে মুসলমান সাধকদের মতোই, হিন্দু সাধকরাও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে মহামিলনের বাণী প্রচার করেছিলেন। এই দুই পক্ষের

মহামিলনের ব্রতবদ্ধ কর্মে, সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল ঐতিহ্য জন্ম নিয়েছে, যা সমগ্র ভারতবাসীকে এক সমতা ও মৈত্রীর বাণীতে অনুরণিত করে, বিশ্বভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছে। যদিও পরবর্তীকালের ইতিহাস এই সম্প্রীতির উজ্জ্বল ধারাকে বহন করতে হয়তো তেমন ভাবে সক্ষম হতে পারেনি। ঔপন্যাসিক মানব গঙ্গোপাধ্যায়ের **'ছেঁড়া পোস্টার'** (১৯৯৮) উপন্যাসের চরিত্র অবিনাশ ব্যানার্জী বলছেন –

"বিদেশী পত্রিকায় মুসলিম লীগের বীভৎস কাণ্ডকারখানা প্রকাশ হয়েছে।....হিন্দুরা প্রথমে আক্রমণ করেনি। গায়ে পড়ে মুসলমানদের সঙ্গে বিবাদ হিন্দুরা করতে চাইনি। হিন্দুরা যা করেছে আত্মরক্ষার জন্য করেছে।....এটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। মুসলমানরা ধর্মের নামে ভারতবর্ষ থেকে এক টুকরো দেশ কেটে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা ধর্মনিরপেক্ষ।....আমরা ভারতবাসী – এই ভোগলিক জাতীয়তাবোধ দিয়ে জাতি কোনদিন জাগে না, ভূগোল কোন ভাবাবেগ তৈরি করতে পারে না। যে জাতীয়তাবোধ ধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে না – সেই জাতীয়তাবোধ স্থায়ী হয় না।....উপন্যাসের আর এক চরিত্র রমেশ বাবুর ভাষ্যে – মুসলমান রাজত্বের আগেও হিন্দু রাজত্ব ছিল, অনেক হিন্দু রাজা ছিলেন – পরস্পরের মধ্যে মারামারি শেষ ছিল না। তখন ধর্মের বন্ধন ছিল – কোথায় ছিল জাতীয়তাবোধ, কোথায় ছিল নীতিবোধ? ইউরোপের কথাই ধর, সারা মধ্যযুগ ধরে এক ধর্মের আওতায় থেকে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ কি এরা কম করেছে?....ধর্ম কোন রাষ্ট্রের চরিত্রকে ধার্মিক করেছে বলতে পার? ধর্ম আর জাতীয়তাবোধ যে এক একথা ইতিহাস বলছে না।"

পৃথিবীর ইতিহাস থেকে এই শিক্ষালব্ধ করা যায় যে জয়ী এবং পরাজিতের স্বার্থ সাধারণত পরস্পরবিরোধী হয়ে থাকে। তাই কোন একটি যুগের ঔপন্যাসিকদের দ্বারা লিখিত উপন্যাসগুলি থেকে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের (শাসক অথবা শাসিত) ইতিহাস অনুসন্ধান করা একপ্রকার অসম্ভব বলা যেতে পারে। কারণ শাসক সম্প্রদায়ের সম্বন্ধেও শাসিত সম্প্রদায়ের মতামতের একটা মূল্য থেকেই যায়। কিন্তু সেই মূল্যবান তথ্য যদি শাসক সম্প্রদায়ের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহলে ইতিহাস অনেক সময় পরিহাসে পরিণত হতে পারে। তাই বাংলা উপন্যাসপ্রাপ্ত ধর্মবিষয়ক সকল মতামত অনেক সময়ই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে। সেই কারণে, সঠিক ঐতিহাসিক সত্য অনুধাবন করতে গেলে শাসকের শাসন নীতির ফলে ধর্মের অমর্যাদার বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মান্যতা দেওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি পাওয়া সত্ত্বেও, জাতীয়তাবোধ কিন্তু বোধহয় সেভাবে প্রকাশিত হতে পারেনি। তার কারণ উপরোক্ত উপন্যাস প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে, ধর্ম এবং জাতীয়তাবোধকে সমার্থক হিসেবে

ইতিহাস স্বীকার করে না। হিন্দু, ইসলাম, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রতিটি ধর্মের ক্ষেত্রেই আন্তরিক ধর্ম ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের আন্তরিক মিল জাতীয়তাবোধেই। আমরা ভারতবাসী অর্থাৎ ভারতবর্ষের অধিবাসী এটাই আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচিতি। ভারতবাসীর এই পরিচয়ে খাদ্য, ভাষা, পরিধান, রীতিনীতি, এমনকি ধর্মও সর্বদা প্রাধান্য পেতে পারেনা। কারণ ভারতবর্ষের কাঠামোটি বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের অনুসন্ধানের ওপর দণ্ডায়মান। তাই বর্তমান গবেষক উপরোক্ত ঔপন্যাসিক মানব গঙ্গোপাধ্যায়ের – *"যে জাতীয়তাবোধ ধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে না – সেই জাতীয়তাবোধ স্থায়ী হয় না।"* এই উক্তির ক্ষেত্রে একমত হতে সক্ষম নন। ঔপন্যাসিক আব্দুল জব্বার লিখিত **'সবুজ নক্ষত্র'** (১৯৯৬) উপন্যাসের চরিত্র সঞ্জয় কুমার রায়, গোলাম নবীকে ছোট আলমারি থেকে একটা পত্রিকা এনে বলল –

"ইসলামীকরণ এবং পাকিস্তানে বিজ্ঞানের আদর্শগত সংকট। লেখক! পারভেজ আমির আলি হুদোভয়।....তিনি এই লেখায় জানিয়েছেন :
ইউরোপ যখন অন্ধকার যুগে আচ্ছন্ন ইসলামিক সভ্যতা তখন উন্নতি ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির চরম শিখরে। বিজ্ঞান পত্রিকা 'নেচার'-এর রিপোর্ট :
'হাজার হাজার বছর আগে তাদের সভ্যতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে মুসলিম বিশ্ব বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল। বিশেষ করে গনিত ও চিকিৎসাশাস্ত্রে সুসময়ে বাগদাদ ও দক্ষিণ স্পেন এমনসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিল যেখানে হাজার হাজার ছাত্র পড়তে আসত। শাসকগণ বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীদের দ্বারা বেষ্টিত থাকত। একটি মুক্ত আবহাওয়া ইহুদি, খ্রীস্টান ও মুসলমানদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে সাহায্য করেছিল। আজ এসবই কেবল স্মৃতি।'
৭৫০ থেকে ১১০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমানদের পূর্ণ আধিপত্য ছিল।....তার আগে গির্জার অনমনীয় মতবাদের কারণে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইউরোপে বিজ্ঞানের উন্নতি অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বিজ্ঞানী বা দার্শনিকেদের ফাঁসি দিত, পুড়িয়ে মারতো। কবর থেকে হাড় তুলে গুড়িয়ে সমুদ্রে ফেলে দিত। কিন্তু সম্রাট আল্‌মামুন বিজ্ঞানী ও শিল্পীদের দ্বারা পরিচালিত হতেন। অনেকেই জানেননা কবি ওমর খৈয়াম মস্ত বড় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন, বিজ্ঞান মানমন্দিরের পরিচালক ছিলেন তিনি। স্যার সৈয়দ আহমদ বিজ্ঞানের ভক্ত ছিলেন বলে তাঁর আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট করেছিল মৌলবাদীরা। ....গোলাম নবী বললেন, 'তুমি তো দেখছি অন্য ধর্মের বিষয়ে বেশ খোঁজ খবর রাখো।' 'বেশি নয়, কিছু কিছু। সব ধর্মই জানতে হয়, নইলে নিজের ধর্মের গোঁড়ামি আচ্ছন্ন করে। ধর্মের কাছে মানুষের ঋণ আছে। আরণ্যক যুগ থেকে মানুষকে সমাজজীবনে তুলে এনেছে। বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণে তারপর পৃথিবী অন্য যুগে চলে এসেছে।...পত্রিকাটি নিয়ে গোলাম নবী সন্ধ্যার আজান শুনে মসজিদে চলে গেলেন।"

ঔপন্যাসিক আব্দুল জব্বার লিখিত **'সবুজ নক্ষত্র'** (১৯৯৬) উপন্যাসে উপন্যাসস্থিত চরিত্র সঞ্জয় কুমার রায় বিজ্ঞান পত্রিকা 'নেচার'-এর রিপোর্ট অনুসারে,

অতীত ইসলামিক সভ্যতার উন্নতি এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যে নিদর্শন তুলে ধরেছেন তা সমর্থনযোগ্য। আবার লেখকের উপন্যাসের একই চরিত্র সঞ্জয় কুমার রায় বর্তমান ইসলামিক অগ্রগতি প্রসঙ্গে বলেছেন – মৌলবাদীদের প্রভাবান্বিত শক্তিতে, আধুনিক যুগের মুসলমানরা বিজ্ঞানে অনগ্রসর। বর্তমানের ইসলামিক সভ্যতার অনগ্রসরতার কারণ হিসেবে এই ধর্মের ধর্মীয় গোঁড়ামিকে দায়ী করা যেতে পারে। 'ইসলাম' শব্দটির অর্থই হল – 'আল্লার প্রতি নির্বিচার বশ্যতা', 'আল্লার ইচ্ছার কাছে ব্যক্তির ইচ্ছাকে উৎসর্গ করা'। মহম্মদ প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম সর্বৈবভাবে এক পুঁথিগত ধর্ম, যা কেবলমাত্র 'কোরান'-এ লিপিবদ্ধ আল্লার বাণীগুলিকেই অনুসরণ করে থাকে। এই ধর্মে আধ্যাত্বিক ও বৈষয়িক বিষয়ের মধ্যে, মসজিদ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে, ধর্ম এবং রাজনীতির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। এই ধর্ম সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে ধর্মের আবেদন কখনো কখনো সংকীর্ণ ও উত্তেজক হয়ে ওঠে যা সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বভাতৃত্ববোধের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। জোর করে বা বল প্রয়োগ করে, নিজ ধর্মের গোঁড়ামিকে উপেক্ষা না করে, কোনো ধর্মই এক সর্বজনীনধর্মে বোধহয় পরিণত হতে পারে না। কারণ শুধু ধর্মে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই মানুষ মানবিকচেতনার স্বাধীনতাকেই গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে থাকে। মানবিকচেতনার অভাবই নীতিহীনতার জন্ম দিতে পারে। ধর্মীয় চেতনার মধ্যে মানুষের আবেগ অনুভূতি প্রকটিত হতে পারে, তাই সংকীর্ণ ধর্মীয় চেতনাকে সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য পরিত্যাগ করা যেতে পারে।

রাজনৈতিক দিক

'রাজনীতি'-র প্রকৃত অর্থ হলো জাগরন। যেকোনো পরিস্থিতিতে ভাতৃত্ববোধ বা সৌহার্দ্যবোধের ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করার সুন্দর ও সহজ এক পন্থা হল – সদর্থক রাজনৈতিক-চেতনার উন্মেষ। মানুষের মধ্যে এই মানসিক সদর্থক ভাবনার রাজনৈতিকচেতনাকে আবিষ্কার করে, ঐক্যচেতনায় পরিবর্তিত করার প্রক্রিয়াকেই 'রাজনীতি' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। মূল্যবোধহীন, লোভী, একশ্রেণীর স্বার্থ ও চক্রান্ত থেকে সমাজ, সংসার ও মানুষকে বাঁচিয়ে তোলার যে সদর্থকচেতনা মানুষের ভেতরে জন্ম নেয় এবং সেই চেতনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে, মানুষ যখন বিশ্বভাতৃত্ববোধের দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়, তখন তাকে সেই পরিস্থিতির সঠিক রাজনৈতিক দিক বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষে শিক্ষায়তনগুলিতে এই মানবিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করার কোন সচেতন প্রয়াস তেমনভাবে প্রাধান্য পায় নি। তাই শিক্ষায়তনগুলির পক্ষে ভারতীয় সমাজকে মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ

করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করা তেমনভাবে সম্ভব হয়নি। নির্ভীক সংচেতনা গড়ে ওঠার মতো অনুকুল পরিবেশ, যুক্তিহীন উশৃংখলতার জন্য প্রায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। ফলে কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার মতো অজ্ঞানতা, সমাজের মানুষের শিরদাঁড়াকে দৃঢ় হতে অনেক সময় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। তাই দেশ ও সমাজ বদলানোর পরিকল্পনায় নব রাজনৈতিক বোধের প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রই একমাত্র এই বিষয়ে সহায়তার অঙ্গীকার করতে পারে। কারণ কুসংস্কার এবং ধর্মান্ধতা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্মদাতা। মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজের অগ্রগতিকে প্রায় পঙ্গু করে তুলতে পারে। খাঁটি ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি যেমন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক তথ্যভিত্তিক ঠিক তেমনি বিভিন্ন ঔপন্যাসিকদের দ্বারা লিখিত উপন্যাসগুলিও যৎপরোনাস্তি তথ্যভিত্তিক। তবে ঔপন্যাসিকদের মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় পরিস্থিতি বিভিন্ন হওয়ার কারণে উপন্যাসপ্রাপ্ত তথ্যগুলিও অবস্থান্তরে ঐক্য ও অনৈক্যের শিকার হয়েছে। সঠিক বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের কারণেই বর্তমান গবেষক উপন্যাসপ্রাপ্ত ধর্মভাবনায় রাজনৈতিক দিকটিকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। সর্বগ্রাসী মানবিক অবক্ষয়ের শিকড়ের সন্ধান করতে গিয়ে যে সমস্ত উপন্যাসে ধর্মভাবনায় রাজনৈতিক দিকটি উঠে এসেছে তার বিশ্লেষণ করা হলো। ঔপন্যাসিক বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় লিখিত **'মান্ধাতার মুখ'** (১৯৯১) উপন্যাসের চরিত্র সুরথের বয়ানে বলছেন –

"এডুকেশনিষ্ট স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের হাতে এই আটচল্লিশ সালে ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি কমিশনের রিপোর্ট। তাতে তাঁর পরামর্শ ধর্মশিক্ষা সবচেয়ে বড় শিক্ষা। ছেলেদের স্কুল কলেজে ইউনিভার্সিটিতে ধর্ম শেখানো হোক। ধ্যান শেখানো হোক স্কুল কলেজে। পৃথিবীর বড় বড় ধর্মগুলোর সঙ্গে পরিচয় করানো হোক। ধর্মশাস্ত্রগুলো পড়ানোর বন্দোবস্ত করা হোক ডিগ্রী কোর্স পর্যন্ত। এই চুয়ান্ন সালে ও দেখছি শ্রী প্রকাশ কমিটিতেও সেই পরামর্শ।....ধর্মের গোঁড়ামি আর রাজনীতি জোড়া লাগে না।"

উপরিউক্ত উপন্যাসপ্রাপ্ত তথ্য থেকে যে সত্য জ্ঞাত হওয়া যাচ্ছে তা হল – সঠিক ধর্মশিক্ষা সাম্প্রদায়িকতার পরিপন্থী। সেই কারণেই বিদ্যালয় স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত, তরুন তাজা মনে সঠিক ধর্মবোধ এবং মূল্যবোধ জাগ্রত করাতে পারলে, সমাজ থেকে ধর্মের গোঁড়ামিকে দূর করা যেতে পারে, যা রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে দূর করে ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত করতে পারে। এই **'মান্ধাতার মুখ'** (১৯৯১) উপন্যাসেই উপন্যাসস্থিত চরিত্র সম্বিতের মা করুণাময়ী সম্বিতকে বলছেন –

"স্বাধীনতা বলতে কি শুধু এদেশের লোকের হাতে রাজ্যের শাসন ফিরে পাওয়া। না আর কিছু-। আমার গুরু – আমাকে বাড়িতে যিনি পড়াতেন একজন তুখোড় ইংরেজিনবীশ। কিন্তু ষোলআনা স্বদেশী। গান্ধীজীর একনিষ্ঠ চেলা। তিনি বলতেন, আগে দেশের আধ্যাত্মিক মুক্তি। তারপর দেশের রাজনৈতিক মুক্তি।"

স্বাধীনতার অর্থ শুধুমাত্র দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করা নয়। স্বাধীনতার অর্থ – দেশের মানুষকে প্রকৃত ধর্মের গোঁড়ামী থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা। দেশে ধর্ম নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা মুক্ত করার, এটাই একমাত্র পথ হতে পারে। দেশের মানুষের ভেতরে নানান বিষয়ে বাছ-বিচার চলতে থাকলে, মানুষে মানুষে পার্থক্য হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে। যেমন জাত বিচার, ধর্ম বিচার, শ্রেণী বিচার, নারী-পুরুষ বিচার ইত্যাদি। এই বিচার-পার্থক্যটা অনেক সময় সরু চুলের মত থাকলেও একসময় তা এক বিরাট ফাটলের সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখতে পারে। যা বিশ্বভাতৃত্ববোধের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশ্বায়নের এই শুভক্ষনে একমাত্র ধর্মীয় বিশ্বভাতৃত্ববোধই অসাম্প্রদায়িকতাকে আহ্বান করতে পারে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস **'পরবাস'**-এ (১৯৯৯) তিনি খুব সুন্দরভাবে শিখ ধর্মের সম্পর্কে নানান মত সচেতনভাবে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের চরিত্র শিখ যুবক কুলদীপ ও তার মা কোমলের কথপোকথনে যে তথ্য উঠে এসেছে তা নিম্নরূপ –

"কুলদীপ তাদের ধর্মের কোন প্রথাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করে না, প্রাতঃকালীন দু-একটা রীতি ছাড়া। যেমন ঘুম থেকে উঠে গুরুজনদের প্রণাম, জাপ্‌জি সাহিব পাঠ, এই সব।....কুলদীপের মা কোমল চুপ হয়ে গেল।....বেশ খানিকক্ষণ পর স্বগতোক্তির মত বলে উঠলো, – এর জবাব আমার জানা নেই পুত্‌তর। কে দুজন শিখ প্রধানমন্ত্রীকে মারলো, তাদের তোর পাপা চিনত, না জানত! তবু তাকে মার খেয়ে দিল্লি ছাড়তে হল। আমাদের বেরাদরির বাইরে কেউই বোধহয় আমাদের বিশ্বাস করে না রে। ধর্ম আলাদা, তো মানুষও আলাদা। তোর ফুফ্‌ফরজি এখানে এসে একটা কথা বলেছিলেন মনে আছে? দাঙ্গা করে গুন্ডা বদ্‌মাশরা, সাধারণ মানুষেরা নয়। কথাটা ঠিক। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে ঘেন্নার ভাব না থাকলে, দুরিয়াঁ না থাকলে, গুন্ডাই বল আর নেতাই বল, কেউ তার সুযোগ নিতে পারে না রে।"

ঔপন্যাসিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর লেখা উপন্যাস **'পরবাস'**-এ (১৯৯৯) তিনি খুব সুন্দরভাবে শিখ ধর্মের সমস্ত প্রথা তুলে ধরেছেন। যেমন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে গুরুজনদের প্রণাম, জপ্‌জি সাহিব পাঠ, শিখদের পঞ্চ 'ক' তথা কেশ, কাংগি, কৃপাণ, কছেরা (কাপড়ের জাঙ্গিয়া), কড়া ইত্যাদির ধর্মের আইন, নিয়মিত গুরুদুয়ারায় যাওয়া, মাসে মাসে করসেবা দেওয়া, গুরুদুয়ারায় গিয়ে লঙ্গরখানায়

কোটিপতি থেকে ভিখিরি সবাই একাসনে বসে পংক্তিভোজন এগুলি উপন্যাসের নায়ক কুলদীপ সবগুলি সঠিকভাবে মানে না। আবার এর মধ্যে কিছু প্রথা তার প্রিয়, আর কিছু ধর্মের আইন মানার তাগিদে শর্টকাট মেথড মেনে, সে মেনে থাকে। শিখদের ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহিব'-এর সে প্রসঙ্গও অতি সচেতনভাবে, নিপুণতার সঙ্গে লেখিকা তুলে ধরেছেন। আবার দুজন শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করেছিল বলে, সমগ্র শিখ সম্প্রদায়কে মানুষের বিশ্বাস হারাতে হয়েছিল। লেখিকা তাঁর উপন্যাসে সেই কারণে বলেছেন – *"ধর্ম আলাদা তো মানুষ ও আলাদা"।* তাঁর মতে সাধারণ মানুষের মনে কোন একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে ঘেন্না বা অবিশ্বাস এবং মানসিক দূরত্ব না থাকলে গুন্ডা বা নেতা কেউই তার সুযোগ নিতে পারে না। কারণ তাঁর মতে, সাধারণ মানুষ নয়, গুন্ডা বদমাশরা দাঙ্গা করে। ফলে তাঁর নায়ক কুলদীপ, ধর্মের কারণে নিজের বন্ধুদের কাছেও ব্রাত্য হয়ে গেছে। অথচ এই বন্ধুদের সাথেই সে সরস্বতী পুজোর চাঁদা তুলেছে, দূর্গাপুজোর ভাসানে সিদ্ধি খেয়ে নেচেছে, এই বন্ধুদের সাথেই কালী পুজোর প্যান্ডেলে প্রথম হুইস্কির সাথে পরিচয় হয়েছে। অর্থাৎ লেখিকা শিখ ধর্মের সাথে, বন্ধুত্বের নিরিখে, হিন্দু ধর্মের এক সুন্দর বন্ধন দেখিয়েছেন। যা থেকে বোঝা যায় ধর্ম মানুষকে আলাদা করে না। কিন্তু কোন বিশেষ ধর্মের পিঠে যদি 'উগ্রপন্থী' তকমা লেগে যায়, তা সমাজের সেই ধর্মের সমস্ত মানুষকেই 'উগ্রপন্থী' হিসেবে চিহ্নিত করে যা যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না। ফলে ধর্মের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ জড়িয়ে যায়। যার ফলস্বরূপ শিখদের প্রধান ধর্মস্থান স্বর্ণমন্দিরে ব্লু স্টার অপারেশন হয়েছিল। মিলিটারিদের সঙ্গে যারা লড়েছিল তাদের লিডার ছিলেন একজন শিখ সন্ত্। যদিও মিলিটারিদের মধ্যেও কিন্তু অনেক শিখ ছিলেন। লেখিকা খুব সচেতনভাবে তুলে ধরেছেন যে – গুরু গোবিন্দ সিং শিখদের আক্রমণের জন্য অস্ত্র ধারণ করতে বলেননি, বিপন্নকে রক্ষা করা ও আত্মরক্ষা এই দুটো কারণে অস্ত্র ধারণ করতে শিখিয়েছিলেন। শিখরা মিলিটারি রেস্ বলেই সেনাবাহিনীতে তাদের কদর বেশি। প্রচুর শিখ দেশরক্ষার প্রয়োজনে অক্লেশে প্রাণ দিয়েছেন। কাজেই শিখ জাতি মানেই 'উগ্রপন্থী' এরকম ভাবা বোধহয় অর্থহীন। ঔপন্যাসিক ডঃ দীপক চন্দ্র লিখিত **'কৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ'** (যা প্রকৃতপক্ষে গীতার উপন্যাসরূপ) (১৯৯৯) উপন্যাসের চরিত্র কৃষ্ণকে সহদেব, সর্বভারতীয় স্তরে আর্যত্ববোধের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিছু কথা বলেছিলেন, যা কৃষ্ণের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। কৃষ্ণ স্বগতোক্তিতে কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করছিলেন –

"ভারতের আর্যরা যে সবাই যযাতির রক্তধারা বহন করছে, সেই চেতনাকে আবিষ্কার করে ঐক্য চেতনায় ফিরিয়ে আনতে হবে তাদেরা....তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে

সচেতন করতে এবং নিজের অধিকার ও ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে, প্রত্যেকের আত্মপরিচয় গড়ে তুলতে, আত্মবোধ ফিরিয়ে আনতেই এই বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রাম। এই সংগ্রামে এক ঐতিহাসিক স্মৃতির মুখোমুখি হয়ে তারা নিজেদের আবিষ্কার করবে।....অনৈক্য, বিরোধ কাটিয়ে তাদের নিছক কাছাকাছি আনার জন্য যে ঐক্যের আয়োজন তা নয়, প্রয়োজন সৌভ্রাত্রবোধ জাগিয়ে তোলা, অখন্ড ভারত রাজ্য গঠনের জন্য আর্যসংস্কার, ও চেতনাকে নাড়া দেওয়া। এই কাজে ধর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে বিচ্ছিন্ন মানুষকে একসূত্রে গাঁথার উপরেই জোর দিল কৃষ্ণ।....কৃষ্ণের বিশ্বাস, বিরোধ বিভেদের সমস্ত ভালো-মন্দের মধ্যে দিয়ে না গেলে জীবনে ঐক্যের বোধ পূর্ণ হয়না।....ভারতীয় আর্যদের ঐক্যবদ্ধ করার কৃষ্ণের রাজনীতিটাও একটু অন্যরকম। বিরোধের মূলোৎপাটন করে ঐক্যের বীজ বপনের জন্য চাই মহাশ্মশানের মত সাম্যের জায়গা। পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় ঐক্যের জায়গা আর নেই। ধর্মক্ষেত্ররূপী কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ তার এক নতুন দিগন্ত সূচনা করবে।”

ঔপন্যাসিক ডঃ দীপক চন্দ্রের **‘কৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ’** (১৯৯৯) উপন্যাসে, ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সুন্দরভাবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে এক অসাধারণ সাম্যের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন যা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার এক অসাধারণ রাজনীতি বলে মনে করা যেতে পারে। বিরোধের শিকড় উৎপাটনের প্রধান অস্ত্র - সমাজে ঐক্যের বীজ বপন করা। তবে বিরোধ বিভেদের সঙ্গে পরিচিত না হলে, ঐক্যকে হয়তো সেভাবে অনুধাবন করা কখনোই সম্ভব হতে পারে না। প্রতিটি মানুষকেই জীবনের নানা স্তরে, এই বিরোধ, বিভেদ, আনন্দ, হাসি-কান্না, শোক-দুঃখ এসবের চড়াই-উৎরাই পেরিয়েই, সেই ঐক্য উপত্যকায় পৌঁছাতে হয়। সমস্ত ঐক্যের রূপ, ভিত্তি এবং উদ্দেশ্য এক নাও হতে পারে। তবু সঠিক গভীর আত্মঅন্বেষণ, ধৈর্য, সংযম ইত্যাদি অনুশীলনের মাধ্যমে, জীবনের নানান সংকট-সমস্যার সামনাসামনি হয়েও, কর্তব্যকর্মে অবিচল থেকে, ঐক্যের সাধনায় রত থাকা যেতে পারে। অনুভূতিপ্রবণ ভাবাবেগ, শত্রুকে আত্মীয়, বন্ধু বা হিতৈষীজনে পরিণত করতে নাও পারে। তাই সকল মানুষের একান্ত নির্ভরতা ও নিরাপত্তার আশ্রয়ের স্থান হল – স্বাধীনতা ও স্বাধিকার রক্ষা। মানুষের জীবন অনন্ত প্রত্যাশার বৈচিত্র্যে নিরন্তর রূপান্তরিত হয়। মানুষের ভাবান্তর, কর্তব্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকাই, মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার চাবিকাঠি। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কর্তব্য পালন করাই যদি ধর্ম হয়, তাহলে সেই কর্তব্য থেকে বিরত থাকাকেই তাই অধর্ম বলা যেতে পারে। মানুষের মধ্য থেকে ‘ঐক্যের অনুপস্থিতি’-এর ধারণা, মানুষের বিবেককে যন্ত্রণা দিতে পারে। সমগ্র মানুষের মঙ্গলার্থেই আদর্শ, আনুগত্য, বিশ্বাসের মূল্যবোধগুলির স্তম্ভের উপরেই একদিন মানুষের সমাজ গড়ে উঠেছিল। তাই বিবেক-বুদ্ধির হাত ধরে, মানবঐক্যকে

সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার যে রাজনীতি, তাকেই প্রকৃত ধর্ম বলে মনে করা যেতে পারে। ঔপন্যাসিক আব্দুল জব্বার লিখিত **'রূপবতী রাত'** (২০০০) উপন্যাসের চরিত্র স্বামী শ্যামসুন্দর মহারাজ বলছেন–

"ভগবান স্বয়ং পরিপূর্ণ। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম। মূর্তি বা প্রতিকৃতিতে তিনি নেই। এটা পুতুল-খেলা। সামাজিক অনুষ্ঠান। কালচার মাত্র। সার্বজনীন করে চাঁদা তুলে ভগবানকে নিয়ে ব্যবসা কেন?....মানুষে মানুষে ভেদাভেদ কেন? ভগবানের কাছে ভেদ আছে কি?....সেই মহাশক্তির কি মূর্তি গড়া যায়?....ঈশ্বর বহু লক্ষ বছর আগে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, মেঘ, পর্বত, নদী, সাগর, অরণ্য, মানুষ, জীবজন্তু সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন – তিনি হলেন উদ্ভাবক, আর বিজ্ঞানীরা তা বিশ্লেষণ করে দেখে বিশেষ জ্ঞান লাভ করে তবে এটা-সেটা আবিষ্কার করছেন। আমাদের চেয়ে বিজ্ঞানীরাই বেশি বিস্মিত যে ঈশ্বর কেমন করে কম্পিউটারে মানুষের ব্রেন তৈরি করেছেন লক্ষ লক্ষ বছর আগে।....বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অনেককাল আর কিছু হয়নি। যা হচ্ছে তা প্রযুক্তি – ইঞ্জিনিয়ারিং বা কারীগরী শক্তি বেড়েছে।"

'রূপবতী রাত' (২০০০) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আব্দুল জব্বার তাঁর উপন্যাসের চরিত্র শ্যামসুন্দর মহারাজের উপলব্ধিতে মানুষে-মানুষে ভেদাভেদের চিত্রকে প্রশ্নের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছেন। ঈশ্বরের কাছে যে কোন ভেদাভেদকে তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে অস্বীকার করেছেন। ঐক্য বা একতাই ঈশ্বরের বা ভগবানের এক অবিস্মরণীয় রূপ। প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে তিনি ঐশ্বরিক বিজ্ঞানের স্পর্শকে অনুভব করে, মানুষের কাছে তার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ তুলে ধরতে চেয়েছেন। ঈশ্বরের প্রতিটি সৃষ্টিই যে মহাশক্তির আধার হতে উদ্ভূত, সেই মহাশক্তিকে কোনো মূর্তির আধারে ধরা সম্ভব নয় বলেই তিনি মনে করেছেন। ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল রহস্যময়তার মধ্যেই তিনি ঈশ্বরোপলব্ধির মাধ্যমে এক সামগ্রিক ঐক্যকেই ঈশ্বরের ইচ্ছার রূপ হিসেবেই গণ্য করতে চেয়েছেন। এভাবে ঔপন্যাসিক ঈশ্বরকে বিজ্ঞানচিন্তার সাথে সমার্থক করে তুলে, একতার ধারণাকে অত্যন্ত সচেতন ভাবে, বিনয়ের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ঈশ্বর এক অভেদ, পরম, পরমাত্মা। তিনি একাধারে সৃষ্টিকর্তা এবং ধ্বংসকারীও। ঈশ্বরের এই একতার ভারসাম্য বজায় রাখার কারণেই, ঈশ্বরের এই সৃষ্টি এবং ধ্বংসের সদর্থক রাজনীতি, মানুষের একমেবাদ্বিতীয়মের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সেই ঈশ্বর সৃষ্ট মানুষের মস্তিষ্কেও এই একতার বা অভিন্নতার ধারণা, ঈশ্বর যেন স্বয়ং গ্রথিত করে দিচ্ছেন তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমেই। সেই কারণেই লক্ষ লক্ষ বছর আগে মানুষের মস্তিষ্করূপ কম্পিউটার বা বিজ্ঞানবুদ্ধি, বৈজ্ঞানিকদের কাছেও এক অনাবিষ্কৃত বিস্ময়। **'মেয়েরা যেমন হয়'**

(২০০০) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার তাঁর উপন্যাসের চরিত্র বাবলুর সাথে সুভাষের কথোপকথনে বাবলুর বক্তব্যে স্বাভাবিক এবং সচেতনভাবে এপার বাংলা ও ওপার বাংলার বিভেদের পরের অবস্থা তুলে ধরেছেন, যা মর্মস্পর্শী ও ধর্মের রাজনীতির এক প্রামানিক রূপ।

"যাঁরা এককালে দেশবিভাগের কারণে পূর্ব বাংলা ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের রাগের কারণ বোঝা যায়। কিন্তু তাঁরা রাজনীতিকে ধর্মের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে চেয়েছেন। পাকিস্তান ঘোষণা হওয়ামাত্র যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পূর্ব বাংলা থেকে পালিয়ে পশ্চিম বাংলায় চলে এসেছেন, তাঁদের বেশিরভাগই হীনমন্যতায় ভুগছেন। যাঁরা ভোলেননি তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম মহাদেব সাহা অথবা নির্মলেন্দু গুণের মতো শ্রদ্ধেয় কবিকে ঢাকায় আবিষ্কার করেছেন।"

সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি সমাজের মানুষের মধ্যে যে মানসিক ভীতির সঞ্চার করে, তা থেকে মানুষ অনেক অভাবিত, অসংগঠিত কর্মকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে যা অনেক সময়েই মানুষের মনের প্রকৃত ভাবের প্রকাশ নয়। স্ববিরোধী পরিস্থিতির চাপে, মনের মধ্যে চেপে রাখা গভীর সংকীর্ণতার প্রকাশও, মানুষ অনেকসময় অবলীলায় প্রকাশ করে থাকে। **'মেয়েরা যেমন হয়'** (২০০০) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার, সমাজের মানুষের 'রাজনৈতিক ধর্মীয় নিরাপত্তা' হারানোর ভীতির দিকটিকেই মানুষের অসংগঠিত ও অভাবিত কর্মকাণ্ডের প্রকাশ বলে মনে করেন। ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার কারণেই ধর্ম অনেক সময় মানবতার শত্রু বা কুসংস্কারে পরিণত হতে পারে। কারণ ধর্ম মূলত ব্যক্তিগত মোক্ষের ধারণা। তাই ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্ম নামে অভিহিত করা যেতে পারে না। ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতাকে একটা ব্যাধি বা রোগ বলে মনে করা যেতে পারে কারণ ভারতবর্ষে ধর্মের বিপদের থেকেও সম্প্রদায়ের বিপদ অনেক সময় লজ্জাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক আবুল বাশার তাঁর **'আকাশলীনা'** (১৯৯৪) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র স্বর্ণদ্বীপার শাশুড়ি, স্বর্ণদ্বীপাকে এদেশের ধর্মের রূপ বিষয়ে, যে উপদেশ দিচ্ছেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ –

"এই দেশে ধর্মের বিপদ হয় না, সম্প্রদায় বিপদে পড়ে।"

সাম্প্রদায়িকতা, যে কদর্য হিংসার উৎপন্ন করে, তার উৎপত্তির উৎস দ্বন্দ্বের রাজনীতি এবং ধর্ম। এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিকৃত হিংসাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের মধ্যে, সাধারণত থাকতে পারে না। জাতিদাঙ্গা করার উদ্দেশ্যই বোধহয় এক সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে, আর এক সম্প্রদায়ের জয়ের ও

সমৃদ্ধির ঘোষণা। অর্থাৎ যেন এক-কে মুছে না ফেললে, অন্যের সমৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক এই ঘৃণা মানবিকতার পরিপন্থী বলে মনে করা যেতে পারে। মানুষের হৃদয়ের এত ঘৃণার উৎপত্তির কারণ বিবিধ। যেমন কালো বলে ঘৃণা, ব্রাত্য বলে ঘৃণা, দরিদ্র বলে ঘৃণা, গ্রাম্য বলে ঘৃণা, সম্প্রদায়গত ঘৃণা, ধর্মীয় ঘৃণা, চাষাভূষো বলে ঘৃণা ইত্যাদি। একজন নিরীহ কৃষককে, ধর্মের অজুহাতে, যখন আর একজন কৃষক ঘরের ছেলেই, হিংসায় উন্মত্ত হয়ে হত্যা করছে, তখন সেই উন্মত্ত, সহিংস, অস্তিত্বভাবনার জীবনচক্রকে কোনভাবেই সমর্থন করা যেতে পারে না। এই ধর্মীয় সম্প্রদায়গত ঘৃণাকে তোষণ করার রাজনীতি কখনোই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। কারণ হিসেবে বলা যায় ঔপন্যাসিক আবুল বাশারের **'আকাশলীনা'** (১৯৯৪) উপন্যাসের তাৎপর্যপূর্ণ উপরোক্ত পঙক্তিটি যে *"এই দেশে ধর্মের বিপদ হয় না, সম্প্রদায় বিপদে পড়ে।"* অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ঘৃণার বলি ধর্ম নয়, সম্প্রদায়ই হয়। ফলে ব্যক্তি নয়, সম্প্রদায় বিপদে পড়ে। এই ঘৃণার রাজনীতিকে মানুষের মন থেকে দূর করতে না পারলে মানুষে মানুষে ভাতৃত্ববোধের বিকাশ সম্ভব নাও হতে পারে। যা সাম্প্রদায়িক বিকাশের ক্ষেত্রে ও তারপর সমগ্র দেশের সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ঔপন্যাসিক আবুল বাশার তাঁর **'আকাশলীনা'** (১৯৯৪) উপন্যাসে উপন্যাসস্থিত চরিত্র আকাশলীনার স্বগতোক্তি –

"মানুষের ধর্ম এবং জাত যৌনতা সন্নিহিত। মানুষকে উলঙ্গ করে দেখা হয় মানুষের জাত কী? রুদ্র সেকথা ভোলেনি। মা সেই অপমানে কেঁদেছেন। দাঙ্গায় শুনেছি, মানুষের যৌনাঙ্গ দেখে ধর্ম নির্ণয় করা, সম্প্রদায় শনাক্ত করা এবং অতঃপর ছুরি বসানো – এইভাবে চলে হিংসার ঐতিহাসিক উৎপাদন। একটা মানুষকে মস্তানি হত্যালীলায় মাস্কেট বিদ্ধ করে বোঝানো হয়, অন্ত্যজ হত্যায় পাপ নেই।"

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে, বাংলা বিভাগের সময় যে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ভয়াবহ রূপ দেখা গেছে, তাতে হিন্দুরা মুসলিমকে মেরেছে আবার মুসলিমরাও হিন্দুকে হত্যা করেছে যার প্রেক্ষাপটে দণ্ডায়মান – ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ত প্রভাব। ফলে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন, মানুষের বিশ্বাসের হত্যা, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের, নিঃসঙ্গতার অসহায়তার সঙ্গে বসবাস। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় যৌনাঙ্গ দেখে ধর্ম সম্প্রদায় সনাক্ত করা এবং তারপর হত্যা করার মতো অপমান, মনুষ্য জাতির ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীতে এক বিরাট মানবিক অবনমন। যে ধর্মীয়, রাজনৈতিকগত, সাম্প্রদায়িক অপমানের দায়ভার সেই সময়ে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে দুই ধর্মের মানুষকেই নিতে হয়েছে, তা মানুষের মানবিক মননে এক বিরাট ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। যার পরিনাম বর্তমানেও দুটি সম্প্রদায় হিন্দু-

মুসলমান অনিচ্ছাকৃতভাবে বয়ে চলেছে। আবার **‘আকাশলীনা’** (১৯৯৪) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আবুল বাশারের উপন্যাসের চরিত্র আকাশলীনার বাবা ইমাম বলছেন –

“অযোধ্যায় গতকাল যে ঘটনা ঘটে গেল তার যুক্তিটা হল বাবরি মসজিদের মধ্যে ঈশ্বর রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কারণ ওটা গোড়ায় ছিল রামমন্দির, কারণ জায়গাটা অযোধ্যা।

– **বাস্তবিক এ তো ইতিহাসের ব্যাপার।**
– **কোনটা ইতিহাসের ব্যাপার? বাবরি মসজিদ গোড়ায় কী ছিল, মন্দির ছিল কি না, ওখানে রামের জন্ম কি না – হ্যাঁ এসবই ঐতিহাসিকের কৌতূহলের বিষয় হতে পারে। কিন্তু সেকথা শুনছে কে?....**
– **কথা কি, মুসলমানদের যথেষ্ট তোল্লাই দেওয়া হয়েছে, অযোধ্যার ঘটনা হলো তারই রিয়াকশন। পৌঢ় বললেন, এসব কিন্তু আমার কথা নয় মশাই। ট্রেনে আসতে আসতে শুনছিলাম, পাবলিক ডায়লগ।”**

ঔপন্যাসিক আবুল বাশার লিখিত **‘আকাশলীনা’** (১৯৯৪) উপন্যাসে আকাশলীনার বাবা ইমাম কন্যা আকাশলীনার সাথে যে কথোপকথন করেছেন বাবরি মসজিদ ধ্বংস সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তা ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমাজের এমন এক দ্যোতনা পরিবেশন করেছে যেখানে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ই এই সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে একে অন্যকে দোষারোপ করেছে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মানুষই তার নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ভাবেন। একথা স্বামী বিবেকানন্দই বলেছেন। আবার মানবিকতাই যদি শ্রেষ্ঠ ধর্মের পরিচয় হয়, তাহলে ধর্মকে এত নানা ভাগে বিভক্ত হতে হয় কেন? কেন পৃথিবীর সব ধর্মই একসাথে এক মানবিকতার ধর্মরূপে পরিচিত হয় না? পৃথিবীর সমস্ত মানুষই সঠিক অর্থে পূর্ণ ধার্মিক নাও হতে পারেন। আবার পৃথিবীর সমস্ত মানুষই অধার্মিক একথাও স্বীকার্য সত্য নয়। তবে রাজনৈতিকভাবে ধর্মের দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ ছাড়া, ধর্মের চাকা অগ্রসর হয়েছে, একথাও সর্বৈবভাবে স্বীকার করতে পারা যায় না। যাযাবর মানুষ, ছিন্নমূল মানুষ, যুদ্ধের তাড়া খাওয়া বিধ্বস্ত ভীত মানুষ, মানুষের এই বিশেষণও মানুষকে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছে। সমাজে মানুষের সাথে, মানুষের রাজনৈতিকভাবে ধর্মীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা – তাকে কোনোভাবেই সঠিক ‘ধর্মভাবাপন্ন কর্ম’ নামে অভিহিত করা যেতে পারে না। তা ধর্মের নামে মানবতার চরম অপমান বলে মনে করা যেতে পারে। ঔপন্যাসিক তসলিমা নাসরিনের **‘লজ্জা’** (১৯৯৩) উপন্যাসে লেখিকার নিজস্ব বয়ানে তিনি বলছেন –

“এক লক্ষ বাঙালির রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা একথা প্রমাণ করেছে যে, ধর্ম কখনও জাতিসত্ত্বার ভিত্তি নয়। ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাসই জাতি গঠনের ভিত্তি। পাঞ্জাবি মুসলমানের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের একজাতিত্ব একদিন পাকিস্তান এনেছিল সত্য কিন্তু হিন্দু-মুসলমান দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা ভেঙে এদেশের বাঙালিরা দেখিয়ে দিয়েছে তারা পাকিস্তানের মুসলমানের সঙ্গে আপোষ করেনি। হিন্দুরা আশা করেছিল স্বাধীন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই দেশের কাঠামো থেকে ধসে পড়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। সংসদে অষ্টম সংশোধনী বিল পাস হয়ে গেল, রাষ্ট্রধর্ম বিল। এদেশের রাষ্ট্রধর্ম এখন ইসলাম।”

ঔপন্যাসিক তসলিমা নাসরিনের লেখা **‘লজ্জা’** (১৯৯৩) উপন্যাসে, ঔপন্যাসিক জাতি গঠনের ভিত্তি হিসেবে ধর্মকে মানতে নারাজ বরং তিনি ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকেই জাতি গঠনের ভিত্তি হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন। দাঙ্গার অর্থ সম্প্রদায়গত মারপিট বা প্রত্যক্ষ লড়াই। যা শুধুমাত্র দুই বা দুই-এর অধিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু একটি সম্প্রদায় যখন আরেকটি সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন এবং সরাসরি সশস্ত্র হামলা করে, তখন তাকে আর হয়তো দাঙ্গা বলা যায় না। তখন তা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক ভয়াবহতা। এই ভয়াবহতায় দুই সম্প্রদায়েরই মানুষ আক্রান্ত হয়, অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে, আবার অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে। যেভাবেই হোক না কেন, ভয়াবহতার হাত থেকে কোনপক্ষই বোধহয় নিষ্কৃতি পেতে পারেনা। দাঙ্গার নামে সাম্প্রদায়িকতার এই ভয়াবহ সংঘর্ষই, দুই সম্প্রদায়ের কাছেই তীব্র যন্ত্রনার অনুভূতি হয়ে উঠতে পারে, যা এক সুস্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে একেবারেই অনভিপ্রেত হয়ে উঠতে পারে। পাকিস্তানে যেমন পাঞ্জাবি মুসলমানের সঙ্গে বাঙালি মুসলমান একসাথে একজাতিত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু ভাষা আন্দোলনের সময়, বাংলাদেশের বাঙালিরা বাংলাভাষাকে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, পাকিস্তানের মুসলমানদের সঙ্গে কোনো আপস করেননি এবং তাতে জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণায় ধ্বস নেমেছিল বলা যেতে পারে। তবু বাংলাদেশে, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভাবনায় বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশের সমগ্র সম্প্রদায় এক হয়ে পাকিস্তানের উর্দুভাষার পরিবর্তে বাংলাভাষাকেই সর্বজনীন স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এখানেও সমগ্র পৃথিবী বিশ্বভাতৃত্ববোধের এক স্পর্শ অনুভব করেছিল, কারণ ‘ভাষাদিবস’ এখন শুধুমাত্র আর বাংলাদেশের কোন স্বতন্ত্র উৎসব নয়, ‘ভাষাদিবস’ বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীর এক বিরাট সাম্মানিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। যার সূচনায় বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের নাগরিকগণ এক হয়ে, এক

বিশ্বআন্দোলনের প্রতীক হয়ে আছেন। 'ভাষাদিবস'-এর উদ্‌যাপন সারা বিশ্বজুড়ে যেন বিশ্বায়নের সর্বাঙ্গীণ আত্মীয়তাকেই আত্মস্থ করেছে।

সামাজিক দিক

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার যে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত তা বলা যেতে পারে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে, ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে দ্বিখন্ডিত করা হয়েছিল। তাই ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে, ধর্মের ভিত্তিতেই সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জন্য, সমান অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষ বিশ্বের সকল ধর্মের আদর্শের প্রতি সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাশীল। এদেশে ধর্মকে যেকোনো কারোর উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে না। মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ অপরিহার্য। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ দ্বারাই মানবজীবন থেকে অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারকে দূরীভূত করা যেতে পারে। কোন ব্যক্তিকেই ধর্ম, বংশ, জাতি বা ভাষার অজুহাতে পৃথক করে, সাম্যের সামাজিকতা থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে না। ভারতবর্ষের সকল নাগরিকদের সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য শিক্ষা, কর্মসংস্থান, অর্থাৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানবাধিকার হল এমন এক অধিকার যা জন্মসূত্রে সব মানুষের সমান অধিকার ও সমমর্যাদার নীতিকেই ঘোষণা করে থাকে। কারণ মানুষের জীবনে মানবাধিকার স্বাধীনতা, সমতা ও সমমর্যাদার সঙ্গে সংযুক্ত। মানবাধিকারের প্রকৃতি সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন। তাই মানবাধিকারকে 'বিশ্বজনীন অধিকার' বলে মনে করা যেতে পারে। মানবাধিকারের অর্থ মানুষের জীবনে স্বাধীনতা, সাম্য এবং মর্যাদার অধিকার। প্রকৃত মানবাধিকার প্রকৃতিগতভাবেই অহস্তান্তরযোগ্য বলা যেতে পারে। কোন মানুষের ব্যক্তিগত মানবাধিকারকে কেউ কেড়ে নিতে পারে না বা ধ্বংস করতেও পারে না। পৃথিবীর সকল মানুষের ক্ষেত্রেই এই মানবাধিকার বিশ্বজনীনভাবেই সহজাত অধিকার। মানবাধিকারকে তাই সমগ্র জাতি ও মানুষের জন্য এক সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের মানদণ্ড হিসেবে ভাবা যেতে পারে। আবার অধিকারের মত কর্তব্যও এক সামাজিক ধারণা। সাধারণভাবে কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালন সমার্থক। মানুষের দায়িত্বগুলিকেই কর্তব্যের শিরোপা দেওয়া যেতে পারে। তাই সামাজিকভাবে মানবাধিকার যেমন মানুষের প্রকৃত সম্মান নির্ণয়ের এক মাধ্যম, ঠিক সেইরকমই সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের সঠিক কর্তব্য পালনও মানুষের মানবিকতা প্রকাশের এক দর্পণ বলে মনে করা যেতে পারে। সমাজের মানুষের, সামাজিক কর্তব্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। আইনগত কর্তব্য যা একটি

রাষ্ট্রের সামাজিক দিকের কথা ভেবেই, সমাজের মানুষ পালন করতে দায়বদ্ধতা প্রকাশ করতে পারে। আরেকটি হলো নৈতিক কর্তব্য, যেমন – বৃদ্ধ পিতা-মাতার তত্ত্বাবধান, পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি। **'ভরা কোটাল'** (২০০০) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক রামকৃষ্ণ সাঁতরা কথকের ভূমিকায় বলেছেন –

"গৈরিক নদীর কোল ঘেঁসা সবুজ অরণ্যানী মনে করিয়ে দেয় যে, ভারতীয় জীবন, ভারতীয় সাধনা আদি যুগ থেকে অরণ্যে প্রতিষ্ঠিত। পত্রপুষ্প তরুলতার সবুজ আবেষ্টনে তা কোমল শ্যামল। বেদ-উপনিষদ মাটি ও অরণ্যের সঙ্গে একাত্মতা ও ঊর্ধবমুখীতার অভিব্যক্তি। অরণ্যের আধ্যাত্মিকতাই ভারতের অন্তর্জীবন।....সুন্দরবনের সাপ খুব বিষাক্ত।....এখানে মৃত্যু যেন পায়ের ভৃত্য। বন্যা আর বাঘের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে এদের বেঁচে থাকতে হয়। মেয়েরা গান গেয়ে হাসিমুখে বিদায় দেয় স্বামীকে মধু ভাঙতে।....কেউ ফেরে কেউ ফেরে না।....বছরের নির্দিষ্ট দিনে এরা বনের গভীরে গিয়ে বনবিবির পুজো দেয়।....মনসার গান এরা ভালোবাসে। ভালোবাসে পীরের গান। মাঝিদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের কোনো ভেদ নেই। দু'ধর্মের সংস্কৃতি এক হয়ে মিশে গেছে।"

সুন্দরবনের মাঝিদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ নেই। দুই ধর্মের সংস্কৃতি সুন্দরবনে এক হয়ে মিলেমিশে গেছে। এখানে নদীর পাড়ের সবুজ বনানী সাক্ষ্য দেয় যে ভারতীয় জীবন, ভারতীয় সাধনপুজন সবই আদিকাল থেকেই জঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত। সবুজ তরুলতার সঙ্গে বেদ উপনিষদ সব একাত্ম আর বনানীর আধ্যাত্মিকতায় ভারতের অন্তর্জীবন প্রকাশিত। সুন্দরবনের অধিবাসীরা মূলত বনবিবির উপাসক। সুন্দরবনে মৃত্যু যেন প্রতিপদে অপেক্ষমান। বন্যা, বাঘ, বিষাক্ত সাপের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে এখানকার মানুষেরা জীবনধারণ করে। সুন্দরবনের মেয়েরা, স্বামীদের নানান কাজে যেমন – মধুভাঙ্গা, মাছধরা, কাঠ কাটতে পাঠায় – গান গেয়ে, হাসিমুখে। এই কাজ থেকে কেউ ফেরে আবার কেউ ফেরে না। যারা ফেরে না, তাদের মঙ্গলার্থে একটা লাল কাপড় পূজো করে, যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে একটা লম্বা কাঠের মাথায় সেই লাল কাপড়টি ঝান্ডা করে পুঁতে দেওয়া হয়। এটাই সতর্কীকরণ। এছাড়া বছরের নির্দিষ্ট দিনে, বনের গভীরে গিয়ে এরা বনবিবির পূজা দেয়। বনে মুরগি বলি দেয়, মুরগি ছেড়ে দেয়, নাচ গান করে। মনসার গান এদের খুব প্রিয় আবার পীরের গানও এরা খুবই ভালোবাসে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে মানুষের মতো বেঁচে থাকাটাই মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম। সেই মহাধর্ম পালনে কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে অন্য ধর্মাবলম্বী তা কখনোই বিবেচ্য হতে পারে না। মানুষের ধর্ম মানুষ থাকা, বাকি সবকিছুই বাহ্যিক।

'স্বপ্নের পরকলা' (১৯৯৬) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আব্দুল জব্বার তাঁর উপন্যাসের চরিত্র কানু গোপালের বয়ানে বলেছেন –

"যে ধর্মের আচার-আচরণে মানবিক অধিকার ক্ষুন্ন হয় সেই রাংতার মুকুট পরে রাজা সেজে লাভ কি? আরণ্যক যুগ থেকে ধর্ম মানুষকে সমাজবদ্ধ করেছিল, সে কাজ এখন শেষ৷ ধর্মের কতগুলো আচার-আচরণই শেষ কথা নয়৷ এখন বিজ্ঞান ভিত্তিক অর্থনৈতিক জীবনের স্বরূপ আলাদা, সর্বজনীন হয়ে গেছে তা৷ বিশ্বের সব দেশের সব মানুষ এখন পরমাত্মীয় – হিন্দু হিন্দুর ভাই, মুসলমান মুসলমানের ভাই শুধু নয়৷ ধর্মের লোকেরাই সাম্প্রদায়িক হানাহানি করছে৷ তারা সংখ্যায় যত বিপুল হবে ততোই বৃহত্তর দাঙ্গা হবে৷ জাতীয় সংহতিও একটা গোঁজামিল৷"

সমাজের 'শ্রেণী' 'জাত' ও কখনো কখনো 'ধর্মীয়চেতনা' নিম্নবর্ণীয়দের আত্মপরিচয়ের সংকটকে তাদের ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কাজ করে থাকে৷ এই প্রতিবন্ধকতা মানবিক অধিকার ক্ষুন্ন করতে পারে৷ তাই এই আত্মপরিচয়ের সংকট, নিম্নবর্ণীয় সম্প্রদায়গুলির সম্প্রদায়গত অবস্থানের মধ্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নির্ণয় করার ভূমিকা পালন করে থাকে৷ 'জাতচেতনার' পরিবর্তে 'ধর্মীয়চেতনার' উৎপত্তির কারণে, শক্তিমান সাম্প্রদায়িক শক্তির দ্বারা সৃষ্ট দ্বিমুখী সন্দেহ, অবিশ্বাস, ঘৃণা ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, নির্মমতা সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মানসিক দূরত্বের সৃষ্টি করে থাকে৷ বর্তমানে বিশ্বায়নের কারণে, বিজ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিক জীবন সর্বজনীন হওয়ার জন্যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের দ্বারা সব দেশের সমস্ত মানুষ পরমাত্মীয় হলেও, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা সম্ভব নাও হতে পারে৷ কারণ সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, জাতীয়সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে৷ ফলে সমাজে সামাজিকতা ব্যাহত হয়৷ উপন্যাসিক নজরুল ইসলাম তাঁর **'আয়ান'** (১৯৯৫) উপন্যাসে আয়ানের, ধর্মের সামাজিকতা সম্পর্কে মনোভাব খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন৷

"আয়ান দেখেছে একই পাড়ার দুটো ছেলে যখন ঝগড়া করে তখন তো পাড়ার কথা উঠতে পারেনা৷ কিন্তু দুই পাড়ার দুটো ছেলে ঝগড়া করলে প্রথমেই কেন পাড়ার কথাটা ওঠে? একই ধর্মের দুটো লোক যখন মারামারি করে তখন কেউ তাদের ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না৷ কিন্তু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দুটো লোকের মধ্যে মারামারি হলেই কেন প্রথমে ধর্মের কথা ওঠে? আয়ান কিছুতেই এটা বুঝতে পারেনা৷ আয়ান বুঝতে পারেনা, দুটো পাড়া এত কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও কেন এত ফারাক৷"

'আয়ান' (১৯৯৫) উপন্যাসের আয়ান যা ভাবছে তা সমাজের সামাজিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে খুব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হয়ে উঠতে পারে। পৃথিবীতে মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, বিবাদ-বিসংবাদের কারণ বোধহয় মানুষের ভেতর থেকে 'মানবিকতা' রূপ ধার্মিকতা বা বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচারণ করা হতে পারে। সামাজিকতার সঙ্গে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিকগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই সমাজে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা বা রাজনৈতিক ধর্মবিরোধীতা, সমাজের সর্বাঙ্গীণ সামাজিকতাকে অনেক সময় প্রভাবিত করতে পারে। সেক্ষেত্রে 'সাম্প্রদায়িকচেতনা', 'জাতচেতনা' ও 'ধর্মীয়চেতনা' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণ হয়ে উঠতে পারে। কারণ সমাজে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও সহাবস্থানের সাথে, স্বাভাবিকভাবেই সাম্প্রদায়িকচেতনাও বর্তমান থাকে। আর এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হলে, সম্প্রদায়গতভাবে সাংস্কৃতিক ও মানসিক ব্যবধানেরও সৃষ্টি হতে পারে। কারণ বেশিরভাগ মানুষেরই মানসিকধারণা সাধারণত ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকার করে থাকে। ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের **'টান'** (১৯৯২) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র অরিন্দম মনে মনে স্বীকার করছেন –

"হিন্দু কিংবা মুসলমান পরিবারের অনেক ছেলেমেয়ে বিদেশে গিয়ে সাহেব-মেম বিয়ে করে। সেটা সবাই মেনে নেয়। মেম বউ কিংবা সাহেব জামাই এলে তার খাতিরের অন্ত নেই। অথচ হিন্দু ও মুসলমান ছেলেমেয়ের বিয়েতে দু' পক্ষেরই আপত্তি ওঠে। মূর্খতা ছাড়া আর একে কী বলা যায়! তিন টুকরো হয়ে যাওয়া ভারতবর্ষে এখন মূর্খদেরই দাপট বেশি!"

ইসলাম ধর্মে নারীর অবস্থা প্রসঙ্গে **'টান'** (১৯৯২) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসের চরিত্র অরিন্দমের ভাবনায় হিন্দু-মুসলিম বিবাহ প্রসঙ্গটিকে অত্যন্ত ব্যুৎপত্তিতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। ইসলাম ধর্মে ধর্মাচরণ অপেক্ষা ধর্ম সম্পর্কে ভয়-ভীতি বিশ্বাস অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই বিধর্মীকে বিবাহ ইসলামের কাছে সঠিক ধর্মাচরণের মধ্যে পড়ে না। সেই কারণেই কোন বিধর্মীর সাথে বিবাহের পূর্বে সাধারণভাবে সেই বিধর্মীকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে হয়। যদিও বর্তমানে এই পদ্ধতির ব্যতিক্রমও দৃশ্য হচ্ছে। যা উপন্যাসের মাধ্যমেই পাঠক জ্ঞাত হতে সক্ষম হতে পারে। হিন্দু-মুসলমান বিবাহে দুই পক্ষেরই অসম্মতি থাকে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে বিদেশিতোষণ নীতির হাত ধরে, এই হিন্দু বা ইসলাম দুই ধর্মের অবলম্বনকারীরাই অবলীলায় বিদেশি সাহেব-মেমদের সাথে বিবাহসূত্রে, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ঔপন্যাসিকের মতে এই ঘটনায় ধর্ম তখন কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। একই দেশকে তিন টুকরো করে অর্থাৎ ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের

বসবাসকারী হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে বিবাহ গর্হিত বা না-জায়েজ বলে গ্রাহ্য হয়। অথচ এই দেশেরই বাসিন্দা হয়েও বিদেশি ছেলে-মেয়েদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে তা গর্বের বিষয় বলে গণ্য করা হয়। তাই ঔপন্যাসিক এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রসঙ্গে ভারতবাসীকে 'মূর্খ'-এর তকমা, অত্যন্ত সচেতনভাবেই দিয়েছেন। ঔপন্যাসিক আব্দুল জব্বার লিখিত **'আগুনের সাঁকো'** (১৯৯৬) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র ওদুদ নিজামকে সংস্কারমুক্ত বিজ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিপূর্ণ জীবনের জন্য সংগ্রাম করার কথা বলে। ওদুদ বলে –

"সব ধর্মই ভালো। আরণ্যক যুগের আদিম বন্যতা দূর করে মানুষকে সমাজবদ্ধ করার জন্য তার প্রয়াস বা দানের নিশ্চয়ই মূল্য আছে কিন্তু কাল অতিক্রম করে গেলে সব বিধি-বিধানই পুরোনো হয়ে যায়। মানুষের সংখ্যা বাড়ে। চাহিদা বাড়ে। তাই পুরোনো ছাঁদে জীবন চলে না বলে, নতুন ছাঁদ তাকে তৈরি করতে হয়। জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। ক্ষুদ্র গণ্ডী বৃহৎ হয়। পৃথিবীর সবদেশের মানুষের সঙ্গে যখন আপদে-বিপদে, শিক্ষা-দীক্ষায়, পোশাকে-পরিচ্ছদে, যানবাহনে, বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে আমরা জড়িত তখন প্রাচীন কোনো আঞ্চলিক ধর্মমত নিয়ে মাতামাতি বা গোঁড়ামি করলে বৃহৎ ভ্রাতৃত্ব ক্ষুন্ন হয়। প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়। নিজাম বলল, বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতিতে ধার্মিকেরা বাধা দিচ্ছেন কারণ তাঁদের বিশ্বাসের ভীত ভেঙে পড়বে কিন্তু বিজ্ঞানের গতিকে রোধ করার ক্ষমতা নেই অলৌকিক অবাস্তব চিন্তায় কালহরণকারী পরভোজী সম্প্রদায়েরা।....ওদুদ বলেছে, মানুষ তার জন্মের জন্য দায়ী নয়। কে কোথায় কিভাবে জন্মাল তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তার দ্বারা কর্ম-শিক্ষা-কল্যাণের কতখানি লাভ উন্নতি হলো সেটাই দেখা দরকার। ব্রাহ্মণ বা সৈয়দের সন্তান যদি অপগন্ড-অশিক্ষিত-ভন্ড-বদমাশ হয় তাকে পুরোহিত-পীর করে মাথায় তুলে রাখার দরকার নেই।"

মানব সভ্যতার একটা অবিচ্ছিন্নতা বা ধারাবাহিকতা বর্তমান। সামাজিক বিবর্তনের ফলে মানুষ তার আদিম বন্য প্রকৃতি থেকে সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। তাই বলা যেতে পারে যে বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির বেশ কিছু উপাদান পুরাতত্ত্ব থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে মানব প্রকৃতির এই বিবর্তন আত্মপ্রকাশ করেছে। সমাজের বিভিন্ন অংশের পরস্পরনির্ভরশীলতা থাকা সত্বেও, সমাজের একটা নিজস্ব একতার ভাব বর্তমান। আর এই একতা এবং পরস্পরনির্ভরশীলতা সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হওয়া সত্বেও এদের প্রকৃতি ভিন্ন। সামাজিক সম্পর্কের মূল অর্থ বলা যেতে পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। তাই ঔপন্যাসিক আব্দুল জব্বার লিখিত **'আগুনের সাঁকো'** (১৯৯৬) উপন্যাসে ওদুদ যখন আরণ্যক যুগের আদিম বন্যতা দূর করে, মানুষকে সমাজবদ্ধ করার জন্য, ধর্মের প্রয়াসকে মূল্যবান বলে মনে করে তখন তা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক মনে হতেই পারে। আবার পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের আঞ্চলিক

ধর্মমতের গোঁড়ামি, বৃহৎভ্রাতৃত্ব বা বিশ্বভ্রাতৃত্বের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে, একথাও অনেক সময় অস্বীকার করতে পারা যায় না। মানুষের মানসিক হীনমন্যতার রোগ, মানুষের অন্তরাত্মাকে সংকুচিত করে তোলার জন্য মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত করতে পারে। তাই মানুষের জন্ম নয়, কর্মই বিবেচ্য হওয়া সমীচীন। মানুষের জাতপাতের বিচারকে ঔপন্যাসিকের মতানুসারে বলা যেতে পারে – অযৌক্তিক প্রাচীন কৌলিন্য প্রথারই এক আধুনিক ছাঁচ, যা সমাজের মানুষের সামাজিক শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসার সাম্যতা আনতে, অনেক সময় অপারগের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সমাজের মানুষের গুণের সমাদর মানুষের মানসিক হীনমন্যতা থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারে। **'ভরাকোটাল'** (১৯৯৮) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আব্দুল জব্বার তাঁর নিজস্ব কথনে উপন্যাসের চরিত্র লজ্জাবতীর ইসলাম ধর্মের নিষেধাজ্ঞাগুলি জ্ঞাত হওয়ার সম্পর্কে বলেন –

"ওজু করে এসে শ্বশুর নামাজ পড়তে দাবার পশ্চিম মাথায় আসছেন দেখে গায়ে মাথায় কাপড় দিয়ে রেডিওর গান শোনা বন্ধ করে দেয়। প্রাচীনপন্থীদের মতে গান হারাম, সিনেমা, টিভি দেখা না-জায়েজ। এতে ধর্মীয় 'ইমান' বা বিশ্বাস চলে যাবে। অথচ সব মুশ্লিম দেশেই রেডিও, টিভি-সেন্টার নাচ-গান-নাটক-বাজনা-বিজ্ঞাপনের চমকপ্রদ ব্যবস্থা করে চলেছে প্রতিদিন। মৌলবাদ বিজ্ঞান-প্রগতির পরিপন্থী। তার ফলে নিজেরাই কূপমন্ডুক হয়ে থাকবে।"

সমাজের মানুষের মনের গভীরে থাকা সুখভোগের নৈরাশ্যই হীনমন্যতা বা হতাশার জন্ম দিয়ে থাকে। সমাজে বস্তুবাদের বিপক্ষে গিয়ে, ভাববাদের মহাশূন্যে ধর্ম ভাবনার বিচরণ করা সর্বদা সম্ভব নাও হতে পারে। ইসলাম সমাজের প্রাচীনপন্থীদের মতে, প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদিতা মানুষকে বিপথগামী করতে পারে তাই পার্থিব বিষয়গুলি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে মূল্যহীন বলে সাধারণত গণ্য হয়। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা রুগ্ন, মনগড়া ধার্মিক মানবতার হাত ধরেই সাধারণত বাঁচতে চায়। কিন্তু কিছু মুসলমানের কাছে এই রুগ্ন, মনগড়া ধার্মিকতার পরিবর্তে, আধুনিকতার বিজ্ঞানকল্যাণ কখনো কখনো গ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারে। কারণ শিক্ষা-সংস্কৃতি দুটোই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, মৌলধ্বজাধারীদের মনের ভেতরে সাধারণত অনেক সময়েই শিক্ষা ও সংস্কৃতি দুটোর কোনটাই উপস্থিত থাকে না। সাধারণ মানুষের কাছে সাধারণত ধর্মই হলো সংস্কৃতি। আর শিক্ষিত মানুষের কাছে সাধারণত সংস্কৃতিই হলো ধর্ম। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই উপরোক্ত কথার সাথে বোধহয় একমত নন। কারণ প্রকৃত সংস্কৃতি দলাদলি, হানাহানি, ঝগড়া-বিবাদের পরিপন্থী। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণেই দেশ-সমাজ-সংসার

ধ্বংসের ভাবনায় ভাবিত হতে পারে, যা বিশ্বভাতৃত্ববোধ জাগাতে অক্ষমের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। **'জাত জামিন জেনানা'** (১৯৯৬) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র তার উপন্যাসস্থিত চরিত্র মাস্টারজির সম্পর্কে বলেছেন –

"মাস্টারজীর মনটা ভেঙে গিয়েছিল। শ্রেণীসংগ্রামের কথা সে বলতে চেয়েছিল, সে কথা ভেসে গেল জাতিদাঙ্গার তোড়ে। এদেশে শ্রেণীর চেয়ে জাতই বড়। সব জাতের মধ্যে ধনী দরিদ্র অল্পবিস্তর আছে। সব জাতই সুযোগ পেলে শোষণ করে পিছিয়ে পড়া দুর্বল লোকদের। তারা অন্য জাতের হোক বা নিজের জাতের হোক। মাস্টারজী শোষিতদের মেলাতে চেয়েছিল, কিন্তু বিফল হল।"

যে কোন জাতির মানুষেরই নিজস্ব জাতি সম্পর্কে সংকীর্ণ মনোভাবকেই জাত্যাভিমানের এক উগ্র প্রকাশ বলে মনে করা যেতে পারে। অর্থাৎ স্বজাতির প্রতি দোষগুণ নিরপেক্ষভাবে অস্বাভাবিক এক আকর্ষণ বা অনুরক্তি যা অন্যান্য জাতির প্রতি একটা বিপরীত মনোভাব পোষণ করে যা অনেক সময় আক্রমণাত্মকও হয়ে উঠতে পারে। এই জাত্যাভিমান একইসঙ্গে অত্যন্ত উগ্র ও অসহিষ্ণু মনোভাবের পরিচায়ক হয়ে উঠতে পারে। এর থেকেই 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যেতে পারে, যা সংকীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা, উগ্রতা, পক্ষপাতিত্ব এবং আক্রমণাত্মক দোষে দুষ্ট হয়ে থাকে। জাত্যাভিমান ভেদবুদ্ধির জন্ম দেয়, উচ্চ-নিচ ভাবকে প্রাধান্য দেয় এবং সামাজিক সাম্যের আদর্শের বিপরীতার্থক শব্দের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। প্রগতিশীল সমাজের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীভেদ বা জাত্যাভিমান এক প্রতিক্রিয়াশীল ও অত্যাচারিত শক্তি হিসেবে বিকৃত মনোভাব পোষণ করতে পারে যা গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয়গোঁড়ামির একতাবিরোধী, অগণতান্ত্রিক চিন্তাধারা হয়ে উঠতে পারে। **'খোয়াবনামা'** (১৯৯৬) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের, উপন্যাসের চরিত্র কাদের আত্মবিশ্বাসী স্বরে বলছেন –

"ইসলাম তো সব মানুষকে সমান অধিকার দিয়েছে। ইসলামে কোন কাস্ট সিস্টেম নাই। আমাদের নবী এই কথা বলে গেছেন কত আগে।"

মুসলমান সমাজে জাতিভেদ প্রথা নেই কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিভেদ বর্তমান। শিয়া, সুন্নি ও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বিরোধ তারই উদাহরণ। **'আকাশ-ভরা সূর্য-তারা'** (১৯৯৭) উপন্যাসে উপরোক্ত কথার রেশ ধরেই ঔপন্যাসিক নিমাই ভট্টাচার্য তাঁর উপন্যাসস্থিত চরিত্র জগন্নাথ ডাক্তারের বয়ানে বলেছেন –

“মনে পড়ে বুড়ো শিবতলার মেলার কথা, মনে পড়ে রথের কথা। সেদিন কে হিন্দু, কে মুসলমান সে খবর কেউ রাখতো না বা রাখার প্রয়োজন বোধ করত না। গ্রামের সবাই মেতে উঠতো একই আনন্দে। কেন মহরমের দিন? জগন্নাথ কাকা, যতীন পাকড়াশী, গদাই চক্রবর্তী, হালদার মাস্টার সবাই আসতো ডাক্তারদের বাড়ি। ধর্মের গোঁড়ামি ছিল, সংস্কার ছিল, কিন্তু মানুষকে ভালোবাসায় কোনো দ্বিধা ছিল না। এইতো প্রথম দাঙ্গা বাধলে জগন্নাথ ডাক্তার উড়ো চিঠি পেল।”

যাঁরা প্রকৃতপক্ষে সমাজের অভ্যস্ত পথ চলার ক্ষেত্রে সমাজের সমস্ত আইন কানুন মেনে চলেন তাঁদের নিয়ে সমাজের কোনো দুশ্চিন্তা সাধারণত হতে পারে না, কিন্তু যাঁরা গতানুগতিকতার পথে না চলে প্রয়োজন ও বিবেচনানুযায়ী নতুন পথের দাবী করেন, তাঁদের সঙ্গে সমাজের সামঞ্জস্য রক্ষা হওয়া অনেক সময় সম্ভব নাও হতে পারে। তবে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা, অপর ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সচেতনতা এবং সে ব্যাপারে সমাজের দাবি প্রয়োজনে উপেক্ষা করা বা সংগতিসাধনের সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করা – এসবই এক বিশেষ ব্যক্তিত্বের পরিচয়। আধুনিক সুসংগঠিত সমাজে এই বিশেষ ব্যক্তিত্বের পরিচয় সমাজের মানুষকে অনেকসময় প্রেরণা প্রদান করে, কারণ সমাজের মূল প্রয়োজন সামাজিক সংহতি। সমাজের মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ বিবাদ, স্বার্থ-সংঘর্ষ, প্রতিযোগিতামূলক হিংসা ও বাধার সৃষ্টি, অবদমন ও শোষণ সমাজের ভারসাম্য রক্ষার্থে এক সংকীর্ণ প্রণালী বলা যেতে পারে। এছাড়াও একচ্ছত্র আধিপত্য, বিভিন্ন প্রথা, নানান নীতি ও নিয়ন্ত্রণ, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরোধিতা মানুষের মধ্যে নৈরাশ্য এবং ব্যর্থতার সৃষ্টি করে যা অনেকসময় সামগ্রিক কল্যাণের বার্তা বহন করতে পারে না। ফলে একচ্ছত্র আধিপত্য, বিভিন্ন প্রথা, নানান নীতি ও নিয়ন্ত্রণ, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরোধিতা ইত্যাদি আধুনিক মানবপ্রকৃতি ও সমাজপ্রকৃতির ক্ষেত্রে এক বিরাট সমস্যার রূপ ধারণ করতে পারে। ঔপন্যাসিক নিমাই ভট্টাচার্য তাঁর **‘আকাশ-ভরা সূর্য-তারা’** (১৯৯৭) উপন্যাসে ধর্মের গোঁড়ামির সংস্কারকে উপেক্ষা করেও মানুষকে ভালোবাসার মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে কোন দ্বিধা করেননি। সেই কারণেই লেখক প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর **‘আকাশ-ভরা সূর্য-তারা’** (১৯৯৭) উপন্যাসে যে – বাংলার পল্লীগীতি, ভাটিয়ালি, কবিগান হিন্দুদের না মুসলমানদের? রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, জসীমউদ্দীন হিন্দুদের না মুসলমানদের? তাই তিনি তাঁর উপন্যাসের চরিত্র জগন্নাথ ডাক্তারের কথনে বলেছেন, হিন্দু-মুসলিম লড়াই করেছে, ঝগড়া করেছে, মারামারি করেছে, কিন্তু হিন্দু মুসলিমদের দেহে একই রক্ত বয়েছে। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের জন্য পলাশীর মাঠে হিন্দু-মুসলিমের মিলিত রক্তপাতও হয়েছে। ঔপন্যাসিক নারায়ণ

সান্যালের লেখা **‘এমনটা তো হয়েই থাকে’** (১৯৯৩) উপন্যাসে লেখক কথকের ভূমিকায় বলেছেন –

“শহর-থেকে-দূরে গ্রাম বাংলায় আমি ব্যক্তিগতভাবে বেশকিছু রাজনীতি-নিরপেক্ষ দেশসেবককে দেখেছি। তাঁরা পল্লীউন্নয়নে ব্রতী। আশপাশের পাঁচদশখানা হিন্দু-মুসলমান গ্রামে তাঁরা অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছেন – জাগতিক ও মানসিক। কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য-শিক্ষা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই। কোনও পার্টি বা পঞ্চায়েত থেকে অর্থ সাহায্য পান না, প্রত্যাশাও করেন না। নিজেদের প্রচেষ্টায় তাঁরা ঘরে-ঘরে তাঁত বসিয়েছেন, টেলারিং ইউনিট খুলেছেন, ফুড-প্রসেসিং সেন্টার খুলেছেন। গ্রামের মহিলা-কর্মীরা দেখলাম লেডিস সাইকেলে ঘোরাফেরা করছেন।....আর্থসামাজিক ক্রমাবক্ষয়ে বাঙালি তার ঐতিহ্য, তার মানবাধিকার-বোধ, তার নীতিগত মূল্যবোধকে হারিয়ে ফেলেনি। সে ভীতু হয়ে যায়নি আদৌ।”

মানুষ সামাজিক জীব। সকল মানুষই সমমর্যাদার অধিকারী এবং জন্মসূত্রে নৈতিক অধিকার বলে, সকল মানুষই সমান। এই মানবাধিকার কোন অবস্থাতেই কোন মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া সম্ভব নয়। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল স্তরেই, মানবাধিকারকে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। মানবাধিকারের মধ্যে মানবজাতির মর্যাদা ও সাম্যের মূল্যবোধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই মানবাধিকারকে সমস্তজাতির মানুষের ক্ষেত্রে, সার্বিক উন্নয়নের মানদণ্ড রূপে গণ্য করা যেতে পারে। বিশ্বজনীনভাবে তাই এই মানবাধিকার বিশ্বের সমস্ত মানুষের সহজাত অধিকারের মধ্যে অন্যতম। তৃতীয়বিশ্বের নানান দেশে জাতিবিদ্বেষ, জাতিদাঙ্গা ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বহু মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তরে নারী নির্যাতনের ও নারী ধর্ষণের ঘটনা ক্রমবর্ধমান। গণহত্যাও সমানভাবে অব্যাহত। প্রকৃত মানবাধিকারকে রক্ষা করতে হলে সন্ত্রাসবাদ, দারিদ্র, ক্ষুধা, অশিক্ষা ও শোষণের হাত থেকে সমস্ত বিশ্বের মানুষকে মুক্ত করতে হবে। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণকে ব্যর্থ করে, উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিকে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে, যা বিশ্বভ্রাতৃত্বের নবঅঙ্গীকাররূপে মানবাধিকারকে রক্ষা করতে পারে। এই সুমহান কার্যে এগিয়ে আসতে হবে সমগ্র বিশ্বের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে। লেখকের মতে একমাত্র দক্ষিণ ও বামপন্থী – সকল সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীরাই এই মানবাধিকারবোধ বা নীতিগত মূল্যবোধকে সমাজের মানুষের মধ্যে সঠিক মানবিকধর্মের বীজরূপে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হতে পারেন। **‘ছুটন্ত সময় ফুটন্ত মানুষ (প্রথম পর্ব)’** (১৯৯৬) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আজিজুল হক উপন্যাসের চরিত্র কিশোর সামসেরের দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন –

“কিশোর সামসের দ্যাখে, মসজিদ শুধু খোদার এবাদতের জায়গা নয়, পার্থিব সমস্যা সমাধানের সভাগৃহও বটে। নামাজের পরে মসজিদে বসেই গ্রামের লোক সব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, সাংসারিক সিদ্ধান্ত নেয়। হাল-বলদ-বীজ-ধান প্রভৃতি লেন-দেন-এর কথা সারে।”

ঔপন্যাসিক আজিজুল হক তাঁর **‘ছুটন্ত সময় ফুটন্ত মানুষ (প্রথম পর্ব)’** (১৯৯৬) উপন্যাসে মসজিদকে শুধুমাত্র আল্লাকে আহ্বান করার বা আরাধনা করার স্থান হিসেবে নয়, তিনি মসজিদকে সমাজের সামাজিক সমস্যা সমাধানের স্থান হিসেবেও ইসলাম ধর্মানুসারে বর্ণনা করেছেন। কারণ ইসলাম ধর্মে নামাজের পরে মসজিদে বসেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও সাংসারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে, যা মসজিদকে প্রকৃতপক্ষে জীবনের নানান সমস্যা সমাধানের প্রতীকীস্থান হিসেবেই গণ্য করে থাকে। কারণ মানুষের প্রাত্যহিক যেকোন সমস্যা সমাধানে, মানুষ সর্বশক্তিমানের কাছেই প্রার্থনা করে থাকে। ইসলামধর্মে মানসিক এবং পার্থিব ও সমস্যার সমাধান মসজিদে হয়ে থাকে, তাই মানুষ যেমন মসজিদে নিজস্ব মানসিক উন্নতির কারণে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, ঠিক তেমনি প্রাত্যহিক হাল-বলদ-বীজ-ধান জাতীয় পার্থিব সমস্যা সমাধানের স্থান হিসেবেও মসজিদকেই মান্যতা দান করে থাকে। এই বিষয়টিতে মানুষ পার্থিব এবং পরমার্থিক জীবনধারণের প্রচেষ্টাতে কোথাও যেন নিজের অজান্তেই মসজিদনির্ভর হয়ে ওঠে। এভাবে ধর্মের সাথে সমাজ একীভূত হয়ে যায়। মানুষের দৈনন্দিন কর্মস্থান ও কর্মস্থানের গুরুত্ব, ধর্মীয় জমায়েতের স্থান মসজিদে প্রাধান্য পায়। এভাবেই মুসলিম সমাজের ধর্ম, সামাজিক ও আর্থিক জীবন একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাই ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস রচনার মাধ্যমে ঔপন্যাসিকেরা, মুসলিম সমাজের ধর্ম ও প্রাত্যহিক জীবন সমার্থক – এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তাকে পাঠকের দরবারে উপস্থাপিত করার ফলে, সমাজের মানুষ মুসলিম সমাজের ধর্ম ও সামাজিক জীবন যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই বার্তা জ্ঞাত হতে পারছেন।

লেখক শম্ভুনাথ বেরার লিখিত উপন্যাস **‘রাঙ্গামাটির ময়না’** (১৯৯৮) উপন্যাসে তিনি সমাজের তথাকথিত জাতিভেদ ভুলে হিন্দু-মুসলিম, মানব-মানবীর মধ্যে বিবাহবন্ধন বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তাঁর উপন্যাসের নায়ক ব্রহ্মানন্দের মা হিন্দু ও বাবা মুসলমান। সে জন্মসূত্রে মুসলমান হলেও তার জন্ম হিন্দু দেবতা ব্রহ্মার কৃপায়, তাই তার নাম ব্রহ্মানন্দ। সে নিজে বড় হয়ে সমাজের অবহেলিত, অপাংক্তেয় মানুষদের সাথে একাত্ম হতে শুরু করল। অবশ্যই ধর্মের দোহাই দিয়ে নয়,

জনকল্যাণকর সমাজসেবার তাগিদে। লেখক তাঁর উপন্যাসে মনুষ্যত্বের ধর্মকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বিবেকানন্দের 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' – এই মতে বিশ্বাসী। সেই কথাই তিনি তাঁর উপন্যাসের চরিত্র জগবন্ধুর মুখ দিয়ে বলিয়াছেন। মানুষ হয়ে জন্মে ধর্মের দোহাই দিয়ে, জাতের দোহাই দিয়ে কোনো মানুষকে ঘৃণা করা, সঠিক সামাজিকতা বলা যেতে পারে না। এই বিবাদই সমাজের অবক্ষয় ডেকে আনে। তাঁর উপন্যাসের চরিত্র ব্রহ্মানন্দের হিন্দু মা হাসিনা বেগমকে তিনি হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সেতুবন্ধন করার মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। লেখক তুলে ধরেছেন যে ব্রহ্মানন্দের বাবা, হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করার কারণে ব্রহ্মানন্দের ঠাকুমা, মৃত্যুকালে তার বাবার হাতের জল পর্যন্ত গ্রহণ করেননি। এই ঘটনা সমাজের দুই সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতার নঙর্থক দিককে সচেতনভাবে তুলে ধরেছে যা প্রকৃত সামাজিকতার বিরুদ্ধতায় মুখর হয়ে উঠেছে। **'রাঙ্গামাটির ময়না'** (১৯৯৮) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক শম্ভুনাথ বেরা উপন্যাসের চরিত্র অম্বর আলি, উপন্যাসের আর এক চরিত্র ব্রহ্মানন্দের মা হাসিনা বেগমের সাথে দেখা করতে এসেছেন। তিনি হাসিনা বেগমের উদ্দেশ্যে বলছেন –

"দেখো ভাবি কারা এয়েচে? বিকালের পোড়ন্তি বেলায় মাদুর পেতে তিনি নমাজ পড়ছিলেন। চোখে তেমন ঠাহর ছিল না। শরীরেরও তেমন তাগদ নেই। জীবনযাত্রায় অবাক হবারও কিছু নেই। হিন্দু হলেও গো-মাংস না খেলেও স্বামীর ধর্মই ছিল তাঁর ধর্ম। হিন্দু দেবদেবীর ছবিও ছিল তাঁর ঘরে। দু'দিক থেকেই ঈশ্বরকে পাওয়ার প্রবল বাসনা।"

লেখক তাঁর উপন্যাসে সমাজের পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রাধান্যের কথাও উল্লেখ করেছেন, ফলে মহিলাদের হীনমন্যতার শিকার হতে হয় বলে তিনি মনে করেন। ব্রহ্মানন্দের মা হাসিনা বেগম যার হিন্দু নাম হাসি ছিল, তিনি গো-মাংস গ্রহণ করতেন না। হিন্দু হওয়া সত্বেও স্বামীর ধর্মই ছিল তাঁর ধর্ম। আবার হিন্দু দেবদেবীর ছবিও তাঁর ঘরে ছিল। তিনি প্রেম-ভালোবাসার জোরেই মুসলমান ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই লেখকের মতে – সমালোচনায় মুখর হওয়ার থেকে মিলতে এবং মেলাতে চাওয়াটাই সবচেয়ে বড় ধর্ম যা মানবিকতার ধর্মকে বিশ্বায়নের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। গোমাংসের প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যালের **'হিন্দু না ওরা মুসলিম'** উপন্যাসের **'সন্তান মোর মার'** (১৯৯৫) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র জামাল সাহেব উপন্যাসের আর এক চরিত্র জুলেখাকে বলছেন –

"কোরানের ওই বাইশ থেকে আটত্রিশ নম্বর সূরাহ্ – যেখানে বকরহ্-ঈদের ওই ঘটনার উল্লেখ আছে সেখানে পশুটার নাম লেখা আছে কি না আমি জানিনা। আমার ধারণা

সেটা ছিল : ভেড়া। মক্কা অঞ্চলে মেষপালক ছিল প্রচুর – গবাদিপশু অল্প। তাছাড়া আমার ধারণা – ভারতবর্ষ অধিকার করার পর থেকে বেশ কিছু অত্যাচারী বাদশাহ্ বা আমীর-ওমরাহ্ বিজিত প্রজাদের উৎপীড়ন করার মধ্যেই আমোদ পেতেন।....তারাই পশুটাকে ছাগল-ভেড়া-দুম্বা থেকে গরুতে রূপান্তরিত করেছিল – একজাতের ধর্ষকামী মনোভাব থেকে। যেহেতু কাফেরদের চোখে গরু হচ্ছে গো-মাতা।"

ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যালের **'হিন্দু না ওরা মুসলিম'** উপন্যাসের **'সন্তান মোর মার'** (১৯৯৫) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র জামাল সাহেব ও জুলেখার মধ্যে যে কথোপকথন তা থেকে সমাজের হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তাতে একটি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে যে ইসলাম ধর্মের কোরানে বকরহ্-ঈদে কোরবানি করার জন্য 'পশু' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছিল। কোরানের কোথাও 'গরু' শব্দটির উল্লেখ নেই। কিন্তু মুসলিমদের কাফেরদের প্রতি তীব্র ঘৃণার এক প্রকাশ কোরানে উল্লেখিত 'পশু' শব্দটিকে 'গরু' শব্দে রূপান্তরিত করা। কারণ তাতে কাফেরদের চোখে গো-মাতাকে অসম্মান করার এক ধর্ষকামী মনোভাব লুকিয়ে আছে। কারণ পশুটা গরুর বদলে যদি ভেড়া বা পাঁঠা হয়, তাহলে তা কোরান অবমাননার গুনাহ্ হয়না। তবুও 'পশু'-টিকে 'গরু' বলে ঘোষণা করার জন্যেই হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব এত প্রবল হয়ে সমাজের সাম্প্রদায়িকতার বীজকে এক মহীরুহে রূপান্তরিত করতে হয়তো সক্ষম হয়েছে। এই একই উপন্যাসে ইসলাম ধর্মে গোমাংস ভক্ষণের ইতিহাস প্রসঙ্গে উপন্যাসের চরিত্র জামাল বলেছেন –

"আমার কথা আমরা ধর্ম বজায় রাখব, কিন্তু কুসংস্কার নয়। গো-মাংস মুসলমানের খাদ্যতালিকায় আবশ্যিক, এ-কথা কোন পীর-পয়গম্বর বলেননি কোনদিন। না শেষনবী, না কোরান, না হাদিস। তবু একশ্রেণীর স্বার্থসন্ধানী মৌলবাদী মুসলিম ফাতোয়া জারি করেন : গো-মাংস খাওয়া আবশ্যিক। 'হিন্দুত্ব-বিরোধিতা' ছাড়া এ নির্দেশের পিছনে আর কোনও প্রেরণা নেই। হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে যাঁরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতেন দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের গো-মাংস খাওয়াটা বাধ্যতামূলক ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি বদল করার দিন এসেছে। আজই! এখনই!"

ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যাল উপন্যাসের চরিত্র জামালের বয়ানে উপরোক্ত যে কথাগুলি উপন্যাসে বলেছেন তা বর্তমান সময়ে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ইসলাম ধর্মে শেষনবী, কোরান এবং হাদিস কোথাও গো-মাংস ভক্ষণের উল্লেখ কেউ করেননি। গরুকে যেহেতু হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা গো-মাতা বলে পুজো এবং সম্মান করে থাকেন, সেই কারণেই একশ্রেণীর স্বার্থসন্ধানী মৌলবাদী মুসলিম ফাতোয়া জারি করেছিলেন যে – গো-মাংস খাওয়া ইসলাম ধর্মে আবশ্যিক। লেখক একে 'হিন্দুত্ব বিরোধিতা'-র এক পন্থা হিসেবেই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

কারণ তাতে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রটি আরো বেশি জোরালো করা যেতে পারে। যা বিশ্বভাতৃত্ববোধের সম্পূর্ণ বিরোধী পন্থা। তাই এই বিষয়টি কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। খাদ্যতালিকায় যে কোন খাদ্যকেই মানুষ তার রুচি অনুসারে গ্রহণ করতেই পারে, কিন্তু তা যখন ধর্মীয় কারণে অন্য সম্প্রদায়ের সম্মানে আঘাত করে, তখন তা অবশ্যই অনভিপ্রেত বিষয় হিসেবেই গণ্য করা যেতে পারে। কারণ এই সাম্প্রদায়িকতা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে অপারগের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সেই কারণেই ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যাল বিষয়টির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তিনি তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে সমাজের মানুষের কাছে এই দৃষ্টিভঙ্গি বদল করার আবেদন জানিয়েছেন। বাস্তবসত্য সমাজের মানুষের কাছে সামাজিকতার মোড়কে ধর্মবিরোধীতাকে অত্যন্ত বাস্তবিক করে তোলার ক্ষমতা রাখতে পারে। ধর্মবিরোধীতার হাতে হাত রেখেই জন্ম হয় সাম্প্রদায়িকতার। বিশ্বভাতৃত্ববোধের অন্তরায় এই বিষয়টিকে তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবেই গ্রহণ করা যেতে পারে। ধর্মবিরোধীতার বিষয়টি শুধুমাত্র কোনো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা বলা যেতে পারে না। পৃথিবীর সকল ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেই ধর্ম বিরোধিতার বিষয়টি কখনোই গ্রাহ্য হতে পারেনা।

লেখক আনন্দময় বড়ুয়ার লেখা উপন্যাস **‘অন্বেষণ’**-এ (১৯৯৪) তিনি তাঁর উপন্যাসের নায়ক তারিনীকে লাইব্রেরি থেকে আনা এক উপন্যাসে মনোনিবেশ করান। সেই উপন্যাসের নায়িকা যাকে ভালবাসে, তার নাম জিতেশ। জিতেশ জাতে কুমোর এবং নায়িকা আশা উঁচু জাতের মেয়ে, ফলে বিবাহে বাধা। এভাবে এক উপন্যাসে, আরেক উপন্যাসের কাহিনী তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক যা তাঁর নিজের উপন্যাসের চরিত্র তারিনীকে মনোবল ফিরিয়ে দেয় কারণ সেও রমলাকে পেতে পারেনি কারন সে ছিল চাষীর ছেলে। লেখক আনন্দময় বড়ুয়ার **‘অন্বেষণ’** (১৯৯৪) উপন্যাসে, আরেক উপন্যাসের চরিত্র জিতেশ বলছেন –

“জাতের কথা তুললে বলতে হবে বিংশ শতাব্দীতে জাত বলে কিছু আছে নাকি! আজকাল ইংরেজ দুহিতার সঙ্গে বাঙালি ছেলের, পাঞ্জাবি মেয়ের সঙ্গে আমেরিকান ছেলের বিয়ে হচ্ছে, তখন আপনি ব্রাহ্মণ আর আমি কুমোর এ কথা বলে কতদিন চালাতে পারবেন! যদি এতেও না হয়, তখন খোলাই আছে নিজেদের পথ। স্বাধীন দেশের স্বাধীন প্রজন্ম আমরা, আমাদের রক্ষা করার জন্য দেশে আইন আছে আদালত আছে। আমরা কি এতই সহায়হীন যে, ওই প্রাচীন পন্থী এক বৃদ্ধের ভয়ে অন্ধকার রাতে পালিয়ে আমাদের নতুন জীবন আরম্ভ করতে হবে।”

এভাবে লেখক আনন্দময় বড়ুয়ার **‘অন্বেষণ’** (১৯৯৪) উপন্যাসে জিতেশ জাত-কুল ইত্যাদি বিষয়গুলিকে একেবারেই মান্যতা দেন না। তার মতে জাত-কুল সব মানুষের সৃষ্টি। জাত-ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে কিছু মানুষ বিবাহ বিষয়টাকে অত্যন্ত জটিল করে তুলতে চেয়েছেন যা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ নারী পুরুষ নির্বিশেষে, জাত ধর্ম নির্বিশেষে, সমাজ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষই সমান মানের অধিকারী – যার নাম প্রকৃত মানবাধিকার। বিদেশে অর্থাৎ রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড-এর উন্নতির প্রধান চাবিকাঠি হলো সহজ-সরল সমাজব্যবস্থা। ধর্ম নিয়ে ওদের কোন কু-প্রথা নেই। তাই বলা যেতে পারে যে উদার সমাজব্যবস্থাই, সমাজ প্রগতির প্রধান সোপান। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত **‘এর বাড়ি ওর বাড়ি’** (২০০০) উপন্যাসে, লেখক উপন্যাসের চরিত্র বিপুল ও অবনীর কথোপকথনের মাধ্যমে সমাজে জাতিভেদের মত কুপ্রথার বিবরণ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। বিপুল অবনীকে বলে –

“ব্রাহ্মণরা জাত-পাত নিয়ে এখনো এত মাথা ঘামায়, আপনাদের মতন শিক্ষিত লোকরা এটা বদলাতে পারেন না? অবনী বললো, একটু একটু বদলেছে। অনেকে এখন ওসব মানে না।....বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দের মতন বড় মাপের কোনো মানুষ তো আমাদের মধ্যে এখন নেই। ঐরকম কেউই বদলাতে পারেন। তোমার-আমার কথা কে শুনবে? তবে কিছু না কিছু জাতিভেদ বা আলাদা সম্প্রদায় তো সব ধর্মেই আছে। মুসলমানদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি নেই? তারপর কাদিয়ানী, আরও কী সব যেন আছে। তাদের মধ্যে মারামারিও হয়। আয়ারল্যান্ডে ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে মারামারি হয় না? এই আমেরিকাতেও অন্য ক্রিশ্চানদের চেয়ে অ্যাংলো স্যাক্সান প্রোটেস্ট্যান্টদের দাপটই বেশি।”

ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা **‘এর বাড়ি ওর বাড়ি’** (২০০০) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র বিপুল ও অবনীর কথোপকথনে যে যুগধর্মের জাতপাতের কথা উঠে এসেছে, তা থেকে সমাজের জাতিভেদ বা মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ,মানুষের অন্তস্থিত সম্পর্কের উত্তরণের ক্ষেত্রে যে কতখানি ক্ষতিকর তা লেখক অত্যন্ত ব্যুৎপত্তিতার সঙ্গে তাঁর উপন্যাস **‘এর বাড়ি ওর বাড়ি’** (২০০০) – তে পরিবেশন করেছেন। বহু শতাব্দী ধরেই, ভারতীয় সমাজে শুধুমাত্র নয়, সারা পৃথিবীতেই জাতিভেদ প্রথা এক জটিল প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষের এক সামাজিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। জাতিভেদ প্রথা ছাড়াও বর্ণবৈষম্যের উগ্রতাও পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বর্তমান। ভারতীয় জাতীয় প্রথা ভারতের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মাচরণের সাথে অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন পরের সামাজিক সংগঠনের

ফল। এই জাতিভেদ প্রথার কারণেই বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, তাই এই জাতিভেদ প্রথাকে বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবীরাই সামাজিক মর্যাদার অবনমন বলেও মনে করতে পারেন। ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর **'এর বাড়ি ওর বাড়ি'** (২০০০) উপন্যাসে সারা পৃথিবী জুড়ে যে জাতিভেদপ্রথার কথা বলা হয়েছে, সেই কথা যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনি ভারতবর্ষের স্বতন্ত্রভাবে নানান সম্প্রদায়ের মধ্যেও আবার যে ভেদাভেদ বর্তমান তাকেও সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেছেন। এই প্রথাকে দূর করার মত কোন তেমন মহৎ মানুষ বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রায় নেই বললেই চলে। তাঁর উপন্যাসের চরিত্র অবনীর আক্ষেপ যে, বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দের মত কোন সমাজসংস্কারক, বর্তমানে ভারতবর্ষে অনুপস্থিত। তাই এই জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ করা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়তে পারে। তবে অবনী এও স্বীকার করেছেন যে, সমস্ত ধর্মেই কিছু-না-কিছু জাতিভেদ বা আলাদা সম্প্রদায়ের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন – হিন্দুদের মধ্যে, প্রাচীন ভারতের চতুর্বর্ণ প্রথার ওপর ভিত্তি করেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র ইত্যাদি জাতের উপস্থিতি আছে। মুসলমানদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি ও আহমেদিয়া। খ্রীস্টানদের মধ্যে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের উপস্থিতি, জৈনধর্মের মধ্যে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর,বৌদ্ধদের মধ্যে হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের উপস্থিতি জাতিভেদ প্রথাকে সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে চলেছে যা প্রকৃতপক্ষে মতানৈক্য বা মতবিরোধের ফলাফল বলেই মনে করা যেতে পারে এবং তা অনেক সময়েই বিশ্বভাতৃত্ববোধের বিরোধিতা করবে বলে মনে করা যেতে পারে। **'একুশে পা'** (১৯৯৭) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বাণী বসু তাঁর উপন্যাসের চরিত্র মিঠুর বয়ানে লিখেছেন –

"ভাবিসনি আমার কোনো সঙ্কট নেই। জানিস তো আমার বাবা মুসলিম, মা হিন্দু। আমি কী রে? আমার ধর্ম কী? পরীক্ষা-টরীক্ষার ফর্মে লিখতে হয় – ইসলাম। কেননা বাবার পরিচয়েই ছেলেমেয়েদের পরিচয় হবার প্রথা। কিন্তু আমার বাবা কোন ধর্ম মানে না। একদম শতকরা একশ ভাগ সেকুলার। আর আমার মা সব ধর্ম মানে।....কিন্তু আমি কোথায় বিলঙ করি আমায় তো জানতে হবে! বাবা-মার রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। মা ধর্ম পাল্টায়নি।....বাবা বলে "আমার কিচ্ছু নেই। খালি কোনক্রমে আমার আমিত্বটুকু এখনও বজায় আছে।" এইসব আমার সঙ্কট ইমন। এই সঙ্কটে আমায় পড়তে হত না, যদি ফর্মে রিলিজন ব্যাপারটা না থাকতো।"

'একুশে পা' (১৯৯৭) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বাণী বসু তাঁর উপন্যাসের চরিত্র মিঠুর বয়ানে যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন তাতে খুব স্পষ্টভাবেই হিন্দু-মুসলিম

বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া দম্পতিদের সন্তানদের অস্তিত্ব-সংকটের চিত্র উঠে এসেছে। উপন্যাসানুযায়ী মিঠুর মা হিন্দু এবং বাবা মুসলিম হওয়ার কারণে মিঠু জন্মসূত্রে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও তার পিতা শুধুমাত্র মনুষ্যত্বের হাত ধরে আমিত্বকে রক্ষা করার ধর্মে বিশ্বাসী বলে, মিঠুর নিজস্ব ধর্ম শেষ পর্যন্ত কি হবে, তাই নিয়ে মিঠু চিন্তিত। কারণ উপন্যাসের চরিত্র মিঠু যখন নিজস্ব সংকটের সময়, কারোর কাছে সেই সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনায় রত হতে চাইবে তখন তাকে একটা খুঁটি বা বিশ্বাসের হাত ধরতেই হবে। কারন মানুষ বিশ্বাসের হাত ধরেই সাধারণত বাঁচতে ভালোবাসে। কিন্তু সেই বিশ্বাসের খুঁটিটি যখন দুই ধর্মাবলম্বীর ভাবনায় ভাবিত হয়, তখন তাদের সন্তানদের ধর্মনিরপেক্ষভাবে কোন একটি ধর্মকে শুধুমাত্র নিজের ধর্ম বলে মেনে নেওয়া কঠিন হতে পারে। তাহলে সেই সন্তানদের ধর্ম কি হতে পারে, তাই নিয়ে তারা ধর্মসংকটে পড়তে পারে। তাই মিঠুর পরামর্শ হল সমস্ত রকমের সরকারি ও বেসরকারি ফর্ম থেকে মানুষের 'রিলিজিয়ান' বা 'ধর্মপরিচয়'- কে বর্জন করা। তাতে সমাজের প্রতিটি মানুষের 'ধর্মপরিচয়' বলে আলাদা কোনো পরিচয় হতে পারবে না, যা মানুষের নিজস্ব পরিচয়ে, অন্তত ধর্মকে গুরুত্বহীন করে তুলতে পারে। তাতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি রোধ করা হয়তো সম্ভব হলেও হতে পারে, যা সমাজের প্রতিটি মানুষকে অসাম্প্রদায়িকতার সূত্রে এক করতে সমর্থ হতে পারে। এভাবেই মানবিক বিশ্বায়নের ভাবনায় মানুষ সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হতে পারে।

সমাজে নারীর স্থান

মানব সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ নারী এবং পুরুষ। সভ্যতার বহমানতা বজায় রাখার জন্য মানব সভ্যতার সূচনা থেকেই বর্তমান কাল পর্যন্ত নারী-পুরুষের অবদান এককথায় অনস্বীকার্য। কিন্তু নারীর সামাজিক অবস্থানের উপর আলোকপাত করলে, তার দৈনন্দিন যে সংগ্রাম দৃষ্ট হয় তা তার 'আত্মপরিচয়' প্রতিষ্ঠা করার লড়াই। নারীর এই সংঘর্ষ তার সামাজিক অবস্থানকেই সচেতনভাবে তুলে ধরে। যা সভ্যতার প্রকৃত উন্নয়নে, প্রাচুর্যে, বিশ্বায়নের ভাবনায় সমাজের মূল স্রোত থেকে অনেক সময়, অনেক ক্ষেত্রে নারীকে বিচ্ছিন্ন, লাঞ্ছিত, অপমানিত করে রেখেছে। নারীর নারীত্ব এবং নারীসুলভ বিশেষত্ব সামাজিকতার মানদণ্ডেই পরিচিতি পায়। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে সমাজের প্রায় সর্বত্রই নারীজাতির অবমূল্যায়ন করা হতো। শুধুমাত্র এদেশে নয়, পাশ্চাত্যসমাজেও দীর্ঘদিন ধরে নারীদের নির্বোধ, দুর্বল, আবেগপ্রবণ ও ধর্মপ্রবণ

বলেই মনে করা হতো। এই কারণেই নারীদের কোনোপ্রকার উচ্চশিক্ষা তো নয়ই, ন্যূনতম শিক্ষাতেও তাদের অনুপযুক্ত বলে ধরে নেওয়া হতো। ফলে, সমাজের কোনো উচ্চস্তরের কর্মে নারীদের সুযোগ-সুবিধা তেমনভাবে পাওয়া হতো না। এমনকি নারীকে সম্পত্তির অধিকার থেকেও বঞ্চিত হতে হতো। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে আচরণের নৈতিক মান-এ ও বিরাট পার্থক্য দৃশ্য হতো। অতীতে নারীদের প্রধান কাজ ছিল – সন্তান প্রসব, সন্তানাদির লালন-পালন করা এবং গৃহকর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সর্বক্ষণ নিজেদের যুক্ত রাখা। সেই সময় সমাজে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল যে, পুরুষের কাছে নারীর এই আত্মসমর্পণ, নারী নিজেও কখনোই নিন্দনীয় বা তার মর্যাদার অবমাননা বলে মনে করতেন না। বরং নারীর প্রকৃতিগত মূল্যবোধের সঙ্গে তার অমর্যাদার সহাবস্থান নারীকে তার নিজের কাছে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিমূর্তিরই দর্পণ করে তুলত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের ইতিহাসে যে সমাজচিত্র পাওয়া যায়, তাতে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবা নারীর পুনর্বিবাহে বাধা, বরপণ, কন্যা বিক্রয়, স্ত্রী বিক্রয়, স্ত্রী বিনিময়, সতীদাহ, কৌলিন্য প্রথা প্রভৃতি বিষয়গুলির দ্বারা, সমাজে নারীর অবস্থানের প্রকৃত চিত্র প্রকাশিত হয়। যেহেতু বর্তমান গবেষণা উপন্যাসনির্ভর, তাই বর্তমান গবেষক বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের দ্বারা লিখিত উপন্যাসের ওপর নির্ভর করেই নারীর সামাজিক অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

নারীর সামাজিক জীবনের এক বৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিবাহ। আজও সামাজিক প্রথার প্রচলন হিসেবে, নারীকেই পিতৃগৃহের পরিচিত, সহযোগী বাতাবরণ ত্যাগ করে স্বামীগৃহে গমন করতে হয়। স্বামীগৃহের সম্মান প্রাপ্তি বা অসম্মান প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও বেশিরভাগ সময়েই নারীকেই দায়ী করা হয়। ঔপন্যাসিক নবনীতা দেবসেনের **'মায়া রয়ে গেল'** (২০০০) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র আদিত্য রায় বলছেন –

"বাবাকে কখনো মায়ের কোনও অনিচ্ছাকে অসম্মান করতে আমি দেখিনি। এজন্য সুষমারও কোনো অনিচ্ছাকে আমি অবহেলা করতে পারিনা। আমার বাবার কাছ থেকে এটাই আমার শিক্ষা যে পত্নীর ইচ্ছাকে, তার পছন্দ-অপছন্দকে সম্মান করতে হয়। ধর্মপত্নীকে আমরা বিবাহের সময় কথা দিই, "নাতিচরিষ্যামি – তোমাকে অতিক্রম করে যাব না।" সে যেমন আমার সংসারে ধ্রুব হবে, আমিও তেমনি তাকে কদাচ অতিক্রম করে যাব না এই প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করে চলেছি। সুষমাও ধ্রুব হয়ে আছে। আমরা কেউ আমাদের বিবাহ মন্ত্রের শপথ অবজ্ঞা করিনি।"

ঔপন্যাসিক নবনীতা দেবসেনের **‘মায়া রয়ে গেল’** (২০০০) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র আদিত্যের সুন্দর ভাবনা – শাস্ত্রানুযায়ী স্ত্রীকে তার উপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া, তাঁর পিতৃসূত্রেই লব্ধ। অর্থাৎ একজন পিতা তাঁর পুত্রকে, নারীর উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্তির শিক্ষাদান করছেন যা তিনি তাঁর নিজের স্ত্রীর প্রতি সারা জীবনের ব্যবহারিক ভাবনায় দৃশ্য করে তুলেছেন। লেখিকা বর্তমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তনের হাল তুলে দিয়েছেন পুরুষেরই হাতে। পিতা-মাতা সন্তানদের যে শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন, সেই শিক্ষার প্রতিচ্ছবি ভবিষ্যতে সন্তানের ব্যবহারিক দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। তাই সমাজের পারিবারিক জীবন, সমাজ সচেতন মানুষ গড়ে তোলার কারখানা বলা যেতে পারে। নারী-পুরুষের সম্পর্কে দুজনাই সমান সম্মানের অধিকারী আর এই অধিকার বর্তমানে আইনসম্মত। তবুও উপন্যাসের চরিত্র আদিত্য রায়ের “সে যেমন আমার সংসারে ধ্রুব হবে, আমিও তেমনি তাকে কদাচ অতিক্রম করে যাব না এই প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করে চলেছি।” – এই শপথ বাক্যে ‘আমার সংসার’ শব্দ দুটিতে কোথাও যেন পুরুষতন্ত্রের দ্যোতনার সৃষ্টি হয়েছে যা আধুনিক সমাজের সামাজিক ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত বলা যেতে পারে। সংসার নারী-পুরুষ দুজনারই। তাই ‘আমার সংসার’ – এর পরিবর্তে ‘আমাদের সংসার’ শব্দ দুটি নারী-পুরুষ দুজনারই একত্রের প্রকৃত সম্মান হয়ে উঠতে সক্ষম হতে পারে। প্রকৃত শিক্ষিত হওয়া সত্বেও উপন্যাসের চরিত্র আদিত্যের মনের গভীরে বহুদিনের সংস্কারপ্রসূত অহংবোধ, তাঁকে নিজের অজান্তেই পুরুষতান্ত্রিকতার সমর্থক করে তুলেছে। যা নারীকে প্রকৃত সম্মান দেওয়ার পরিপন্থী। তাই পিতা-মাতার প্রকৃত শিক্ষার ভাবনায় শিক্ষিত হওয়ার সাথে সাথে, নারী-পুরুষ উভয়কেই নিজস্ব সদর্থক ভাবনার শিক্ষাকে, প্রতিনিয়ত নিজস্ব শিক্ষাভাবনায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তবেই প্রকৃত সচেতন শিক্ষিত নারী-পুরুষ রূপে সমাজের সামাজিক পরিবর্তনে অগ্রগতি আনতে পারা যাবে।

ঔপন্যাসিক নিমাই ভট্টাচার্য তাঁর লেখা **‘রুদ্রাণী’** (১৯৯৫) উপন্যাসে হিন্দুধর্মের কয়েকটি দিক সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। প্রথমতঃ হিন্দুধর্মের বাল্যবিধবাদের কি ভয়ানক কষ্টকর অবস্থা ছিল, তা তাঁর উপন্যাসের চরিত্রদের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয়তঃ হিন্দু ধর্মের বিধবাবিবাহ বিষয়টিও তাঁর উপন্যাসে খুব সহজভাবেই ধরা পড়েছে। তৃতীয়তঃ বিধবাবিবাহ যে পুরুষরা করতেন তাঁদের সমাজে কিভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হতো এবং রক্ষণশীলদের অপমান, উপেক্ষা কিভাবে তাঁদের সহ্য করতে হতো, তার সম্পর্কে সুন্দরভাবে

ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে বিবৃত করেছেন। তাঁর উপন্যাসের চরিত্র গুরুদাস মুখুজ্জে মাত্র একুশ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন। এবং মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন। সমাজের অনেক অপমান, লাঞ্ছনা এই কারণেই তাঁকে হাসিমুখে মেনে নিতে হয়। কিন্তু নিজের কর্তব্যে কোনো ত্রুটি তিনি কখনোই করেননি। **'রুদ্রাণী'** (১৯৯৫) উপন্যাসের চরিত্র গুরুদাস মুখার্জী স্যার আশুতোষকে প্রণাম করে বললেন –

"স্যার, আপনি আশীর্বাদ করবেন, আমি যেন আপনার আস্থা ও বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারি। স্যার আশুতোষ ওঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, যে মহামহোপাধ্যায় মশায়ের বিধবা মেয়েকে বিয়ে করতে পারে, তার উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে।"

এছাড়াও ঔপন্যাসিক নিমাই ভট্টাচার্য **'রুদ্রাণী'** (১৯৯৫) উপন্যাসে হিন্দুধর্মের আরেকটি দিক তুলে ধরেছেন। সেকালের গ্রামের বাড়ির ছেলেরা ছাড়া কেউ পড়াশোনা করত না। কিন্তু তাদেরও সাত-আট মাইল দূরের কেশবপুরের স্কুলে পড়তে যেতে হতো। মেয়েদের পড়াশোনার বিষয় তো সেভাবে প্রাধান্যই পেত না। তাই এই গুরুদাস মুখুজ্জে কলকাতায় চাকরি করলেও তাঁর নিজের গ্রাম চণ্ডীতলায় পড়ুয়াদের সুবিধার্থে স্কুলবাড়ি বানান। কিন্তু তাঁর স্কুলে কেউ পড়তে আসত না। কারণ তিনি বিধবাবিবাহ করেছিলেন। তাই তিনি গ্রামের চাষীদের বাড়ি থেকে ছেলেদের ডেকে এনে তাঁর স্কুলে ভর্তি করেছিলেন এবং নিজের পুত্রকেও ওই স্কুলেই ভর্তি করেছিলেন। অর্থাৎ শাস্ত্র বহির্ভূত কাজ করেছিলেন। কারণ বামুনের ছেলের সঙ্গে চাষীর ছেলে একাসনে বসে বিদ্যালাভ করার অধিকার পেতে পারে না। ঔপন্যাসিক সেইসময়ের ধর্মের এই সহনশীলতাকে সুন্দরভাবে তাঁর উপন্যাসে বিবৃত করেছেন। এর থেকে সমাজের ধর্মের ধীর পরিবর্তনকে পাঠক অনুধাবন করতে সক্ষম হতে পারে। বিধবাবিবাহ সেইসময়ে এতটাই সমাজবহির্ভূত কাজ বলে গণ্য হতো যে যিনি এই কাজে অগ্রসর হয়ে সমাজের বিধবাদের একটা সাম্মানিক পরিচয় দিতে আগ্রহী হতেন, সমাজ তাঁকেই বর্জন করার সিদ্ধান্ত সচেতনভাবে গ্রহন করত। ফলে সাধারণত, সাধারন কোনো পুরুষ সমাজের ভয়ে এই কাজে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পিছুপা হতেন। ফলে অনেক বিধবাই অত্যন্ত কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করতেন। এই প্রসঙ্গে **'প্রেম ও প্রয়োজন'** (১৯৯৫) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আশাপূর্ণা দেবী তাঁর উপন্যাসের চরিত্র বিধবা জ্যোতির্ময়ীর অসহায় অবস্থার ছবি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন –

"সত্যই যে তিনি স্বামী হারাইয়া শূন্য হৃদয়ের হাহাকার লইয়া ব্যাকুলচিত্তে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ছুটিতেছিলেন এমন নয়। বিধবা হইলে ধর্ম্মকর্ম্ম করা উচিত এই এক সংস্কার। তাছাড়া অবসর প্রচুর, কাজ অল্প। অর্থের অগাধ স্বাধীনতা, এ এক নতুন খেলার আস্বাদ দিয়াছে। হয়ত আরও গোপনে, নিজের অজ্ঞাতসারে লুকানো আছে, চিত্তদৈন্যের ত্রুটিপূরণ। স্বামীর বিরহে যতটা কাতর হওয়া উচিত সে কাতরতা মনের মধ্যে খুঁজিয়া পান কই? নতুন করিয়া কোন শূন্যতা আসিল জীবনে?"

ঔপন্যাসিক আশাপূর্ণা দেবী তাঁর উপন্যাস **'প্রেম ও প্রয়োজন'**-এ (১৯৯৫) সেইসময়ের সমাজের বিধবাদের মানসিক অবস্থার কথা বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী যে সর্বদাই সেই স্বামী বিরহে কাতর হতেন তেমনটা নয়, তার যে বিশেষ কারণগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে তা হ'ল – বিধবা হওয়ার পর সেইসময়ে সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থায়, বিধবাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েও দিনের প্রায় সর্বক্ষণই প্রচুর ধর্ম-কর্মের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে হতো। এবং তাদের পার্থিব সুখ ও সমস্ত রকম আনন্দকে বর্জন করতে হতো। বার-ব্রত, পূজা-অর্চনা, দান-ধ্যানের তালিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত। যেখানে একবেলা উপবাস করলেই চলে, সেখানে তিনবেলা উপবাসের কৃচ্ছসাধন করতে হতো। স্বামীর রেখে যাওয়া প্রচুর অর্থাদির ক্ষেত্রে অগাধ স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও, চিত্তদৈন্যের অবসান ঘটানোর মতো কোনো আনন্দকর্মে অংশগ্রহণ করা যেত না। তাই এই স্ব-নিষ্পেষণের মধ্যে থাকাকালীন, স্বামীবিরহের কাতরতা বিধবারা অনেক সময়ই মনের মধ্যে খুঁজে পেতেন না। এক অগাধ শূন্যতায় চিত্তবিকল হয়ে থাকতো, যে শূন্যতায় স্বামী প্রাধান্য পেতেন না। এছাড়া কাঁচা বয়সে আমিষ খাওয়ায় অভ্যস্ত বিধবাদের, দিনের পর দিন নিরামিষ খাওয়াও দুঃসহ হয়ে উঠতো। শুধুমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ, পরনের কাপড়, শীতের কম্বল ও মাথা গোঁজার একটা আস্তানাই বিধবাদের জীবনের সম্বল হয়ে উঠতো। জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা নিরাময়ের উপায় এই প্রাথমিক চাহিদাগুলির উপর নির্ভর করে থাকেনা। তাই বিধবাদের ক্ষেত্রেও কোনমতে জীবনধারণের জন্য এই প্রাথমিক চাহিদা ছাড়াও যে আরো কিছু জীবনকে ভালোলাগার চাহিদা থাকতে পারে সে বিষয়ে, সেই সময়ের সমাজ ভাবতেও চাইত না। বিধবাদের ক্ষেত্রে সমাজের এই ভাবনাহীনতার সঙ্গে তাল রেখেই বিধবারা অমানুষিক কৃচ্ছসাধনে এক অদ্ভুত মোহের আবর্তনে আবর্তিত হতেন। এভাবেই স্বাভাবিক অথচ দুঃসহ এক জীবন সেইসময়ের বিধবাদের প্রাপ্য ছিল, যা সমাজের সেই সামাজিকদিককে তুলে ধরেছে – যেখানে সংস্কারসাধনের নামে বিধবা মহিলাদের বঞ্চিত ও শোষণ করা হতো। ঔপন্যাসিক আশাপূর্ণা দেবী অত্যন্ত

ব্যুৎপত্তিতার সঙ্গে, সমাজের বিধবাদের অবস্থার ছবি তাঁর উপরোক্ত উপন্যাসে এভাবেই বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন, যা থেকে পাঠককুল সেইসময়ের সমাজব্যবস্থায় বিধবা মহিলাদের অবস্থান সম্পর্কে এক সম্পূর্ণ ধারণা পেতে পারেন। যা বর্তমান গবেষকের গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে।

ইসলাম ধর্মে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাকেই 'তালাক' বলা হয়। আরবি ভাষায় 'তালাক' শব্দের অর্থ হলো 'বন্ধনমুক্ত করা'। মুসলিম সমাজে এই তালাক প্রথা নিয়ে যে অব্যবস্থা বর্তমান আছে, তাতে 'তালাক' প্রথাকে মুসলিম পুরুষসমাজ নারী নির্যাতনের এক হাতিয়ারে পরিণত করেছে। নারীর স্বপ্ন, সম্মান, নিরাপত্তাবোধ 'তালাক' প্রথার জন্যই ক্ষতবিক্ষত হয়। ইসলাম ধর্মে শরীয়ত অনুসারে তিন তালাক দিলেই স্বামী-স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে যায়। এর জন্য কোন আইন আদালতের দ্বারস্থ হতে হয় না। বিষয়টি এতটাই সহজসাধ্য যে মুসলিম সমাজে অত্যন্ত তুচ্ছ অজুহাতে ইচ্ছে হলেই তালাক দিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যাল **'মান মানে কচু'** (১৯৯২) উপন্যাসের চরিত্র অশোকের বয়ানে বলেছেন –

"ভারতবর্ষ একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। পাকিস্তান বা ইরানের মতো মুস্‌লিম রাষ্ট্র নয়। তাহলে এখানে কেন ঐ আইনটা আজও বলবৎ থাকবে, যার বলে বলীয়ান হয়ে একজন মুসলমান পৌঢ় ভদ্রলোক তাঁর বিশ বছরের বিবাহিত বিবিকে পুত্র-কন্যাসহ বিনা খোরপোশে পথে বার করে দিতে পারবেন। 'তালাক-তালাক-তালাক' বলে?...মুসলমান নারীসমাজ অনুন্নত, তারা ভোট দিতে আসে না। নারী ভোটারদের চেয়ে মুসলমান পুরুষ ভোটার সংখ্যাগরিষ্ঠ।"

'মান মানে কচু' (১৯৯২) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যাল বলেছেন – মুসলমান নারীসমাজ অনুন্নত। তারা ভোট দিতে আসে না। নারী ভোটারদের চেয়ে তাই মুসলমান পুরুষ ভোটার সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই প্রসঙ্গে **'হিন্দু না ওরা মুসলিম'** উপন্যাসের **'সন্তান মোর মার'** (১৯৯৫) উপন্যাসটিতেও ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যাল উপন্যাসের চরিত্র জামালের বয়ানে বলেছেন –

"দশ কোটি মুসলমান আছে ভারতে। তার মধ্যে যাঁরা ভোটার তার আশি-নব্বই শতাংশ পুরুষ, বাকি দশ বিশ শতাংশ মহিলা। ঐ মহিলাদের ঘরে বন্দি করে রাখলেই হল! এই দশ কোটি মুসলমান ভোট নিয়ে আমরা ব্যবসা করব।"

ভারতবর্ষের মুসলমান ভোটারদের মধ্যে আশি-নব্বই শতাংশ পুরুষ বাকি দশ-বিশ শতাংশ মহিলা। অর্থাৎ মুসলমান সমাজে পুরুষেরা মহিলাদের ঘরে বন্দী করে রাখতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এভাবেই পুরুষপ্রধান মুসলমান ধর্ম বা ইসলাম ধর্ম বিনা প্রতিবাদে নিজস্ব পুরুষতান্ত্রিক মতামত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ঔপন্যাসিকদের বিভিন্ন উপন্যাসে লেখা থেকে মুসলিম মেয়েদের আর্থিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরাধীনতা সম্পর্কে, সমকালীন সম্পূর্ণ এক চিত্র অবগত হওয়া সম্ভব হয়, যার প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত প্রভাবে, সমাজ এক সম্পূর্ণ, সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিপন্থী, এই বিষয়ে সমাজের মানুষেরা সম্যক জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হয়। মুসলমান সমাজের নারীদের বহু বিবাহ ও তালাক প্রথা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যাল **'হিন্দু না ওরা মুসলিম'** উপন্যাসের **'সন্তান মোর মার'** (১৯৯৫) উপন্যাসটিতে উপন্যাসের চরিত্র জামালের বয়ানে বলেছেন –

"বহুবিবাহ এবং তালাক-প্রথা। কট্টর মুসলিম নেতারা মনে করেন মুসলমানকে একসঙ্গে চার-চারটি বিবি রাখার অনুমতি দিতে হবে। এ নাকি শরিয়তি আইনের অপরিহার্য নির্দেশ। তাছাড়া তালাক প্রথা পরিবর্তন করা যাবে না – সুপ্রিম কোর্ট শাহ্‌বানুর পক্ষে রায় দিলেও! কেন? না, আমরা মুসলমান পুরুষ মানুষেরা স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীমুক্তি, স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী!"

'হিন্দু না ওরা মুসলিম' উপন্যাসের **'সন্তান মোর মার'** (১৯৯৫) উপন্যাসটিতে যে তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তা হ'ল – মুসলিম নেতারা মনে করেন মুসলমানকে একসঙ্গে চারটি বিবি রাখার অনুমতি দিতে হবে, কারণ এই প্রথা শরিয়তি আইনের অপরিহার্য নির্দেশ। মুসলিম নেতাদের মতে তালাক প্রথা পরিবর্তন করা যাবে না, যদিও সুপ্রিম কোর্ট শাহাবানুর পক্ষে রায় দিয়েছেন। কারণ মুসলমান পুরুষ মানুষেরা স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীমুক্তি, স্ত্রীস্বাধীনতা বিরোধী অথচ পাকিস্তানের মতো ইসলামী দেশেও বর্তমানে বহুবিবাহ এবং তালাক প্রথা নিষিদ্ধ। কিন্তু বেশিরভাগ মৌলানা সাহেবেরা এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন – পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র হলেও ইসলামিক নয়। পাকিস্তানের মুসলমান একসঙ্গে চারটি বিবি পুষতে পারেনা। তিনবার তালাক দিয়ে কুড়ি বছরের বিবাহিত সহধর্মিনীকে ঘর থেকে পথে নামিয়ে দিতে পারেনা। এদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের অশিক্ষার কারণেই তারা মৌলবীদের মতে মত দেয়। কারণ বেশিরভাগ মুসলমান পুরুষ ভাল করে আরবি পড়তেই জানেনা, পড়লেও সঠিক অর্থ বোঝেনা। ফলে যেসব মৌলবীরা কিছু কিতাব পড়া জ্ঞান অর্জন করেছে তাদের মতেই সহমত হয়। মৌলবীদের বিধান হ'ল, তিনবার

‘তালাক’ বললেই ‘তালাক’ হয়ে যায়। শরিয়তি কানুনে কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যায় বটে, কিন্তু একটি বিকল্প ব্যবস্থাও আছে তাদের পুনর্বিবাহের। যদি ওই তালাকপ্রাপ্তা রমণীকে, কোন দ্বিতীয় পুরুষ নিকা করে, তিনমাস শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করে এবং তারপরে তাকে তালাক দিয়ে দেয়, এক্ষেত্রে যে দ্বিতীয় পুরুষ, প্রথম পুরুষের স্ত্রীকে নিকা করবে, তার পূর্বের বিবাহ করা চার বিবি জীবিত থাকতে পারবে না। দ্বিতীয় পুরুষের সাথে নিকা করার পর, তালাকপ্রাপ্তা রমণী ও দ্বিতীয় পুরুষকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তিনমাস বাস করতে হবে। প্রয়োজনে এই তিনমাস চান্দ্রমাসের সময়কাল বর্ধিতও হতে পারে। এরপরে তালাকপ্রাপ্তা রমণীকে দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিলে তবেই সে মুক্তি পাবে। তখন সে আবার তার প্রথম স্বামীকে বিবাহ বা নিকা করতে পারে। অথচ এই নিয়মে তালাকপ্রাপ্তা রমণীর খসম্ বা স্বামী হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যে তালাক দিয়েছে, সেই স্বামীর হঠকারিতার জন্য তালাকপ্রাপ্তা রমণীকে, ইচ্ছা না থাকলেও অন্য পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হতে বাধ্য করা হয়। লেখকের মতে, এই শরিয়তি কানুন অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। কারণ এই প্রথার একটি মুশকিল বা অসুবিধা হ’ল – অনেকক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ হয়েও তিনমাস পরে দ্বিতীয় পুরুষটি তালাক দিতে রাজি হয় না। ব্ল্যাকমেলিং শুরু করে। শরিয়তের মাধ্যমেও তাকে বাধ্য করা যায় না, এমনকি আদালতের মাধ্যমেও নয়। এমন হৃদয়হীন পরিস্থিতির সঙ্গে শুধুমাত্র মুসলমান রমনীদেরই মুখোমুখি হতে হয় যা সেই তালাকপ্রাপ্তা রমণীটির, স্বামীর হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতার পরিস্থিতির ফসল। শরিয়ত অনুসারে শুধুমাত্র মুখের কথায় তালাক দিতে পারা যায় না। কারণ তালাক দিলে খোরপোষ দিতে হয়। যতদিন না সেই পুরুষটি পুনরায় বিবাহ করছে, ততদিন সে তার তালাকপ্রাপ্তা বিবিকে খোরপোষ দিতে বাধ্য থাকে। আবার দ্বিতীয়বার অন্য মেয়েকে বিবাহ করলেও, তখন আইন তাকে বাধ্য করবে খোরপোষ দিতে। কারণ মেয়েদের পূর্ণ সম্মতি বিনা কোন বিবাহই ইসলামী শাস্ত্রে আইনসম্মত নয়। এইরকম বিবাহকে ইসলামী শরিয়তে বে-আইনি বা বে-শরিয়তি কাজ বলে গণ্য করা হয়। ঔপন্যাসিক আফসার আহমেদ লিখিত **‘বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা’** (১৯৯৫) উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের বয়ানে –

“কেননা তালাক পাওয়া মেয়েটি ঘরে বসে থাকবে না তার নিশ্চয় বিয়ে হবে। তার তালাকের খবরের ভেতর ছিল এই অনিবার্যতা। নির্ধারিত সময় ফুরিয়ে গেলেই তাকে অন্য পুরুষের হাতে গিয়ে পড়তে হবে....একটা মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ শুধু। মনহীন, যেন লীলার লীলাবতী নয়, খেলার খেলনা।”

ঔপন্যাসিক আফসার আমেদ তাঁর **'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা'** (১৯৯৫) উপন্যাসে ধর্মের মধ্যে লুক্কায়িত অধর্মের বীজের শিকার জাহান বিবির মধ্যে দিয়ে সমগ্র মুসলিম মহিলাদের বিপজ্জনক সমস্যার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, যা বাংলা সাহিত্যে নারী অসম্মানের এক দলিল সমতুল্য। ধর্মের ধ্বজা ধরে, ইসলামের আচরনগত ধর্মের প্রতি পদক্ষেপে, মুসলিম নারীদের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করার জীবন্ত ইতিহাসের মাধ্যমে, মুসলিম নারীদের মনুষ্যত্বের আঘাতকে ও তালাকের নামে নারীর সম্মানের ধর্ষণকে, ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এই অধর্মের অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় হিসেবে তিনি মূলত শিক্ষার আলো, যুক্তি, মানবিকতা এবং সর্বোপরি ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করে, বর্তমান সমাজকে এক কলুষমুক্ত সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যে সমাজে তালাক, বধূনির্যাতন, পণপ্রথা ইত্যাদির পরিবর্তে মানবিকতা ও স্বর্গীয় সুখসমৃদ্ধ এক বাতাবরণের স্পর্শ পাওয়া যাবে। ঔপন্যাসিকদের লেখা উপন্যাসের মাধ্যমে সমাজের সমস্ত ধর্মনির্বিশেষে সকল পাঠকগণ মুসলমান নারীদের এই হৃদয়বিদারক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং নারীর সম্মান রক্ষার্থে একীভূত হয়ে এক সদর্থক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে যা এক সদর্থক সমাজ সংস্কারের কাজের সহায়ক। এভাবেই সমাজের সমস্ত মানুষ একীভূত হয়ে নারীর সম্মানের হেতু এক সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

ধর্মীয় দিক

মানুষের ভাবনার বিবর্তনের ইতিহাসে ধর্মের স্থান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। ধর্ম মানুষের জীবনের কেন্দ্রে অবস্থান করে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষের চিন্তার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের স্বরূপও পরিবর্তিত হয়েছে। এদের প্রত্যেকটিকেই ধর্ম নামে অভিহিত করলেও তাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সর্বদা নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নাও হতে পারে। প্রকৃত ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া যেমন সাধ্যাতীত ঠিক তেমনই ঈশ্বরের অস্তিত্বের সংজ্ঞাও সাধ্যাতীত। কারণ ধর্ম কোনো নিশ্চল ভাবনা নয়, ধর্ম এক অভিরুচি বা প্রবৃত্তি। তেমনই ঈশ্বরের ঐশ্বরিক ভাবনাও কখনো গতিহীন কোন বিষয় নয় সেই কারণেই স্থান-কাল-পাত্রভেদে তা সদাসর্বদা পরিবর্তনশীল। ধর্মোৎপত্তির মূলে দুই ধরনের ধর্মের কথা বলা যেতে পারে। প্রথমতঃ মানুষের সুবুদ্ধিজাত শুদ্ধ ও স্বাভাবিক ধর্ম, যা অভিজ্ঞতালব্ধ নয় বুদ্ধিলব্ধ বা যুক্তিসিদ্ধ। যেমন গাণিতিক বিশ্বাস যা বিশুদ্ধবুদ্ধি নির্ভর। ঠিক তেমনই ঈশ্বর ভাবনা বা পরমাত্মার ধারণাও বিশুদ্ধ বুদ্ধি নির্ভর। বিচারবুদ্ধি মানুষের স্বভাবগত ধর্মের অন্তর্গত হওয়ার

কারণে বিচারবুদ্ধি থেকে উদ্ভূত ধর্মের ধারণা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম বলেই মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এই বিশুদ্ধ বুদ্ধি নির্ভর ধর্মবোধকে পরবর্তীকালে ধূর্ত ও স্বার্থান্বেষী পুরোহিত এবং ধর্ম যাজকরা নিজেদের স্বার্থ সাধনের কারণে চতুরতার দ্বারা সেই ধর্মবোধকে বিকৃত ধর্মবোধে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেই কারণে মানুষের ভেতরের স্বাভাবিক ধর্মবোধ ধীরে ধীরে বাহ্যিক ধর্মীয় আচার-আচরণ, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে পরিণত হয়েছিল। এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাসই কালে ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। যা ধর্মের প্রকৃত রূপ বলে সর্বদা গণ্য করা যেতে পারে না। **'বোকা প্রপিতামহ কথা'** (২০০০) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক চিরঞ্জয় চক্রবর্তী উপন্যাসস্থিত একটি চিঠিতে উল্লেখিত প্রশ্ন – 'আমাদের ধর্ম কি?' – এর উত্তরে যে চিঠিটি তিনি উপস্থাপন করেছেন তার একটি অংশ গবেষণার তথ্য হিসেবে তুলে ধরা হ'ল –

> **"আমাদের ধর্ম সনাতন ধর্ম। আমাদের ধর্ম ত্রিবিধ। ভগবান অন্তরাত্মায়, মানসিক জগতে, স্থূল জগতে – এই ত্রিধামে প্রকৃতিসৃষ্ট মহাশক্তিচালিত বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এই ত্রিধামে তাঁহার সহিত যুক্ত হইবার চেষ্টা সনাতন ধর্মের ত্রিবিধতত্ত্ব। আমাদের ধর্ম-জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম এই তিন স্বতন্ত্র বা মিলিত উপায়ে আত্মশুদ্ধি ত্রিমার্গগামী গতি। আমাদের ধর্ম ত্রিকর্ম্মরত। সত্য প্রেম ও শক্তিদ্বারা ত্রিমার্গে অগ্রসর হওয়া সনাতন ধর্ম্মের ত্রিকর্ম্ম।"**

'বোকা প্রপিতামহ কথা' (২০০০) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক চিরঞ্জয় চক্রবর্তীর মতে ধর্ম সনাতন। ধর্ম ত্রিবিধ। ভগবান অন্তরাত্মায়, মানসিক জগতে ও স্থূল জগতে – এই ত্রিধামে প্রকৃতিসৃষ্ট, মহাশক্তিচালিত, বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই ত্রিধামে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টাই সনাতন ধর্মের ত্রিবিধ তত্ত্ব। আমাদের ধর্ম জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিন স্বতন্ত্র বা মিলিত উপায়ে আত্মশুদ্ধিই হ'ল ত্রিমার্গগামী গতি। সত্য, প্রেম ও শক্তি দ্বারা ত্রিমার্গে এগিয়ে যাওয়াই সনাতন হিন্দু ধর্মের ত্রিকর্ম। ব্যক্তিগতধর্ম, জাতিধর্ম, বর্ণাশ্রিতধর্ম, যুগধর্ম পরিত্যাগ করলে সনাতন ধর্মের পুষ্টি হয় না। অধর্মই বেড়ে যায়। গীতার ভাষায় 'সঙ্কর' উৎপন্ন হয়। সনাতন ধর্মের সঠিক পালনের জন্য যে ব্যক্তিগত ধর্ম, জাতিধর্ম, যুগধর্মের উপস্থিতি আছে, তার আচরণ সর্বদা রক্ষণীয়। ব্যক্তিগতধর্ম, জাতি-ধর্মের আশ্রয় থেকে আচরণ না করলে জাতি ধ্বংস হয়। আর জাতিধর্ম লোপ পেলে ব্যক্তিগতধর্মের ক্ষেত্রেও সুযোগ নষ্ট হয়। জাতিকে প্রথমে রক্ষা করতে হবে, তবেই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত হওয়া সম্ভব। ভারতবাসী আর্যজাতির বংশধর। হিন্দু ধর্মাশ্রিত জাতিধর্ম ও যুগধর্ম অনুষ্ঠান করে সনাতন ধর্ম প্রচার করতে হবে। হিন্দুর কুলধর্ম ও জাতিধর্ম হ'ল এই আর্যভাব। জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম আর্যশক্তির ও আর্যশিক্ষার মূল। তাই যুগধর্ম জাতি-ধর্ম

সঠিকভাবে সাধিত হলে, জগৎময় সনাতন ধর্ম অবাধে প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত হবে। কারোর অনিষ্ট করা ধর্ম নয়। সবার মঙ্গল প্রার্থনাই ধর্ম। ধর্মকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সত্য ও ধ্যানপ্রকৃতি এই বিশ্বজগতকে ধারণ করে আছে। সত্যকে ভুলে যাওয়াই ধর্মচ্যুত হওয়া। সকলের কল্যাণ সাধনের জন্য স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। যা সমাজস্থ সকল মানুষের মধ্যে একতা জাগ্রত করতে সক্ষম হবে। এই ধর্মের বার্তা উপন্যাস রচনার মাধ্যমে ঔপন্যাসিকেরা সমাজস্থ মানুষ বা পাঠকের সম্মুখে প্রতিফলিত করছেন। ফলে মানুষ এই বিষয়ে সম্যকজ্ঞান আহরণে সক্ষম হয়ে, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অনুপ্রাণিত হয়ে, এক উন্নত ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজ গড়তে, সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহী হতে পারবে। ত্যাগের প্রসঙ্গ টেনে **'অচেনা ভরত'** (১৯৯৬) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক ডঃ দীপক চন্দ্র উপন্যাসের চরিত্র বশিষ্ঠ ভরতের দিকে তাকিয়ে এক অনবদ্য আবৃত্তি করে তার ব্যাখ্যা করে বললেন –

"পুণ্যকর্মের প্রশংসা স্বর্গ ও পৃথিবী স্পর্শ করে। যতকাল এই প্রশংসা থাকে, ততকালই মানুষ পুরুষরূপে গণ্য হয়। পৌরুষ বলে যেমন জয় করে, তেমনি ত্যাগও করে। ত্যাগে মানুষ সুন্দর হয়। মনুষ্য চরিত্রের শোভা হলো ত্যাগ। ত্যাগের আনন্দে, তৃপ্তিতে হৃদয় ভরে উঠে পুণ্যের সুখে।"

'অচেনা ভরত' (১৯৯৬) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক ডঃ দীপক চন্দ্র উপন্যাসের চরিত্র বশিষ্ঠ ভারতকে ত্যাগের যে উপদেশ দিয়েছেন তা মর্মস্পর্শী। ত্যাগ মানুষকে সুন্দর করে, মহান করে, শুদ্ধ ভাবনাময় আত্মার আধার করে তোলে। মানুষের চরিত্রের সৌন্দর্যের শোভাবর্ধক হিসেবে ত্যাগকে মনে করা যেতে পারে। ত্যাগ মানসিক এমন এক অবস্থা যা প্রেমের সর্বোচ্চ অবস্থা বলে গণ্য করা যেতে পারে। গীতার মূল কথা ত্যাগী। যা গীতাকে উল্টো করে উচ্চারণ করলেই গীতার মধ্যে লুকানো এই প্রধান অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভারতের কর্ণকে মহান দাতা কর্ণ বা ত্যাগী কর্ণ নামেও অভিহিত করা হয় তার প্রধান কারণ – যে কোনো অবস্থাতেই, যেকোনো স্থানে, ব্যক্তি নির্বিশেষে যেকোনো ব্যক্তিকে, তিনি নিজের সমস্ত কিছু ত্যাগ করে, সেই ব্যক্তিকে সাজিয়ে তুলতে সক্ষম ছিলেন। মানুষের এই মহান গুন মানুষকে প্রকৃত ধার্মিক করে তুলতে সক্ষম হতে পারে। ত্যাগের প্রসঙ্গে **'একা'** (১৯৯৮) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় শঙ্করাচার্যের কথা তুলে ধরেছেন–

"সুরমন্দিরতরুমূলনিবাসহশয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥

মন্দির অথবা বৃক্ষতল তোমার গৃহ। হরিণের চর্ম তোমার পরিধান। ভূতল তোমার শয্যা। উপহার অথবা ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ। এরই নাম সন্তোষ। এমন ত্যাগীই ধন্য পৃথিবীতে।....ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর চেয়ে সৎ গৃহী অনেক ভালো। ভক্তি আর বিশ্বাস এই সার। ধর্ম হল আনন্দ। ধর্ম হল পবিত্রতা। ধর্ম হল বিবেক। ধর্ম হল জ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটি জ্ঞান, ঈশ্বর নেই এইটি অজ্ঞান।"

বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষের পূর্ণতা লুকিয়ে থাকে, ঠিক সেইভাবেই ত্যাগের মধ্যে মানুষের চরিত্রের পূর্ণতা দৃশ্য হতে পারে। ঈশ্বর শুধুমাত্র জ্ঞানময় নয়, তিনি আনন্দময় এক অস্তিত্ব। স্ব-অস্তিত্ব ভুলে বা বলা যেতে পারে স্ব-অস্তিত্বের মায়া ত্যাগ করে ঈশ্বরে যখন পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা হয়, তখন তা পরমত্যাগের উদাহরণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই ত্যাগের পথে সঠিকভাবে অগ্রসর হতে পারলে পারিপার্শ্বিক সমগ্র জগতকেও সুন্দর ও শৃঙ্খলাময় মনে হতে পারে এবং স্ব-অস্তিত্বকে এই শৃঙ্খলাময় মহাজগতের এক আনন্দময় অংশ মনে হতে পারে কারণ ত্যাগের মাধ্যমেই মানুষ নিজের মধ্যে সকল বিকাশের পূর্ণতা ও গুরুত্ব অনুভব করতে সক্ষম হতে পারে। এতে মানুষের অন্তরে যে স্বর্গীয়ভাবের অনুভূতি হয়, তা তাকে পার্থিব সকলকিছুর মোহবন্ধন থেকে অব্যাহতি দিয়ে, চরম মুক্তির পথে অগ্রসর হতে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। **'শ্রীকৃষ্ণের শেষ প্রহর'** (১৯৯৯) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায় উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের মুখোমুখি হয়ে স্পষ্ট ভাষায় তাকে পাপ কর্ম থেকে নিবৃত হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন –

**"হে জরাসন্ধ, অধর্ম থেকে নিবৃত্ত হন। মুক্ত করুন রাজন্যদের। মানব বলি অশাস্ত্রীয়।
হে গোপ কৃষ্ণ। ধর্মাধর্মের জ্ঞান আমার নিষ্প্রয়োজন। জরাসন্ধ যা করে তাই ধর্ম।
অসম্ভব। ধর্ম কারোর আজ্ঞাবহ নয়। আমরা অধর্ম থেকে আপনাকে প্রতিহত করব। আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।"**

'শ্রীকৃষ্ণের শেষ প্রহর' (১৯৯৯) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায় লিখেছেন – ধর্মাধর্মের জ্ঞান মানুষের জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। ধর্ম কারোর আজ্ঞাবহ নয়। মানুষকে নিজেকে অধর্ম থেকে প্রতিহত করতে হবে, নীতিভ্রষ্টতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। নৈতিকতার বিজয়ই মানবিকতার বিজয়। ক্ষমা মানুষের পরম ধর্ম। অনুশোচনাগ্রস্ত মানুষকে ক্ষমা করাই ধর্মের রূপ দর্শায়। প্রতিটি মানুষের অন্তর প্রতিটি মানুষের জন্য ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হলে সমাজের সামাজিকতায় এক পরিপূর্ণতা আসা সম্ভব। সমাজের মানুষের শরীরের ধর্ম, ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্মকে স্বীকার করে নিয়েই, সেই ধর্মকে উচ্ছেদ নয়, নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ কামনাই জীব সৃষ্টির মূল। কামনার উচ্ছেদ তাই কখনোই কাম্য

হতে পারে না। উপন্যাসগুলিতে ঔপন্যাসিকদের লেখনীর গুনে ধর্ম ও ধার্মিকতার চিত্র পাঠক সম্যকরূপে জ্ঞাত হয় ও সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ গঠনে প্রয়াসী হতে পারে।

ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখা **'মিত্তির বাড়ি'** (২০০০) উপন্যাসে বনেদি পরিবারের দর্শনের অধ্যাপক মেজভাই ও জ্যোতিষীর কথোপকথনে জ্যোতিষীর বক্তব্য হল –

"শোনো, ইন্দ্রিয় হল শ্রেষ্ঠ। কোন সন্দেহ নেই ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। তুমিও জানো, আমিও জানি, রামও জানে, শ্যামও জানে। সব মানুষই জানে। কারা জানে না? বল, জানে না পশুরা। তা ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ হলো তো কী হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের ওপরে তো বসে আছে মন। আরে ব্যাটা মনই তো ইন্দ্রিয়গুলোকে চালাচ্ছে। তুমি গাড়ি চালাচ্ছ,তোমার ফ্যাক্টরিতে তুমি মানুষ চালাচ্ছ, যন্ত্র চালাচ্ছ। সেইরকম ইন্দ্রিয়কে চালাচ্ছে মন।....মনের মাথার ওপর তো বুদ্ধি বসে আছে। মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ।....বুদ্ধির মাথার ওপর বসে আছে আত্মা। শুধু আত্মা নয়, বল পরমাত্মা।....সেই পরমাত্মার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর। তাকে সন্তুষ্ট কর।"

ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখা **'মিত্তির বাড়ি'** (২০০০) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র জ্যোতিষী উপন্যাসের আরেক চরিত্র মেজভাইকে মানুষের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, আত্মা ও পরমাত্মার যে গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে বলছেন তা হল – ধর্মের প্রধান বিষয় হলো – ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব ও নৈতিক নিয়মের প্রভুত্ব যা সমাজের প্রায় সমস্ত মানুষেরই স্বাভাবিক ধর্মের সাধারণ বিশেষত্বের মধ্যেই অবস্থান করে। উপরোক্ত বিষয়গুলি মানুষের মানসিক চিন্তা-ভাবনার শক্তিতে অনুপ্রবেশ করে, তার মানসিক চিন্তা-ভাবনার শক্তিকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। মানুষের মন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয় পদবাচ্য, তাই মনের আরেক নাম ষষ্ঠেন্দ্রিয়। মনকে পরিচালনা করে মানুষের বুদ্ধি। বুদ্ধির আলোকে মানুষ জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে আত্মিকশক্তির সাথে পরিচিত হতে সক্ষম হতে পারে। মানুষের আত্মিকশক্তিই মানুষকে পরমাত্মার সাথে যোগসুত্র তৈরি করতে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ মানুষের অন্তঃস্থ প্রাণশক্তিই মানুষকে প্রাণবন্ত বা আত্মিক শক্তির অধিকারী বলেই প্রচার করে থাকে। মানুষের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত পঞ্চেন্দ্রিয় মানুষকে উদ্দীপ্ত করে, এবং সঠিক কর্ম সম্পাদন করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতি জাগ্রত করে। মানুষ যখন কোনোকিছুকে গ্রহণ বা বর্জন করে, তখন তার পিছনে অবশ্যম্ভাবীভাবে কোনও উদ্দেশ্য সম্পাদনের ইচ্ছাশক্তি কাজ করে। মানুষের শরীরাতিরিক্ত আত্মা বা আত্মিকশক্তি সেই ইচ্ছাপূরণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। প্রকৃত কর্মই ধর্ম। এভাবেই সঠিক কর্ম সম্পাদন করতে পারলেই মানুষের

পক্ষে পরমাত্মার সন্ধান লাভ করা সহজ হতে পারে। পরমাত্মার থেকে প্রাপ্ত আনন্দের সন্তুষ্টি, মানুষকে মানবিকচেতনায় পূর্ণ করে তুলতে সক্ষম হয়। এভাবেই মানুষের মধ্যে সৃষ্ট প্রকৃত মানবিকতার ধারণাই ক্রমে মানুষের মধ্যে ঈশ্বর ধারণার বীজ বপন করে প্রতিটি মানুষকে, প্রতিটি মানুষের প্রতি মানবিক করে তোলে। সৃষ্টি হয়, প্রকৃত ধর্মবোধ যা বিভিন্নভাবে প্রতিনিয়ত বিশ্বভাতৃত্ববোধে মানুষকে প্রভাবিত ও উন্নত করে তুলতে পারে। প্রতিটি মানুষের কাছে প্রতিটি মানুষের বিশুদ্ধ আত্মসমর্পণই, মানুষকে মানুষের কাছে ঈশ্বর সমতুল্য করে তুলতে পারে। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই বিশুদ্ধ আত্মসমর্পণই মানুষের প্রকৃত ধর্মমন্ত্র হয়ে উঠতে পারে। এই কথার রেশ ধরেই উপন্যাসিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের **'প্রথম পুরুষ'** (১৯৯৯) উপন্যাসের চরিত্র খ্রীষ্টান জোন্স 'শ্রীভাগবত' খুলে কৃষ্ণের বাণী পড়তে লাগলেন। কৃষ্ণ অবতার বলেছেন –

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। সব ধর্ম পরিত্যাগ করে শুধু আমার শরণ নাও। আর একটু একটু করে জলের ফোঁটার মতো শান্তি ঝরছে জোন্সের হৃদয়ের গভীরে। কী বিশুদ্ধ ভক্তি দাবি করছেন ভগবান কৃষ্ণ! একাগ্রতা! হৃদয়ের সমস্ত আর্তির একমুখী অভিনিবেশ। সমস্ত তত্ত্ব, তথ্য, তর্ক ছাপিয়ে গিয়ে শুধু নির্মল ভক্তি। বিশুদ্ধ আত্মসমর্পণ।"

'প্রথম পুরুষ' (১৯৯৯) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের উপন্যাসের চরিত্র খ্রীষ্টান জোন্স বলেছেন – ফরাসি বিশ্বকোষ প্রণেতা দিদরো নিজের নাস্তিকতা প্রমাণ করার জন্য খ্রীষ্টান ধর্মকে চিরকাল হেয় করতেন। তবে মাঝে মাঝে দু একটি ভালো কথাও বলেছেন এই ধর্মটি সম্পর্কে। এই অনবদ্য লেখক পাস্কাল শুধুমাত্র একটি বাক্যেই মানব পরিস্থিতির এক চমৎকার চিত্র তুলে ধরেছেন – "হৃদয়েরও কিছু যুক্তি আছে যা যুক্তি নিজেই বুঝে উঠতে পারে না।" খ্রীষ্টীয় সরণির একটা সুন্দর পরিস্থিতি তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে বর্ণনা করেছিলেন – খ্রীষ্টহীন ভাবে ঈশ্বরকে বোঝা শুধু অসম্ভবই নয়, অবান্তরও। ভাগবত বা বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল পশ্চিম ভারতে এবং এই ধর্মের আদি প্রবক্তা ছিলেন সম্ভবত যাদব উপজাতির মানুষেরা। কৃষ্ণের পিতা বাসুদেব এবং তার আত্মীয়রা সময়ের সাথে সাথে ক্রমে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে যাদবদের প্রধান নায়ক বাসুদেব-কৃষ্ণকে, বৈদিক দেবতা বিষ্ণুর অভিন্ন অবতার বলে মান্যতা দেওয়া হয়। এই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন – 'সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে শুধু আমাকেই শরণ করো।' হৃদয়ের গভীরের এই বিশুদ্ধ ভক্তি ভক্তের কাছে শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছেন যা এক শুদ্ধ একাগ্রতার প্রতিরূপ বলা যেতে পারে। মানুষের কাছে যে কোন কিছুর অস্তিত্বের প্রতি একমুখী

প্রেম যখন একাগ্র অভিনিবেশে পরিণত হয় তখন তাকে 'শুদ্ধভক্তি' নামকরণ করা যেতে পারে। ঈশ্বরের প্রতি শুদ্ধভক্তির ক্ষেত্রেও এই একাগ্র অভিনিবেশের কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। এই শুদ্ধভক্তিতে কোন তর্ক, তত্ত্ব, তথ্য প্রাধান্য পেতে পারে না। শুধুমাত্র নির্মল, সুন্দর, ভক্তি সহযোগে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ – যার আর এক নাম দেওয়া যেতে পারে বিশুদ্ধ প্রেম। এই বিশুদ্ধ প্রেম যখন সমগ্র মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আবিষ্কার করে প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের সাথে প্রেমে একাত্বতা অনুভব করতে পারবে তখন সৃষ্টি হবে এক অসাধারণ বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ যা মানুষের ঈশ্বরের কাছেও অত্যন্ত অভিপ্রেত। **'সমুদ্র-হৃদয়'** (১৯৯২) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রতিভা বসু উপন্যাসের চরিত্র সুলেখা তার বক্তৃতায় যে বক্তব্য রাখেন তা হল –

"বয়স বাড়া মানেই বড়ো হওয়া। বয়স বাড়ে নিজে নিজে। তার জন্য কোনো চেষ্টার দরকার হয়না। কিন্তু মন? মনের প্রসারের জন্য চাই সাধনা। মনকে বড় করতে হ'লে চেষ্টা করতে হয়, একাগ্র হ'তে হয়। আর মন বড় হ'লেই আমরা ভাবতে পারি, বুঝতে পারি, কাজে লাগাতে পারি। তারপর জোর গলায় বলতে পারি আমরা হিন্দু নই, মুসলমান নই, জাতের যুপকাষ্ঠে বলির পাঁঠা নই। আমরা মেয়েও নই, পুরুষও নই। সর্বপ্রথম আমরা মানুষ। বুকের মধ্যে আমরা আত্মাকে বহন করি। মনুষ্যত্বটাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো কথা, বড়ো সম্পদ।....মানুষের মনের ক্ষুধাটাই বড়ো ক্ষুধা। সেই ক্ষুধা কিসের জন্য? স্বাধীনতা!"

প্রকৃত জীবনবোধের জন্য চাই প্রকৃত শিক্ষা। ঔপন্যাসিক প্রতিভা বসু **'সমুদ্র-হৃদয়'** (১৯৯২) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র সুলেখার বক্তৃতায় যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন তা শুনে মনে হয় এই সংলাপে মানুষের যুগ-জীবন যন্ত্রণা,অমর্যাদা, বাক-স্বাধীনতা ইত্যাদির অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষের কোনো বিশেষ বয়ঃক্রমের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। কারণ বয়স বাড়ার জন্য কোনো চেষ্টা করার প্রয়োজন পড়ে না। সে তার নিজের ছন্দেই বেড়ে চলে। কিন্তু মনের প্রসারতার বৃদ্ধির জন্য মানুষকে মনুষ্যত্বের সাধনা করতে হয়। চেষ্টা করতে হয়। মানসিক বৃদ্ধির ক্রমউন্নয়ন মানুষকে সমাজের কাছে এক বিশেষ পরিচয়ে পরিচিত করে। সেই পরিচয়ের নাম 'ধার্মিক'। মানুষের মানসিক বৃদ্ধির সাথে মানুষের মানবিক ভাবনার পরিবর্তন ঘটে। মানুষ অনুভব করতে পারে যে – বিশেষ ধর্মের পরিচয়ে, মানুষ ধার্মিক পদবাচ্য হয়ে ওঠে না। বরং মানুষ যখন বিশেষ ধর্মের আড়াল থেকে বেরিয়ে, নারী-পুরুষ পরিচয় পর্যন্ত ত্যাগ করে, মনুষ্যত্বকে প্রাধান্য দিয়ে, নিজেকে শুধুমাত্র একজন মানুষের কাছে আর একজন মান-হুঁশ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে পরিচিত করাতে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং মনুষ্যত্বপূর্ণ মানুষের মত বাঁচতে চায়, তখনই সেই মানুষ প্রকৃত ধার্মিক রূপে নিজেকে প্রমাণিত করতে সক্ষম হতে পারে। মানুষ শুধুমাত্র প্রাথমিক চাহিদা অর্থাৎ

খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের হাত ধরেই বাঁচতে চায় না। কারণ সে পশুর জীবন নয়, মানুষের সাম্মানিক জীবনপ্রাপ্ত হতে আগ্রহী হয়ে থাকে। মানুষের পেটের থেকেও মনের ক্ষুধা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এই মনের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শর্ত হলো – স্বাধীনতা। মানুষের নিজস্ব স্বাধীনতার আনন্দ, মানুষকে অন্যের স্বাধীনতার আনন্দকে অনুভব করতে সহায়তা করে থাকে। এখানেই মানুষ পশুর থেকে স্বতন্ত্র অনুভূতির জীব হিসেবে প্রতিপন্ন হতে পারে। মানুষের এই স্বতন্ত্র অনুভূতির ভাবনার আলোকের সাথে একমত হয়ে ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী তাঁর **'তিনকাল'** (১৯৯৮) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র তারানাথের সুন্দর মানসিক ভাবনাকে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন –

"তারানাথ কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন, অমিতার কোল থেকে টুকুকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে তাকে সমুদ্র দেখাচ্ছেন, ওরা সচেতন ছিল না। উনি ভগবান-টগবান নিয়ে জীবনে কখনো বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হননি। পুজো-আর্চায় বিশ্বাসও করেন কিনা সন্দেহ। হঠাৎ বলে বসলেন, দিস ইজ গড।....আর তারানাথ সবাইকে শুনিয়ে বললেন, একেই তো ভগবান বলে। এই প্রকৃতি, এই সৌন্দর্য, এই রহস্য। হাসতে হাসতে বললেন, আগেকার দিনে এই তীর্থস্থানগুলো যারা বানিয়েছিল, তারা এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যেই ভগবানকে দেখেছিল। ঘিঞ্জি মন্দিরগুলোয় নয়। গঙ্গোত্রী, গোমুখ, অমরনাথ, দ্বারকা, কন্যাকুমারিকা, যেখানেই যাও পাহাড়পর্বত, নয়তো সমুদ্র। এতকাল পরে বাবার কথাগুলো কোনো দাগ কাটে না। মনে পড়ে জামাইবাবুর কথাগুলো। মানুষের রংও পাল্টে যায়। তার ওপর এক এক রকম আলো পড়লে..."

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ঔপন্যাসিকদের ধ্যান-ধারণার প্রতীক হলো প্রতিটি উপন্যাস। বিশ্বজনীন মানুষের প্রতিদিনকার জীবন যুদ্ধে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে মানুষ প্রকৃতপক্ষেই প্রকৃতি নির্ভর। এই লড়াইয়ের কোনদিন মৃত্যু নেই কারণ মানুষের বেঁচে থাকার ইপ্সা অন্তহীন। তাই মানুষ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই প্রকৃতিকে সর্বদাই প্রাধান্য দিয়েছে। নব বাস্তবতার সৃজনে প্রকৃতির হস্তক্ষেপ সর্বদাই হয়ে উঠেছে অনন্য ও সৃজনশীল। এমনকি ঔপন্যাসিকের **'তিনকাল'** (১৯৯৮) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী তাঁর উপন্যাসের চরিত্র তারানাথের প্রকৃতির সৌন্দর্য স্পর্শের মধ্যেই ঈশ্বর বা গডের আবিষ্কার করা, মানুষের প্রকৃতিগত সৃজনশীলতার সাম্মানিক দৃষ্টির স্বপক্ষে যেন সরব হয়ে ওঠা। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্থানগুলিই প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে ঈশ্বরের স্থান বা তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। যেমন গঙ্গোত্রী, গোমুখ, অমরনাথ, কেদারনাথ, বদ্রিনাথ, কন্যাকুমারিকা ইত্যাদি। উপন্যাসের চরিত্র তারানাথের শুধু নয়, হয়তো বেশিরভাগ মানুষেরই ঘিঞ্জি মন্দিরের

তুলনায় এইসব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্থানগুলিতে ঈশ্বরানুভূতির আবেগপ্রবণতা অনেক বেশি মাত্রায় প্রাঞ্জল হয়ে উঠতে পারে৷ কারণ যেকোনো স্বর্গীয় সৌন্দর্যের মধ্যেই ঈশ্বরের বাস বলেই বেশির ভাগ মানুষের বিশ্বাস বলা যেতে পারে৷ ঔপন্যাসিক মৃত্যুঞ্জয় মাইতির লেখা **'যখন বৃষ্টি নামল'** (১৯৯৮) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র মুক্তি উপন্যাসের আর এক চরিত্র স্বামীজীকে প্রশ্ন করল –

"ঈশ্বর আছেন, কি, নেই! তার রূপ কি? তিনি কি শিব, না কৃষ্ণ, না কালী - তাঁর প্রকৃত রূপটা কি? স্বামীজি কেন যেন হাসলেন৷ বললেন – ঈশ্বরের ইচ্ছা বলছি ঠিকই৷ এইসব কথা বলতেই আমরা আজও অভ্যস্ত৷ আসলে তাঁর কোন রূপ নেই৷ ঈশ্বর বিমুর্ত!"

ঔপন্যাসিক মৃত্যুঞ্জয় মাইতির লেখা **'যখন বৃষ্টি নামল'** (১৯৯৮) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র মুক্তি ও স্বামীজীর কথোপকথনের মাধ্যমে উপন্যাসিক ঈশ্বর ধারণার একটা স্পষ্ট চিত্র দেওয়ার চেষ্টা করেছেন৷ উপন্যাসের চরিত্র মুক্তির প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি সরাসরি বলছেন ঈশ্বর বিমুর্ত৷ যেকোনো সৌন্দর্যায়নের অন্তরস্থিত সৌন্দর্যের বোধটিই ঈশ্বর৷ তবে মানুষ নিজেদের ঈশ্বর উপাসনার সুবিধার জন্য ঈশ্বরকে মূর্তিতে কল্পনা করে নিতে চায়৷ কিন্তু ঈশ্বরসাধনার শীর্ষ স্তরে যখন মানুষ পৌঁছায়, তখন মানুষ প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই ঈশ্বর অনুভূতির মঙ্গলস্পর্শ অনুভব করতে সক্ষম হতে পারে৷ মুক্তি স্বামীজীকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিল – ঈশ্বর অনুভূতির স্তরগুলির ব্যাখ্যা কিরকম ভাবে করা যেতে পারে, তাতে স্বামীজি অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টির ব্যাখ্যা, উপন্যাসের চরিত্র মুক্তির সামনে তুলে ধরেছিলেন৷ তিনি মুক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, ঈশ্বর অনুভূতির তিনটি স্তর বর্তমান৷ প্রথম স্তরে, মানুষ দেবদেবীর মূর্তি কল্পনা করে, সেই মূর্তিকেই দেবতা বা ঈশ্বর বলে মেনে থাকে৷ এই বিষয়টি একই সাথে ভুল আবার ঠিকও৷ ভুল এই কারণে যে ঈশ্বরের বিশাল অনুভূতিকে, কোন এক মূর্তির মধ্যে কল্পনা করে, তাঁর আরাধনা করা সহজসাধ্য বিষয় হতে পারে না, বা সঠিক বিষয়ও হতে পারে না৷ কিন্তু এই মূর্তিপুজোরও এক সদর্থক প্রয়োজনীয়তা বর্তমান৷ এই মূর্তিপুজোর ফলেই মানুষের মন ঈশ্বরমুখী হয়, অথচ যে মূর্তি কল্পনা করে মানুষের মন ঈশ্বরমুখী হয়, সেই মূর্তি কিন্তু বাস্তবে ঈশ্বর নন৷ কিন্তু মানুষের মন ঈশ্বমুখী হয়ে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত যখন হয়, তখন মানুষ ঈশ্বর অনুভূতির দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছে যেতে সক্ষম হতে পারে৷ এই দ্বিতীয় স্তর হল ঈশ্বরকে নিজের মধ্যে অনুভব করা৷ বিবেকানন্দের মত অনুযায়ী বলা যেতে পারে 'সোহম্' - অর্থাৎ 'আমিই সে'। মানুষ যখন নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে বা ঐশ্বরিক গুণগুলিকে অনুভব করতে সক্ষম হতে পারে, তখন মানুষ ঈশ্বরের সাথে নিজেকে এক করে,

প্রকৃত ধার্মিকতার ধারক ধার্মিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে সক্ষম হতে পারে। সেই সময় মানুষের অন্তর আন্তরিকভাবে পবিত্র হওয়ার কারণে মন্দির, মূর্তি, পুজো-আর্চার আর কোনো দরকার পড়ে না। কারণ পবিত্র অন্তরই ঈশ্বর অনুভূতির বা ঈশ্বরের বাসভূমি। এই স্তরে মানুষ যে নির্মল আনন্দের স্পর্শ পেতে পারে, তা ঈশ্বরেরই ঐশ্বরিক অনুভূতির অনুভব। এই দ্বিতীয় স্তরের অনুশীলনের মাধ্যমেই মানুষ তৃতীয় স্তরের দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হতে পারে। তৃতীয় স্তর অর্থাৎ মানুষের মন ঈশ্বরের সঙ্গে যেখানে একাত্ম হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ মানুষ ও ঈশ্বর তখন সখা বা বন্ধু। যে বন্ধনের পরম শান্তি, অনির্বচনীয় অনুভূতির এক একাত্মবোধ ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরের সেই বন্ধুকে, এক অমৃতত্বে মিশে যেতে সাহায্য করতে পারে। তখন ঈশ্বর এবং ঈশ্বর বান্ধবের কোন পৃথক সত্তা থাকতে পারে না। এই আলোচনার দ্বারা প্রতিটি মানুষের মধ্যে না হলেও, পৃথিবীর কিছু মানুষের মধ্যে যদি এই ঈশ্বর অনুভূতির স্পর্শ এক অমৃতত্বের সন্ধান দিতে পারে, তাহলেই পার্থিব বা জাগতিক মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বের অবসান করতে তা সক্ষম হতে পারে। সমস্ত বস্তুর মধ্যেই স্বর্গীয় আনন্দের কণা বর্তমান। যা বহির্বিশ্বের সমস্ত বস্তুর মূল কেন্দ্রের চেতনাকে জাগ্রত করে পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকে একেশ্বরের আবর্তে বাধতে সক্ষম হতে পারে। **‘একদা এক’** (১৯৯৬) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় উপন্যাসের চরিত্র মোহনলালের ভাবনার প্রতিফলন তুলে ধরেছেন –

“ধর্ম! ধর্মের কোনো শক্তি নেই। ধর্ম মানুষকে সন্ন্যাসী করে লোকালয়ের বাইরে নিজের মুক্তি খুঁজতে পাঠায়। স্বামী বিবেকানন্দ একজন। সমাজের জন্যে মোক্ষ বিসর্জনে প্রস্তুত। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ও একজন। সঙ্ঘ নেই, গেরুয়া নেই, আশ্রম নেই। দক্ষিনেশ্বর থেকে কলকাতা। পথে পথে, গৃহে গৃহে ঘুরছেন। মানুষ তুমি মান্‌হুঁশ হও।”

উপরোক্ত উপন্যাসের তথ্য অনুযায়ী, উপন্যাসের চরিত্র মোহনলালের ভাবনার প্রতিফলন হল – প্রকৃতপক্ষে ধর্মের কোন এমন শক্তি নেই, যে শক্তিতে মানুষ নিজের অন্তঃস্থলের সুন্দর বিকাশের উপর নির্ভর করে, সমাজের জন্যে, মানুষের জন্যে, নিজের সমস্ত রকম সুখ ত্যাগ করতে পারে। কারণ সাধারণত মানুষ ধর্মের আশ্রয়ে নিজের মুক্তি অন্বেষণে, ধার্মিক জীবন কাটাতে উৎসাহিত হয়ে থাকে। সমাজের অন্য মানুষের মুক্তির বিষয়ে, সেই তথাকথিত ধার্মিক মানুষের পৃথকভাবে কোনো দায়বদ্ধতা সাধারণত থাকেনা। এই পরিস্থিতিকে ধর্মের দোহাই দিয়ে ‘ধার্মিকতা’ নাম দেওয়া সঠিক কাজ হতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব এমন এক জীবন যাপন করে গেছেন, যে জীবনে তাঁরা পথে-পথে

ঘুরেছেন, অন্যান্য মানুষের সর্বাঙ্গীণ মোক্ষের কারণে। সেইসময়ে তাঁদের নিজস্ব কোন সংঘ ছিল না, আশ্রম ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সন্ন্যাসীর জীবন কাটিয়েও কখনো গেরুয়া বসন ধারণ করেননি। তবুও তিনি ছিলেন অবতার পুরুষ। তিনি ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে প্রকৃত মান-হুঁশ সম্পন্ন মানুষ করার জন্যে, সারাটা জীবন সন্ন্যাসীর জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুযোগ্যা সহধর্মিনী মা সারদাও এই একই উপরোক্ত উপন্যাসে বলেছেন – খারাপের দিকেই মানুষের মন যায়। ভালোর দিকে যেতে হলে মনের কঠিন শক্তি চাই। সেই শক্তির ইন্ধনদাতারাই মানুষের প্রকৃত বন্ধু। এইরকম প্রকৃত বন্ধু হওয়ার জন্যে কোন সন্ন্যাসীর বেশ না ধরলেও চলতে পারে। সমাজের কিছু মানুষের অপচেষ্টার কারণেই সমাজ সুন্দর হয়ে গড়ে উঠতে অপারগ হয়। এই কারণেই সারা পৃথিবী বর্তমানে ধার্মিকতার নামে বিপর্যস্ত। প্রকৃত ধর্মভাবের অভাব, মানুষের মনোরোগী হয়ে ওঠার পেছনেও এক বিরাট পরোক্ষ ষড়যন্ত্র। ঔপন্যাসিক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস **'করোয়ার পানি'** (১৯৯৮) উপন্যাসে তিনি বাংলার পাঁচশ বছর আগেকার ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সমাজের ধর্ম ও সামাজিক পরিস্থিতি, অনেক সময় একে অপরের উপর এতটাই নির্ভরশীল যে, তারা একে অন্যের সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত থাকে। সেই বিষয়টিই নিম্নোক্ত উপন্যাসে খুব সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। –

"এবার বাংলা মুলুকের কথা। শ পাঁচেক বছর আগেকার ইতিহাস। গৌড় ছিল তখন বাংলা মুলুকের রাজধানী। – পূর্বদেশের সেরা সমৃদ্ধ নগরী।....সেদিন বাংলা মুলুকের মসিহা ছিলেন তুর্কি সুলতানেরা। তাঁদের খেয়াল খুশিতেই শাসিত হতো এ দেশ।....সেদিন বহু হিন্দু অভিজাত লোকেরা এগিয়ে এসেছিলেন সুলতানকে সাহায্য করতে। সুলতান এইসব হিন্দুদের উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে বহাল করেছিলেন মুলুক পরিচালনার কাজে। কিন্তু যাঁরা পোড়খাওয়া আর অভিজ্ঞ অভিজাত হিন্দু ছিলেন, তাঁরা সুলতানের কাছে থেকেও তেমন কাছাকাছি যেতেন না। বেশ খানিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন।....ভরসা রাখতেন না তুর্কি সুলতানদের উপরেও।....এঁরা জানতেন, কোনও সুলতানই তাঁদের মসিহা নন। তুর্কিদের এঁরা 'তুরুক' বলে অবজ্ঞা করতেন।"

ঔপন্যাসিক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় লেখা **'করোয়ার পানি'** (১৯৯৮) উপন্যাস থেকে বাংলার যে হিন্দু-মুসলিম ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যাচ্ছে তা থেকে সেই সময়কার হিন্দু-মুসলিমের মধ্যেও যে চিরাচরিত ধর্মবিরোধিতা উঠে এসেছে তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। হিন্দু ও ইসলামের সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে, হিন্দুরা যবনদের বশীভূত হওয়া সত্বেও যবনদের দ্বারা প্রভাবিত হতে চাইতেন না। আবার

এই সময়েই ঔপন্যাসিক, তাঁর উপন্যাসে মুসাফির হরিদাসের প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন। হরিদাস ইসলাম ধর্মের মানুষ হয়েও হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। মুলুকপতি এই খবর পেয়ে, হরিদাসকে পাইক দিয়ে ধরে তাঁর দরবারে হাজির করেছিলেন। দরবারে বসিয়ে ভালো করে বুঝিয়ে বলেছিলেন, কাফেরদের ধর্ম হরিদাসকে ত্যাগ করতে হবে। কারণ তাঁরা হিন্দুদের ঘৃণা করেন। হিন্দুদের তাঁরা কাফের মনে করেন। উত্তরে হরিদাস বলেছিলেন – ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন। প্রত্যেক মানুষেরই ঈশ্বরকে যেকোনো নামে আরাধনা করার অধিকার আছে। তাই তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছে মতই ঈশ্বর ভজনা করবেন। মুলুকপতি তখন হরিদাসকে হরিনাম ত্যাগ করার জন্য জোর করলেন। হরিদাস তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। ফলে অত্যন্ত শাস্তি তাঁর জন্য মুলুকপতি বরাদ্দ করলেন। তবুও যবন হরিদাসকে হরিনাম করা থেকে বিরত করা যায়নি। প্রচুর মুসলমান, তুর্কিদের কষ্টকর শাসনব্যবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। যদিও শাস্ত্রজ্ঞদের মতানুযায়ী হিন্দু ধর্মে প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ কিন্তু হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করা অনেক সহজ। হরিনাম সংকীর্তনের দ্বারা বৈষ্ণব প্রেম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া কঠিন কাজ ছিলনা। হরিদাস হিন্দুদের মধ্যে যেমন নতুন করে কৃষ্ণপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিলেন, তেমনি মুসলমানদের হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতেও উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থায়, মুসলমান মুলুকপতিদের হাত থেকে হিন্দুদের ও মুসলিমদেরও রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে ‘ধর্ম’-এর নামে হিন্দু কৃষ্ণপ্রেম, নামসংকীর্তন এক বিরাট হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। এভাবে মুসলমান তুরুকদের বিরুদ্ধে এক মুসলমান, যিনি পরবর্তীকালের বিখ্যাত বৈষ্ণব হরিদাস নামে পরিচিত হয়েছিলেন, তিনি এগিয়ে এসেছিলেন সমাজের মানুষের মধ্যে মানবিকতার ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। যা সেই সময়েও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে খুব ধীর লয়ে বিশ্বভাতৃত্ববোধের প্রতিষ্ঠা করতে এক সদর্থক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহের **‘সারেং মিঞা’** (১৯৯২) উপন্যাসের নিম্নোক্ত প্রাপ্ত তথ্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে বর্তমান গবেষকের মনে হয়েছে। ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের চরিত্র সারেং মিঞা, উপন্যাসের আর এক চরিত্র হোসেনকে বলছেন –

“এ দুনিয়াই যে একমাত্র দুনিয়া নয়, জান্নাতও আছে, জহান্নমও আছে একথা বোধ হয় এরা জানে না! আল্লার কাছে হিন্দু মুসলমান কেরেস্তান নেই। ভালো মানুষ আর খারাপ মানুষ। ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষ আর অবিশ্বাসী মানুষ এই দুই ভাগ।”

‘সারেং মিঞা’ (১৯৯২) উপন্যাসটিতে উপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহ, ঔপন্যাসিক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের **‘করোয়ার পানি’** (১৯৯৮) উপন্যাসটিকে যেন সমর্থন করেই উপরোক্ত কথাগুলি তাঁর উপন্যাসের চরিত্র সারেং মিঞার বয়ানে বলিয়েছেন। ইসলাম ধর্মে ‘আল্লা’ এমন এক উপস্থিতি যাঁর কাছে, ধর্মের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কোনও বিভেদ নেই। বিভেদ শুধু মানুষের চারিত্রিক গুণে হয়। তাই ইসলাম ধর্মাবলম্বী সারেং মিঞা অবলীলায় হোসেনকে বলতে পারেন আল্লার কাছে হিন্দু, মুসলমান, কেরেস্তান নেই। আল্লার কাছে মানুষের মাত্র দুটি ভাগ – ভালো মানুষ আর খারাপ মানুষ এবং ‘ঈশ্বর-বিশ্বাসী’ মানুষ আর ‘অবিশ্বাসী’ মানুষ। লক্ষ্য করার মতো বিষয় হচ্ছে, ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষ অর্থাৎ যে মানুষ ঈশ্বরকে অথবা ঐশ্বরিক গুণগুলিকে বিশ্বাস করে, নিজের মধ্যে গ্রহণ করে, প্রকৃত ধার্মিক হয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় রত থাকেন। আর একদল মানুষকে সারেং মিঞা শুধুমাত্র ‘অবিশ্বাসী’ মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ যে মানুষের মধ্যে বিশ্বাসের অনুপস্থিতি থাকে, সেই মানুষ প্রকৃতপক্ষে নিজেকেও বিশ্বাস করতে অপারগ হয়ে উঠতে পারে। তাই সে অবিশ্বাসের কর্মগুলি অতি সহজেই করতে সক্ষম হতে পারে। তাই বর্তমান গবেষকের মনে হয়েছে ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহ খুব সচেতনভাবেই ‘ঈশ্বর অবিশ্বাসী-র পরিবর্তে শুধুমাত্র ‘অবিশ্বাসী’ মানুষ বলে, মানুষের চরিত্রগত বিভক্তিকরণের দ্বিতীয় ভাগকে উল্লেখ করেছেন। ঔপন্যাসিকের এই সচেতনতা সমাজের মানুষদের মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত করতে উদ্যোগী হতে পারে যা বর্তমান সমাজের ধর্মীয় সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে বর্তমান গবেষক মনে করেছেন। মানুষের দেহঅস্তিত্বের সাথে সাথেই মানুষের মানসিক অস্তিত্বও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টিকেই যেন সমর্থন করছেন ঔপন্যাসিক চিত্তরঞ্জন মাইতির লেখা **‘সোনিয়া অগ্নিহোত্রী’** (২০০০) উপন্যাস। ঔপন্যাসিক চিত্তরঞ্জন মাইতির লেখা **‘সোনিয়া অগ্নিহোত্রী’** (২০০০) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র বিদিশা নাভাল তাঁর নষ্টমেয়ে হয়ে যাওয়ার বিষয়টি অসংকোচে, কোনরকম গোপনতার আশ্রয় না নিয়েই সৌম্য পুরোহিত আনন্দতীর্থকে জানিয়েছিলেন। উপন্যাসের আর এক চরিত্র পুরোহিত আনন্দতীর্থ, তিনি, যে ধর্মসমর্থিত, দেহতত্ত্বজনিত উপদেশ বিদিশা নাভালকে দিচ্ছেন, তা অনেকক্ষেত্রেই মানুষের দেহঅস্তিত্বের সাথে সাথে মানুষের মানসিকতাকেও মার্জনা ও শুদ্ধ করার পক্ষে সমর্থনযোগ্য বলা যেতে পারে।

“অস্তিত্বের জন্যই দেহকে রাখতে হয়। দেহ জীবনকে ধারণ করে। মনের উত্তরণ, পরমাত্মার অন্বেষণ, সবই এই দেহ-নির্ভর জানবে। তবে দেহকেই সর্বস্ব বলে ভাবতে নেই। দেহ, দেবতার লীলাভূমি। তাকে মার্জনা করা, শুদ্ধ করা তোমার দায়িত্ব। নাভাল আবার বলল, আপনি ভরসা দিচ্ছেন মহারাজ, এই পাপ দেহ ধীরে ধীরে শুদ্ধ হয়ে আসবে?সেই সৌম্য পুরোহিতের মুখে প্রসন্ন হাসি দেখা দিল। তিনি বললেন, এখুনি গঙ্গার স্রোতে একতাল কাদা গুলে দাও, দেখবে হঠাৎ স্বচ্ছ জল ঘোলাটে হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখবে, জল একেবারে নির্মল, কাদার চিহ্নমাত্র নেই। বহতা জীবনও তাই, ময়লা তার ওপর চিরস্থায়ী দাগ রাখতে পারেনা। একদিন সব ময়লা জীবনের স্রোতে ধুয়ে মুছে, ভেসে চলে যায়।”

ঔপন্যাসিক চিত্তরঞ্জন মাইতির **‘সোনিয়া অগ্নিহোত্রী’** (২০০০) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের খুব সুন্দরী তরুণী বিদিশা নাভাল, কোনরকম গোপনতার আশ্রয় না নিয়েই অসংকোচে, সর্বসমক্ষে যখন পুরোহিত আনন্দতীর্থকে বলছেন – ‘আমি যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছি মহাত্মা।’ তখন তার উত্তরে পুরোহিত আনন্দতীর্থ খুব শান্ত ও সুন্দরভাবে বলেছিলেন – ‘এই বোধ যখন এসেছে তখন সব পচনই পূর্ণ হয়ে যাবে।’ কারণ তাঁর মতে, পাপ স্বীকার করা, পাপ নিরাময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধ বলা যেতে পারে। তিনি উদাহরণ হিসেবে বলেছিলেন, গঙ্গার স্রোতে একতাল কাদা গুলে দিলে, কিছুক্ষণের জন্য সেইজায়গার জল ঘোলা হয়ে গেলেও, কিছুক্ষণ পরেই আবার সেই বহতা জল নির্মল,পরিষ্কার ও পবিত্র হয়ে যায়। তখন সেই কাদার অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ঠিক সেভাবেই মানুষের জীবনের প্রবাহমানতায়ও অনেক সময়েই, অনেক খারাপ পরিস্থিতি উপস্থিত হয়, যা জীবনকে কিছুক্ষণের জন্য হয়ত ময়লা বা অপবিত্র করতে সমর্থও হয়। কিন্তু জীবনের গায়ে কোন চিরস্থায়ী দাগ রেখে যেতে পারে না। কারণ সমস্ত অপবিত্রতাই জীবনের সদর্থক ভাবনার স্রোতে ধুয়েমুছে ভেসে যায়। জীবন আবার পবিত্র সুন্দর ও নির্মল হয়ে ওঠে। কারণ বহতা জীবনে দেহঅস্তিত্বের সাথে সাথে দেহস্থিত পবিত্র মনের সদর্থক ভাবনার স্রোত, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলা যেতে পারে। কারণ যেকোনো মানুষের মনের মধ্যে পবিত্রবিশ্বাসের সচেতনতা জাগ্রত হলেই, মানুষ অবিশ্বাসের অপবিত্র কর্ম থেকে অব্যাহতি পেতে পারে, কারণ মানুষের মনের পবিত্রতা, সমগ্র একটি মানুষের এক গুণগত চারিত্রিক গুণ হিসেবেই বিবেচ্য হতে পারে। যা মানুষকে বারবার জীবনের পবিত্র পথের সন্ধান দিতে পারে। মানুষকে প্রকৃত ধার্মিকতার পথে চালিত করতে সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। **‘ধর্মের গ্রহণ’** (১৯৯২) উপন্যাসে উপন্যাসিক আবুল বাশার তাঁর উপন্যাসের চরিত্র অলক এবং বেলালের কথোপকথনের মাধ্যমে, ইসলাম ধর্মের এক বিশেষ ধর্মীয় দিককে তুলে ধরেছেন, যা

– মানুষের মন, মানুষের ধার্মিকজীবনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, সেই দিককেই নির্দেশ করছে। উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র অলক খুব সচেতনতার সঙ্গেই বেলালকে বলে–

"পৃথিবীর সকল ধর্মের চেয়ে ভালোবাসা বড়....বেলাল ফিরে এলো গাঁয়ে।.... তার মনের মধ্যে জিরাফ-সদৃশ যে শূন্যতা আছে, তা আরো বাড়তে লাগল। সেই শূন্যতা আকাশ-প্রমাণ। তা আকাশ ছাড়িয়ে নক্ষত্রলোকে ব্যাপ্ত হয়েছে। নক্ষত্রলোক ছাড়িয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে। এই নিরাকার বিশালতাই কি ঈশ্বর? রাত্রির আকাশে চেয়ে থাকতে থাকতে বেলালের মন কেমন করে। এই মন কেমন করাই কি ঈশ্বরের অনুভূতি? খোদার একশ একটি নাম। কিন্তু আকাশ অতিক্রান্ত এই বিশালতা যেন ওই শতাধিক নামকে ছাপিয়ে অন্য এক ব্যাপ্তিকে বোঝায়, এ ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বরের কথা ভাবতে পারেনা বেলাল। এই ব্যাপ্তির না আছে নাম, না আছে বিশেষ্য-বিশেষণ – এ কোন গুণবাচক বা দোষবাচক পদার্থ নয়। ক্ষুদ্র মানুষের মন এই ব্যক্ত নিরাকার অনন্ত নিঃসীমতার মধ্যে বেশিক্ষণ ভেসে থাকতে পারে না"

'ধর্মের গ্রহণ' (১৯৯২) উপন্যাসে উপন্যাসিক আবুল বাশার তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসের চরিত্র অলকের বয়ানে বলেছেন – পৃথিবীর সকল ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা বড়, ভালোবাসা। ভালোবাসায় সম্পৃক্ত মানুষ মানবিকতার আবেশে বিত্তবান হন। মানুষের জন্ম অনুযায়ী যে ধর্ম প্রাপ্তি ঘটে, সেই ধর্ম অনুসরণ করা যদি সেই ব্যক্তির ভালো না লাগে, তাহলেও তার মানসিক বৃত্তিগুলির বিকাশে কোন ঘাটতি নাও হতে পারে। যেমন বলা যেতে পারে – ধর্ম মানুষের মধ্যে সহিষ্ণুতা,দয়া,মায়া,মমতা ইত্যাদি বৃত্তিগুলির সৃষ্টি নাও করতে পারে অথচ মানুষের মধ্যে কোন বিশেষ ধর্মকে মানার প্রবণতা না থাকা সত্বেও – সহিষ্ণুতা, দয়া, মায়া, মমতার এই বৃত্তিগুলির উপস্থিতি থাকলেও থাকতে পারে। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে এখানেও এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল – মানুষের মন। **'ধর্মের গ্রহণ'** (১৯৯২) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র বেলাল, রাতের অন্ধকারের নিরাকার আকাশের নক্ষত্রলোকের দিকে তাকিয়ে, আদিগন্ত আকাশ-প্রমাণ শূন্যতার নিরাকার বিশালতাকেই 'ঈশ্বর' নাম দেয়। এই আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বেলালের যে মন কেমন করার অনুভূতি অনুভব হয়, বেলালের মনে হয়, একেই কি 'ঈশ্বরানুভূতি' নাম দেওয়া যায়! ইসলাম ধর্মে আল্লার একশো একটি নাম আছে। কিন্তু বেলালের মনে হয়, আদিগন্ত আকাশ-প্রমাণ শূন্যতার নিরাকার এই বিশালতা, সেই শতাধিক নামকেও অতিক্রম করে যেন অন্য এক ব্যাপ্তিকে নির্দেশ করে যা ঈশ্বরেরই নামান্তর। এই ব্যক্তির কোন নাম, কোন বিশেষ্য, কোন বিশেষণ, কোন গুণবাচক বা দোষবাচক পরিচয়, কিছুই এই ব্যাপ্তিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে না। এই ব্যাপ্ত নিরাকার অনন্ত

নিঃসীমতার মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার যে আনন্দ, সেই আনন্দ প্রকৃতপক্ষে অব্যক্ত। কারণ সেই আনন্দ ব্যক্ত করার ভাষা আয়ত্ত করা বেশিরভাগ মানুষের পক্ষেই সম্ভব নাও হতে পারে। মানুষের মন শুধুমাত্র তাঁকে অনুভব করতে পারে। মানুষের মনের এই প্রেমানুভূতি এতটাই শক্তিশালী। যা সাধারণত যে কোনো ধর্মের ঊর্ধ্বে। **'চাঁদের অমাবস্যা'** (১৯৯৫) উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্, উপন্যাসের চরিত্র কুদ্দুসের দাদা সাহেব, কুদ্দুসকে ইসলাম ধর্মের কিছু উপদেশ দান করছেন যা কুদ্দুসের কাছে ইসলাম ধর্মের বিষয়গুলিকে সহজ করে তোলে।

"খোদাকে কখনো ভুলতে নাই, বিশেষ করে যখন কেউ তাঁর অসীম দানশীলতায় শরিক লাভ করে। নিঃস্বার্থতা, ত্যাগশীলতা এবং আত্মসংযম ধর্মের গোড়াঘাট। সে-সব গুণ ছাড়া দুনিয়ার কোনো সংগ্রামে তো জয়ী হওয়া যায়ই না, ক্ষমাশীল অসীম দয়াবান খোদারও প্রিয়পাত্র হওয়া মুশকিল।....সুন্নার নির্দেশ হলো, সদালাপের সঙ্গেই ক্ষুধানিবৃত্তি করা উচিত। সদালাপের জন্যে ধর্মতত্ত্বের চেয়ে আর কোন বিষয় বেশি উপযুক্ত?"

ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্-এর **'চাঁদের অমাবস্যা'**(১৯৯৫) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র কুদ্দুসের দাদাসাহেব, বড়বাড়ির প্রধান মুরুব্বী ছিলেন। পাঁচবছর আগে তিনি দেশের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সারাজীবন সরকারি চাকরি করেছেন। কিন্তু চাকরিতে তাঁর কখনোই মন ছিল না। তার এক বিশেষ কারণ ছিল। তিনি চাকরিজীবনে সুখী ছিলেন না। চাকরিজীবনের সময়টা তাঁর পরাধীনযুগে কেটেছে। কিন্তু পরাধীনতার অপমান তাঁকে ততটা কষ্ট দিতে পারেনি, যতটা কষ্ট তাঁকে তাঁর বিধর্মীয় মনিব দিয়েছেন। তাঁর সেই বিধর্মীয় মনিব, তাঁর প্রিয় ধর্মের প্রতি প্রকাশ্যভাবে কোন বিরোধিতা বা অবজ্ঞা প্রকাশ না করলেও, তিনি সেই বিধর্মীয় মনিবের, তাঁর ধর্ম সম্পর্কে বিরোধিতা, অবজ্ঞা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতেন। যা তাঁকে অত্যন্ত পীড়া দিতো। তিনি ছিলেন একজন সাচ্চা মুসলমান। তাই তিনি খাবার খাওয়ার সময়ে, তাঁর নাতিদের ইসলাম ধর্মের নিয়মাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত করাতে চাইতেন। ইসলাম ধর্মানুযায়ী, সুন্নার নির্দেশানুযায়ী, খাওয়ার সময় সদালাপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। তাই তিনি ইসলাম ধর্মের ধর্মতত্ত্বকে উৎকৃষ্ট সদালাপ হিসাবে খাওয়ার সময়ে আলোচনা করতেন। ইসলাম ধর্মে খোদাকে কখনো বিস্মৃত হতে নেই। ইসলাম ধর্মের উৎকৃষ্ট গুণগুলি হল – নিঃস্বার্থতা, ত্যাগশীলতা ও আত্মসংযম। এই গুণগুলির দ্বারাই পৃথিবীর যেকোন যুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভব হতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। মানুষের মধ্যে এই গুণগুলি না থাকলে খোদারও প্রিয়পাত্র হওয়া যায়না। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

প্রতিটি নামাজকে কাজা (স্বর্গীয়) হতে হবে। আর একেবারে নামাজ না পড়া ইসলাম ধর্মে কল্পনাতীত বিষয়। এছাড়া 'বিসমিল্লাহ্' বলেই প্রত্যেক ইসলাম ধর্মাবলম্বীকে খেতে বসে মুখে 'লোকমা' (খাবারের গ্রাস)তুলতে হবে। এছাড়া ঈমানের অর্থ, কোরান-পাঠ ও হাদিস-সুন্নার প্রয়োজনীয়তা, তসবি-পড়ার উপকারিতা, নফল (ঐচ্ছিক ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম) নামাজের কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়েও দাদাসাহেব তাঁর নাতিদের অবগত করাতেন। এভাবে তিনি বাড়ির সম্পূর্ণ পরিবেশকে একটি ধর্মীয় বাতাবরণের দ্বারা প্রাঞ্জল করে তোলার চেষ্টা করতেন। ধর্মীয় উপদেশের বাতাবরণে বাড়ির প্রতিটি সদস্যের মধ্যে, মানবিক গুণগুলিকে প্রবিষ্ট করে, প্রত্যক্ষভাবে তাদেরকে ইসলাম ধর্মে আগ্রহী করে তুলতে চেয়েছিলেন। ঔপন্যাসিক বেদুইনের লেখা **'মির্জা গালিব'** (১৯৯৮) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র গালিবের স্ত্রী উমর বেগম ও গালিবের কথোপকথনে নানান ধর্মের উপাস্যের মধ্যের মিলকে উল্লেখ করেছেন –

"তুমি ভুল করছ মিঞা। আল্লাহতালা এক, আর সর্বত্র তার রহম। হাসতে হাসতে গালিব বলল, সবই ঠিক। হিন্দুর ভগবান আর মুসলমানের আল্লাহ তো আলাদা নয়। ওরা বলে ভগবান সর্বত্র বিরাজ করে। আমাদের কেতাবও বলে আল্লাহ তো আলাদা নয়। ওরা বলে আল্লাহ সর্বত্রই বিরাজ করে। আবার ইসাইরা তাদের গুরু যীশুকে মনে করে ভগবানের সন্তান, আমরা মনে করি হযরত মহম্মদকে আল্লার পয়গম্বর, হিন্দুরাও তাদের সাধুসন্তদের ঈশ্বরের বরপুত্র মনে করে। অথচ আমরা লড়াই করতে কসুর করি না। উমর বেগমও হেসে বলল, মিঞা, ওটা হল মানুষের অপশিক্ষা। যেভাবেই খোদার উপাসনা কর, তাঁর করুণা মানুষ পেয়ে থাকে।"

ঔপন্যাসিক বেদুইন তাঁর **'মির্জা গালিব'** (১৯৯৮) উপন্যাসে উপন্যাসস্থিত চরিত্র মির্জা গালিব এবং গালিবের স্ত্রী উমর বেগমের কথোপকথনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম ও ইসাইয়ের ধর্মগুলির মধ্যে যেন এক সদর্থক সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন। গালিবের স্ত্রী উমর বেগমের উক্তি – 'আল্লাহতালা এক আর সর্বত্র তাঁর রহম', এই বাক্যটির মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদকে তিনি সমর্থন করেছেন এবং পৃথিবীর সর্বত্র, সেই একেশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট হচ্ছে বলে যেন ঘোষণা করছেন। উত্তরে মির্জা গালিব হিন্দুর ভগবান ও মুসলমানের আল্লা পৃথক নন এবং তাঁরা সর্বত্রই বিরাজিত বলে সমর্থন করেছেন। আবার তিনিই ইসাই বা খ্রীষ্টানের যীশুকে, ঈশ্বরের বরপুত্র বা ভগবানের সন্তান বলেও স্বীকার করেছেন। ইসলামের মহম্মদকেও তিনি আল্লাহর পাঠানো দূত বা পয়গম্বর বলেই মানেন। তাঁর মতে হিন্দুরাও তাদের সাধুসন্তদের ঈশ্বরের বরপুত্র বা অবতার মনে করেন। ফলে এর থেকে বলা যেতে পারে যে, মির্জা গালিব হিন্দু, ইসলাম ও খ্রীষ্টান সকল ধর্মের আরাধ্যকেই

সমমর্যাদাময় বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই তাঁর মতে প্রত্যেক ধর্মের আরাধ্য যদি একই হয়, তাহলে পৃথক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এত মতানৈক্য হওয়ার কারণ থাকা বাস্তবসম্মত ও সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। তিনি উমর বেগমের কাছে আক্ষেপ করেই বলেছেন, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের কাছে নিজস্ব আরাধ্য ও অন্যান্য ধর্মের আরাধ্য সম্পর্কে মতপার্থক্য না থাকা সত্বেও অনেক সময়েই, ধর্মগুলির মতাবলম্বীদের মধ্যে মতানৈক্য বা লড়াই চলতেই থাকে। উমর বেগম, মির্জা গালিবের এই উপরোক্ত মতের সমর্থনে বলেছেন – বিষয়টি অপশিক্ষার প্রকাশ, কারণ যেভাবেই উপাস্যকে মানুষ উপাসনা করুক না কেন, উপাস্য সর্বদাই তাঁর সন্তানদের করুনার দৃষ্টিতেই দেখে থাকেন। ফলে বলা যেতে পারে যে, মির্জা গালিবের বহু রচনায়, গালিব প্রত্যেক ধর্মের উপাস্যকেই প্রধানশক্তিরূপেই স্বীকার করেছেন। তবে একথাও ঠিক, ধর্মের নামে অনাচার, অত্যাচারের গালিব তীব্র নিন্দাও করেছেন। কোন কোন সময়ে বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে, কঠিন প্রতিবাদও করেছেন। মানুষের জন্য তিনি, এমন এক জান্নাত বা স্বর্গের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে চির আনন্দের, হিংসা-দ্বেষহীন আলোর অবাধ যাতায়াত থাকবে। গালিবের কাছে জীবনের অর্থ, সুস্থ জীবন নিয়ে জীবনের দায়িত্ব পালন করা। আর সবকিছুই তাঁর কাছে অবাস্তব ছিল। ঔপন্যাসিক বেদুইনের লেখা **'মির্জা গালিব'** (১৯৯৮) উপন্যাসটির থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী যে নির্যাস পাওয়া গেল, তা থেকে বলা যেতে পারে যে ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সুচারুভাবে তাঁর উপন্যাসে বিশ্বভাতৃত্ববোধের বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হতে পারেন। কারণ উপন্যাসের চরিত্র মির্জা গালিব, হিন্দু-মুসলিম-খ্রীষ্টান সকলের উপাস্যকেই সমাদরের দৃষ্টিতে, পক্ষপাতশূন্য হয়ে দেখে, যে উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা এই বিশ্বায়নের যুগে, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধকে জাগ্রত করে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। ঔপন্যাসিক ডঃ দীপক চন্দ্রের **'উপেক্ষিতা শূর্পণখা'** (১৯৯৪) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র দূষণের চিন্তাধারায় রাবণের যে কথাগুলি দূষণের কানে ঝংকার তুলছিল তা হ'ল –

"জাতিত্ব মরে গেলে, ধর্ম গেলে একজন মানুষ কোন পরিচয় নিয়ে বাঁচবে?....এই মানুষদের কি দাম দিচ্ছে মহান মানবধর্ম?....মানুষের পরিচয় মানুষ নামে নয়, তার একটা জাতি পরিচয়, ধর্ম পরিচয়, সামাজিক পরিচয় এবং পিতৃ পরিচয় আছে। সেই পরিচয় নিয়ে তাকে বাঁচতে হয়। এই পরিচয়টাকে যে রক্ষা করতে না শেখে মানুষ হিসেবে সে বাঁচতে শেখেনি।"

‘উপেক্ষিতা শূর্পণখা’ (১৯৯৪) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র দূষণের চিন্তাধারা অনুযায়ী, মানুষের জীবনে ধর্ম আর ঈশ্বরের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। মানুষের পরিচয় শুধুমাত্র তার নামের মধ্যে নিহিত থাকে না। মানুষের জাতি, ধর্ম, সামাজিক ও পিতৃপরিচয়ও থাকে। সমাজে এই সমস্ত পরিচয়গুলি একসাথে একজন মানুষের ‘যথার্থ পরিচয়’ হয়ে ওঠে। তখন সেই যথার্থ পরিচয়রূপ পরিচয়কে সম্বল করেই সমাজে তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন যথার্থ মানুষ হিসেবে এই যথার্থ পরিচয়কে রক্ষা করার জন্য মানুষকে কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়ম নীতি অনুসরণ করে চলতে হয়। এই সামাজিক এবং ধর্মীয় নীতিগুলি মানুষের জীবনে ঈশ্বররূপ ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়। নীতিহীন মানুষ যেমন ধর্মকে আঁকড়ে বাঁচতে পারে না, ঠিক তেমনই ধর্ম কখনও নীতিহীন হতে পারে না, একথা বলা যেতে পারে। তাই মানুষের যথার্থ পরিচয়ের মধ্যেই মানুষের জাতি, ধর্ম, সামাজিক ও পিতৃ পরিচয় প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিটি পরিচয়ই দেশ, জাতি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির সাথে অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। মানুষ যদি যথার্থ পরিচয়ের হাত ধরে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে চায়, তাহলে তাকে নিয়ম-নীতির সাথে গাঁটছড়া বাঁধতেই হবে, এ কথা বলা যেতে পারে। নিয়ম-নীতি সম্পন্ন মানুষ, ঈশ্বরের সাথে পরিচিত হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে, কারণ নিয়ম-নীতি সম্পন্নতাকে, ঈশ্বরের ঐশ্বরিক গুণরূপে মানুষই স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই নিয়ম-নীতি সম্পন্ন মানুষের মধ্যে, ঐশ্বরিক অংশ হিসেবে মানবতার বাস একথা স্বীকার করাই যেতে পারে। মানুষের মধ্যেই মানবতার প্রকাশকেই ‘মানবিক ধর্ম’ রূপে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এই মানবিক ধর্ম মানুষের মনুষ্যত্বের দ্বারা প্রতিটি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। যা বিশ্বভাতৃত্ববোধের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা অর্জন করতে সক্ষম হতে পারে।

দ্বিতীয় পর্ব (সময়কাল : ২০০১ – ২০১০)

ইতিহাস

সাহিত্য সমাজের আয়না। তাই দেশ, সময়, সমাজ বারংবার প্রতিবিম্বিত হয়, সচেতন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে। আত্মনিমগ্ন ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মাধ্যমেই সমাজের সমসাময়িক সমস্যাগুলিকে উপস্থাপন করে, ক্রমে সমাজ সচেতন ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠেন। সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সমস্যাগুলি ঔপন্যাসিককে সামাজিক দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। অন্ধকার থেকে আলোর পথে, নতুন জীবন-উত্তরণের কারণে, প্রকাশিত হয় সমাজের ইতিহাস। তাই সময়ের প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সাথে সাথে ঔপন্যাসিকের উপন্যাস রচনায়, ঔপন্যাসিকের নিজস্ব ভূমিকাও পরিবর্তিত হতে পারে। তাই সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের ইতিহাসে ঔপন্যাসিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সভ্যতার মহরৎ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের জীবনের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্তমান। ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পরিবর্তনের ইতিহাসকে ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের সৃষ্ট উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই উপন্যাসগুলির মাধ্যমে সমাজের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চিত্র খুব প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। 'ইতিহাস বিশ্লেষণ'-এর আর এক নাম 'অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ'ও বলা যেতে পারে। সমাজে স্থিত হতে হলে, সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে বসবাস করতে হলে, সমাজের কিছু নিয়ম-নীতি বা অনুশাসন সমাজের মানুষকে অনেক সময়ে মেনে চলতে হয়। সমাজের অনুশাসন সর্বদা মঙ্গলময় হয়ে উঠতে না পারলেও তা সাধারণত সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশ বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, যা মানুষের জীবনবোধকে মঙ্গলময় করে তোলার প্রচেষ্টা করে থাকে। কিন্তু যখন সমাজের সেই অনুশাসন সত্য-শিব-সুন্দর সম্পৃক্ত হয় না, তখন সেক্ষেত্রে সেই অনুশাসনের প্রতিবাদ করার অধিকার প্রতিটি সমাজবদ্ধ মানুষেরই আছে। সামাজিকহেতুর নিরিখেই সতীদাহ, ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন, বাল্যবিবাহ, স্ত্রীলোককে অশিক্ষিত করে রাখার কুপমন্ডুকতা ইত্যাদি সবই তীব্র প্রতিবাদের বিষয়বস্তু। উনবিংশ শতকে সাদায়-কালোয় মেশানো এক কালপর্ব। এই কালপর্বের একদিকে বাবু-কৃষ্টি, অপরদিকে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে অতন্দ্র সাধনার প্রয়াস। বিবর্তনের ফল্গুধারায় উপন্যাসে, ঐতিহাসিক কালপর্বের পরিচয় খুব সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। কালের নিরিখে, সমাজের মানুষের বিচিত্র জীবনবোধকে

অনুভব করার জন্য উপন্যাস এক বিরাট উপাদান। সময়-অভিজ্ঞতাকে লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করার শরিক হলেন সাহিত্যিকেরা। উপন্যাস রচনার মাধ্যমে ঔপন্যাসিকেরা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের দলিলরূপ উপন্যাসের দ্বারা, সমাজের মানুষকে ইতিহাস-জ্ঞানপুষ্ট করে তুলতে সহায়কের ভূমিকা পালন করে থাকেন। ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যাল রচিত **'রূপমঞ্জরী (তৃতীয় খন্ড)'** (২০০৫) উপন্যাসে তিনি এমনই এক ইতিহাসের দলিল তুলে ধরেছেন। ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যাল তাঁর উপন্যাসের চরিত্র শঙ্করাচার্য, উপন্যাসের আর এক চরিত্র উভয়ভারতীকে বিচার্য শাস্ত্রের নির্বাচন-অধিকার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার ক্ষেত্রে শঙ্করাচার্য নীরবে সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকেন। তখনো উভয়ভারতী শঙ্করাচার্যকে বলেন –

"উভয়ভারতী পুনরায় বলেন, আপনি বিবেচনা করে দেখুন মহর্ষি : আপনার সিদ্ধান্ত যদি সমগ্র ভারত নির্বিচারে গ্রহণ করে তাহলে শতাব্দীকালের মধ্যে ভারতবর্ষে মনুষ্যপ্রজাতি অবলুপ্ত হয়ে যাবে। থাকবে শুধু মনুষ্যেতর প্রাণী –শ্বাপদসঙ্কুল সে অরণ্য অনিবার্যভাবে প্রাগ্‌মানবযুগে প্রত্যাবর্তন করবে। কারণ অন্যান্য জীবনে আপনি আপনার মূল তত্ত্ব – 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা' এ মত গ্রহণ করাতে পারবেন না। বিবেচনা করে দেখুন, মহাভাগ! 'ব্রহ্ম সত্য' এ মন্ত্র আছে শুধু আপনার মননে, আপনার ধীশক্তিতে, ধ্যানে। 'জগৎ' মিথ্যাই হোক আর মায়াই হোক – সে মিথ্যা বা মায়া সৃজন করেছেন সেই ব্রহ্মই। নয় কি? এ 'মায়া দোলা' তাঁরই – জীবের সৃষ্ট নয়। পূর্বমীমাংসা দর্শনের চতুরাশ্রম পথেই শুধু মানব প্রজাতি বিবর্তনপথে অগ্রসর হতে পারবে। অন্যথায় আপনার চতুরাশ্রম শতাব্দীকাল পরে ধবংসস্তূপে পরিণত হবে – ভবিষ্যৎ শঙ্করাচার্যের অভাবে।"

ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যাল লিখিত **'রূপমঞ্জরী (তৃতীয় খন্ড)'** (২০০৫) উপন্যাসে উভয়ভারতী ও শঙ্করাচার্যের কথোপকথনে যে ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া গেল তা হ'ল – বেদ ঈশ্বরবিশ্বাসী, কিন্তু পূর্ব মীমাংসা ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী নয়। কুমারিল ভট্ট এই পূর্ব মীমাংসা দর্শন আলোচনা করে গ্রন্থ লিখেছিলেন। প্রায় হাজার বছর পূর্বে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের বৈদিক কর্মকাণ্ড যাকে পূর্ব মীমাংসা বলা হয় তা ক্রমশ উত্থিত হয়। এই পূর্ব মীমাংসা দর্শনের তখন প্রধান প্রবক্তা হন গৌড়মন্ডলের আচার্য কুমারিল ভট্ট। যিনি ছদ্মবেশে সমকালীন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ অর্হৎ আচার্য ধর্মকীর্তির নালন্দা সংঘারামে উপনীত হয়ে, তাঁর শিষ্যত্ব নিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্নিহিত ভাব, বক্তব্য ও যুক্তিগুলি আয়ত্ত করেন, বৌদ্ধ অর্হতদের সাথে তর্কে জয়লাভের উদ্দেশ্যে। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন যে ত্রৈবর্ণিকের বেদে স্পষ্ট নির্দেশ আছে, চতুরাশ্রমের পথেই প্রতিটি হিন্দুর জীবনযাপন বাধ্যতামূলক, যা মানব সমাজের

অবলুপ্তি ঘটানোর ক্ষেত্রে অপারগ। পূর্ব মীমাংসা দর্শনের চতুরাশ্রম পথেই মানব প্রজাতির অগ্রসর সম্ভব। এই দর্শন বৈদিক কর্মকাণ্ডের সমর্থনকারী দর্শন। এই দর্শনের মতানুযায়ী আত্মা চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর ও অমর। আত্মা মনুষ্যজীবনের কর্মফল ভোগ করে। মীমাংসকেরা বেদবিহীত কর্মকেই ধর্ম বলেছেন। তাঁরা ঈশ্বর বলে পৃথক কোন অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না। কিন্তু বেদ ঈশ্বর মানে। **'রূপমঞ্জরী (তৃতীয় খন্ড)'** (২০০৫) উপন্যাসে নারায়ণ সান্যাল এর মতে – 'বেদ অভ্রান্ত' – এ কথা না মানলে হিন্দু থাকা যায় কিন্তু ব্রাহ্মণ ধর্মে থাকা সম্ভব নয়। যেমন মহামুনি জাবালি, গৌতমবুদ্ধ এঁরা কেউই বেদকে স্বীকার করেননি। কিন্তু গৌতমবুদ্ধ, গুরুনানক, তুলসীদাস, শ্রীচৈতন্যদেব সকলেই বেদবিহীত চতুরাশ্রমকে স্বীকার করেছেন। 'ব্রাহ্মণ' এর যুগে, উপনিষদের যুগে, তিনটি বেদই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই তাকে বলা হত 'বেদত্রয়ী'। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বেদকে 'ত্রয়ী' বলা হয়েছে। এরপরে আসে উপনিষদের যুগ। প্রাচীনতম উপনিষদ দুটি। 'ছান্দোগ্য' এবং 'বৃহদারণ্যক'। তাতেও ক্রমাগত তিনটি বেদের উল্লেখই আছে। কিন্তু বেদ চারটি। 'ছান্দোগ্য' ও 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদে একটি অনুপপত্তিও বর্তমান। 'ছান্দোগ্য' উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের একটি উপাখ্যানে নারদ মুনিকে তাঁর গুরু সনৎকুমার ব্রহ্মবিদ্যা দেওয়ার পূর্বে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, নারদ মুনি কোন্ কোন্ বেদ অধ্যয়ন করেছেন। নারদ মুনি প্রত্যুত্তরে অথর্ববেদ সমেত, চারটি বেদেরই নামোল্লেখ করেছিলেন। ঠিক তেমনি 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে চতুর্বেদের উল্লেখ বর্তমান আছে। ঔপন্যাসিক শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত **'প্রহর গোনার পালা'** (২০০৫) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র গুরুদেবকে উপন্যাসের চরিত্র অঞ্জলি নিয়ে এলো নিস্তব্ধ, চেনাজানা পাড়া-প্রতিবেশীর দ্বারা ভর্তি পুজোর দালানে, যেখানে নরেন্দ্র নারায়ণ ও সুলক্ষণা দেবীও বসে ছিলেন। নিস্তব্ধ পুজোর দালান গুরুদেবের ভরাট গলার স্বরে গম গম করে উঠলো। তিনি বলতে শুরু করলেন শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের ইতিহাস –

"ওঁ বসুদেবসুতং দেবং কংসচানুরমর্দনম্।
দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগৎগুরুম্।।"

ঔপন্যাসিক শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'প্রহর গোনার পালা'** (২০০৫) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের যে ইতিহাস শুনিয়েছিলেন তার ওপর নির্ভর করে যে কৃষ্ণকথা উঠে এসেছে তা হ'ল – কৃষ্ণ শব্দটি 'কৃষ্' ধাতু থেকে এসেছে। যার বিশেষ অর্থ – 'আকর্ষণ'। জগতে যা কিছু আকর্ষণ তাই কৃষ্ণ। সাগর, পর্বত, কালো মেঘ, ছয়টি ঋতু, ফুল, ফল, মানুষ, গাছ – এদের মধ্যে

আকর্ষণজনিত যে আনন্দ পাই, তাই কৃষ্ণ। কান দিয়ে শুনে, চোখ দিয়ে দেখে, জিভ দিয়ে আস্বাদন করে আমরা যে আনন্দ পাই, তা হল কৃষ্ণ। আকর্ষণের বস্তুটি শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ আমাদের ভিতরেই। ভাগবতে দশম স্কন্দে রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। রাসলীলা করতে করতে গোপীদের অহংকার হয়েছিল। গোপীরা ভেবেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরই এবং আমাদেরই মতো এক গোয়ালার ছেলে। শ্রীকৃষ্ণ শুধু তাঁদেরই। আর কারো নয়, গোপীদের এই অহংকার চূর্ণ করার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ কিছুক্ষণের জন্য লীলাক্ষেত্র থেকে অন্তর্ধান করেছিলেন। তখন গোপীরা ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বৃক্ষলতায়, বন-জঙ্গলে শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজেছিলেন। সেই সময় গোপীদের মুখ থেকে কিছু শ্লোক বেরিয়েছিল। যাকে 'গোপীগীতা' বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বটা অশিক্ষিত গোয়ালিনীরা সহজ, সরল এবং সুন্দরভাবে বুঝেছিলেন। তাই তাঁরা একটা শ্লোকে সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে বোঝাতে পেরেছেন –

ন্‌খলু গোপিকানন্দনোভবান
সকল দেহীনাম্ অন্তরাত্মাদৃক্।।

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, তুমি শুধুমাত্র গোপিকানন্দন (নন্দ-যশোদাপুত্র) নও। সমস্ত ব্রহ্মান্ডে যতগুলি দেহ (স্বেদজ, অন্ডজ, উদ্ভিদজ, যোনিজ) আছে, সেই সকল দেহের অন্তরাত্মা। 'দৃক' অর্থাৎ সাক্ষীস্বরূপ। সকল জীবের মধ্যে 'আমি' চৈতন্যস্বরূপ। তাই চৈতন্যটাই সকল দেহে 'আমি' 'আমি' করছে। বেদান্তে শরীর, পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংকারকে 'আত্মা' বলা হয়। এদের থেকে অন্তরতম যে আত্মা তাকেই 'অন্তরাত্মা' বলা হয়। যিনি 'অন্তরাত্মা' বা 'ভিতরে চৈতন্য' তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কীরকম? তিনি 'দৃক্'। দৃক্ মানে সাক্ষীস্বরূপ। ভিতরে অন্তর্যামীর যে সচ্চিদানন্দভাব আনন্দপ্রকাশ, তাকেই গোপীরা বলেছেন, সাক্ষীস্বরূপ। সকল দেহীর মধ্যে অন্তরাত্মা দৃক্ এই ভাবটাই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমস্ত জীবের যে আকর্ষণ বোধ হচ্ছে তিনিই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। ভিতরে যিনি 'আমি' চৈতন্য রূপে আছেন, তাঁকে আমরা ধরতে পারি না। বাইরে যে পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ আছে, তাকে আমরা আসল মনে করে সুখ-দুঃখ ভোগ করি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, আগে এক না থাকলে শূণ্যের মূল্য হয় না। অর্থাৎ ভিতরের আমি চৈতন্য না থাকলে শূণ্যরূপ শরীর, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকারের কোনো মূল্য হয় না। **'পায়ে পায়ে পথ চলা'** (২০০৮) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিনী সারদার প্রসঙ্গ ও তার সাথে ধর্মঠাকুরের ইতিহাস তাঁর নিজস্ব বয়ানে বলেছেন –

“জয়রামবাটি পূর্বে যার নাম ছিল তেঁতুলমুড়ি সেই গ্রামটি বাঁকুড়ায় হলেও হুগলি জেলার সীমারেখায়। বেশ কিছুটা এগতে পারলেই বিষ্ণুপুরে বসে আছেন মদনমোহন। সেই বাঁশির আওয়াজ জয়রামবাটির প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়তো। নদী ছিল। বড় বড় পুকুর ছিল। একটি খালও ছিল। ধান হত। রবিশস্য হত আবার তুলোও হত। তুলোর খেতে শুয়ে থাকা ওই মেয়েটি যে একদিন সারা পৃথিবীতে মাতা নামে পরিচিতা হবেন এমন কথা সেই সময়ে কে ভেবেছিল! দুটি নামই পালটে গেল। তেঁতুলমুড়ি কবে কেন জয়রামবাটি হলো কেউ জানে না। তবে ক্ষেমঙ্করীই কেমন করে সারদা হলেন সেটি জানা যায়।”

‘পায়ে পায়ে পথ চলা’ (২০০৮) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ধর্মসম্পর্কিত যে ইতিহাস তুলে ধরেছেন তা হ’ল – রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাসুন্দরী দেবীর প্রথম সন্তান সারদা। রামচন্দ্র সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ ছিলেন। খেলারাম মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্রের ঊর্ধ্বতন পঞ্চমপুরুষ ছিলেন। এই খেলারাম মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুরের তৎকালীন রাজা শ্রীচৈতন্যসিংহ দেবের কাছ থেকে তেঁতুলমুড়ি গ্রামে দেবোত্তর নিষ্কর জমি পেয়েছিলেন। কারণ তিনি ধর্মঠাকুরের পুজারী ছিলেন। ওই অঞ্চলে তখন একইসাথে শ্রীরামচন্দ্রদেব এবং ধর্মঠাকুর, দুজনেই সাধারণ মানুষের দেবতা ছিলেন এবং তাঁদের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। ধর্মঠাকুর প্রকৃতপক্ষে গ্রামের সমস্ত গরিব মানুষের দেবতা ছিলেন। ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করেই গ্রামের গরিব মানুষের পালাপার্বন ও উৎসব চলত। ধর্মঠাকুরের কোন প্রতিমা ছিলনা। একটি শিলাখণ্ডকে বা পাথরের টুকরোকেই দেবতা বলে মানা হতো। এই পাথরের টুকরোটি মানুষের বিশ্বাসধারণ করা দেবতারূপে পূজিত হতেন। আবার ধনুর্বীর দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্র বা রঘুবীরও ক্ষুদ্র শালগ্রাম শিলা হিসেবেই পূজিত হতেন। ধর্মঠাকুর ও রঘুবীর একইসঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণেরও দেবতা ছিলেন। একই সাথে শাস্ত্রানুযায়ী পুজো আবার লোকাচারকে মানুষ মেনে চলত। বৌদ্ধধর্মই বিভিন্নভাবে রূপ পরিবর্তন করতে করতে ধর্মঠাকুরে পরিণত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ খেলারাম মুখোপাধ্যায় ছিলেন পৈতেধারী, শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে শালগ্রামের সেবা যেমন করতেন, সেই রকমই মানুষের মন্ডপে বসে লোকদেবতা ধর্মঠাকুরের পুজোও করতেন। এই ধর্মঠাকুরটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিবঠাকুরও হয়ে যেতেন। তাই এই অঞ্চলে শিবের গাজনের মত ধর্মের গাজনও খুব প্রসিদ্ধ উৎসব ছিল। ধর্মঠাকুরের রথের প্রচলনও প্রচলিত ছিল, যা আজও বর্তমান। ধর্মঠাকুর তখন ভারতবর্ষের আর এক প্রসিদ্ধ দেবতা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ছায়া হয়ে উঠতেন। এভাবেই মানুষের সমাজের ধর্মের ইতিহাসের চাকা এগিয়েছে। সেই সময়ে গরিবমানুষের তেমন অর্থপ্রাচুর্য না থাকার কারণেই দেবতার প্রতিমার পরিবর্তে শিলাখণ্ডকেই দেবতার প্রতিভূ রূপে পুজো

করার প্রচলন ছিল। এই ধর্ম ঠাকুরের ইতিহাসটি, ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখা **‘কালের কান্ডারী’** (২০০৩) উপন্যাসেও সমান গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের **‘কালের কান্ডারী’** (২০০৩) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বলছেন –

“বিষ্ণুপুরের শেষ রাজা চৈতন্য সিংহ গ্রাম জয়রামবাটীর খেলারাম মুখোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠালেন। শুনেছি আপনি ধর্ম ঠাকুরের সেবায়েত। আপনাকে আমি প্রায় বারো কাঠা ব্রহ্মোত্তর ও প্রায় সাত কাঠা দেবোত্তর নিষ্কর ভূমি দান করছি। আপনারা বংশপরম্পরায় নির্বিঘ্নে সেবার কাজ চালিয়ে যাবেন – এই আমার প্রার্থনা। কে এই ধর্ম ঠাকুর! এক সময় বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে কচ্ছপরূপী ধর্মঠাকুরের পূজা হত। খুব জোরে ঢাকঢোল পিটিয়ে। ধর্মঠাকুর এক অপূর্ব সমন্বয়। বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি আবার শিবঠাকুরের জনগণ জীবন রূপ।”

‘কালের কান্ডারী’ (২০০৩) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের বয়ানে – এক সময় বঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঢাকঢোল পিটিয়ে কচ্ছপরূপী ধর্মঠাকুরের পূজা হত। ধর্মঠাকুর হলেন শিব ঠাকুর, ভগবান বুদ্ধ ও জগন্নাথদেবের একত্রে এক অপূর্ব সমন্বয়। ধর্মঠাকুর দরিদ্র চন্ডালের বন্ধু। ধর্মঠাকুর সেই শিব, যে শিব ছাইভস্ম মেখে শ্মশানে বসে থাকেন। সংসারের দায়ে ভিক্ষা করেন। প্রয়োজনে হলকর্ষণও করেন। গ্রামের গরিব মানুষেরা এই ধর্ম ঠাকুরের সঙ্গে কোথাও যেন নিজেদের জীবনযাত্রার মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। ধর্ম ঠাকুরের কোন মূর্তি পূজিত হতো না। শুধুমাত্র এক শিলাখণ্ডের মধ্যেই মানুষের বিশ্বাসভাবনা, ধর্ম ঠাকুরের রূপ পেতো। বুদ্ধদেবের অনেক বিশেষণের একটি হল ধর্মধাতু। এক সময় চড়ক অনুষ্ঠান ধর্মঠাকুরেরই উৎসব ছিল। চৈত্রের গাজন একসময় ধর্মঠাকুরেরই উৎসব ছিল। রাঢ়দেশের গ্রাম্যদেবতা ধর্মঠাকুরই ছিলেন। ধর্মঠাকুরের গ্রাম্য লোকোৎসবের নামই গাজন ছিল। ক্রমে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এই গাজন উৎসবকে শৈব উৎসবে পরিণত করেছিলেন। পরবর্তীকালে শিবঠাকুরই গ্রামের প্রধানদেবতা হয়েছেন বলে, ধর্মের গাজন, শিবের গাজনে পরিবর্তিত হয়েছে। ধর্মপুজোর পুঁথির রচয়িতা ছিলেন রামাই পন্ডিত। শেষ পর্যায়ে বৌদ্ধধর্মই ধর্মপুজোয় রূপান্তরিত হয়েছিল। **‘কালের কান্ডারী’** (২০০৩) উপন্যাস থেকে ধর্মের ইতিহাসের আরেকটি দিক যে পাওয়া গেছে তা হ’ল – আকবর ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদার ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ ছিল না। তিনি খ্রীষ্টানদের ব্যাপারেও খুব উদার ছিলেন। হিন্দুদের প্রতি তাঁর অনুরাগ অত্যন্ত আন্তরিক ও যথার্থ ছিল। সেই সময়ে রাজা বীরবল সামান্য এক কবি ছিলেন। বীরবল আকবরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আকবর বীরবলকে রাজা করে দিলেন। হিন্দু রাজা বীরবলের মৃত্যুতে সম্রাট আকবর তিনদিন মৌনী ছিলেন। আকবর নিজের বড় ছেলের

বিবাহ হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানসিংহের বোনের সঙ্গে দিয়েছিলেন। সেই কারণে আকবর মানসিংহকে তাঁর সাম্রাজ্যের প্রধান কান্ডারী বা সেনাপতির পদ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রায় সাতহাজার সৈন্যের মনসবদার। আকবরের রাজত্বকালে এত বড় পদ কোনও মুসলমান আমীরও কোনদিন পাননি। হিন্দুধর্মের অনুরাগী হয়ে আকবর 'এলাহী ধর্ম' নামে একটি নতুন ধর্ম প্রচার করেছিলেন। আকবর বৈষ্ণব মতের তিলকসেবা করতেন। তিনি মাঝে মাঝে নিরামিষ খেতেন। ব্রাহ্মণদের দিয়ে হাতে রাখি বাঁধাতেন। হোম করতেন। আকবর খ্রীষ্টান পাদ্রিদের মনেও এই বিশ্বাস জাগাতে পেরেছিলেন যে, তিনি খ্রীষ্টধর্ম মানেন। ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর **'কালের কান্ডারী'** (২০০৩) উপন্যাসে ধর্মের ইতিহাস প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন যে –

> **" 'হোসেন শাহের আমল' মানে বাঙালিজীবনের অতি উজ্জ্বল এক সময়। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাঙালি উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল।' এইকালেই যে মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছিল।"**

বাঙালি জীবনের ইতিহাসে হোসেন শাহের অত্যুজ্জ্বল রাজত্বকালেই নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করে লীলা করেছিলেন। হোসেন শাহের আমল মহাপ্রভুর উপস্থিতিতে ধন্য হয়েছিল। ধর্মে সাম্প্রদায়িকতা, একটা চিরকালের অশান্তির বিষয়। বাংলাদেশে সুলতানি রাজত্বের সময়ে এক অসাধারণ ধর্মসংস্কারক ও সমাজসংস্কারক শ্রীনিমাই বা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর লীলাক্ষেত্র হুসেনশাহী বাংলা থেকে সরিয়ে নিয়ে, উড়িষ্যায় স্থানান্তরিত করলেন এবং সেখান থেকেই তিনি রহস্যজনকভাবে একদিন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হল। হিন্দুরা তাদের সনাতন ধর্মের মূলতত্ত্ব ভুলে গিয়ে, বেদবেদান্তের চর্চা উঠিয়ে স্মৃতি ও ন্যায়ের চর্চা শুরু করলেন। স্মৃতি হ'ল শুধুমাত্র আচার-আচরণের শাস্ত্র। ফলে সনাতন ধর্মের শাশ্বত সত্য অন্তর্হিত হল। কারণ আচার-আচরণ শাশ্বত নয়, তাই হিন্দু ধর্মের পরিণতি যা হওয়ার তাই হয়েছিল। ধর্ম পালনের নামে পুরোহিতদের ফরমান ও নানা কুসংস্কারই সংস্কার হয়ে দাঁড়াল। তাই এক্ষেত্রে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজে আচার-আচরণই হয়ে দাঁড়ালো, হিন্দুর ধর্ম! সেই সময় কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, বুকানন, ফরসাইথ প্রমুখ পাদ্রীরা উপস্থিত হয়েছিলেন। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কিত বিরূপ প্রচার সেই সময়েই শুরু হয়েছিল। হিন্দুদের দেবদেবী কদর্য। গোপাল মাখন খায়, মাকালী ছাগল, মানুষ খায়। অর্থাৎ মাকালীর সামনে ছাগল ও মানুষ বলির বিষয়টিকে তারা এভাবে সমাজের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এই মাকালীই আবার মড়ার খুলি দিয়ে গাঁথা মালা গলায় ঝোলায়। মনসা

দেবীর এক চোখ কানা। তিনিই সাপ হয়ে ছোবল মারেন। শিব ঠাকুর গলায় সাপ জড়িয়ে, ষাঁড়ের পিঠে চেপে ঘুরে বেড়ায়। শ্মশানে ভুত-প্রেত নিয়ে নাচানাচি করেন। তাই তাঁরা হিন্দুদের মনুষ্য পদবাচ্য বলে মনে করেন না। ব্যাপটিস্ট মিশনের জোয়া মার্শম্যান লিখলেন, ভারতে বৃটিশ শাসন যদি কায়েম করতে হয় তাহলে খ্রীষ্টধর্মের প্রসার অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ শিক্ষার ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। সেই সময়ের গ্রাম্য মানুষের দারিদ্রতা দেখে সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে, বিনা ব্যয়ে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। খ্রীষ্টধর্মের প্রচারের কারণেই খ্রীষ্টান পাদ্রীরা এক নতুন নিয়ম কায়েম করলেন। একজনকে ধরে গায়ে জল ছিটিয়ে, নামের আগে মাইকেল জুড়ে দিলেই তার হিন্দুর সংস্কার ঘুচে যাবে। সেই সময়ে শিক্ষার প্রসার, স্ত্রী শিক্ষা অতি গর্হিত কর্ম বলেই বিবেচিত হতো। ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্তের পন্ডিত। তিনি সেই সময়ে খ্রীষ্টানদের শিক্ষানীতির ব্যাপারে সদর্থক ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি ছাড়াও আরো অনেক সমাজ সংস্কারক, সমাজ সংস্কারের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ঔপন্যাসিক নজরুল ইসলাম তাঁর **‘ভূমিপুত্র (১)’** (২০০২) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র ইসলাম ধর্ম অনুসারে কামালের মনে যে সমস্ত প্রশ্নের উদয় হয়েছে সে সম্পর্কে এবং হিন্দু ও খ্রীষ্টান সম্পর্কেও নানান তথ্যের উপস্থাপনা করেছেন, যা বর্তমান গবেষণায় ধর্মের ইতিহাসের আলোচনাকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছে।

“ইসলাম ধর্ম অনুসারে মূর্তি পুজো করা পাপ। যে করবে সে নরকে যাবে। কিন্তু হিন্দুরা স্বর্গে যাওয়ার জন্যই বিভিন্ন দেবদেবির মূর্তি তৈরি করে পুজো করে থাকে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, কে কার ঘরে জন্ম গ্রহণ করবে সেটা সে ঠিক করে না, সৃষ্টিকর্তা আল্লা বা ভগবানই ঠিক করে। আর অধিকাংশ লোকই পিতৃপুরুষের ধর্ম পালন করে যায়। তাহলে হিন্দু ঘরে জন্মালে তার পক্ষে মুর্তি পুজো করাই স্বাভাবিক। তা হলে আল্লা কাউকে মুসলমানের ঘরে কাউকে হিন্দুর ঘরে পাঠাচ্ছে কেন? সকলকে মুসলমানের ঘরে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়। আর যখন পাঠাচ্ছে তখন বাবা-মার দেখাদেখি মুর্তি পুজো করলেই নরকে যেতে হবে কেন? এটা চলতে পারে না।”

‘ভূমিপুত্র (১)’ (২০০২) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র কামালের মনে, হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যে পরস্পরবিরোধী মতের উদ্ভব হয়েছে, তা তাকে অনেক সময় বিভ্রান্ত করেছে। সে নিজে ইসলাম ধর্মাবলম্বী। ইসলাম ধর্মে মূর্তি পুজো করলে নরকে যেতে হয়। কিন্তু হিন্দু ধর্মে স্বর্গপ্রাপ্তি করার জন্যই নানান দেবদেবীর মূর্তি পুজো করা হয়ে থাকে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী যদি কে কোন ধর্মাবলম্বীদের ঘরে জন্মগ্রহণ করবে

তা তার নিজের ইচ্ছানুসারে হওয়ার ক্ষমতা না থাকে এবং সেটা যদি সৃষ্টিকর্তা আল্লা বা ভগবানের দ্বারাই নির্ধারিত হয়, তাহলে যে হিন্দুর ঘরে জন্মেছে তার পক্ষে যেমন স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মূর্তি পুজো করাই স্বাভাবিক, তেমনি যে মুসলমানের ঘরে জন্মেছে তার পক্ষেও নরকে যাওয়ার পথ হিসেবে মূর্তি পুজো না করা অবশ্যই স্বাভাবিক। কিন্তু এই মূর্তি পুজো করলে যদি নরকপ্রাপ্তি হয়, তাহলে আল্লা পৃথিবীর কিছু মানুষকে হিন্দুর ঘরে এবং কিছু মানুষকে মুসলমানের ঘরে কেন পাঠাচ্ছেন? কামালের এই প্রশ্ন যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক বলেই মনে করা যেতে পারে। পৃথিবীর সকল মানুষেরই আকাঙ্খা যদি স্বর্গপ্রাপ্তিই হয়, তাহলে এক ধর্মের ধর্মবোধ, আরেক ধর্মে অধর্মবোধ, কি করে হয়ে উঠতে পারে? এভাবেই **'ভূমিপুত্র (১)'** (২০০২) উপন্যাসের চরিত্র কামাল, যত বড় হয়েছে ততই সে, তার নিজের ধর্মের সাথে সাথে নানান ধর্ম সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে, সেই ধর্ম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এভাবেই কামালের ধর্ম জিজ্ঞাসার উত্তরের সঙ্গে বর্তমান গবেষকের যে পরিচয় হয়েছে, তাতে বর্তমান গবেষকের গবেষণার ইতিহাস সমৃদ্ধ হতে পেরেছে বলেই বর্তমান গবেষক মনে করেন। কামাল জ্ঞাত হয়েছিল যে, পৃথিবীতে পাঁচটি মহাদেশ থাকলেও সব ধর্মগুলো এই এশিয়া মহাদেশেই উৎপন্ন হয়েছে। এর মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ – এই চারটি ধর্ম ভারতবর্ষে জন্মেছে। হিন্দু ধর্ম সেই অর্থে কোন নির্দিষ্ট ধর্ম প্রচারক প্রচার করেন নি। প্রাচীনকাল থেকে এ দেশে প্রচলিত বিভিন্ন আচার-আচরণ, রীতি-নীতির সমষ্টিই কালে হিন্দু ধর্ম বলে পরিচিত হয়েছে। মুসলমান ধর্মের নিয়ম বলে যা প্রচলিত তা মোটামুটি তিন রকম উপাদানে গঠিত। মহম্মদ আল্লার কাছ থেকে সরাসরি যেসব নির্দেশ পেয়েছিলেন, সেগুলি পরবর্তীকালে একসাথে গেঁথে 'কোরান' নামে পরিচিত হয়। মহম্মদ নিজে যা বলেছেন তা বিভিন্ন 'হাদীস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর মহম্মদ নিজে যা করতেন তাকে 'সুন্নত' বলা হয়। 'কোরান', 'হাদিস' ও 'সুন্নত' এগুলিকে একত্রে 'শরীয়ত' বলা হয়। **'ভূমিপুত্র(১)'** (২০০২) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র কামাল আরো জ্ঞাত হয়েছে যে – আদম (অ্যাডাম), ইব্রাহিম (আব্রাহাম), ইয়াকুব (জ্যাকব), মুসা (মোজেস), দাউদ (ডেভিড), ইশা (যীশু) প্রত্যেককেই এই ইসলাম ও খ্রিস্টান উভয় ধর্মের লোকেরাই সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত পুরুষ বলে মানে। ইশা এবং যীশু একই ব্যক্তি। তিনি মানুষের জন্য একই রকম বার্তা প্রচার করেছিলেন। মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের জন্য আলাদা আলাদা বার্তা প্রচার করেন নি। কিন্তু মুসলমান ও খ্রীষ্টানরা তাঁর বাণীকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত করে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় নেতারা যা করতে চান, তা ধর্মের নামে সৃষ্টিকর্তা বা কোন ধর্ম প্রচারকের মুখনিঃসৃত বাণী বলে প্রচার করেন। এই কারণেই

বেদ, কোরান, বাইবেল এর বাণী গুলিকে সরাসরি ঈশ্বর প্রেরিত বাণী বলে প্রচার করা হয়। ধর্ম প্রচারকের ভাষার উপর নির্ভর করে 'ঈশ্বর' বা পরমপিতার নাম নির্ধারিত হয়। সেই কারণেই খ্রিস্টানেরা ঈশ্বরকে 'গড' বলেন আর ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরকে 'আল্লা' বলেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈনদের মধ্যেও একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে পৃথিবী যখনই পাপপূর্ণ হয়ে উঠবে, তখনই মানুষকে পাপমুক্ত করার কারণে অবতার পুরুষের আবির্ভাব ঘটবে। তেমনি পশ্চিম এশিয়ায় জরাথ্রুস্ট-ইহুদী-খ্রিস্টানদের মধ্যেও একটি প্রচলিত ধারণা ছিল যে, পৃথিবীতে ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেলে, ধর্মরাজ্য স্থাপনার্থে ঈশ্বরপ্রেরিত একজন অবতারপুরুষ আসবেন। এভাবেই সমকালীন সাহিত্যে সমাজ ও বিভিন্ন ধর্ম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে। খুব ছোটবেলা থেকেই উপন্যাসের চরিত্র কামালের খুব ভালো হতে ইচ্ছে করতো। যে পরিবেশে সে মানুষ হচ্ছিল সেই পরিবেশ ভালো এবং ধার্মিক সমার্থকই ছিল। সে শিখেছিল ভালো হতে হলে ধর্ম পালন করতে হয়, আর এই ধর্ম পালন করার জন্যই কিছু আবশ্যকীয় করণীয় কর্ম থাকে যেমন – কলমা পড়া, নামাজ পড়া, রোজা করা, সাধ্য থাকলে হজ করা ও জাকাত দেওয়া। আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে হজ করা বা জাকাত দেওয়া। তবে কলমা পড়া, নামাজ পড়া এবং রোজা করা এই প্রথম তিনটে ইসলাম ধর্মাবলম্বীকে করতেই হবে। কলমা মুখস্থ করে নামাজ পড়া, রোজা করা, 'আল্লার নামকরা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। লেখক নজরুল ইসলাম উপরোক্ত উপন্যাসে আরো বলেছেন – মুসলমানদের নাস্তিক হওয়া বড় শক্ত। মুসলমানদের আল্লাতে ঈমান বা বিশ্বাস, দিনে পাঁচবার নামাজের প্রার্থনা, রমজান মাসে রোজার উপোস এবং সাধ্য থাকলে মক্কায় হজ ও সম্পদের উপর জাকাত বা দান একজন মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। ধর্মের নিয়ম বলে যা চালু আছে তা মোটামুটি তিন রকম উপাদানে গঠিত। ১) মহম্মদ আল্লার কাছ থেকে সরাসরি যেসব নির্দেশ পেয়েছিলেন সেগুলি পরবর্তীকালে একত্রে গ্রথিত হয়ে 'কোরান' নামে পরিচিত হয়। ২) মহম্মদ যা বলেছেন তা বিভিন্ন 'হাদিশ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। ৩) মহম্মদ যা করতেন তা 'সুন্নত'। সবগুলিকে একসঙ্গে বলে 'শরিয়ত'। মুসলমান ধর্মে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী পৃথিবীতে ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেলে ধর্মরাজ্য স্থাপন করতে একজন প্রেরিত অবতার পুরুষের আবির্ভাব হয়। প্রায় সব প্রেরিত পুরুষরাই, তাঁর পরেও প্রেরিত পুরুষ আসবেন, এরকমই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। মহম্মদই প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজেকে শুধু প্রেরিত পুরুষ নয়, শেষপুরুষ বলে দাবি করলেন (৩৩ নম্বর সুরা 'আহযাব' এর চল্লিশ নম্বর আয়াত) অর্থাৎ তাঁর পরে আর কোনো প্রেরিত পুরুষ আসবেন না। তাই তিনি যা বলছেন সেটাই চূড়ান্ত। পাকিস্তানের আহমেদিয়াদেরও

অমুসলমান ঘোষণা করার কারণ এখানেই নিহিত। কারণ তারা আহমেদকে শেষ প্রেরিত পুরুষ বলে দাবি করে যা মহম্মদের দাবির পরিপন্থী।

ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত **'প্রথম আলো (দ্বিতীয় পর্ব)'** (২০০৬) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র স্বামীজি, উপন্যাসের আর এক চরিত্র স্টার্ডিকে বলছেন—

"খ্রিস্ট ধর্মে অনেক মহান ভাবের কথা আছে। যিশু কোথায় মহা ত্যাগ বৈরাগ্য দেখিয়ে গেলেন, এক কম্বল গায়ে দিয়ে পথে পথে ঘুরে ভগবানের নাম শুনিয়ে গেলেন আর পাদরিগুলো কেবল টাকা টাকা করে বেড়াচ্ছে। স্টার্ডি বললেন, বেদান্ত ধর্মের কথাই এখন সকলকে শোনানো দরকার। স্বামীজি বললেন, অন্যান্য ধর্মগুলিতে আচারআচরণের কথা, নিজস্ব গৌরবের কথাই বেশি বলা হয়। ধর্মের দর্শনের কথা কেউ বলে না। বেদান্তের দর্শন হচ্ছে সর্ব ধর্মের সমন্বয়। সেই একটা বিশ্বধর্মের আদর্শের কথাই আমি মানুষকে জানাতে চাই।"

ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত **'প্রথম আলো (দ্বিতীয় পর্ব)'** (২০০৬) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র স্বামীজির বক্তব্য অনুযায়ী বলা যেতে পারে, বিশ্বধর্মের আদর্শের সঙ্গে যখন স্বামীজি কথা বলেন, তখন তিনি নিজেও যেন ইতিহাস ধর্মতত্ত্ব দর্শন মথিত করা বাণী-মূর্তিতে রূপান্তরিত হন। এই বিশ্বধর্ম প্রসঙ্গে জ্ঞাত হতে হলে নিজের ধর্মের সাথে সাথে অন্যান্য ধর্মগুলির সম্পর্কেও সমানভাবে জ্ঞাত হতে, হতে পারে। স্বামীজি হিন্দু ধর্মের দর্শনের বিষয়কে, অন্যান্য ধর্মগুলির আচার আচরণের কথা, নিজস্ব গৌরবের কথার থেকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর মতে বেদান্তের দর্শনই হচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়ের দর্শন। তাই বেদান্তে উল্লেখিত বিশ্বধর্মের আদর্শের ভাবনাই তিনি সমস্ত বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। হিন্দুদের বিশ্বাস, ত্রিবেণীসঙ্গমের জল অমৃত সমান। অসুরদের ছলনা করে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত যখন অমৃতের কুম্ভ নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কয়েক ফোটা অমৃত তার থেকে পড়ে যায় ত্রিবেণীসঙ্গমের জলে। অমৃত সর্বদাই অফুরন্ত এবং বিনাশের অতীত, তাই সেই অমৃতের স্পর্শে ত্রিবেণীসঙ্গমের জলে স্নান করলে সব পাপ নিঃশেষিত হয়ে যায়। মৎস্যপুরাণে কথিত আছে যে, সমুদ্রমন্থনের পরে প্রাপ্ত অমৃতকুম্ভ নিয়ে, স্বর্গের নন্দনকাননে পৌঁছতে জয়ন্তর দীর্ঘ বারো দিন সময় লেগেছিল। দেবতাদের বারো দিনে মানুষের বারো বৎসর, তাই জয়ন্তর সেই যাত্রার স্মৃতিতে ত্রিবেণীসঙ্গমে প্রতি দ্বাদশ বৎসরে পুণ্যস্নান হয়। এখন আর বারো বছর অপেক্ষা করতে হয় না, ছ'বছর অন্তরই অর্ধকুম্ভের প্রবর্তন হয়েছে। অন্যদিকে, ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

লিখিত **'প্রথম আলো (দ্বিতীয় পর্ব)'** (২০০৬) উপন্যাসে, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপনয়ন উপলক্ষে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিশুদ্ধ আর্য মতে উপনয়ন করতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চেয়েছিলেন৷ এবং ভারতবর্ষের আর্যসমাজের সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের একটা যোগসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছিলেন৷ সেই উপলক্ষে কয়েকজন বিশিষ্ট আর্য সমাজের পন্ডিতদের আমন্ত্রণও জানানো হয়েছিল৷ কারণ একটা প্রমান করার প্রচেষ্টা ছিল যে বাঙালি ব্রাহ্মণদের তুলনায় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মণত্বের গৌরব বেশি৷

"পৈতে ধারণ বা পরিত্যাগের প্রশ্নটিই ছিল ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হওয়ার অন্যতম কারণ৷"

উপরোক্ত তথ্যটির প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ৷ এই কারণেই অন্য দুটি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে উপনয়ন অনুষ্ঠানই বর্জন করা হয়েছিল৷ ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীরা হিন্দু ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, এক নতুন ধর্মের প্রচার করেছিলেন, যেখানে জাতিভেদের কোনও স্থান থাকার কথা নয়৷ কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজ এখনও পুরনো অনেক প্রথাই আঁকড়ে ধরে আছে৷ শুধুমাত্র মূর্তি পুজোয় আদিব্রাহ্মরা বিশ্বাসী নন৷ এছাড়া হিন্দুত্বের আচার-আচরণের সাথে তাদের আর বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই৷ সেই সময়ে হিন্দুদের মধ্যে গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে পরোপকারের কোনও রীতি তেমনভাবে প্রচলিত ছিল না৷ দরিদ্র মানুষদের মধ্যেও যে নারায়ণ বাস করেন, বিবেকানন্দ সেই নারায়ণ সেবায় উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন সর্বস্তরের মানুষকে৷ হিন্দু ধর্মের এক বিশেষত্ব, হিন্দু ধর্ম ছেড়ে মানুষ বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু নতুন কেউ হিন্দু ধর্মে প্রবেশ করতে পারবে না৷ বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন নামে ঈশ্বরোপলব্ধির প্রকাশ প্রকাশিত হয়৷ ঈশ্বর জীবন দিয়েছেন, একথা যেমন সত্য তেমনি তিনিই নিহন্তা৷ ঈশ্বরকে সময়ের অতীত নিত্য বলে ব্যাখ্যা করা যেতেই পারে৷ যার শুরু ও শেষ দুর্জ্ঞেয়, রহস্যাবৃত৷ **'প্রথম আলো (দ্বিতীয় পর্ব)'** (২০০৬) উপন্যাসপ্রাপ্ত তথ্যগুলি দ্বারা যে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে তাতে জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার যে উন্মেষ হয়েছে – তাতে ধর্ম আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক ভেদরেখা ইত্যাদি বিষয়গুলি যেন ভারতবর্ষের এক অনতিঅতীতের চিত্রায়ন করছে, যা বর্তমান গবেষকের গবেষণা বিশ্লেষণের দ্বিতীয় পর্বের ইতিহাসের বাস্তবসম্মত উপস্থাপন হয়ে উঠতে পারে৷

'আকাশকুসুম' (২০০১) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার কথকের বয়ানে বলেছেন –

"সম্ভবত চৈতন্যদেব প্রথম বাঙালি যিনি দেবতা এবং মানুষের মাঝখানের জায়গা পেয়েছিলেন।....ভক্তিভাবের জোয়ার এনেছিলেন তিনি দক্ষিণবঙ্গে, শেষতক উড়িষ্যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে অবতার হয়ে যাওয়া এই মানুষটিকে সমগ্র বাঙালি সমাজ পরিত্রাতা হিসেবে কখনও গ্রহণ করতে পারেনি। এই না পারার কারণ এর উৎস খুঁজলে ওই শৈব শাক্তশ্রেণীর আরষ্টতা পাওয়া যাবে। তাছাড়া চৈতন্যদেব শুধুই ঈশ্বরপ্রেমের কথাই বলেছেন। এই প্রেম সমর্পণের প্রেম। সেখানে কোন ধর্মীয় আচরণের বাধ্যবাধকতা নেই। এই না থাকাটাই বাঙালি হিন্দু সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি।"

হিন্দু ধর্মে শাক্ত, বৈষ্ণব এবং গুরুপ্রথা প্রসঙ্গে **'আকাশকুসুম'** (২০০১) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার লিখেছেন – হিন্দুরা পুতুলকে দেবতা সাজিয়ে, দেবতার কথা কল্পনা করে, পুতুল পুজো করে। তাই বিভ্রান্তি বেড়েই গেছে। আর এই বিভ্রান্তির কারণে হিন্দুদের জীবনে ধর্মীয় শৃঙ্খলা অনুপস্থিত। পুতুল খেলা খেলতে খেলতেই হিন্দুদের পূর্বপুরুষেরা প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিলেন – শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব। হিন্দু-মুসলিম বিরোধের থেকেও প্রবল ছিল শাক্ত-বৈষ্ণবের বিরোধ। মূলত কালীর উপাসকেরাই 'শাক্ত' বলে চিহ্নিত হলেন। শক্তির পূজারীরা কালীর রুদ্ররূপে আশ্বাস পেয়েছিলেন। কিন্তু একটা কল্পিত ভয় কালীর উপাসনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকার কারণে শাক্তরা বাঙালি হিন্দুর আটপৌরে জীবনে মিলেমিশে যেতে পারেনি। শ্রীকৃষ্ণ বাঙালি হিন্দুর কাছে খুব আপন দেবতা কখনই নন বরং গোপাল অনেক কাছের। এই কাছাকাছি হয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল কিছুটা শ্রীচৈতন্যদেবের জন্যে। কিন্তু বৈষ্ণবদের জীবনযাপনের পদ্ধতি ও বাঙালি হিন্দু অন্তরঙ্গভাবে নেয়নি। তারা লক্ষ্মীকে পুজো করেছেন কিন্তু কৃষ্ণ বা নারায়ণকে নয়। শৈবরা তেমন আমল পাননি। হিন্দুরা যদিও একমাত্র শিবরাত্রিতে জল ঢেলে শিবকে স্মরণ করে। ক্রমশ হিন্দুরা যা স্বাভাবিক তাই করল। তার জীবন যাপনের সুবিধার জন্য যে সমস্ত দেবদেবীকে দরকার তাদের স্মরণ নিল। যেমন ব্যবসায়ীরা নিল গণেশ এবং লক্ষ্মীকে, পড়ুয়ারা সরস্বতীকে, দুর্গার ভূমিকা হয়ে গেল বাৎসরিক, কারণ দশহাতের মহিমাকে ঘরোয়া বলে ভাবতে সম্ভবত অসুবিধে হল। কালীকে অশুভের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতীক হিসেবে ভেবে নিয়ে অমঙ্গল দূর করতে হিন্দুরা ভক্তিভরে তাঁকে ঘরে ডেকে নিল। স্বার্থসিদ্ধি হবে বলে নিজের নিজের দেবতা অথবা দেবীকে বেছে নিতে চেয়েছিল হিন্দুরা। এর সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। শতকরা নিরানব্বই ভাগ হিন্দু বেদ-উপনিষদ দূরের কথা, গীতাও পড়েনি বলে ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার মনে করেন। দেবতাদের পুজোর সময় যে ভাষায় মন্ত্রপাঠ হয়, তাও হিন্দুদের কাছে অনেকটাই দুর্বোধ্য, কারণ সমস্ত মন্ত্রই সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারিত হয়।

এই সংস্কৃত ভাষা বেশিরভাগ হিন্দুদের কাছেই দুর্বোধ্য। যার ফলে বাঙালি হিন্দু জীবনে ধর্মীয় শৃঙ্খলা গড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। যেহেতু দেব-দেবীরা এই পুতুলের মধ্যে সীমিত, তাই তাঁদের কাছে প্রার্থনা জানালেও বিনিময়ে কোন মুক্তির পথ পাওয়া যেত না। তাই বাঙালি হিন্দুদের একটা বিরাট অভাববোধ ছিল। সম্ভবত শ্রীচৈতন্যদেব প্রথম বাঙালি যিনি দেবতা এবং মানুষের মাঝখানে জায়গা পেয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে অবতার হয়ে যাওয়া এই মানুষকে সমগ্র বাঙালিসমাজ পরিত্রাতা হিসেবে কখনো গ্রহণ করতে পারেনি। এই না পারার কারণের উৎস হল শৈব এবং শাক্ত শ্রেণীর আরষ্ট সম্পর্ক। শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মীয় আচরণের বাধ্যবাধকতাবিহীন ঈশ্বরপ্রেমের ধর্ম বাঙালি হিন্দু সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। বাঙালি হিন্দুর এই অভাবকে পূর্ণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। মূলত শাক্ত হলেও বাঙালি হিন্দু তাকে শাক্ত বলে সরিয়ে দিতে পারেনি। কারণ কালীসাধকের এই অভিমানী, শিশুর মতো রূপ মানুষ এর আগে দেখেনি। তিনি শাক্ত হয়েও তাঁর কথাবার্তা বৈষ্ণবদের থেকেও নরম ছিল। তিনি অহংকারী, রাগী মানুষ নন। তিনি শাক্ত হওয়া সত্বেও শ্রীকৃষ্ণের নামে মুগ্ধ হতেন। তাই তাঁকে পেয়ে শাক্ত এবং বৈষ্ণব হিন্দু বাঙালির মধ্যে দূরত্ব কমে গেল এবং এই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের, বিবেকানন্দের মত একজন বস্তুমুখী, বিজ্ঞানমনস্ক শিষ্য ছিলেন, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করায় বাঙালি হিন্দুর অনেক অস্বস্তি দূর হয়ে গেল। বাঙালি হিন্দুর জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গুরুদেব হিসেবে পেয়ে তারা ধন্য হল। এই সূত্র ধরেই বাঙালি হিন্দুর জীবনে অনেক গুরুদেবই আলোকিত হয়েছিলেন। যেমন – লোকনাথ বাবা, ওঙ্কারনাথ, অনুকুল ঠাকুর, নিগমানন্দ, বালক ব্রহ্মচারী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যদি বিবেকানন্দের মত শিষ্য না পেতেন এবং পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনের যদি জন্ম না হতো, তাহলে বাঙালির ইতিহাসে রামকৃষ্ণ মিশন এমন এক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে সক্ষম হতো না, যারা একমাত্র সংগঠিত প্রতিষ্ঠান এবং যারা বাঙালিকে সুশৃঙ্খল ধর্মপথে হাঁটতে সাহায্য করে চলেছেন। উপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার লিখিত **'আকাশকুসুম'** উপন্যাসের এই ঐতিহাসিক সত্য কাহিনীর তথ্যগুলি হিন্দু এবং বাঙালি হিন্দুর জীবনের এক সুশৃংখল ইতিহাস বৃত্তান্ত তুলে ধরে বর্তমান গবেষককে তার গবেষণার কাজে প্রভূত সহায়তা করেছে।

'অনুপ্রবেশ' (২০০৫) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সালাম আজাদ অসমের ধর্মীয় ইতিহাস সম্পর্কে অসাধারণ তথ্যাবলী তুলে ধরেছেন। তাঁর উপন্যাসের চরিত্র লুইস

অসম সম্পর্কে জানার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি কামাখ্যা মন্দিরের বেশ কিছু তথ্য উপন্যাসের আর এক চরিত্র অজয় দত্তের কাছ থেকে জেনে ছিলেন।

"এই অঞ্চলের ভূমিপুত্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় উৎসব বিহু। এই উৎসব সে দেখতে চায়। তখন আর কিছুই সে পড়তে আগ্রহী হবে না। অসমের যত বড় বড় মন্দির তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অহম রাজন্যবর্গ। তার মধ্যে কিছু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কোচ রাজারা। অহম রাজন্যবর্গ এসব মন্দিরে পুরোহিত হিসেবে নবদ্বীপের শান্তিপুর থেকে ব্রাহ্মণদের অসমে এনেছিলেন। কিছু কিছু পুরোহিত তাঁরা এনেছিলেন কনৌজ থেকেও। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পুরোহিত অসমে পার্বতীয়া গোসাঁই নামে পরিচিতি লাভ করেন। অসমে বাঙালি বসতির সূচনা ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে লুইস জানে না। তবে এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অসমে আগমন বাঙালি বসতি স্থাপনের একটি মাইল ফলক। লুইস কামাখ্যা মন্দিরের আরও কিছু তথ্য জেনেছিল গুয়াহাটির একজন ভদ্রলোকের কাছে। বইমেলায় তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সে পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়েছে আরও। ভদ্রলোকের নাম অজয় দত্ত। তিনি রাজনীতি করলেও পড়াশুনা করা মানুষ। অসম সম্পর্কে তিনি একটা এনসাইক্লোপিডিয়ার মতো।"

ঔপন্যাসিক সালাম আজাদের **'অনুপ্রবেশ'** (২০০৫) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র লুইস, উপন্যাসের আর এক চরিত্র অজয় দত্তের কাছ থেকে অসমের যে ইতিহাস প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা হ'ল – অসমের ভূমিপুত্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় উৎসব হ'ল বিহু। অহম রাজন্যবর্গ অসমের অনেক বড় বড় মন্দিরে ব্রাহ্মণদের এনেছিলেন, এইসব মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে। কনৌজ থেকেও কিছু কিছু পুরোহিত কোচ রাজারা এনেছিলেন। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা অসমে পার্বতীয়া গোঁসাই নামে পরিচিত হতেন। কুমারী পুজোর তীর্থক্ষেত্র হলো অসম। এখানেই প্রথম কুমারী মেয়েদের পুজো করার প্রথা শুরু হয়। স্বামী বিবেকানন্দ অসমে এসে কুমারী পুজো করেছিলেন। কুমারী পুজোর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কোচ রাজারাও তার মধ্যে কিছু মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। নবদ্বীপের শান্তিপুর থেকেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিনে, কুমারী পুজোর ধারাবাহিকতা বয়ে চলেছে। কারণ অসমের খাসি, জয়ন্তিয়া সমাজ হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। এই সমাজের প্রধান হচ্ছেন মা। লেখক আরো বলেছেন – মোঘলরা বহুবারের প্রচেষ্টাতেও অসম জয় করতে অপারগ হয়েছিলেন। মোগলদের পরাজিত করে, অহম রাজারা পরাজিত মুসলমানদের বন্দি করে, যে যেরকম কাজের উপযুক্ত তাকে সেই রকম কাজের ব্যবস্থা করে পুনর্বাসিত করতেন। এই যুদ্ধবন্দী মুসলমানদের বিভিন্ন উপাধিও অহম রাজারা দিতেন। যেমন – বরুয়া, বড়া, হাজারিকা। এরকম উপাধি হিন্দুদেরই সাধারণত দেওয়া হতো। কিন্তু অহম রাজাদের উদারতা যে কত বড়, তা প্রমাণিত হয়

যুদ্ধবন্দীদের হত্যা না করে, তাদের উপাধিসহ পুনর্বাসিত করা থেকে। অসমের আজকের যে মুসলমান, যারা নিজেদের অভিজাত মুসলমান বলে দাবী করে, তারা প্রায় সকলেই মুঘলদের নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারী। কিন্তু অসমের মুসলমানরা কোনদিনই ঐক্যবদ্ধ ছিল না। অষ্টাদশ শতকে আপার অসমে আজান ফকির, অসমের মুসলমানদের অরগানাইজ করে শান্তির পথে আসার আহ্বান জানান। তাই অসমে মুসলমানদের বসতি স্থাপনের ইতিহাসে আজান ফকির মানুষটি একটি মাইলস্টোন। এই উপন্যাসের উপরোক্ত বিবৃতি থেকে বোঝা যায় যে – হিন্দু রাজারা, যারা অসমে মুসলমানদের প্রতি বন্ধুত্ব ভাবাপন্ন ছিলেন এবং সেই কারণেই তারা যুদ্ধবন্দী মুসলমানদের সঙ্গে এমন উদারতাপূর্ণ ব্যবহারের পরিচয় দেন, যা পাঠকের কাছে সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায়, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মানসিকতা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তার সার্থক ঐতিহাসিক দিকটি, ঔপন্যাসিক অত্যন্ত ব্যুৎপত্তিতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ঔপন্যাসিক সালাম আজাদ তাঁর **‘অনুপ্রবেশ’** (২০০৫) উপন্যাসে আরও জানিয়েছেন যে – বর্তমানে অসমে বাংলাভাষী হিন্দুরা খুবই অহংকারের সঙ্গে দাবি করে যে তারা বাঙালি কিন্তু বাংলাভাষী মুসলমানেরা নিজেদের পরিচয় শুধুমাত্র মুসলমান অথবা সংখ্যালঘু হিসেবেই দিয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে **‘অনুপ্রবেশ’** (২০০৫) উপন্যাসের চরিত্র লুইসের একটি বিষয় খুব চোখে লেগেছিল তা হ’ল –

“কেউ কেউ বলে আমরা মিয়া, যদিও বাংলাভাষীরা হচ্ছে বাঙালি।....বাঙালি না মুসলমান অনেকটা এই প্রশ্নেই তো বাংলা ভাগ হয়েছিল। সেটাই কি ধরে রাখতে চায় অসমের মুসলমান বাঙালী? কিন্তু সেটা তো কোন সম্মানজনক কাজ ছিল না।”

অসমের মুসলমানেরা বাংলায় কথা বললেও নিজেদের বাঙালি মনে করেনা। অথচ বাংলা হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র ভাষা যা প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু বাংলাদেশ নয়, অসমের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল মানুষই রক্ত দিয়েছিল। ভারতবর্ষের মুসলমানরাই প্রথম বাংলায় বক্তৃতা শুরু করেছিলেন। বাঙালি মুসলমানদের ক্ষেত্রে যা এক বিরাট অহংকারের বিষয় হতে পারে। কিন্তু অসমের বাঙালি মুসলমানেরা নিজেদের শুধুমাত্র সংখ্যালঘু বা মুসলমান বলে পরিচিত করানোর বিষয়টিকে বর্তমানে অসন্মানজনক বলে মনে করেন না। পত্রিকার খবর অনুযায়ী স্বয়ং অসমের রাজ্যপাল বলেছেন, প্রতিদিন প্রায় ছয় হাজারেরও বেশি মানুষ বাংলাদেশ থেকে অসমে এসে ঢুকছে। তাদের সকলেই প্রায় মুসলমান। আর তারা কেউ ফিরে যাচ্ছে না। এই কারণে ভারতবর্ষের জম্মু-কাশ্মীর ছাড়া, মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্যের মধ্যে এক নম্বরে হচ্ছে অসম। ভারতবর্ষে সম্প্রতি যে ধর্মভিত্তিক সেনসাস চিত্র প্রকাশিত হয়েছে, এই চিত্র

সেই সেনসাসের। উপরোক্ত উপন্যাসের জাতপাত বিষয়ক পরিস্থিতির সূত্র ধরে বলা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষে যে জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার উপাদানে গড়া ধর্মীয় কাঠামো দৃশ্য হয়, যা এখনো পরিপূর্ণভাবে সহিষ্ণুতার জন্ম দিতে অক্ষম বলা যেতেই পারে। তৎসত্ত্বেও একথা স্বীকার করা যেতে পারে যে, অসমের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝে কামাখ্যামন্দিরের যে তীর্থস্থান, তা দর্শককে মোহিত করে। ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলির প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন সর্বদাই তীর্থযাত্রীদের শুধুমাত্র তীর্থস্থানের প্রতি আকৃষ্ট করে না বরং তার থেকে বেশি আকৃষ্ট করে তীর্থস্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্যের বাতাবরণের কারণেই। সেই সূত্র ধরেই ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহ লিখিত **'পর্ণমোচী'** (২০০৪) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র দিগন্ত, উপন্যাসের আর এক চরিত্র ইন্দি সেনকে, ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলিতে বেড়াতে গিয়ে তার সৌন্দর্যের বিবরণ ও ধর্মের ইতিহাসের দিকটিকে প্রাধান্য দিয়ে চিঠি লিখছেন। সেই চিঠিরই কিছু অংশ গবেষণার তথ্য হিসেবে বর্তমান গবেষক তুলে ধরলেন। –

"বুঝলে ইন্দি, অমরকন্টকের গভীর জঙ্গলাবৃত বিন্ধ্য পর্বতমালার দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার মনে হয় যে আমাদের যেকোন তীর্থস্থানে মন্দিরের মধ্যে যা আছে তার চেয়ে অনেকই বেশি আছে সেই তীর্থস্থানের পথে। হিন্দুদের সব তীর্থ সম্বন্ধেই বোধহয় একথা বলা চলে। সেই পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য, তার সৌন্দর্য এবং অমোঘতা, তার ভয়াবহতাই মানুষকে বিনত করে, SUBLIME করে, HUMILITY- তে ভরে দেয় তার মন। এমনি করেই তার মনের আধারটি ঈশ্বরের ভাবনা ভাবার যোগ্য হয়ে ওঠে। ওঠে বলেই আমার বিশ্বাস।....ভাবছ, আমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি? উত্তরে আমি বলব, তোমাকে খুবই অবাক করে দিয়ে বলবো যে, করি। মূর্তিতে বিশ্বাস করিনা কিন্তু ঈশ্বরে অবশ্যই করি। ঈশ্বরবোধহীন মানুষ, ধর্মরহিত মানুষ, ন্যায়-অন্যায় বোধহীনও হতে বাধ্য। সে মনুষ্যেতর জীব। জানোয়ারের ঈশ্বরবোধ বা ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকে না। কিন্তু মানুষের থাকে। থাকা উচিত অন্তত। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের মূল উদ্দেশ্যই হয়তো : মানুষকে মনুষ্যত্ব যোগ্য করে তোলা, তাকে মনুষ্যেতর হতে না-দেওয়া।"

ভারতবর্ষের সৌন্দর্য ও পবিত্রতার সংস্কৃতির মূর্তরূপ ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলির ঐশ্বর্য। ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহ তাঁর উপন্যাস **'পর্ণমোচী'**-র (২০০৪) চরিত্র দিগন্ত সেই ঐশ্বর্য আবিষ্কারের আনন্দ উপলব্ধি করার কারণেই এবং কেন ভারতীয়রা বা ভারতের বাইরের মানুষেরা এইসব তীর্থস্থানগুলিতে আসেন তা জানার আকাঙ্খাতেই অমরকন্টকের পথে যাত্রা করেছিলেন এবং তার সম্পূর্ণ তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতা তিনি একটি চিঠিতে ইন্দি সেনকে লিখে পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে, অমরকন্টকের মন্দির নয়, কোন জায়গার কোন মন্দিরই তাঁর কাছে প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় নয়। কারণ ভারতবর্ষের তীর্থস্থানের মন্দিরের মধ্যে যে

ঈশ্বর অনুভূতি হয়, তার থেকে অনেক বেশি ঈশ্বরানুভূতি তীর্থস্থানের পথে পথে অবস্থান করে। তার মতে হিন্দুদের প্রায় সমস্ত তীর্থস্থানগুলিরই ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। কারণ তীর্থস্থানগুলির পথের স্বর্গীয় সৌন্দর্য, অনেক সময় পথের ভয়াবহতা এবং মানুষের আত্মার সাথে সেই সৌন্দর্যরূপ ঈশ্বরানুভূতির বা পরমাত্মার একাত্মতা, মানুষকে সেই সৌন্দর্যরূপ পরমাত্মার অনুভূতির কাছে নত করে, বিনম্র করে ও বিস্মিত করে। মানুষের মন এই বিস্ময়ের হাত ধরেই ঈশ্বর ভাবনায় স্নাত হয়। ঈশ্বরের ভাবনা ভাবার যোগ্য হয়ে ওঠে বলেই লেখকের বিশ্বাস। লেখকের মতে, ঈশ্বরবোধহীন মানুষ, ধর্মরহিত মানুষ সাধারণত ন্যায়-অন্যায় বোধহীন হতেও বাধ্য হয়। তাই মানুষ সেই অবস্থায় 'মনুষ্য' পদবাচ্যের পরিবর্তে 'মনুষ্যেতর জীব' রূপে প্রতিপন্ন হতে পারে, কারণ পশু বা জানোয়ারের কোন ঈশ্বরবোধ বা ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকেনা। কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্বপূর্ণ মানুষের ঈশ্বরবোধ এবং ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকে যা লেখকের অভিমতানুযায়ী, অন্তত তা থাকা উচিত। কারণ পৃথিবীর সমস্ত ধর্মেরই মূল উদ্দেশ্য – মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের যোগ্য করে তোলা এবং অবশ্যই তাকে মনুষ্যেতর জীব হতে না দেওয়া। ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের **'বিজনে নিজের সঙ্গে'** (২০০১) উপন্যাসে তাঁর বয়ানে ইস্তাম্বুল শহরের ধর্মীয় ইতিহাস প্রসঙ্গে যে বিবরণ দিয়েছেন, বর্তমান গবেষকের গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রয়োজনে তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে।

"আগে জানতাম না। টার্কিতে জনসংখ্যার আটানব্বই শতাংশ এখন মুসলমান হলেও সেটি সংবিধানগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সেখানে অসংখ্য মসজিদ, গির্জা ও পেগান আমলের ধর্মস্থানের সহাবস্থান।....তা ছাড়াও ইস্তাম্বুলই পৃথিবীর একমাত্র শহর যা দুটি মহাদেশে বিস্তৃত। সত্যিই তাই, ইস্তাম্বুল শহরের কিছু অংশ এশিয়ায়, কিছুটা ইউরোপে। ব্রিজ পেরিয়ে যখন তখন এশিয়া থেকে ইউরোপে যাওয়া যায়। কোনও ভিসা-টিসার প্রয়োজন হয় না।....ইস্তাম্বুলের একটি সৌধের কথা না বললেই নয়।....এর নাম সোফিয়া, বা হাজিয়া সোফিয়া।"

'বিজনে নিজের সঙ্গে' (২০০১) উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়ানে ইস্তাম্বুলের হাজিয়া সোফিয়া সৌধের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা এই বিশ্বায়নের যুগে সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল প্রমাণ হয়ে উঠতে পারে – ইস্তামবুলের এই সৌধের কথা সর্বজনবিদিত। রোমান সম্রাটরা এই কনস্তান্তিনোপোলে একটি গীর্জা বানিয়েছিল, সেটা যেমন সুদৃশ্য ছিল, তেমনই সুবিশালও ছিল। এর নাম সোফিয়া, বা হাজিয়া সোফিয়া। 'হাজিয়া' শব্দটির অর্থ 'পবিত্র', আর 'সোফিয়া'-র একটি অর্থ 'মূর্তিমতী দিব্যজ্ঞান'। ইস্তাম্বুলের এই হাজিয়া সোফিয়া ধার্মিক সৌধটি যেন প্রকৃতধর্মের সমার্থক

শব্দ হয়ে উঠেছে। খ্রীষ্টানদের জগতে রোমের ভ্যাটিকানের পরই এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মস্থান। প্রায় পাঁচশো বছর এই গীর্জাটি খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা ভবন ছিল। তারপর রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর মুসলমানরা এটি দখল করে, পরবর্তীকালে মুসলমানেরা এই হাজিয়া সোফিয়া সৌধটির বাইরে, চারপাশে চারটি গম্বুজ বানিয়ে এটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করে। তারপর প্রায় এক হাজার বছর ধরে, এই মসজিদে মুসলমানরা নামাজ পড়েছে। তারপর তুরস্কে আধুনিকতার প্রবর্তক কামাল আতাতুর্ক এসে ঘোষণা করে দেন, এই হাজিয়া সোফিয়া আর শুধু মসজিদ থাকবে না, গীর্জাও হবে না। এটি একটি ঐতিহাসিক পুরকীর্তির নিদর্শন হয়ে বিরাজ করবে। এর সংরক্ষণ করবে সরকার এবং যে কোনো ধর্মের মানুষদের এখানে প্রবেশ ও প্রার্থনা করার অধিকার থাকবে। বর্তমানে এই হাজিয়া সোফিয়াতে টুরিস্টদের ভিড়ের মধ্যেও মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের কাছাকাছি বসে প্রার্থনায় মগ্ন হতে দেখা যায়। এই হাজিয়া সোফিয়া যখন গির্জা হিসেবে নির্মিত হয়েছিল তখন এর প্রতিটি দেওয়ালে বড় বড় শিল্পীদের দ্বারা কৃত অসংখ্য রঙিন রেখাচিত্র বর্তমান ছিল। ইসলাম মতে মূর্তি বা মানুষের ছবি পুজো করা নিষিদ্ধ। তৎসত্ত্বেও হাজিয়া সোফিয়াকে গির্জার পরে যখন মসজিদ করা হয় তখন তৎকালীন মুসলমান শাসকেরা সুবুদ্ধির বা শিল্পবোধের বশবর্তী হয়ে ওই মহামূল্যবান ফ্রেস্কোগুলো ধ্বংস না করে বা নিশ্চিহ্ন না করে তা পুরো চুনকাম দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন। বর্তমানে হাজিয়া সোফিয়া যখন সর্বধর্ম সমন্বয়ের স্থান হিসেবে ঘোষিত হ'ল, তখন আবার সেই অমূল্য ইতিহাসের উপাদান ছবিগুলিকে খুব সযত্নে চুনকাম তুলে দিয়ে পুনরুদ্ধার করা হলো। হাজিয়া সোফিয়া একটি দেওয়ালে এক রাজা-রানীর ছবিতে রাজার মুখখানা তার শরীরের সঙ্গে ঠিক মানানসই ছিল না। **'বিজনে নিজের সঙ্গে'** (২০০১) উপন্যাসে, ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতানুযায়ী, ঐতিহাসিকেরা এর কারণ হিসেবে যে তথ্যসত্য অন্বেষণ করে আবিষ্কার করেছেন, তা হ'ল, প্রথম রাজার মৃত্যুর পর তাঁর রানী তাঁর প্রথম স্বামীর ধরের উপর, শিল্পীদের দিয়ে দ্বিতীয় স্বামীর মুন্ডুটা শিল্পকৃতিতে জুড়ে দিয়েছিলেন। এই বিষয়টি আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে, নারী মনস্তত্ত্বের স্বাধীনতার যে অসাধারণ স্বাধীনচেতা মননের পরিচয় বহন করছে, সেই যুগের নারী ভাবনায়, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেই যুগের নারী স্বাধীনতাকে ধর্ম কতখানি সমর্থন করলে, একজন রানী তাঁর প্রথম স্বামীর ধরের জায়গায় দ্বিতীয় স্বামীর মাথা জুড়ে দেওয়ার মতো শিল্পকৃতিকে, ধর্মীয় স্থানের দেওয়ালে পরিস্ফুট করে তুলে দ্বিতীয় স্বামীকে প্রথম স্বামীর মর্যাদা দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। এই ঘটনায় যেমন নারী স্বাধীনতার দিকটি

প্রদীপ্ত হতে পারে, তেমনি ধর্মে বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে, সর্বধর্ম সমন্বয়ের চিত্রটিও অত্যন্ত স্বচ্ছতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে একথা স্বীকার করা যেতে পারে।

রাজনৈতিক দিক

যেখানে মানুষ নয়, মানুষের পদাধিকার বা পদমর্যাদা মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়, সেখানে ক্ষমতার মোহ মানবিক সম্পর্ককে যদি অতিক্রম করে যায়, তাহলে তা কোন অপ্রত্যাশিত বিষয় হতে পারে না। বর্তমানে কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে মানুষের জীবনের নানান ক্ষেত্রে যে দলাদলি মানুষ প্রত্যক্ষ করে, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ‘জনসেবা’ হতে পারে না বরং তাকে ‘ক্ষমতা আহরণের নীতি’ নাম দেওয়া যেতে পারে। সেই কারণেই রাজনৈতিক দলগুলো দল হিসেবে আইনের সৃষ্টি নয়, আইনের দ্বারা সংগঠিতও নয়, এমনকি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সংবিধানেও রাজনৈতিক দলের কোনো উল্লেখ নেই। একমাত্র সোভিয়েত রাষ্ট্রে সংবিধান স্বীকৃত সরকারি দল হিসেবে কমিউনিস্ট দল স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু আইন বহির্ভূত হলেও রাজনৈতিক দলের অবস্থান প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বর্তমান। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমাজের সামাজিক কারণেই দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক। তাহলে বলা যেতে পারে রাজনীতির বিষয়বস্তু হলো সমাজ। রাজনৈতিক দলগুলির প্রাথমিক কাজই হ’ল, প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ও মতের বিভেদকে চিহ্নিত করে, তাদের সংগঠিত করা। সমাজের ধর্মবোধ এই রাজনৈতিক দলগুলির কর্মপদ্ধতির সাথে অনেক সময়েই ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত থেকে, সমাজের মানুষকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হতে পারে। ধর্ম সমাজস্থ মানুষের শুধুমাত্র বিশ্বাস নয়, এ এক সমাজের মানুষের গভীর অনুভূতি, যা মানুষের বুদ্ধির বিকাশের ক্রমান্বয়ে উন্নতির সোপান হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর **‘অশেষ’** (২০০৫) উপন্যাসে স্বামী বিবেকানন্দের ভারত দর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রগতির কালে স্বামী বিবেকানন্দেরই অসাধারণ বক্তব্য লেখক তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। যা রাজনীতির আঙ্গিকে ধর্মের চিত্রপ্রদর্শনী বলা যেতে পারে। বিবেকানন্দ বলছেন –

“এইবার আমার ভারত দর্শন। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পুব থেকে পশ্চিম ভারতবর্ষের জনজীবনের মধ্যে দিয়ে আমার এগিয়ে চলা। সেই সময় আমি বলেছিলাম - হে বীর যুবকবৃন্দ, দেশে দেশে আগে যাও, বিভিন্ন দেশের অবস্থা বেশ করে দেখ। নিজের চোখে দেখ, পরের চোখে নয়, তারপর মাথা থাকে তো ঘামাও।....এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম আর

তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে দিয়ে হয় তো হবে; নইলে তোমার চেঁচামেচিই সার।"

ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর **'অশেষ'** (২০০৫) উপন্যাসে স্বামী বিবেকানন্দ যে কর্ম করতে উদ্যোগী হতে বলেছেন, তা থেকে বলা যেতে পারে যে, স্বামী বিবেকানন্দ এক উচ্চস্তরের রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তাই তিনি দেশের বীর যুবকবৃন্দকে, দেশের কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। মানুষের প্রকৃত সেবার উদ্দেশ্যে, দেশের কাজে যোগ দেওয়ার আগে, দেশকে সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে জ্ঞাত হওয়া ও তারপরে দেশের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হওয়া, বুদ্ধিমান জ্ঞানী যুবকদের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হতে পারে। এছাড়াও নিজস্ব জ্ঞানবৃদ্ধির কারণে একদিকে যেমন পুরাণপাঠ, নানান পুঁথিপাঠের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে হবে, ঠিক তেমনই বুদ্ধিমান পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের ছায়ায় স্ব-দর্শনও করতে হবে। কারণ স্বামীজীর মতে মানুষের চিন্তার ঐশ্বর্য, শাস্ত্রে বর্তমান। মন থেকে বিশ্বমনের অনুধ্যানের মাধ্যমে জন্মভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারা যেতে পারে। তিনি বলেছেন যে, যে ধর্ম গরিবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা সমান সম্মান করে না, সেই ধর্ম কখনোই প্রকৃত ধর্ম হতে পারেনা। যে ধর্ম বিচারসর্বস্ব, সেই ধর্ম মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারে না। স্বামীজি আরও বলেছেন সেই মানুষ চাই, যার থাকবে শংকরের ক্ষুরধার বুদ্ধি, বুদ্ধের হৃদয় ও চৈতন্যের প্রেম। সমগ্র বিশ্বকে আধ্যাত্বিকতার দ্বারা জয় করা সম্ভব হতে পারে। স্বামীজীর উপরোক্ত এই মতামত অত্যন্ত বৃহৎ মাপের রাজনীতিজ্ঞের পরিচয় বলা যেতে পারে। ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের **'হরপার্ব্বতী সংবাদ'** (২০০২) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে গণতন্ত্র ও রাজনীতি নিয়ে যে কথোপকথন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা থেকে দেশের রাজনীতির আভাসও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

"আচ্ছা মহেশ্বর, তুমি বলতে পার গণতন্ত্র জিনিসটা কি বস্তু! আমি জগৎ সৃষ্টি করলুম প্রজা সৃষ্টি করলুম। পৃথিবীকে ঘুরিয়ে দিলুম লাট্টুর মত। বলে দিলুম, রাজার কর্তব্য কী, প্রজাপালন কিভাবে করতে হয়! সমাজ কিভাবে গড়ে উঠবে। সামাজিক রীতিনীতি কি হবে।....বেদ আছে বেদান্ত আছে। গীতা আছে। কয়েকশো ব্যাখ্যা আছে। মন্দির আছে, মসজিদ আছে, গির্জা আছে, গুরু আছে, চ্যালা আছে, মেলা আছে, প্রণামী আছে, সব আছে, কেবল আপনিই অনুপস্থিত। মহেশ্বর আমার এ দশা হল কেন? মানুষকে অত পাওয়ার দিলে এইরকমই হবে প্রভু। পিতা হয়ে পিতার কর্তব্য করেননি। শাসনের অভাব।....ধর্ম-কর্ম সব গেছে। থাকার মধ্যে আছে রাজনীতি। আপনাকে ভজে ভজে মানুষের খুব আক্কেল হয়ে গেছে। পায় তো ঘোড়ার ডিম। কেউ তারকেশ্বরে, কেউ কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে ঘন্টার পর

ঘন্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো।....পান্ডা আর সেবাইতদের পেট মোটা হয়। ঐশ্বর্য বাড়ে। নিজেরা পায় কাঁচকলা।....আপনার ওপর মানুষের আর আগের মত বিশ্বাস নেই।"

'হরপার্ব্বতী সংবাদ' (২০০২) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় উপন্যাসের চরিত্র বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কথোপকথনে যে গণতন্ত্র ও রাজনীতির কথা উঠে আসছে তা বর্তমান গণতন্ত্র ও রাজনীতির সাপেক্ষে মানবসমাজের ক্ষেত্রে, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বার্তা হয়ে উঠেছে। মহেশ্বর ও বিষ্ণুর কথোপকথন যেন প্রতীকী হয়ে উঠেছে। গণতন্ত্রের নামে মানুষ রাজনীতির ক্ষেত্রে যেভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছে তা অনেক সময়েই অগণতান্ত্রিক হয়ে উঠছে। কারণ সমাজে সাম্প্রদায়িকতার কারণে যে হিংসা, দ্বেষ বিভেদরূপ এঁটোকাটা সমস্ত মানব সমাজের সুন্দর মানসিকতার মাহাত্ম্য নষ্ট করছে, তা অত্যন্ত ভীতিজনক হয়ে উঠতে পারে। দেশে মন্দির আছে, মসজিদ আছে, গির্জা আছে, কিন্তু সমাজের পারস্পরিক সাম্প্রদায়িকতার যূপকাষ্ঠে, মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্বের ধর্ম সম্পর্কে মানসিকতা অন্তর্হিত হয়েছে বলা যেতে পারে। প্রকৃত মনুষ্যত্বের মানসিকতার ধর্মকে ব্রাত্য করে দিয়ে, জাতপাতের রাজনীতির ধর্মকেই মানুষ বেশি প্রাধান্য দিয়ে মানুষে-মানুষে যে বিভেদের লক্ষণরেখাকে অত্যন্ত জোরালো করে তুলেছে তা বলা যেতে পারে। ঈশ্বরকে মানুষ যেমন বিশ্বাস করে, নিজের অন্নের সংস্থান না থাকা সত্বেও ঈশ্বরকে সেবা হিসেবে পুজো দেয়, কিন্তু সেই অর্থে সেই ঐশ্বরিক বিশ্বাসের তেমন কোনো সদর্থক ফলাফল সর্বদা প্রাপ্ত হয় না, ঠিক সেইরকমই ভারতবর্ষের প্রায় চুয়াত্তর বছরের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষ গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক বিশ্বাসভাবনাকে সর্বদা যে সঠিকভাবে প্রাপ্ত হয়েছে তা বলা যেতে পারে না। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে সাম্প্রদায়িকতার বিভেদ ভারতবর্ষকে তিন টুকরো করেছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ। এই সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর **'হরপার্ব্বতী সংবাদ'** (২০০২) উপন্যাসে প্রতীকীরূপে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিতার সাথে তুলে ধরেছেন, যা বর্তমান গবেষণার কাজকে অত্যন্ত উপকৃত করেছে। দুর্নীতিই নীতিহন্তক। তাই রাজনীতির 'নীতি'-কে যদি হত্যা করা হয়, তাহলে শুধুমাত্র 'রাজ' কথাটিকেই প্রাধান্য দিতে হয়, যা প্রকৃত ধার্মিক রাজনীতি কখনোই হয়তো হয়ে উঠতে পারে না। উপরোক্ত প্রসঙ্গেই **'বিভীষণ'** (২০০৫) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক ডঃ দীপক চন্দ্র তাঁর উপন্যাসের চরিত্র বিভীষণ ও বিভীষণপুত্র তরণীসেনের কথোপকথনে যে নীতির প্রসঙ্গ তুলেছেন তা হ'ল –

“নীতির দুটো দিক আছে। দেশ, কাল, পাত্র, সমাজ, সভ্যতা সব কিছুর ঊর্ধ্বের যে নীতি তা হল – আদর্শবাদী নীতি। এই নীতি নিয়ে দুনিয়া চলে না। যে নীতি ব্যাবহারিক তা নির্দিষ্ট হয় সমাজ, ধর্ম, আর্থিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা এবং ঐতিহাসিক বিবর্তন দিয়ে।”

‘বিভীষণ’ (২০০৫) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক ডঃ দীপক চন্দ্র তাঁর উপন্যাসের চরিত্র বিভীষণ ও বিভীষণপুত্র তরণীসেনের কথোপকথনে যে নীতির প্রসঙ্গ তুলেছেন, সেই নীতি অনুযায়ী রাজনৈতিক উচ্চাশা পূরণের জন্য, আধিপত্য বিস্তারের জন্য, নিজের চরিত্র কলঙ্কিত করতে, নীতিহীন মানুষের কোন মনোকষ্ট হয়না। এমনকি নীতিহীন, বিবেকহীন, ধর্মহীন কাজের জন্যও এই নীতিহীন মানুষদের কোন অনুতাপও থাকে না। এই নীতিহীন মানুষদের কাছে ‘স্বার্থ’ – বিষয়টি, শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ হয়। কারণ নীতিহীন মানুষদের নিজেদের কর্মের ক্ষেত্রেও বিচার-বিশ্লেষণ হয় স্বার্থগত। স্বার্থ-দুর্বলতা এবং স্বার্থ-আনুগত্যই বিভেদ যুদ্ধ প্রস্তুতির মূলধন বলা যেতে পারে। কারণ মানুষ নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে, চরিত্রগুণে বহু মানুষের মঙ্গল ও উন্নয়নের কার্যে নিজেকে রত করতে পারে। কিন্তু বলা যেতে পারে, নীতিহীন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের জোর তেমনভাবে থাকে না। ফলে তা বিশ্বভাতৃত্বের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে।

‘ত্রাস’ (২০০১) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সিস তাতান এক সাংবাদিকের বয়ানে লিখেছেন –

“মিশনারী ইংরেজরা ঢুকে পড়েছে ছোটনাগপুরের জঙ্গলে। বিভিন্ন জায়গায়, যেখানে সেখানে আদিবাসী সাঁওতালদের বাস। মত্তকা বুঝে যেখানে সেখানে তৈরি করছে মিশনারী স্কুল এবং চার্চ। গরিব সাঁওতাল আদিবাসীদের ওরা ভালো খাবার দেয়, পোষাক দেয় ভালোভাবে স্নান করিয়ে পোষাক পরিয়ে চার্চে নিয়ে গিয়ে প্রার্থনাসভায় জায়গা দেয়, ধীরে ধীরে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করে। তারপর ইংরেজি শেখায়। ইংরেজি শিখলে ইংরেজদের দপ্তরে চাকরি দেবার টোপ দেয়। এভাবে ধীরে ধীরে আদিবাসী সাঁওতাল যুবকদের একটা অংশকে ইংরেজরা তাদের হাতের পুতুল করে ফ্যালে। বিরসাও কিছুদিন মিশনে থেকেছেন লেখাপড়াও শিখেছেন। কিন্তু তাঁর সুচতুর বিদ্রোহী মন ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি হয়নি।”

ঔপন্যাসিক সিস তাতানের উপন্যাস **‘ত্রাস’** (২০০১) মূলত মধ্যযুগীয় ভাবধারায় পরিপুষ্ট এক উগ্র ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ এক বিশ্বব্যবস্থার বর্ণনা। ত্রাস উপন্যাসটি একটি ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মননশীল মানবতাবাদী উপন্যাসরূপে গণ্য হতে পারে। ব্রিটিশরাজ ছোটনাগপুরের জঙ্গল

অঞ্চলের অরণ্য ধ্বংস করে কাঠ পাচার করত এবং সেই বিপুল অর্থে নিজেদের রাজকোষ পরিপূর্ণ করতো। এর প্রতিবাদ স্বরূপ ছোটনাগপুরের দামড়ি পাহাড়ের জঙ্গলে হাজার হাজার সশস্ত্র সাঁওতাল যুবকদের বীর বিদ্রোহী বিরসা মুন্ডা 'উলগুলান' বা 'বিপ্লব'-এর বীজমন্ত্র দিয়েছিলেন। সেই 'উলগুলান' বা 'বিপ্লব'-এর বীজমন্ত্রে দীক্ষিত সাঁওতাল জাতি স্বপ্ন দেখেছিল, ছোটনাগপুরের বনাঞ্চলের ওপর সাঁওতালদের স্বাধীনতা। কিন্তু ব্রিটিশরাজ এই বিদ্রোহ এবং সংগ্রামকে, অরণ্যচারী আদিবাসীদের ওপর ভয়ানক নির্যাতন করে দমন করতে চেয়েছিল। ব্রিটিশ, রাজবিদ্রোহী বিপ্লবী বিরসা মুন্ডাকে গ্রেপ্তার করে এবং মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে ইংরেজদের অকথ্য অত্যাচারে বিপ্লবী বিরসা মুন্ডা শহীদ হন। ইংরেজরা ছোটনাগপুরের বনাঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব, স্বাধীন রাজত্ব, জঙ্গলের কাঠ এমনকি ভূ-সম্পদকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করবে বলে এবং তার বিনিময়ে সাঁওতালদের মিশনারি সদনের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার সুযোগ দিতে অগ্রসর হয়েছিল। আর মিশনে যোগ দেওয়ার প্রধান শর্ত ছিল – খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়া। এছাড়াও আরো কিছু অসম্মানজনক শর্ত ছিল, যার সরব প্রতিবাদ করেছিলেন প্রতিবাদী বিরসা মুন্ডা। পরিবর্তে তিনি যে গর্হিত রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন, তাতে এক ধর্মীয় প্রচ্ছন্ন প্রভাব নজরে পড়ে। নিচু জাতি আদিবাসীদের ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে, তাদের খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার যে নিকৃষ্ট রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছিল, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে মনে করা যেতে পারে। এই নিকৃষ্ট রাজনীতির প্রতিবাদ করে প্রতিবাদী, বিদ্রোহী বিরসা মুন্ডা নিজেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে ঈশ্বরতুল্য করে তুলতে পেরেছিলেন। তাই আজও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কাছে 'ত্রাতা' বিরসা মুন্ডা, 'ভগবান' বিরসা মুন্ডা বলে পরিচিত। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কাছে ভগবানের অর্থ বিপ্লবের নেতা বা উলগুলানের নেতা। ধর্মাশ্রয়ী ভগবানকে তারা ব্রাত্য মনে করে। ভগবান বিরসা মুন্ডা তাই সাঁওতাল আদিবাসীদের কাছে মানবিক ও বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন এক পথপ্রদর্শক। তাই বলা যেতে পারে, ভগবান বিরসা মুন্ডা ধর্মীয় প্রতিভূ না হয়েও, নির্ভীক বিপ্লবের মাধ্যমে সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে ঐক্যভ্রাতৃত্ব জাগিয়ে তুলে বিশ্বভাতৃত্বের পথ উন্মুক্ত করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঔপন্যাসিক সিস তাতানের লেখা **'ত্রাস'** (২০০১) উপন্যাসের মতোই ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদারের লেখা **'এত রক্ত কেন'** (২০০১) উপন্যাসেও ত্রিপুরার আদিবাসী অঞ্চলে এবং পাহাড়ের মানুষদেরকেও ব্রিটিশদের প্রশ্রয়ে, খ্রিস্টান মিশনারীরা ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টায় রত থাকতো, এ এক অদ্ভুত রাজনৈতিক ধর্মান্তরিত করার খেলা বলা যেতে পারে।

“ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ব্রিটিশদের প্রশ্রয়ে আসা খ্রিস্টান মিশনারীরা যে ধর্মপ্রচারে নেমেছিল তাদের কাজের জায়গা প্রশস্ত ছিল আদিবাসী অঞ্চল এবং পাহাড়ের মানুষদের মধ্যে। ত্রিপুরার আদিবাসীরা মূলত হিন্দু এবং দরিদ্র। এদের সচ্ছলতার স্বপ্ন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করতে যেটুকু অসুবিধা হচ্ছিল, বাঙালি খেদাও আন্দোলন সেটা কিঞ্চিৎ দূর করল। বাঙালিরা হিন্দু।....হিন্দু হয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না। তোমরা খ্রিস্টান হও, নিজের মাটি নিজে ভোগ কর। কিছুটা সাড়া পাওয়া যে যায়নি তা নয় কিন্তু সব মানুষ চট করে ধর্ম ছাড়তে পারছিল না। অভ্যেস অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।”

ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার লিখিত **‘এত রক্ত কেন’** (২০০১) উপন্যাসে হিন্দু ত্রিপুরার আদিবাসী ও পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষদের খ্রিস্টান করার মত নিন্দনীয় কাজের পূর্বে উপন্যাসস্থিত চরিত্র ট্রাইবাল ন্যাশনাল ভলেন্টিয়ারের নেতা বিজয় রামখেল, ত্রিপুরার মানুষের অধিকার আদায় করার জন্য এক রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে ব্যাপক গণআন্দোলনের ভাবনায় ভাবিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ, সংঘাত ও দাঙ্গা হওয়ার কারণে শেষপর্যন্ত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তাদের পৃথক জেলা পরিষদ গঠন করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। সেইসময়ে এই অধিকার আদায়টাই অনেকখানি মনে হলেও, পরবর্তীকালে নতুন দল ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা বিষয়টিকে তুচ্ছ মনে করে, মেনে নিতে চাইল না। তাদের স্লোগান হ’ল – বাঙালি খেদাও, স্বাধীন ত্রিপুরা চাই। এ ব্যাপারে একটা বিষয় লক্ষ্য করার মত ছিল যে এই নতুন দল, ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরায়, দলের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে বিষ্ণুপ্রসাদ জামাতিয়া এবং নয়নবাসি জমাতিয়া ছাড়া সবাই খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। ব্যাপ্টিস্ট চার্চ এর সঙ্গে তাদের একটা সদর্থক সম্পর্ক বর্তমান। ত্রিপুরার আদিবাসীরা মূলত দরিদ্র হিন্দু ছিল। ভারতবর্ষে নানা প্রদেশেই ব্রিটিশদের প্রশ্রয়ে খ্রিস্টান মিশনারীরা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারে নেমেছিল এবং তাদের কাজের জায়গা মূলত তারা দরিদ্র আদিবাসী অঞ্চল এবং পাহাড়ের দরিদ্র মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করেছিল। কারণ এই আদিবাসীদের দারিদ্রতাকেই পুঁজি করে, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে, তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে, তাদের সচ্ছল জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে, এই সমস্ত শর্তসাপেক্ষে তাদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হতো। এই ধর্মান্তরিত করার রাজনীতির শিকার, ত্রিপুরার দরিদ্র হিন্দু ও পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দুদের মধ্যে যে সংঘাতের সৃষ্টি করেছিল, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় রাজনীতি বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। খ্রিস্টান মিশনারিদের এই ধর্মান্তরিত করার প্রাবল্যে হিন্দু বাঙালিরা অত্যন্ত বিপন্নবোধ করেছে তা বারংবার প্রমাণিত হয়েছে। এই নিন্দনীয় রাজনীতির শিকার হিন্দুরা, যে সাম্প্রদায়িকতার মুখ

দেখেছিল তা জাতিভাতৃত্বের বিরোধী। শেষ পর্যন্ত এই আক্রমণের নিষ্পত্তি করার জন্য ত্রিপুরায় শুধুমাত্র রাজনৈতিক আদর্শ নয়, বাঙালি আবেগকে সম্বল করে 'আমরা বাঙালি' নামে ত্রিপুরার দ্বিতীয় শক্তিশালী দল স্বীকৃতি পেয়েছিল। যদিও তা তেমনভাবে সার্থকতাকে ফলস্বরূপ পেয়েছিল তা হয়তো বলা যায়না। কিন্তু প্রায় সকল বাঙালির মনে এক ভাতৃত্ববোধের সূচনা হয়েছিল, একথা মনে করা যেতেই পারে। ঔপন্যাসিক সিস তাতানের উপন্যাস **'ত্রাস'-**এ (২০০১) দরিদ্র সাঁওতাল আদিবাসীদের খ্রিস্টান করার প্রবণতা এবং ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদারের লেখা **'এত রক্ত কেন'** (২০০১) উপন্যাসে ত্রিপুরার আদিবাসীদের এবং পাহাড়ের দরিদ্র মানুষদেরকেও সচ্ছল জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে ও বিশেষ শর্তসাপেক্ষে ব্রিটিশদের তত্ত্বাবধানে 'খ্রিস্টান' করার প্রবণতার বিষয়টি প্রায় একই পর্যায়ের। ব্রিটিশদের ছত্রছায়ায় খ্রিস্টান মিশনারীরা, ত্রিপুরার দরিদ্র হিন্দুদের ও পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দুদের মধ্যে যে বিরোধের রাজনীতি অনুপ্রবেশ করানোর প্রচেষ্টা করেছিল এবং আংশিকভাবে হলেও তাতে যে সফলতার ফল দেখতে চেয়েছিল, তা যথেষ্ট নিন্দনীয় রাজনীতি বলা যেতে পারে। যখন ইংরেজ এবং সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে জাত বিভ্রাটের কারণেই, ভগবান বিরসা মুন্ডা সেই জাত বিভ্রাটের প্রতিবাদ করে, বিশ্বভাতৃত্বের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য, মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তখন তাঁর সময়ের থেকে আরও প্রায় শতাধিক বছর পরেও ভারতবর্ষে দুই বাংলা বিভক্ত হচ্ছে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। অর্থাৎ জাতিভেদের নঙর্থকথার ভাবনা তখনো সমানভাবেই কার্যকর, যার জন্য এক দেশ ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যেতে পারে। ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রতিবাদের বিদ্রোহের দাম দিতে হয়েছিল তাঁর নিজের জীবন দিয়ে, ঠিক সেই রকমই দুই বাংলার বিভক্তিকরণের প্রতিবাদও সে ভাবে কার্যকর হয়নি। ঔপন্যাসিক তসলিমা নাসরিন রচিত **'ফেরা'** (২০০৬) উপন্যাসের পাতায় পাতায় তারই বর্ননা ধরা পড়ে। **'ফেরা'** (২০০৬) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তসলিমা নাসরিন উপন্যাসের চরিত্র স্বপন ও কল্যাণীর মধ্যে যে কথোপকথন হয়, তার থেকে তারা দুজনেই এক স্বপ্ন দেখে যা হ'ল – একই ভাষা ও একই সংস্কৃতি ধর্মের বাধা নিশ্চয়ই দূর করতে পারবে। ভাষা ও সংস্কৃতির কাছে সারা জীবনের বয়ে বেড়ানো ধর্মের বাধা একদিন হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

"– আচ্ছা বল তো তোমার কি মনে হয় না আমরা আবার এক হয়ে যাব?

– এক হওয়া মানে?

– মানে কোন পাসপোর্ট-ভিসা থাকবে না, কাঁটাতার থাকবে না।

– ও দুই দেশ এক হবার কথা বলতাছেন? সেইটা কি আর এখন সম্ভব?

– কেন সম্ভব নয়? জার্মানিতে হলো না?

– জার্মানি আর বাংলাদেশ এক হইল? ধর্ম এইখানে প্রধান বাধা দিদি।

– ধর্ম আর কদিন? ধর্ম কি আর সারা জীবন বয়ে বেড়াবো আমরা? এক ভাষা আর এক সংস্কৃতি নিশ্চয়ই ধর্মের বাধা দূর করতে পারবে। কি বল?”

ঔপন্যাসিক তসলিমা নাসরিনের লেখা **‘ফেরা’** (২০০৬) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক দেশভাগের কষ্টকে একাধারে স্বাধীনতার আগমন ও অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার বীভৎস ও বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি, মানুষের জীবনের প্রগতিকে যেন রুদ্ধ করে দিয়েছিল। এই দেশভাগ অপ্রার্থিত ছিল। একই দেশের মানুষের মধ্যে কাঁটাতার তুলে বিচ্ছিন্নতার ভাবনাকে মানুষের মননে যেন প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হল। জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে এই ভাগাভাগির ভাবনা, একই দেশের থাকা কাছাকাছি মানুষগুলোকে হঠাৎ করেই যেন অনেক দূরের করে দিল। আর এই ভাগাভাগির কর্মকাণ্ডে দুই বাংলার মানুষই রক্তাক্ত হল। দেশভাগের রাজনীতি প্রসঙ্গে এই উপন্যাসপ্রাপ্ত নানান প্রামাণ্য তথ্য ইতিহাসের অন্তঃস্থ ইতিহাসকে তুলে ধরেছে। অর্থাৎ অনেক সময় জীবনের নানান ইতিহাস প্রয়োজনীয় তথ্য হিসেবে সর্বদা উল্লেখিত হয়না। অথচ সেই ইতিহাস অজানা থাকলে দেশভাগ কিভাবে সমগ্র বাংলার মানুষের উপরে প্রভাব ফেলেছিল তাও হয়তো অজানা থেকে যেতে পারে। সাম্প্রদায়িকতার ভাবনার তীব্রতা দুই দেশের মধ্যে কাঁটাতার তুলে দিতে পারলেও, মানুষের বিশ্বাসে কোন বিভেদ হয়তো সেভাবে আনতে পারেনি। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের প্রেক্ষাপটে তাই দুই সম্প্রদায়েরই চোখের জল ঝরেছিল। দেশভাগের যন্ত্রণায় দেশ ভেঙেছে, স্বপ্ন ভেঙেছে, আশ্রয় ভেঙেছে। সর্বহারা মানুষগুলোর জীবন সংগ্রাম বেঁচে থাকার তাগিদে আবার শুরু করতে হয়েছে। দীর্ঘদিনের চেনা-পরিচিত নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে, সহসা বিপর্যস্ত জীবনের হাত ধরে, অভাবের তীব্রতাকে জীবন সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবেই বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হয়েছে। তাই বলা যেতে পারে, ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত দুই বাংলার মানুষের মধ্যে যে অবশিষ্ট মানবতার ধর্ম আছে, তা ভাষা এবং সংস্কৃতির হাত ধরেই আবার অসাম্প্রদায়িকতাকেই হয়তো একদিন প্রাধান্য দেবে – সেই বার্তাই যেন ঔপন্যাসিক তসলিমা নাসরিনের **‘ফেরা’** (২০০৬) উপন্যাসের, বর্তমান গবেষণায় গৃহীত তথ্যাবলীতে পরিস্ফুট হয়েছে। ঔপন্যাসিক শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত **‘গাছ একটি চরিত্র’** (২০০৫) উপন্যাসেও ঔপন্যাসিক তসলিমা নাসরিনের লেখা **‘ফেরা’** (২০০৬) উপন্যাসের উপরিউক্ত বার্তার প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হয়। **‘গাছ একটি চরিত্র’** (২০০৫) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র রতিকান্ত, উপন্যাসের আর এক চরিত্র টুকুকে বলছেন –

"মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান হেরেছে। আমাদের সেনাধ্যক্ষের সামনে সাদা ফ্ল্যাগ দেখিয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী রেজিমেন্ট না পাঠালে ওদের গৃহযুদ্ধ এত সহজে থামতো না। বাঙালী মুসলমানদের মেরে পাট করে দিত পাকিস্তানিরা। সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর এই চব্বিশ বছরে পূর্ববাঙালী মুসলিমরা টের পেয়েছে যে ধর্ম দিয়ে মানুষের মিলন হয়না, ভাষা দিয়ে হয়।"

'গাছ একটি চরিত্র' (২০০৫) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় একইভাবে বলেছেন – সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর এই চব্বিশ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি হিন্দু ও মুসলিমরা অনুভব করতে পেরেছে যে – ধর্ম দিয়ে মানুষের মিলন হয় না, ভাষা দিয়ে হয়। কিছু মানুষের দেশ ভাঙার কারণে তছনছ হয়ে গিয়েছিল বাঙালির জীবন, বাঙালির সংস্কৃতি, বাঙালির সমাজ। এখানে হিন্দু-মুসলমান মুখ্য ছিল না। অর্থাৎ ধর্ম মুখ্য ছিল না। ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হয়েছিল, যা ভাষার কাছে টিকে থাকতে সক্ষম হয়নি। সেই কারণে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান হেরেছে। ভাষা-আন্দোলনের ফলে হিন্দু-মুসলমানের পরিচয় তাদের ধর্মে হয়নি। তাদের ভাষা বাংলা। তারা বাঙালি। মানুষের মিলন ধর্মে নয়, ভাষা দিয়ে হয়েছে যা সমাজকে এক নতুন পথ দর্শিয়েছে। ঔপন্যাসিক অমর মিত্র **'ধুলোগ্রাম'** (২০০১) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র শুভ ও উপন্যাসের আর এক চরিত্র মৌলবির কথোপকথনে দেশভাগ হওয়ার যন্ত্রণা, অনেক সময় এপার বাংলা, ওপার বাংলার মানুষদের জীবন বিমুখতার পথের পথিক করে তুলেছিল। তাই মৌলবি মওজান সাহেব চরম অসহায়তার শিকার হয়েই বলেছিলেন –

"আমি হচ্ছি মোছলমান, মোছলমানদের জন্য দেশ আলাদা করে দে গেছে ব্রিটিশ গরমেন্ট ইচ্ছামতীর ওপারে, আর নেহেরু গান্ধী বলেছে এপারটা হিন্দু মোছলমান উভয়ের দেশ, আমার আবার ভিটে ছেড়ে যেতে কেমন লাগে, কোথায় যাব? বুড়ো হতি চললাম, এখন কি নোতন জায়গায় গে ঘর পত্তন করা যায়! আমারে তো কেউ ঠেলা দেচ্ছে না..."

দেশভাগের যন্ত্রণা অন্যান্য উপন্যাসের মতো ঔপন্যাসিক অমর মিত্রের **'ধুলোগ্রাম'** (২০০১) উপন্যাসেও অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই উঠে এসেছে। দেশভাগের পরে এপার বাংলার কিছু মানুষকে ওপার বাংলায় ও ওপার বাংলার কিছু মানুষকে এপার বাংলায় আবার নতুন করে জীবন সাজাতে হয়েছিল, যা সকলের পক্ষে সম্ভব হতে পারেনি। কারণ বেশিরভাগ মানুষের পক্ষেই, নিজেদের সাজানো জীবন একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবার পর আবার নতুন করে সাজানোর যন্ত্রণা মেনে নিতে পারা হয়তো সম্ভব হয়নি। তাই অনেকের কাছে নিজের দেশ ছেড়ে না যাওয়ার অজুহাত হিসেবে বয়স, মানসিক দ্বন্দ্ব, সর্বহারার দলে নাম না লেখানোর আকুতি এবং

সর্বোপরি নিজেদের এতদিনকার সাজানো জীবনের প্রতি অসম্ভব আবেগসম্পৃক্ত মানসিকতাকে তারা হয়তো অতিক্রম করতে অক্ষম হয়েছিল। তাই এই ধর্মভিত্তিক দেশভাগ বিষয়টিকে ভাতৃত্ববোধের পরিপন্থী বলা যেতে পারে। সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গে **'চর শীলাবতীর সেরেঙ্গ'** (২০০৭) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সজল মণ্ডল উপন্যাসের চরিত্র অনিন্দ্যের বয়ানে –

"ওরা হিন্দু না, মুসলিম, জৈন না খৃষ্টান। এই আমরা, যে টিভির পর্দায় দেখি তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সম্প্রচার। জাত ধর্ম বৈষম্যের বিরুদ্ধে ন্যাংটো শিশুটির হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করা। সে বোবা, সে অবোধ, জানেনা আমরা যেখানে বাস করছি তার অবয়ব কেমন। তার প্রান্তর সবুজ নাকি রুক্ষ। তার তাপমাত্রা শীতল, উষ্ণ নাকি নাতিশীতোষ্ণ।"

ঔপন্যাসিক সজল মণ্ডলের **'চর শীলাবতীর সেরেঙ্গ'** (২০০৭) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র অনিন্দ্যের বয়ানে যে তথ্য উঠে এসেছে তা হ'ল – ইসলাম ধর্ম, জাত, সম্প্রদায়গতভাবে হিন্দুদের বিপরীত। কিন্তু সমাজের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, সমাজের মানুষ টিভির পর্দায় দেখে তথ্যসংস্কৃতি দপ্তরের সম্প্রচার। জাত-ধর্ম-বৈষম্যের বিরুদ্ধে ন্যাংটো শিশুটির হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করা। শিশুটি বোবা, অবোধ, জানে না সে, যে পরিবেশে বাস করছে তার ভাবনার প্রকৃতি কেমন! সেই ভাবনায় ভালোবাসার শীতলতা, উষ্ণতা নাকি নাতিশীতোষ্ণতার স্পর্শ বর্তমান। প্রায় সমস্ত সমাজেই বর্তমানে ভালবাসা নির্ধারিত হয় সম্প্রদায়, জাত ও অর্থনৈতিক সহাবস্থানের মাপকাঠির ভিত্তিতে। কিন্তু মানুষ নয়, প্রাধান্য পায় হৃদয়হীনতা, অনধিকার, জাতিভেদচেতনা। বিশ্বস্ত মনুষ্যত্ববোধ অন্তর্হিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতাই বিশ্বাসঘাতক হতে হয়তো বাধ্য করে। সাম্প্রদায়িকতার মানদণ্ডে মানুষ মানুষকেই চরম অসম্মান করে, অথচ মানুষ শিক্ষার বড়াই করে, চিৎকার করে গান গায় – 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান।' ধর্মীয় রাজনৈতিক কারণে মানুষের সম্মান যেখানে ব্রাত্য, যেখানে সাম্প্রদায়িকতার উত্তাপ মানুষকে বিশ্বাসঘাতক হতে উদ্যোগী করে, যেখানে জাতিভেদ চেতনার মানদণ্ডে মনুষ্যত্ব অন্তর্হিত হয়, সেখানে ঔপন্যাসিকের মতে প্রকৃত শিক্ষাভাবনাকে অবজ্ঞা করে, অসাম্প্রদায়িকতার বড়াই করা 'নিন্দনীয়' বলে ব্যাখ্যা করা যেতেই পারে। মানুষের সঠিক পরিচয় মনুষ্যত্বে, ভ্রাতৃত্ববোধে ও অসাম্প্রদায়িকতার মোড়কে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক কিন্নর রায় তাঁর **'পদ্মবীজের মালা'** (২০০৪) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র সমীর মুখার্জী উপন্যাসের আর এক চরিত্র আলি রেজাকে বলছেন–

"চৌষট্টির হজরত বাল দাঙ্গার সময় ওখান থেকে হুড়মুড় করে পালিয়েছে মুসলমানরা। ঘর-বাড়ি ছেড়ে, আত্মীয়-পরিজন সঙ্গে নিয়ে। আর ফেরা হয়নি। যাদবপুর সাইডে এমন মসজিদ আছে, যেখানে আর নামাজ হয় না। পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের বহু বাড়িতেও এরকমই হয়েছে। গরুটি তুলে নিয়ে গিয়ে কাটা হয়েছে বাড়ির সামনে। গৃহ দেবতার মূর্তি ভেঙে দিয়েছে আক্রমণকারীরা। মেয়েরা, বউরা, পুকুরঘাটে চান করতে যেতে পারছে না। গেলেই সেখানে অশ্লীল গান, কু-প্রস্তাব। বিবাহ ইচ্ছুক বহু জন।"

চৌষট্টির হজরত বাল দাঙ্গার সময় পাকিস্তান থেকে প্রচুর হিন্দুকে পালিয়ে ভারতবর্ষে আসতে হয়েছিল। তারা এই ধর্মবৈষম্য, জাতিভেদ এবং ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে অসমর্থ হয়েছিল। উপন্যাস প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, তাই তারা নানান উপায় অবলম্বন করে নিজেদের জুতোর গোড়ালির ভেতরে বাক্স তৈরি করে তাতে সোনার গয়না এবং নিজেদের গলায় ঝুলানো কাপড়ের শক্ত ঝুলির মধ্যে গৃহদেবতাকে সঙ্গে নিয়ে কাউকে প্রায় না জানিয়েই সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। নিজের জন্মভূমির জন্য তাদের দুচোখে ছিল ভরা বিষাদ। সীমান্তের চেকিংয়ে অনেক সময়ই, তারা সঙ্গে করে যা নিয়ে আসছিল, তাও সীমান্তরক্ষীদের হাতে তুলে দিয়ে আসতে হয়েছিল। দেশভাগ হলেও, এই যন্ত্রনার কোনো ভাগ হয়না। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর 'মার্জিনাল মেন'-এ সব তথ্যচিত্র পাওয়া সম্ভব হবে। ধর্ষণ, হত্যা, সম্পত্তি দখল – সবার ওপর শত্রু সম্পত্তি আইন – এনিমি প্রপার্টি বলে হিন্দু-বৌদ্ধের জমি-বাড়ি-বাগান-পুকুর হস্তগত করে, মানুষগুলোকে মানসিক ও শারীরিকভাবে একেবারে সর্বস্বান্ত করা হয়েছিল। যার নঙর্থক প্রভাবে আজও দুই বাংলার হিন্দু-মুসলিম প্রভাবিত বলে মনে করা যেতে পারে। অথচ এই শত্রুতার বাতাবরণ একেবারেই অনভিপ্রেত এই বিশ্ব ভাতৃত্বের বাতাবরণে। সেই কারণেই সেই সময়ের বেশিরভাগ লেখকেরাই তাঁদের কলম-কণ্ঠের জোরে দুর্নীতি, অত্যাচার, অপশাসন, ভোগবাদ, স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এত দুঃসময় এত হতাশার মধ্যেও কোথাও এক আশার আলো – বিশ্বভাতৃত্বের হাত ধরে ভোগসর্বস্বতা, স্বার্থপরতা, সাম্প্রদায়িকতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার বিনাশ একদিন হবে – কলমেরই হাত ধরে, প্রকৃত ধর্মীয় রাজনীতির সুশিক্ষাকে সঙ্গী করে। ঔপন্যাসিক প্রফুল্ল রায়ের **'ভাগাভাগি'** (২০০১) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র আলি হোসেনের ধারণা –

"ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। খুব বেশি হলে পাঁচ সাত বছর,তার মধ্যেই পাততাড়ি গুটিয়ে ইন্ডিয়া ছেড়ে তাদের পালাতে হবে। আর এই সুযোগে

মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি রাষ্ট্র চাই – তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি দেশ। আর সেই দেশটা হবে টু নেশন থিওরি অর্থাৎ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে। মনে রাখতে হবে, হিন্দু এবং মুসলিম আলাদা দুটি নেশন....দূরে বসে শুনতে শুনতে হঠাৎ রাঙাদাদুর কথা মনে পড়ে যায় দীপুর। ভদ্রলোকের নাম সুরেশ্বর ঘোষ।....প্রায়ই তিনি তাদের বাড়ি আসেন। হিন্দু ধর্ম, হিন্দু কালচার, সনাতন সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রথা ইত্যাদি নিয়ে সর্বক্ষণ তিনি চিন্তিত। তাঁর বিশ্বাস, এই ধর্মটিকে ধ্বংস করার জন্য বিশাল যড়যন্ত্র চলছে। পৃথিবীর স্বার্থে, ভারতবর্ষের স্বার্থে বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব বজায় রাখতেই হবে।"

'ভাগাভাগি' (২০০১) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রফুল্ল রায় হিন্দুর প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত করাতে গিয়ে উপন্যাসের চরিত্র সুরেশ্বর ঘোষ– হিন্দু ধর্ম, হিন্দু কালচার, সনাতন সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রথা ইত্যাদি নিয়ে সর্বক্ষণ চিন্তিত থাকতেন। এই ধর্মটিকে ধ্বংস করার জন্য এক বিশাল ষড়যন্ত্র চলছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। পৃথিবীর স্বার্থে, ভারতবর্ষের স্বার্থে বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব বজায় রাখতেই হবে। মুসলমানদের জন্য যেমন একটা আলাদা রাষ্ট্র বা সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি দেশ প্রয়োজন, কিন্তু সেই দেশটা হবে 'টু নেশন থিওরি' অর্থাৎ 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' – এর ভিত্তিতে। হিন্দু এবং মুসলিম আলাদা দুটি নেশন। ভারতবর্ষে সকল জাতির সহাবস্থান। শত শত বছর ধরে, হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে আছে এবং একসঙ্গে থাকবে। কিন্তু এই যুক্তি অত্যন্ত যুক্তিহীন। কারণ হিন্দু এবং মুসলমানের পোশাক, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, এমনকি বহু ক্ষেত্রে খাদ্যরুচিও পৃথক। তাই মুসলমানদের জন্য যদি আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান হয়, তাহলে শুধুমাত্র হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান হওয়াটা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু নানা জাতির দেশ এই ভারতবর্ষে এমনটা হওয়া সম্ভবপর নয়। তাই মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হলেও, হিন্দুস্থান ভারতবর্ষে নানান জাতির মানুষ যারা ধর্মে, রুচিতে, পোশাকে, খাদ্যে পৃথক হওয়া সত্বেও তাদের একমাত্র পরিচয় তারা ভারতবাসী। তবে এও বোধহয় সত্য যে – পৃথিবীর স্বার্থে, ভারতবর্ষের স্বার্থে- হিন্দু ধর্ম, হিন্দু কালচার, সনাতন সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রথার ধারক হিন্দু ধর্মটিকে রক্ষা করার জন্য বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব বজায় রাখতেই হবে।

'উত্তরমার্গ' (২০০৮) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রতিভা রায়ের উপন্যাসস্থিত চরিত্র আচার্য দিগদর্শী শুধু সন্ন্যাসী নন – তিনি বিপ্লবী। ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে তাঁর "যুদ্ধং দেহি" আহ্বান।

"আচার্য দিগদর্শী অহিংস সন্ন্যাসী। তিনি গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলনের সমর্থক।.... ঐ আন্দোলনের মূল কথা হলো – অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য একত্রিত হওয়া। দিকদর্শন গান্ধী বাণীর প্রচারক। .....গীতার বাণী শোনাতে শোনাতে তিনি গান্ধীজী, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের কাছে পৌঁছে যান।"

‘উত্তরমার্গ’ (২০০৮) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রতিভা রায়ের (অনুবাদক ভারতী নন্দী) উপন্যাসস্থিত চরিত্র আচার্য দিগদর্শীর বয়ানে – মানুষ নতুন ইতিহাস সৃষ্টিতে বিশ্বাস করে। পুরাতন ইতিহাস কণ্ঠস্থ করে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকায় মানুষ বিশ্বাস করে না। মানুষের ঠিকানা মানুষের হৃদয়ের মাঝে। মানুষ যখন মানুষের অন্বেষণে রত হয়, তখন সে নিজেকে আবিষ্কার করে মানুষের হৃদয়েই। মানুষ জাত-ধর্ম-ভাষা দ্বারা অন্য মানুষের থেকে পৃথক হলেও, এক দেশে বসবাসকারী হিসেবে সমদেশীয় বলে, একজন আরেকজনের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এতে যে একাত্মতার সৃষ্টি হয়, তা মানুষের মন থেকে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় দূর করে, মানুষকে করে তোলে মানুষের কাছে – ‘এক দেশের’ মানুষ এবং অত্যন্ত আপনজন। দীর্ঘদিন পরাধীনতার কারণে ও হীনমন্য সুপ্ত মানুষের হৃদয়ে মহাভারতীয় চেতনা জাগাতে, গান্ধীজী অহিংসা আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ‘শ্রীকৃষ্ণ উবাচ’র থেকে শুরু করে ‘গান্ধীজী উবাচ’-এ এমন সুন্দরভাবে আচার্য দিগদর্শী পৌঁছে যান, বোঝা যায় না তিনি সন্ন্যাসী না সৈনিক। ঈশ্বরভক্ত না দেশভক্ত। মানুষের মনে ভ্রম সৃষ্টি হয়। দিগদর্শী হাসতে হাসতে বলেন – ঈশ্বর এবং দেশ অভিন্ন। নাস্তিক অর্থাৎ যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সে কখনও দেশপ্রেমী হতে পারে না। তাই দেশ ও ঈশ্বর সমার্থক। দেশভক্ত হয়ে ওঠাই ঈশ্বর প্রেমের আর এক নিদর্শন। মানুষ ঈশ্বর আরাধনা করে নিজের স্বার্থে, অর্থাৎ নিজের স্বামী সন্তানের উন্নতির জন্য দানধর্ম, পূজাপাঠ এবং উপবাস করা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর আরাধনা নয়। প্রকৃত ঈশ্বর আরাধনা হ’ল – মানুষের সেবা করা। মানুষের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করা। অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ করা থেকে, সমাজকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে ব্রতী হওয়াই হ’ল – প্রকৃত ঈশ্বর আরাধনা। পাপ করে গঙ্গা স্নান করলে যদি পূণ্য হতো, তাহলে সবাই মোক্ষলাভ করত। প্রজাদের শোষণ করে বড় বড় মন্দির প্রতিষ্ঠাকারী জমিদার, ঈশ্বরের ভক্ত বলে গণ্য হতো। সৎকার্য করার জন্য যদি অসৎ পন্থা অবলম্বন করা হয়, তাহলে তা অসৎকাজ নয়। প্রেম থেকেই এই জগতের সৃষ্টি। আত্মা-পরমাত্মার প্রেমবন্ধনে টিকে আছে এই পৃথিবী। ঈশ্বর জীবন দিয়েছেন, দেশের কোলে স্থান দিয়েছেন, বঁচিয়ে রেখেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়ক হয়েছেন। একজন জন্ম দিয়েছেন, একজন জীবন রক্ষা করেছেন। দেশকে ঈশ্বরের আসনে বসালে উপলব্ধি করা যাবে যে দেশভক্তের মত বড় ধার্মিক আর কেউ নাও হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, রাম-রাবণের যুদ্ধের পরবর্তীকালে আসেন শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজী, ভগিনী নিবেদিতা, রাজা রামমোহন, মহামান্য তিলক ও আরো মহান বিদগ্ধজনেরা। হিন্দু-মুসলমান একটা ‘নেশন’ বা একটা ‘জাতি’ নয়, দুটো জাতি। আর উভয়ের সংস্কৃতি

অবশ্যই পৃথক। এই পার্থক্যের মধ্যেই ঐক্য অন্বেষণ বিশ্বভাতৃত্বের নিদর্শন। সেই কারণেই সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন – "আমি সুভাষ বলছি, স্বাধীনতা কেউ দেয় না, তা আদায় করতে হয়। সেজন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীকে একত্রিত হতে হবে, বন্দে মাতরম্।"

ঔপন্যাসিক রমানাথ রায়ের **'দেশপ্রেমিক'** (২০০৫) উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের বয়ানে –

"মুখ্যমন্ত্রী সব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে সভা ডাকলেন। তিনি বুঝতে পারলেন গান্ধি, লেলিন বা সুভাষচন্দ্রের ভক্তদের চটানো যেমন ঠিক নয়, তেমনি কৃষ্ণ, কালী ও শিবের ভক্তদেরও চটানো উচিত হবে না। কারণ বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈবদের ভোটের সংখ্যা কম নয়। তিনি যে এলাকা থেকে নির্বাচনে দাঁড়ান সেই এলাকায় লেলিন-উপাসক এবং বিষ্ণু, কালী ও শিবের উপাসকের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। ফলে তাঁকে ভোটে জেতার জন্য কখনও কখনও বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈবদের ওপর নির্ভর করতে হয়। ফলে ভোটের রাজনীতিতে কাউকে অবহেলা করা যায় না। এখানে সব সম্প্রদায়ের মানুষকে গুরুত্ব দিতে হয়।"

'দেশপ্রেমিক' (২০০৫) উপন্যাসে রাজনীতি প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক রমানাথ রায়ের বয়ানে – ভারত একটি মহান ও বিচিত্র দেশ। এখানে হাজার রকমের রাজনীতি ও ধর্ম। এখানে দল-উপদলেরও শেষ নেই। এই দেশে রাজনীতির নামে বিভিন্ন অন্যায় মানুষ করে থাকে। এখানে নানান রাজনৈতিক দলের মানুষের মধ্যে মতানৈক্য থাকার জন্যে, মানুষকে মানুষ, নির্দ্বিধায় খুন করে। কিন্তু ধর্মের নামে কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে এখানে মেনে নেওয়া হয় না। ধর্মের নামে কোথাও কোন গোলমাল হলেই, তাকে কঠোর হাতে দমন করা হয়। তাই এখানে দলীয় রাজনৈতিক দাঙ্গা হলে তাকে 'মতাদর্শগত লড়াই' নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মারামারি হলে তাকে 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ গান্ধীর নামে, লেনিনের নামে, যত খুশি মারামারি, খুনোখুনি হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের নামে কেউ কারোকে দৈহিকভাবে ও মানসিকভাবে আঘাত করতে পারবে না। এ ব্যাপারে সরকার অত্যন্ত কঠোর। তবে সরকার ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের চটাতেও চায় না। কারণ তাদের চটালে নির্বাচনে তার প্রভাব পড়তে পারে। আর ঈশ্বর-বিশ্বাসীরাও তার সম্পূর্ণ সুযোগ দ্বিধাহীনভাবে ব্যবহার করে থাকে। কারণ ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের মধ্যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, নানান দলাদলি বর্তমান। যেমন – যাঁরা শৈব, তাঁরা বৈষ্ণবদের পছন্দ করেন না। আবার যাঁরা বৈষ্ণব, তাঁরা শাক্তদের পছন্দ করেন না। রাজনৈতিক দলগুলোর মত

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও নিজ নিজ আরাধ্যকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। সর্বদা সেই আরাধ্যের প্রচারে রত থাকেন। আরাধ্য দেবতার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের প্রচার করেন, নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেন। এইদিক দিয়ে রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক মতবাদীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অতীতের শিক্ষা-আদর্শ সব মূল্যহীন বলেই প্রতিপন্ন হয়, কারণ যুগের পরিবর্তন হচ্ছে এবং তার সঙ্গে যুগধর্মও পরিবর্তিত হয়ে, ধর্মকে পণ্যে পরিণত করলে, তাকে প্রয়োজনে পছন্দমত বদলানোও যেতে পারে। দুই বা ততোধিক সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন দেশভাগের মতো ঘটনাও ঘটে এবং মানুষকে রাতারাতি একটা ভগ্নস্তূপে পরিণত করার ক্ষমতা রাখে। তখন প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি মানুষকে ঘৃণার চোখে, সন্দেহের চোখে দেখে। মানুষ বিস্মৃত হয়, মানুষের একমাত্র পরিচয় মনুষ্যত্ব। বাকি সবকিছুই অনাবশ্যক, অর্থহীন। ঔপন্যাসিক ইন্দু সাহা লিখিত **'লম্পট'** (২০০৩) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বয়ানে –

"আসলে এক জাতি কর্তৃক কিংবা বহু জাতি কর্তৃক কোনো অনুন্নত জাতি শোষিত হতে থাকলে – প্রথমে তা কমিউন্যাল দিকে টার্ন নেয়।....পাকিস্তান হওয়ার তো কোনো কথাই ছিল না। হলো ক্যানো? সেটাতো ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হলো। 'হিন্দু' একটা জাতি হলো। 'মুসলমান' একটা জাতি হলো। ধর্ম দিয়ে জাতি হয় কখনো?....জাতিগত নিপীড়ন আর ধর্ম দুই জিনিস। তাই মুসলমান পীড়নকারী আর মুসলমান পীড়িতও এক থাকে না।"

ঔপন্যাসিক ইন্দু সাহা লিখিত **'লম্পট'** (২০০৩) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, ধর্মীয় রাজনীতি সম্পর্কে যা বলেছেন তা হ'ল – আসলে এক জাতি কর্তৃক বা বহু জাতির দ্বারা কোন অনুন্নত জাতি শোষিত হতে থাকলে, প্রথমেই তা সাম্প্রদায়িকতার হাত ধরে। মার্কসবাদীরা তার সমাধান দিতে যদি ব্যর্থ হন, তাহলে তার দায় নিতে হয় মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্টদেরই। ধর্মের ভিত্তিতেই পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের জন্ম হয়। হিন্দু একটা জাতি, মুসলমান আর একটা জাতি। ধর্ম দিয়ে কখনো জাতি হয় না। জাতিগত নিপীড়ন ও ধর্ম দুটি পৃথক বস্তু। তাই মুসলমান বা হিন্দু পীড়নকারী ও মুসলমান বা হিন্দু পীড়িত পৃথক দুটি সত্ত্বা। এরা কখনোই এক নয়। অতীতে মানুষ অদৃষ্টবাদকে, বস্তুবাদের ওপরে স্থান দিয়েছিল। ধর্মকে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু বর্তমানে এই সাম্প্রদায়িকতার বিষে বিষাক্ত হয়েছে শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষ ও সমাজ। এই সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ বা পাথেয়ের সন্ধান বোধহয় কোন মানুষের কাছেই আজ আর সেই অর্থে নেই। তাই জাতিগত নিপীড়নকে, দেশের রাজনৈতিক মোড়কে, জাতির এক প্রধান সমস্যা বলে মনে করা

যেতে পারে। ঔপন্যাসিক মন্দাক্রান্তা সেনের **‘অন্ত্যক্ষরী’** (২০০৪) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র অরিত্র, উপন্যাসের আর এক চরিত্র রুচিরাকে বলে –

“শুধু আক্রমণাত্মক ডিবেট করে রাজনীতি করা যায় না। সহজভাবে মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। অন্যের কথা শোনার, বোঝার, অভ্যাস তৈরি করতে হয়....বিনা তর্কে কোন কিছু মেনে নেওয়াটা ধর্মবিশ্বাসে চলতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে সেটা ঠিক সুস্থ আবহাওয়া নয়...”

ঔপন্যাসিক মন্দাক্রান্তা সেনের **‘অন্ত্যক্ষরী’** (২০০৪) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র অরিত্রের বয়ান অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে, রাজনীতির অর্থ আক্রমণাত্মক কোন বক্তৃতা অথবা আক্রমণাত্মক আচরণ বোঝায় না। বরং বলা যেতে পারে যে রাজনীতির অর্থ মানুষের কাছে, নিজের অস্তিত্বকে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাবে তুলে ধরা, মানুষের কথা শোনার, বোঝার মানসিকতার অভ্যাসে নিজেকে পরিণত করে তুলতে পারা। কারণ এ কথা স্বীকার করে নেওয়া যেতেই পারে যে ধর্ম বিশ্বাসে বিনা তর্কে কোন কিছু মেনে নেওয়া মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি। কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক অবশ্যম্ভাবী হতেই পারে। বিনা তর্কে রাজনৈতিক কোন মতকে প্রাধান্য দেওয়াটা সুস্থ রাজনীতির পর্যায়ভুক্ত হয়ত হতে পারে না। কারণ তর্ক-বিতর্কই রাজনীতির ক্ষেত্রে জনসংযোগ বৃদ্ধি করার এক মাধ্যম বলা যেতে পারে। ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যালের **‘শের-এ-শহিদদ্বীপ’**(২০০২) উপন্যাসে উল্লেখ করা হয়েছে যে–

“মহাবিদ্রোহকালে বিপ্লবীদের মুখপাত্র ছিল পায়াম-এ-আজাদী। সেই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে যা লেখা হয়েছিল তার উদ্ধৃতি শোনাই : ভাইসব! ইংরেজ শাসক আপ্রাণ চেষ্টা করবে হিন্দু ও মুসলমানদের পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে। আপনারা তাদের এ শয়তানীর ফাঁদে যেন পা দেবেন না। হিন্দু ও মুসলমান ভাইয়েরা! সমস্ত তুচ্ছ ভেদাভেদ ভুলে এই স্বাধীনতাযুদ্ধে একই পতাকাতলে সামিল হোন।”

ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যালের **‘শের-এ-শহিদদ্বীপ’** (২০০২) উপন্যাসে পত্রিকার সম্পাদকীয়তে যা লেখা হয়েছিল তার উদ্ধৃতি অনুসারে – সেই ইংরেজ আমলেও যখন স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়নি, তার পূর্বেই মহাবিদ্রোহের সময় বিপ্লবীরা সকলেই, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে, ইংরেজ শাসকগণ যে শাসনকার্যের রাজনীতিতে ব্যবহার করবে, তা তাঁরা আগাম বুঝতে পেরেছিলেন। তাই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে সম্প্রদায়গত সাম্প্রদায়িকতাকে, ইংরেজদের এক রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে আগাম প্রচার করেছিলেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষে তখন হিন্দু-মুসলিম ভাতৃত্ববোধে তেমন আঁচড় পড়েনি। তবু ভারতবর্ষের

স্বাধীনতার মহাবিপ্লবে হিন্দু-মুসলিমের সাম্প্রদায়িকতাকে বাধা দেওয়ার কারণেই, মহা বিপ্লবীরা এই রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবুও শেষ রক্ষা করা যায়নি। তিন টুকরো করা ভারতবর্ষের মূল কারণ কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির বিরাট মহীরুহ।

সামাজিক দিক

সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তন হলো, সমাজ ক্রমশ বিশিষ্টকরনের দিকেই অগ্রসর হয়। শ্রেণিবিন্যাসের দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে দেবদেবীদের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনও দৃশ্য হয়। যেমন অতীতের কৃষিভিত্তিক পুজো ও উৎসব পরবর্তীকালে নাগরিক সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে তার গুরুত্ব হারায় এবং নতুন প্রতীকের সৃষ্টি হয়। ঋতু কাল অনুসারে উৎসবের সময় নির্ধারিত হয়। রাজনৈতিক শক্তির দ্বারাও সমাজে ধর্মীয় বিকাশ স্থায়ী ভাবে প্রভাবিত হতে পারে। এছাড়া ধর্ম যখন দেশ থেকে দেশান্তরে প্রবর্তিত হয়, তখন দেশের সংস্কৃতির ওপরও ধর্ম নির্ভরতা সম্পৃক্ত থাকে। আবার সমাজে যে সমস্ত অঞ্চলের অগ্রগতি তেমনভাবে হয় না, সেই সব অঞ্চলের ধর্মও পূর্বাবস্থায় স্থিত হয়। তাহলে বলা যেতে পারে ধর্মের গঠনে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত গভীর। অন্যদিকে সমাজ ও সংস্কৃতিও ধর্মের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়।

ঔপন্যাসিক নজরুল ইসলাম লিখিত **‘ভূমিপুত্র (১)’** (২০০২) উপন্যাসে উপন্যাসের নায়ক কামালই ভূমিপুত্র। কামালের ধর্ম ভারতবর্ষের সংখ্যাগুরুদের ধর্মের থেকে পৃথক এবং এই ধর্ম ভারতবর্ষের ধর্ম নয়। তাই তাকে ভারতীয় সমাজে এমন কিছু পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের যেকোনো কারোর পক্ষে উপলব্ধি করা সহজ নয়। এই পরিস্থিতির নঙর্থকতা তাকে পীড়িত করে। এই পরিস্থিতিকে জয় করার জন্যে সে পথের অন্বেষণ করে। মানুষের মঙ্গলার্থেই ধর্মের আগমন এবং ধর্ম মানুষেরই সৃষ্টি। তাই সমাজের ধর্মীয় সচেতনতার পরিবর্তন এক প্রয়োজনীয় বার্তা বহন করতে পারে। **‘ভূমিপুত্র (১)’** (২০০২) উপন্যাসের সেটাই মুখ্য বিষয়। উপন্যাসের নায়ক কামাল উপরের ক্লাসে উঠে জেনেছিল –

“হিন্দুধর্ম সেই অর্থে কোন নির্দিষ্ট ধর্ম প্রচারক প্রচার করেননি। প্রাচীনকাল থেকে দেশে প্রচলিত বিভিন্ন আচার-আচরণ, রীতিনীতির সমষ্টিই কালে হিন্দু ধর্ম বলে পরিচিত হয়েছে। ফলে হিন্দু ধর্মের মধ্যে এমন অনেক রীতিনীতি আছে যা পরস্পর বিরোধী। যেমন বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে মামা-ভাগ্নির মধ্যে বিয়ে হয় না। কিন্তু তামিল হিন্দুদের মধ্যে এরকম বিয়ে প্রচলিত। একজন লোক শিব ভক্ত হয়ে হিন্দু হতে পারে, শিব বিদ্বেষী হয়ে হিন্দু হতে

পারে, এমনকি নাস্তিক হয়েও হিন্দু থাকতে পারে। কিন্তু খ্রিস্টান বা মুসলমানদের এরকমটা হওয়া শক্ত।"

হিন্দু ধর্মের ধারাটিকে জ্ঞাত হওয়ার সবচেয়ে কার্যকর সূত্র হল ভারতীয় সনাতন ধর্মীয় সাহিত্য ও সনাতন ধর্ম ব্যবস্থায়, আভ্যন্তরীণ আচার-আচরণের পদ্ধতির সমন্বয়। ভারতীয় সনাতন ধর্মে ধর্মের তত্ত্বগত ও প্রয়োগমূলক দিকটিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উল্লেখ কখনো কোথাও সেভাবে পাওয়া যায়নি বলেই ঐতিহাসিকেরা দাবি করেন। কিন্তু ধর্মের আচার-আচরণকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের প্রভাব অপরিসীম ছিল। সময় এবং স্থান সাপেক্ষে ভারতীয় সনাতন ধর্মের রূপ পরিবর্তিত বলে, নানান সনাতন ধর্মীয় সাহিত্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন প্রাক্-বৈদিক যুগে পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে যখন কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রবেশ ঘটেছিল তখন প্রাক্-বৈদিক মাতৃদেবীর আরাধনা ও তাঁর আচার অনুষ্ঠান বৈদিক সাহিত্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই স্থান পেয়েছিল। পরবর্তীকালে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থে যে সমস্ত নতুন দেবীর পরিচয় উঠে এসেছিল, তার উৎস মূলত প্রাক্-বৈদিক কৃষি নির্ভর সমাজের দেবীকল্পনার অভিযোজন বলা যেতে পারে। হিন্দুধর্মের ওপর এই প্রাক্-বৈদিক সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করা হয়। ঋগ্বেদে ধর্মবিশ্বাসের বহু পরিবর্তন ও তার পরিচয়, আচার-আচরণ উল্লেখিত আছে বলেই সৃষ্টির বিবর্তনকে অনুভব করার বিষয়টি তাই সরলীকৃত হয়েছে বলা যেতে পারে। হিন্দুধর্ম সেই অর্থে কোন নির্দিষ্ট ধর্ম প্রচারক প্রচার করেননি। ।বিভিন্ন পূর্বাচার্যরা, বিভিন্ন সময়ে, এই ধর্ম সম্বন্ধিত গ্রন্থগুলিকে নিজস্ব ভাবনার ধারাভাষ্যে স্নাত করেছেন। তাই বলা যেতে পারে যে সনাতন হিন্দু ধর্ম কোন একজন নির্দিষ্ট ধর্মপ্রচারকের সৃষ্টি নয়। প্রাচীনকাল থেকে নানান ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখিত ও প্রচলিত বিভিন্ন আচার-আচরণ, রীতিনীতির সমষ্টিই ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্মের পরিচিতি হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন পূর্বাচার্যদের ধারাভাষ্যে স্নাত বলেই ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত আচার অনুষ্ঠান অনেক সময় পরস্পরবিরোধী হয়ে উঠেছে। স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে তাই এই সমস্ত ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখিত আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-কানুন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেমন বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে মামা-ভাগ্নির মধ্যে বিয়ে হয় না। কিন্তু তামিল হিন্দুদের মধ্যে এরকম বিয়ে প্রচলিত। আবার সনাতন ধর্মের আর এক অসাধারণ স্বাধীনতা হিসেবে বলা যেতে পারে যে – একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিবভক্ত হয়ে হিন্দু হতে পারে, শিববিদ্বেষী হয়ে হিন্দু হতে পারে, এমনকি নাস্তিক হয়েও হিন্দু থাকতে পারে। কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বী যেমন খ্রিস্টান বা মুসলমানদের এরকমটা হওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের যে সামাজিক প্রবাহ এবং পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বলা

যেতে পারে যে, নানান আচরণের বিধিনিষেধ থাকলেও হিন্দুধর্ম অনেক নমনীয়, কারণ হিন্দুধর্মে প্রয়োজনানুসারে ধর্মের আচার-আচরণ, নিয়ম-কানুন, ধর্মাচার্যগণ পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে নিজস্ব ভাবনাকে প্রাধান্য দিতে পেরেছিলেন। ঔপন্যাসিক নজরুল ইসলাম তাঁর **'ভূমিপুত্র (২)'** (২০০৬) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র কামালের পাশে বসা এক ভদ্রলোক কামালকে প্রশ্ন করছেন ও কামাল উত্তর দিচ্ছেন –

"সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট শব্দদূষণ আইন ভঙ্গ করে মসজিদে মসজিদে মাইক লাগিয়ে যে আজান দেওয়া হয় তা বন্ধ করার আদেশ দেয়। মুসলমান নেতারা সেটা মানে নি।....আমি মনে করি এটা মানা উচিত। কারণ মসজিদে আজান দিয়ে নামাজ পড়া বলুন আর মন্দিরে ঘন্টা বাজিয়ে পুজো করা বলুন, আপনি নিজে আপনার ধর্ম পালন করতে পারেন। কিন্তু মাইক লাগিয়ে দানব কন্ঠে অন্যের বিরক্তির উৎপাদন বা অসুবিধা সৃষ্টি করার কোন অধিকার আপনার নেই। আপনি আজান দিতে চান দিন। আপনি সারা রাত ব্যাপী ধর্ম সংকীর্তন করতে চান করুন। কিন্তু আমার শোনার ইচ্ছে না থাকলেও জোর করে আমার কর্ণকুহরে তা প্রবেশ করাতেই হবে কেন?।....কোরানে কোথাও বলা নেই যে, আজানে মাইক ব্যবহার করতে হবে। মহম্মদ মদিনায় যখন প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠা করলেন, আজান দেওয়া চালু করলেন, তখন মাইক ছিলই না। কাজেই মাইক ছাড়াই আজান দেওয়া হত। তাহলে অন্যের অসুবিধা করে আজই বা কেন দিতে হবে?"

'ভূমিপুত্র (২)' (২০০৬) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র কামাল বলছেন – প্রতিটি মানুষেরই নিজের ইচ্ছা অনুসারে ধর্ম পালন করার অধিকার আছে। কিন্তু এই ধর্ম পালন করতে গিয়ে যদি অপর মানুষের ইচ্ছাকে গুরুত্ব না দেওয়া হয় তাহলে তা প্রকৃত ধর্ম পালন হয়ে উঠতে পারে না। যেমন তিনি বলেছেন, মসজিদে মাইক লাগিয়ে আজান দেওয়া বা মন্দিরে সারারাত্রিব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মাইক লাগিয়ে করা, দুটি বিষয়ই অন্যের বিরক্তির উৎপাদন করতেই পারে। অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি করে নিজের ধর্ম পালন করার আচার-আচরণ বা অনুষ্ঠান কখনোই সামাজিকভাবে গ্রাহ্য হতে পারে না। তাই কামাল বলছেন, আজান দেওয়ার সময় মাইক ব্যবহারের রীতি কোরানের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মদিনায় যখন প্রথম মসজিদ তৈরি হয়েছিল, সেই সময়ে মাইকের ব্যবহারের প্রচলনই ছিলনা। কাজেই আজান দেওয়ার সময় মাইক ব্যবহারের রীতিটি পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। যার প্রতিবাদস্বরূপ কলকাতা হাইকোর্ট শব্দদূষণ আইন ভঙ্গ করে মসজিদে আজান দেওয়া বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের প্রধান কারণ একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস, বাহ্যিক আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাসে বৈপরীত্য। বৈপরীত্য অর্থাৎ হিন্দুরা মূর্তি পুজো পুন্যের কাজ মনে করে। মুসলমানরা এটাকে পাপ

মনে করে। তাই মসজিদের কাছ দিয়ে পুজোর শোভাযাত্রা নিয়ে গেলে মুসলমানেরা বাধার সৃষ্টি করে। ফলে সৃষ্টি হয় বিরোধের। আবার মুসলমানেরা, ছাগল ভেড়ার মত গরুর মাংসও খায়। হিন্দুরা গরু কাটায় বাধা দিতে যায়, সৃষ্টি হয় বিরোধের। ভারতের নথিভূক্ত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এই গরু কাটাকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর **'পরবাসী'** (২০০৮) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র নিরাপদ ওরফে আসাদ আলির বয়ানে –

"শাস্ত্রমতে তিনবার সন্ধ্যা করা মাস্ট। থ্রি টাইমস। যেমন মুসলমানগণ ফাইভ টাইমস।....মোসলমানের মূর্তিপূজা করতে নাই। যে মোসলমান মূর্তিপূজা করে সে মোনাসেফ, সে কাফের।"

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর **'পরবাসী'** (২০০৮) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র নিরাপদ ওরফে আসলাম আলি, যিনি জন্মেছিলেন হিন্দু হয়ে পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তিনি মুসলমান ধর্মাবলম্বী হয়েছিলেন। কিন্তু নিরাপদ বা আসলামের দাদা অসুস্থ হওয়ার পরে তাদের গৃহদেবী বগলা মায়ের পুজো বেশ কয়েকদিন বন্ধ করা হয়েছিল। কারণ নিরাপদ এখন মুসলমান, তাই তার ধর্মানুযায়ী মূর্তিপুজো করতে নেই। তাতে নিরাপদের অত্যন্ত মনোকষ্ট হয়েছিল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে, সে নিজের পূর্বধর্মের ইষ্ট বগলামায়ের পুজো করতে অপারগ হয়ে উঠেছিল। নিরাপদের মানসিক অবস্থার বিবরণ ঔপন্যাসিক অসাধারণ ব্যুৎপত্তিতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। মুসলমান হয়ে মা বগলাকে পুজো করার ক্ষেত্রে, মা বগলাকে নিয়ে তার কোন চিন্তা ছিল না। কারণ মা বগলা তার নিজের মাতৃসম। মুসলমানের ছোঁয়া জবা, মা বগলা পেলে তাতে মা বগলা রেগে যাবেন বলে নিরাপদ মনে করেন নি। কিন্তু পাশের গ্রামের তিন ঘর নমঃশূদ্র পরিবার মাঝেমধ্যেই বগলা মায়ের কাছে পুজো দিতে আসে। নিরাপদের ভয়, তারা যদি বিষয়টা জানতে পারে যে, সে মা বগলাকে পুজো করেছে দাদার অসুস্থতার কারণে, তাহলে ঘোর বিপদ হতে পারে। কারণ তারা প্রচার করে দিতে পারে যে, মুসলমানের ছোঁয়ায় মা বগলার দেবীত্ব নষ্ট হয়েছে। নিরাপদের এরপরে মনে হয় ইসলাম ধর্ম অনুসারে যদি মূর্তিকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, তাতে কোন পাপ নেই। আবার হিন্দু ধর্মানুসারে মূর্তি বিসর্জন শাস্ত্রসিদ্ধ। কিন্তু নিরাপদের মনে হয়, এতদিনের পুজো করা নিজের মা বগলাকে, কি করে সে জলে ভাসিয়ে দিতে পারে! তাই সে এক ব্রাহ্মণকে, সেই বগলা মাকে দিয়ে দিল। একটি দেবীমূর্তি অপবিত্র হয়ে গেলে একজন মানুষ কি করে তাকে পুনঃপবিত্র করতে পারে, তা ভেবে নিরাপদের বা আসলাম আলির খুব বিস্ময়বোধ হয়। একজন মানুষ কি দেবতার

থেকেও বড় হতে পারে? তা না হলে সে কি করে একজন দেবীকে তীর্থবারি, গোমূত্র, গোবর, গরুর দুধ ইত্যাদির দ্বারা শোধন বা পবিত্র করার ক্ষমতা রাখে। পরে নিরাপদ ওরফে আসলাম আলি বগলা মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল। সে দেখেছিল, বগলা মাকেই লোকে বেশি সময় ধরে প্রণাম করে খুচরো প্রণামী দিচ্ছে। বগলা মায়ের সামনের এক বেলগাছের ডালে-ডালে নিজেদের কামনা-বাসনা রূপ ঢিল, নানা রঙের সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে। কিন্তু নিরাপদ সেই মন্দিরে ঢোকার অধিকার হারিয়েছে কারণ সে এখন মুসলমান। দেবীমুর্তির মতো তার প্রায়শ্চিত্ত বা শোধন কোনটাই এখন সম্ভব নয়। মন্দিরে প্রবেশ করার আগে শাস্ত্রের বিধান মত সে যদি মন্দিরে ঢোকে, তার নিজের সেই গৃহদেবী বগলামাকে স্পর্শ করে, তাহলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এবং এই প্রায়শ্চিত্তের কোন বৈধতার সীমা নেই। অর্থাৎ প্রতিবার এলে প্রতিবারই নতুন করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তার 'পরবাসী' উপন্যাসে হিন্দু-মুসলিম সমাজের যে তথ্যচিত্র তুলে ধরেছেন, তা এককথায় অভিনব। যে ধর্মের স্থান মানুষের বিবেকে, মননে থাকা উচিত সেই ধর্ম মানুষকে মননশীল বা বিবেকবান হতে বাধা দেয়। সেই কারণেই নিরাপদ ওরফে আসলাম আলি নিজেদের গৃহদেবী বগলামাকে ইচ্ছে থাকলেও পুজো না করে, বগলা মায়ের পুজো হওয়ার কারণেই, অন্যের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। কারণ সমাজে কখনো কখনো, ঈশ্বরের থেকেও মানুষ বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। এবং ঈশ্বরকে এবং মানুষকে কিভাবে শোধন করা হবে, তা সবই মানুষ নির্ধারিত করে। ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহ তার **'ঋভু (চতুর্থ পর্ব)'** (২০০৪) উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের বয়ানে –

"এই দেশটার নাম ভারতবর্ষ। একজন সালাম ওয়ালেকুম বলে সম্ভাষণ করে তো অন্য জনে ভালোবেসে উত্তর দেয়, জয় রামজিকি! আইয়ে, আইয়ে, পাধারিয়ে। অর্থাৎ আসুন, আসুন পায়ের ধুলো দিন। কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে শিখ তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা ছিল না। এখন মাথা ব্যথা হচ্ছে কারণ ওসামা বিন লাদেনের নানা হরকত এবং মধ্যপ্রাচ্যের অঢেল টাকা এবং সারা পৃথিবীব্যাপী ইসলামী দুনিয়া প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলছে এখন জোর কদমে। সংখ্যালঘুদের মৌলবাদীতার কারণেই এতদিন উদাসীন এবং ঔদার্যের গর্বে গর্বিত সংখ্যাগুরুরা নেহাতই নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই অন্যরকম ভাবনা চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছেন।"

ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহ তার **'ঋভু (চতুর্থ পর্ব)'** (২০০৪) উপন্যাসে যে তথ্যচিত্র প্রাপ্ত হওয়া যাচ্ছে, তা থেকে ভারতবর্ষের যে সামাজিক দিক উন্মুক্ত হয়ে উঠছে, তা থেকে বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীতে যে কোন স্থানেই প্রত্যেক মানুষ

প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিক্ষা লাভ করে থাকে। ভারতের সনাতন ধর্মের প্রধান শিক্ষাই হ'ল – মানুষকে, মানুষ জ্ঞান করতে হবে। মানুষের ধর্ম, জাত, তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, তার ঐশ্বর্য, তার যশ, তার রাজনৈতিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস এসবের কোন কিছুতেই আগ্রহী না হয়ে মানুষকে শুধুমাত্র তার মনুষ্যত্বের জন্যই সম্মান করতে হবে। এবং তার কাছ থেকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী হতে হবে। মানুষের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির কারণে মানুষের মধ্যে অহংবোধের সৃষ্টি হতে পারে যা শিক্ষাভ্রংশতার প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে করা যেতে পারে। তাই বলা যেতে পারে যে, বিনয়ের সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষমতা, মানুষকে প্রকৃত শিক্ষিত প্রতিপন্ন করে তোলার ক্ষমতা রাখে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার অনতিকাল পূর্বে ও পরে, হিন্দু-মুসলিমের মধ্যের সদ্ভাবকে লেখক অত্যন্ত সহমর্মিতার সাথে তুলে ধরেছেন। কিন্তু বর্তমানে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ হিসেবে লেখক তাঁর উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন যে ওসামা বিন লাদেনের নঙর্থক কর্মপদ্ধতি, মধ্যপ্রাচ্যের অপরিসীম অর্থের যোগান ও বিশ্বব্যাপী ইসলামী দুনিয়া প্রতিস্থাপনের প্রচেষ্টা যা সংখ্যালঘুদের মৌলবাদীতার কারণেই সংঘটিত হচ্ছে বলে মনে করা যেতে পারে। বর্তমানে তাই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়েরা নিজেদের ভবিষ্যতভাবনার পরিপ্রেক্ষিতেই অন্যরকম ভাবনায় ভাবিত হতে বাধ্য হচ্ছে। স্বাধীনতার অনতিকাল পূর্বে ও পরে, ভারতবর্ষের প্রায় সব জায়গাতেই সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সম্প্রীতি ও মনুষ্যত্বের আদান-প্রদানের মানসিকতা পরিপূর্ণভাবে অবস্থান করতো। বর্তমানে সেই পরিবেশ নষ্টের মূলে যারা, তারা ভারতবর্ষের শত্রু একথা বলা যেতেই পারে। প্রত্যেক দেশপ্রেমী ভারতবাসীর কর্তব্য সেই শত্রুদের চিহ্নিত করে উৎপাটন করা। স্বাধীনতার পরে যারা ধর্মভিত্তিক দেশ গড়তে চেয়েছিল তারা পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ গড়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। একটি কথা মনে রাখতে পারা যায় যে মানুষ মহাপুরুষ না হলেও কাপুরুষ যেন না হয়। উপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহ লিখিত উপন্যাস **'কুরুবকের দেশে'** (২০০৬) উপন্যাসের চরিত্র ভটকাই ও তিতিরের কথোপকথনের ভিত্তিতে যে তথ্যচিত্র পাওয়া গেল তা হ'ল –

"ভটকাই বলল, না ঠাকুর দেবতা নিয়ে ইয়ার্কি করা ভালো নয়। তাও আমাদের সবই সহ্য হয়। ইসলামে এসব বাঁদরামো সহনীয় নয়। মুসলমান হলে তোরা এতক্ষণে হয়তো আমাকে 'কাফের' আখ্যা দিয়ে কোতলই করে দিতিস। – সে পাকিস্তানি বা ইরানি বা আফগানি হলে বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালি হিন্দুদের বিশেষ তফাৎ নেই। তিতির বলল। তারপর বলল, শিক্ষাই মানুষকে ঔদার্য দেয়। বাঙালি মুসলমানেরা তো আর মাদ্রাসার

শিক্ষাতে আটকে থাকেননি। আসল দোষ হচ্ছে ধর্মান্ধতা। তিনি বা তাঁরা যে জাতের মানুষই হোন না কেন! দাদুর কাছে শুনেছি, ওঁদের ছেলেবেলাতে শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই দুর্দান্ত আরবী-ফারসি জানতেন। আবার তেমন শিক্ষিত মুসলমানেরাও সংস্কৃত জানতেন। ওই ইংরেজরাই এসে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নষ্ট করে চাকরের জাত বানিয়ে দিয়ে গেল। সাহেব বানালো। তাও পুরো সাহেব বানালেও বুঝতাম। ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতিতে শামিল করল আমাদের।"

ভারতবর্ষ যে বার বার বিদেশি শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং সর্বশেষে ইংরেজদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে একথা তথ্যঋদ্ধ। তবে ভারতবর্ষে এসে ইংরেজরা এদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ও জনজীবনের সঙ্গে মিশে যাওয়ার মানসিকতাকে কোনদিনই প্রশ্রয় দেয়নি, এ কথা সর্বাংশে না হলেও আংশিক সত্য হিসেবে বলা যেতেই পারে। কিন্তু আরব, তুর্কি, তাতার, পাঠান, মোগল ইত্যাদি শক্তিগুলি এদেশে আক্রমণকারী হিসেবে প্রবেশ করলেও, শেষপর্যন্ত এদেশের শিল্প-সংস্কৃতি ও জনজীবনের সাথে যুক্ত হয়ে প্রায় ভারতীয়ই হয়ে গিয়েছিল। তাদের শিল্প সংস্কৃতির সাথে মিলিত হয়ে ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি আরো বেশি সমৃদ্ধ হয়েছিল। ভারতবর্ষে ইসলামের প্রথম প্রচার রক্তপাতের মাধ্যমে হয়নি, বরং মুসলমান সাধু-সন্ত অর্থাৎ সুফি-পীর-দরবেশ এঁদের মাধ্যমেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মহান মানব ধর্মের প্রচার সম্প্রচারিত হয়েছিল। ঠাকুর দেবতা নিয়ে মস্করা করা হিন্দুধর্মে সহনীয়, ইসলাম ধর্মে এসব সহনীয় নয়। মুসলমান ধর্মে আল্লার বিরুদ্ধে কথা বলা মানুষকে, 'কাফের' আখ্যা দেওয়া হয়। বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালি হিন্দুদের বিশেষ তফাৎ নেই। কারণ শিক্ষাই মানুষকে ঔদার্য দেয়। বাঙালি মুসলমানেরা তো মাদ্রাসা শিক্ষাতেই শুধু আটকে থাকেননি। শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই দুর্দান্ত আরবি-ফারসি জানেন। ঠিক সেইরকম আবার শিক্ষিত মুসলমানেরাও অনেকেই সংস্কৃত জানেন। ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসে ভারতবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি নষ্ট করে ভারতবাসীদের ইঙ্গবঙ্গ সংস্কৃতিতে শামিল করেছিল। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-ইসলামের মধ্যে আসল দোষ হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার মোড়কে মোড়া ধর্মান্ধতা। উপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহ রচিত **'স্বপনে নিভৃত স্বপনে'** (২০০৩) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র অবনীবাবুকে রফিক সাহেবের প্রশ্ন – 'আপনি কি ঈশ্বর মানেন অবনীবাবু?' – এর উত্তরে অবনীবাবু বলছেন –

"ধর্ম-কর্ম, মানে Rituals পালন করি না তেমন করে বটে কিন্তু ঈশ্বর মানি অবশ্যই। বিজ্ঞানের সঙ্গে তো ঈশ্বরের কোনো বিরোধ নেই।....যাঁরা পুণ্যার্থী তাঁদের কথা আলাদা। তাঁরা দেবদর্শন করতেই পুণ্যস্থানে যান। দেবর্শনই শুধু তাঁদের প্রার্থনার এবং দেবদর্শন হলেই তাঁদের কার্যসিদ্ধি হয়। আমি ব্রাহ্ম। মূর্তিপুজো আমি করি না। তবে মূর্তিপুজো যাঁরা করেন

তাদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্রও অসূয়া নেই। স্বামী বিবেকানন্দ ওই ব্যাপারটাকে ভারি সুন্দর করে বুঝিয়েছিলেন। জঙ্গলের আদিবাসীরা টোটেম পুজো করে। গাছ, পাথর, বা অন্য কিছু। বিগ্রহও পুজো করে না তারা।....স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছিলেন যে "হিন্দুধর্ম যদি মৃত হইত তবে তাহা ব্রাহ্মধর্মকে প্রসব করিতে পারিত না"। ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুরাই প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা ব্রহ্মধর্ম। যদিও প্রকৃতিতে ভিন্ন।....সৌন্দর্য তো প্রকৃতিতে থাকে না, ভক্তিও মূর্তিতে থাকে না, সেই সব থাকে তোমার মনে।"

'স্বপনে নিভৃত স্বপনে' (২০০৩) উপন্যাসস্থিত যে তথ্যসত্য প্রাপ্ত হওয়া যাচ্ছে তা হ'ল – ধর্ম হচ্ছে যা ধারণ করে। যাঁরা পুণ্যার্থী তাঁদের কথা আলাদা, তাঁরা দেবদর্শন করতেই পূণ্যস্থানে যান। শুধু তাঁদের প্রার্থনা এবং দেবদর্শন হলেই তাদের কার্যসিদ্ধি হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়টিকে ভারী সুন্দরভাবে বিবৃত করেছিলেন। জঙ্গলের আদিবাসীরা টোটেম পুজো করেন, অর্থাৎ গাছ, পাথর বা অন্য কিছু, তারা বিগ্রহ পুজো করে না। কেউ কেউ কোনো পাহাড়ের মধ্যের অতল এবং অশেষ কোনো গুহাকে পুজো করে। অর্থাৎ তাদের বিদ্যা বুদ্ধি যেখানে শেষ হচ্ছে সেখানেই তাদের দেবতার অধিষ্ঠান। কোনও কোনও আদিবাসী আবার কোনও সুপ্রাচীন গাছকেও পুজো করে। কারণ তারা মনে করে, অতিকায় সেই সুপ্রাচীন গাছই তাদের রক্ষয়িত্রী। এভাবেই সহজাত প্রবৃত্তিবশেই তাদের অনুভূতিতে, তাদের জীবনের চারপাশের রহস্যময় শক্তিকে, নিজেদের জীবন সংগ্রামের সহায়ক শক্তি রূপে পেলে, তারা জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে পারবে বলে তাদের বিশ্বাস হয়। বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছার কারণেই, তা সে সদর্থকভাবেই হোক বা নঙর্থকভাবেই হোক, এই মৌল তাড়নার থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে বলা যেতে পারে। বেঁচে থাকার সদর্থক দিকটি হলো – পূর্ণতা, আনন্দ ও ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা। বেঁচে থাকার নঙর্থক দিকটি হলো – ধ্বংস ও মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষার ইচ্ছা। তাহলে বলা যেতে পারে যে ধর্মের মূল হল জৈবিক প্রয়োজন বা জীবন সংগ্রাম। যদিও বেঁচে থাকার ইচ্ছা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে একথা সর্বতোভাবে বোধহয় সমর্থন করা যেতে পারে না। 'বেঁচে থাকার ইচ্ছা' শুধুমাত্র এক জৈব ইচ্ছা, যাকে কোনভাবেই 'ধর্মীয় ইচ্ছা'-র নথিভূক্ত করা হয়তো সম্পূর্ণভাবে যেতে পারে না। কারণ এই জৈব ইচ্ছা শুধুমাত্র ধর্মকে পরিচালিত করে তা নয়, মানুষের সমগ্র জীবনকেই পরিচালিত করে। আবার বলা যেতে পারে শুধুমাত্র মানুষ নয়, মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যেও এই অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম তীব্রভাবে বর্তমান। কিন্তু মানুষ ছাড়া ইতর প্রাণীদের জীবনে সম্ভবত সেইঅর্থে ধর্ম বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব হয়তো থাকতে পারে না। তবে মানুষের বিভিন্ন চেতনার সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত ধর্মীয় চেতনার মূল হ'ল – জৈবিক

বোধ বা জীবন সংগ্রাম। আদিবাসীদের সমাজদর্শনে এভাবেই হিন্দুত্ব স্থান পেয়েছে। সৌন্দর্য তো প্রকৃতিতে থাকেনা, ভক্তিও মূর্তিতে থাকেনা, এই সবই থাকে মানুষের মনে। এ প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের গানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "পুষ্প বনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে"। এক সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে মানুষের সদর্থক মন তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ষষ্ঠেন্দ্রিয়। যা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। তাই সত্য প্রকৃত ধর্মের মূল উপকরণ – সদর্থক পবিত্র মন, একথা বলা যেতেই পারে। পবিত্র মনে সাধারণত নিষেধের অনুশাসন এবং ভেদাভেদের সংকীর্ণতা বসতি করতে পারেনা। এই কথার ধারণাকে আঁকড়ে ধরেই **'জগন্নাথ তোমাকে প্রণাম'** (২০০৫) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক চঞ্চল কুমার ঘোষ উপন্যাসের চরিত্র জগন্নাথের সমাজ সম্পর্কে মানসিক ভাবনাকে বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন।–

"ওই অসীম অনন্ত আকাশের মতোই সে জীবনকে প্রসারিত করতে চায়। তার পিতা, পিতামহের জীবনচর্চা তো শুধু কতকগুলো নিয়ম আর নিষেধের অনুশাসন। সূর্যোদয় থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রতি পদক্ষেপে হাজার ছুঁৎমার্গের বেড়াজাল। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ আর সংকীর্ণতা। যন্ত্রচালিতের মত শুধু ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য নিবেদন করা, মন্ত্রপাঠ, হোম-যজ্ঞের আগুনে নিজেকে শুদ্ধ করার সর্বতো প্রচেষ্টা। এখানে কোনও আনন্দ নেই। হৃদয়ে তৃপ্তির অনুভূতি নেই। শুধু ভারবাহী নৌকার মতো বয়ে চলা জীবন। কিন্তু সে তো এ জীবন চায়না – যে জীবন সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে প্রতিনিয়ত সত্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, অন্ধকারের বুকে আলোকিত হয়ে ওঠে, সে তো সেই জীবনপথের সন্ধানী।"

'জগন্নাথ তোমাকে প্রণাম' (২০০৫) উপন্যাসের ভাবনায় ভাবিত হয়ে বলা যেতে পারে যে – মানুষের মন বা অনুভূতিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানসিক প্রকাশরূপে গণ্য হতে পারে। তাই বলা যেতে পারে, ধর্মোৎপত্তির মূলে হ'ল – 'বিশুদ্ধ উপলব্ধি' এবং ধর্মচেতনার মূলে হ'ল – 'পবিত্র অনুভূতি'। ধর্মচেতনার থেকে যদি অনুভূতি বিলুপ্ত হয় তখন তাকে আর ধর্মীয়চেতনা বলা যেতে পারে না। সভ্যতার নষ্টবুদ্ধিতে ও নিয়মকানুনের বেড়াজালে বিশুদ্ধবুদ্ধির বা উপলব্ধির বিকৃতি ঘটতেই পারে। তাই ধর্মীয় চেতনার চালিকাশক্তি হ'ল – মানুষের শুদ্ধবুদ্ধি বা সুচিন্তনের সামর্থ্য। কারণ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, আচার-আচরণ সাধারণভাবে বুদ্ধিভিত্তিক বা যুক্তিক্রিয়ার দর্পণ হতে পারে। এই বুদ্ধিভিত্তিক ভাবনা বা যুক্তিক্রিয়ার দর্পণই, মানুষকে ক্রমান্বয়ে জীবনের সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে যে সত্য জীবনপথ, সেই পথে পরমসত্যের দিকে প্রতিনিয়ত অগ্রসর করাতে পারে এবং সেই পথের দিশারী হয়ে উঠতে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। ঔপন্যাসিক নীলকন্ঠ ঘোষালের **'ভূমিকন্যা'** (২০০৬) উপন্যাসটিতে উপন্যাসের চরিত্র পালন এবং মৌলবির মধ্যে ভালোবাসার অধিকার ও ধর্মের অধিকার

নিয়ে যে তর্ক দৃশ্যমান, তাতে উপরোক্ত ভয়মিশ্রিত ভালোবাসা ও ধর্মের অধিকারের যে দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে তা বর্তমান গবেষণায় ধর্মীয় সামাজিক দিকের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

"আমি বলব কেন? তুমি বলবে কেন? এটা ওদের অধিকার। – বলল পালন।
অধিকার? কীসের? মৌলবির কথা।
ভালবাসার অধিকার। তোমরা কোন্ অধিকারে এখানে এসেছ? ওরা এসেছে কোন অধিকারে? মৌলবি বলল, ধর্মের অধিকারে। সমাজ সংসার চলে ধর্মের শাসনে।
মনুষ্যত্বকে ঠকানোর জন্য, দাবিয়ে রাখার জন্য অনুশাসনের যে-জঙ্গল সৃষ্টি করেছ, তোমরা সেই জঙ্গলের অধিকার চাপাতে চাইছ দু'টি নির্মল সৎ মনের ছেলেমেয়ের ওপরে। এভাবেই তোমরা ধর্মের নামে জমিদারি চালাবে? তোমার প্রজা নাকি এরা? ওরা ঈশ্বরের বা আল্লাহ্‌র প্রজা। শুনে রাখো তোমরা, সবাই শোনো, কোরানে নির্দেশ আছে এক মুসলমান অ-মুসলমানকে বিয়ে করতে পারে। তুরস্ক দেশে সিভিল আইন একজন মুসলমান নারীকে অ-মুসলমান মানুষকে বিয়ে করার স্বাধীনতা বা অধিকার দিয়েছে। আমাদের দেশেও এটা চলছে সেই মুসলমান রাজত্বের সময় থেকেই।"

ঔপন্যাসিক নীলকন্ঠ ঘোষালের **'ভূমিকন্যা'** (২০০৬) উপন্যাসটিতে ভালোবাসার অধিকার ও ধর্মের অধিকার নিয়ে যে তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যাচ্ছে তা অনেকটাই ভয়রূপ ধর্মীয় আবেগের বশবর্তী বলে মনে করা যেতে পারে। ভয়রূপ আবেগ ধর্মের উৎপত্তির একটি বিশেষ শর্তরূপে গণ্য হলেও তা পর্যাপ্ত শর্তরূপে গণ্য হতে অপারগ হতে পারে। কারণ ভয়রূপ আবেগের সঙ্গে সর্বদাই এক পলায়নপ্রবৃত্তি জড়িত থাকতে পারে। ধর্মীয় ভয়ের দুটি বিরুদ্ধ মনোভাবের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ ঈশ্বরকে ভয় পাওয়ার জন্যই ঈশ্বর থেকে দূরে থাকার মনোভাব, যাকে 'পলায়নের মনোভাব' নাম দেওয়া যেতে পারে, দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা,ভালোবাসার কারণেই ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হবার মনোভাব, যাকে 'সভয় বিস্ময়'-এর মনোভাব নাম দেওয়া যেতে পারে। তাই ভয়মিশ্রিত ধর্মীয় আবেগ কখনোই ঈশ্বর সান্নিধ্যলাভের বাসনা, আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের কামনা, জাগ্রত করতে পারেনা, তা সে মানুষের সাথেই হোক বা ঈশ্বরের সাথেই হোক। মনুষ্যত্বকে ঠকানোর জন্য, দাবিয়ে রাখার জন্য অনুশাসনের বেড়াজালে কখনোই কোন মানুষকে বন্দী করা যেতে পারে না। কারণ, কোরানে নির্দেশ আছে এক মুসলমান অ-মুসলমানকে বিয়ে করতে পারে। তুরস্কদেশে সিভিলআইন একজন মুসলমান নারীকে, অ-মুসলমান পুরুষকে বিয়ে করার স্বাধীনতা বা অধিকার দিয়েছে। আমাদের দেশেও এটা চলছে সেই মুসলমান রাজত্বের সময় থেকেই। এর প্রচুর প্রামাণ্য উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় বর্তমান আছে বলা যেতে পারে। ঔপন্যাসিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

তাঁর **‘অমৃতং গময়’** (২০০৫) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র মাধবানন্দ গোঁসাইজী বলছেন –

“কথা-ই সব। কথাতেই মানুষ আনন্দ পায় – বলে কথামৃত; আবার কথাতেই মানুষ কাঁদে – বলে হুল ফোটাচ্ছে।....শিশির বলল, আমার কথা হল, আরে ভাই হিন্দু নয় মুসলমান নয় মানুষের পরিচয় তার আচরণে।....মূল্যবোধ না থাকলে অচেনা অজানা মানুষের জন্য কেউ এসব করে বিশেষত আজকালকার দিনে....গোঁসাইজী বললেন.... কেউ যখন জন্ম নেয় তখন জগত হাসে সে কাঁদে, কিন্তু তার কর্ম যদি ভালো হয় তবে তার যাওয়ার সময় জগত কাঁদে, সে হাসতে হাসতে যায় – একেবারে খাঁটি কথা।”

একটা প্রচলিত কথা আছে – বোবার শত্রু নেই। তার প্রধান কারণ হিসেবে বলা যায় আসলে বোধ হয় বোবার সমাজ নেই। কারণ সমাজ মনুষ্য দ্বারা সৃষ্ট এবং সমাজে শত্রুতাও একটা সামাজিক সম্বন্ধ। কোন সামাজিক সম্বন্ধই ভাষা ব্যতিরেকে গড়ে ওঠা সম্ভবপর বোধহয় নয়। তাই মূকব্যক্তিকে সামাজিক সম্পর্কযুক্ত করার জন্য ইশারা-ইঙ্গিত, অঙ্গভঙ্গিমার দ্বারা ভাষাশিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। শত্রুর আচরণ ও বাক্য প্রকাশের মধ্যে এমন একটা ভাষা লুকিয়ে থাকে, যার ভাবার্থ দুই পক্ষই সমানভাবে উপলব্ধি করতে পারে। তাই মানুষের সম্পর্ক অনুকূলই হোক আর প্রতিকূলই হোক, সব সম্পর্কই সামাজিক সম্পর্ক। তাই ঔপন্যাসিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর **‘অমৃতং গময়’** (২০০৫) উপন্যাসে যখন বলেন, ‘কথা-ই সব। কথাতেই মানুষ আনন্দ পায় – বলে কথামৃত; আবার কথাতেই মানুষ কাঁদে – বলে হুল ফোটাচ্ছে।’ – একথা সর্বৈব সত্য বলে অনুধাবন করতে পারা যায়। সমাজে ‘সমাজমানস’ এই কথাটি খুব প্রচলিত। ভাষা ছাড়া বা কথার অস্তিত্ব ছাড়া এই ‘সমাজমানস’ কথাটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যতা বর্তমান। প্রতিটি মানুষের তাই মানসিকতাও পৃথক। সেই কারণেই প্রতিটি মানুষের ভাবনাময় কথার সংকেতগুলি প্রতিটি মানুষের কাছেই দুর্বোধ্য হয়ে উঠতে পারে। তাই মানুষের ব্যক্তিসত্তা তার কথাতেই পরিস্ফুট হয়ে উঠতে সক্ষম হতে পারে। যদি প্রতিটি মানুষ শুধুমাত্র নিজের সাথে কথা বলেই তৃপ্ত হয়, তাহলে একে অন্যের অভিজ্ঞতাকে কখনোই পরস্পরের সঙ্গে আদান-প্রদান করা সম্ভব হতে পারে না। ফলে ‘কথামৃত’ বা ‘কথার হুল ফোটানো’ শব্দ দুটি সমাজ সাপেক্ষে সমাজের মানুষের কাছে অর্থহীন হয়ে উঠতে পারে। সেই কারণেই হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার ভাবনার প্রাধান্য নয়, প্রাধান্য পেতে পারে, যেকোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়েরই মূল্যবোধ, যা মানুষের সাথে মানুষের কর্মের দ্বারা এমন সদর্থক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম, যেখানে ভাষা এক মধুময় উপকরণ হয়ে উঠতে পারে। যা সমাজের মানুষকে সুস্থ ও মরমী ধার্মিকতার আবহে উজ্জীবিত করে তুলতে সক্ষম

হতে পারে। ঔপন্যাসিক আবুল বাশার তাঁর **‘আমি লালন কবীর’** (২০০৮) উপন্যাসে মধুময় ভাষার সমর্থনেই, পরোক্ষভাবে প্রেম বা ভালোবাসাকে সমর্থন করেই, উপন্যাসের চরিত্র নাজের চিন্তন অনুযায়ী বলেছেন –

“কোনও কোনও মনীষী নাকি বলেছেন, জীবন এক প্রহেলিকা। তা ঠিক। কিন্তু একমাত্র ভালোবাসাই সেই জীবন-কুহেলিকার অতল অস্পষ্টতায় আলো ফেলে জীবনের মানে কী, মানুষকে তারই কিছু ইশারা দিয়ে চলেছে। মনীষী-বয়ান ছেড়ে দিলেও সামান্য সাধারণ প্রেম জীবনকে বয়েত করার ক্ষমতা রাখে। নাজও যে ঘর ছেড়ে, কৌমধর্ম ছেড়ে এসেছিল এক ঐতিহাসিকের মাত্র দু-চারটি চকিত ইশারায় – প্রেমের চেয়ে শক্তিশালী ধর্ম পৃথিবীতে নেই।”

ঔপন্যাসিক আবুল বাশার তাঁর **‘আমি লালন কবীর’** (২০০৮) উপন্যাসে ভাষার মাধুর্যকে স্বীকার করে, নাজের যে চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তা হল, একমাত্র ভালোবাসাই যা ব্যক্তিচেতনায় ভাষার ব্যবহারে প্রেমকে জাগ্রত করতে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। আর বলা যেতে পারে, প্রেমই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শক্তিশালী ধর্ম। ধর্ম ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অক্ষুন্ন রাখে ভাষার দ্বারা, এবং ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম করে, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিকে মিলিত করে। তাই বলা যেতে পারে, ভাষার ক্ষমতাই মানুষের মানসিক ক্ষমতা প্রকাশের এক হাতিয়ার। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভাষার মধুময়তাই ভালোবাসা বা প্রেমের জন্ম দিতে পারে। তাই সেই অর্থে জ্ঞান ও ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে, ভাষার মধুময়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেইকারণেই অনেকসময় ভিন্ন মতাদর্শী মানুষও একে অন্যের সাথে সমার্থবোধে সম্মত হতে পারে। তাই মানুষ ভিন্ন হলেও কখনোই সে বিচ্ছিন্ন নয়। তার প্রমাণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে – মানুষ বাঙ্ময়। অর্থাৎ মানুষের মানসিক মিলনের প্রধান প্রমাণ – বক্তা ও শ্রোতার ভাষার অন্তঃস্থ মিলন। এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে যে, অসাধারণ ব্যক্তিও শব্দ ব্যবহারের কারণেই, সময় সাপেক্ষে, নিজেকেই নিজে সাধারণ প্রমাণিত করতে পারে। কারণ শ্রোতা ও বক্তার ব্যক্তিচেতনাই জ্ঞান সাপেক্ষে ও সময় সাপেক্ষে, পরস্পরকে মিলিত করে আবার বিচ্ছিন্নও করে। তাই ব্যক্তিচেতনার সাথে প্রকৃত জ্ঞান, ভাষার মধুময়তাকে গ্রাহ্য করে তুলতে পারলে ধার্মিক অসাম্প্রদায়িকতাকে আলিঙ্গন করা, সামাজিকভাবে সম্ভব হতে পারে। তাতে বিশ্বভাতৃত্ববোধের সৃষ্টি হওয়া অনেক সহজ হতে পারে। পূর্ণকুম্ভের মেলাতে কোটি কোটি মানুষ আসে স্নান করতে। এ যেন এক ধার্মিক অসাম্প্রদায়িকতাকে বরণ করার উৎসব। সকলেই বুকসমান ঠান্ডাজলে দাঁড়িয়ে

মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকেন। খ্রিস্টান, মুসলমানরা মৃত্যুর পর মৃতদেহ কবর দেয়, কিন্তু হিন্দুরা দাহ করে। তারপর সেই দেহভস্ম গঙ্গায় বিসর্জন দেয়। হিন্দুরা যখন সঙ্গমে স্নান করতে নামে, তখন প্রণামের ভঙ্গিতে সঙ্গমের জল নিয়ে মাথায় ঠেকায়। এই প্রণামের মাধ্যমে, তারা যেন শুধু নিজের মৃত পুরুষ-নারীদের নয়, সমস্ত মানবজাতির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়। এ যেন এক বিশ্বভাতৃত্ববোধের প্রতীকী ভাবনা। ঔপন্যাসিক সুবীর ভট্টাচার্যের লেখা **'বিষ অমৃত কুম্ভে'** (২০০৬) উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের বয়ানে –

"প্রয়াগ তো তিনটে স্রোতের সঙ্গম। কিন্তু আমার মনে হয় কুম্ভের কটা দিন আরও একটা স্রোত এসে মেশে এই ত্রিবেণী সঙ্গমে – সে শাশ্বত ভারতের স্রোত। প্রতিটি মানুষ তার জাত-ধর্ম-সম্মান-অবস্থার কথা ভুলে কোটি মানুষের ধারায় একটি বিন্দু হয়ে যায়। নদীর প্রবাহ থেকে যেমন কোন জলবিন্দুকে পৃথক করা যায় না, পুণ্যার্ত মানুষের এই ধারা থেকেও মনে হয় তেমন-ই কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে আলাদা করা যায় না। সব মিশে শুধু একটাই স্রোত – অমৃতলোভী মানুষের স্রোত।"

ঔপন্যাসিক সুবীর ভট্টাচার্যের লেখা **'বিষ অমৃত কুম্ভে'** (২০০৬) উপন্যাসে পাওয়া তথ্যানুযায়ী বলা যেতে পারে যে – ত্রিবেণীসঙ্গমে উত্তর থেকে বয়ে আসে পতিতপাবনী গঙ্গা, আর দক্ষিণ থেকে বয়ে আসে যমুনা। এই সঙ্গমেই মিলিত হয় গঙ্গা-যমুনা। আশ্চর্যের বিষয় হলো, গঙ্গার গেরুয়াধারা আর যমুনার কৃষ্ণধারার স্বাতন্ত্র্য কিন্তু সঙ্গমে অক্ষুন্ন থাকে। সরস্বতী নদীও গঙ্গা-যমুনার সাথে এখানেই মিলেছে। তবে সরস্বতী এখানে অন্তঃসলিলা। আপামর মানুষের বিশ্বাস ত্রিবেণীসঙ্গম অর্থাৎ তিনটি নদীর সঙ্গমটি গঙ্গানদীর মাঝখানে অবস্থিত। তাই অনেকেই সঙ্গমে স্নান করে পুণ্যার্জন করার জন্য, নৌকো ভাড়া করে নদীর মাঝখানে যান। অপার ভক্তি ও প্রত্যয় সম্বলিত প্রতিটি পুণ্যার্থী মানুষের 'চতুর্থস্রোত' যেন বয়ে সঙ্গমে মিশে যাচ্ছে। এই পুণ্যার্থী মানুষদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা – এক অপার্থিব সিদ্ধিলাভ। মানুষের বিশ্বাসকে দেখে এখানে বিস্মিত হতে হয়। কোন মন্দির নেই, দেবতা নেই। আছে শুধু তিনটি নদীর সঙ্গম – আর সেই তিনটি ধারার মিলিত সঙ্গমে দিতে হবে এক ধার্মিক একাগ্রতার ডুব। মানুষের একীভূত হওয়ার এই অপূর্ব একাগ্র বিশ্বাসকে সম্মান না জানিয়ে থাকতে পারা যায় না। এখানে মানুষের প্রতি মানুষের কোন প্রতিবাদ নেই, বিরোধিতা নেই, সমালোচনা নেই, সাম্প্রদায়িকতা নেই। আছে শুধু এক অভূতপূর্ব পুণ্যার্জনের আকাঙ্ক্ষা। তাই একে বিশ্বভ্রাতৃত্বের সঙ্গমও বলা যেতে পারে। **'জীবনটাকে চেখে দেখুন'** (২০০৭) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার

ধর্মের যে সামাজিকতার দিক তুলে ধরেছেন এবং ধর্মের দ্বারা সামাজিকতা কিভাবে পরিচালিত হতো, তার যে প্রয়োজনীয় তথ্যচিত্র প্রাপ্ত হওয়া গেছে, তা বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তাই তিনি তাঁর **'জীবনটাকে চেখে দেখুন'** (২০০৭) উপন্যাসে কথকের ভূমিকায় বলেছেন –

"ধর্ম মানুষকে একত্র করে। তাকে নিয়মশৃঙ্খলা শেখায়। তার জীবনযাপন পদ্ধতিতে সুচারুভাব আসে। প্রকৃত ধার্মিক উদার হন। ধর্ম তার অনুসরণকারীকে আশ্রয় দেয়।"

'জীবনটাকে চেখে দেখুন' (২০০৭) উপন্যাসে উপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার লিখেছেন – সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল – ধর্ম। ধর্মকে কেন্দ্র করেই মানুষের সমাজ জীবনে উঠে আসে বিভিন্ন সমস্যা। তবে একটা কথা বলা যেতে পারে যে ধর্মই সমাজের মানুষকে একত্র করে। মানুষকে সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে শেখায়। তার জীবনযাপন পদ্ধতিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। তবে সমাজ যেমন একদিকে মঙ্গলের আহ্বাহক, তেমনি অপরদিকে অমাঙ্গলিক বাতাবরণেরও জন্ম দিতে পারে। তাই যেসব সংস্কার ও প্রথা মানবতার অপমান বলে মনে করা যেতে পারে, সেইসব আচার-ব্যবহার প্রত্যাহার করতে পারলেই, সমাজের সামাজিক পরিস্থিতির শুভমননধারা জাগ্রত হবে বলেই প্রত্যাশী হওয়া যেতে পারে। প্রকৃত ধার্মিকব্যক্তি উদার হন। ধর্ম তার অনুসরণকারীকে আশ্রয় দেয়। কিন্তু যারা ধর্ম নিয়ে অন্ধ হয়ে পড়েন, তাদের 'মৌলবাদী' বলা হয়। 'মৌলবাদী' শব্দটির অর্থ – যিনি মূল-এর প্রতি অবিচল থাকেন। হিন্দুদের মৌলবাদী হওয়ার কোন উপায় নেই। কারণ হিন্দুধর্মের কোনও নির্দৃষ্ট প্রচারক না থাকার কারণে, হিন্দু ধর্মের কোনো মূলধারা নেই। হিন্দুধর্মে যে ভাষায় বেদ, উপনিষদ, গীতা লেখা হয়েছে ও যে ভাষায় পূজাপদ্ধতি পরিচালিত হয় সে ভাষা দেবভাষা। এই দেবভাষার অধিকার শুধুমাত্র হিন্দু গুরুরাই পেতেন। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে এই দেবভাষা অজ্ঞাত হয়েই থাকতো। তাই সমাজে দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'ল – গুরু এবং ভক্ত। লেখক সমরেশ মজুমদারের মতে পাঠান আক্রমণের আগে হিন্দু-মুসলিম সকলেই এই বঙ্গ ভূখন্ডে একত্রেই বসবাস করতেন। ধর্মবিদ্বেষী ভাবনা তখন কারোর মধ্যেই গড়ে ওঠেনি। কিন্তু হিন্দু ধর্মের শ্রেণিবিন্যাসের ফলে যারা অন্ত্যজ শ্রেণীর, তারা উচ্চ শ্রেণীর বা বর্ণের মানুষদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করলেন। হিন্দুদের ভীতির দুটি কারণ ছিল। তাঁদের নিজস্ব এমন কোন ধর্ম ছিল না, যা তাঁদেরকে একত্র করবে। কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন, নানা দেবদেবী আশ্রিত ধর্ম ও উচ্চশ্রেণীর ও নিম্নশ্রেণির পার্থক্য তাঁদের একত্র করতে অপারগ। মানুষ যখন সৎ এবং

অসৎ - এর পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হয় না, তখন মানুষের জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। এভাবেই উচ্চশ্রেণীর-নিম্নশ্রেণীর দূরত্ব প্রতিহত করতেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছিল। বৈষ্ণবদের কোন জাত ছিল না, শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের এটিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঔপন্যাসিক গোপীকৃষ্ণ মণ্ডল **'চোখে দেখা'** (২০০৩) উপন্যাসে বৈষ্ণব ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের সহাবস্থান এবং মিলনের দিকটিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেছেন। ঔপন্যাসিক গোপীকৃষ্ণ মণ্ডলের **'চোখে দেখা'** (২০০৩) উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের বয়ানে –

"সত্যিই তো বোষ্টমদের আবার জাত কী? কথায় বলে জাত খুইয়ে বোষ্টম। তাহলে জাত যাবার ভয়'টা কিসের? যদিও বৈষ্ণবদের মধ্যে সম্প্রদায়গত অনেক 'স্তর' আছে। রামাদি বৈষ্ণব, নাম দেওয়া বৈষ্ণব,সহজিয়া ভিখারি বৈষ্ণব,জাত বৈষ্ণব (গৃহস্থ বৈষ্ণব) এমন অনেক ভাগ আছে। ওদের কাছে একথা শুনেছিলুম।....বুদ্ধদেব থাকাকালীন তাঁর পুরুষ শিষ্যদের দীক্ষা দিয়ে তাঁদের করে তুলেছিলেন কর্মহীন ভিক্ষুক। মেয়েদেরও হাতে তুলে দিয়েছিলেন ভিক্ষাপাত্র। সেইসঙ্গে অধিকার দিয়েছিলেন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার। চৈত্যগুলি যেমন ছিল উপাসনার আগার, তেমনি বিহারগুলি ছিল ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের আবাস স্থল। ফলতঃ এই সহাবস্থান, বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর তাঁদের মধ্যে চরিত্রের অবক্ষয় কিছুমাত্র বিচিত্র ছিল না। তাঁরাও বৌদ্ধ ধর্মের ব্রত কাঠিন্য ভেঙে জীবন চর্যা শুরু করেন। এর দৃষ্টান্ত বুদ্ধদেব নিজেও কিছু কিছু করেছিলেন।"

'চোখে দেখা' (২০০৩) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক গোপীকৃষ্ণ মণ্ডল লিখেছেন – বৈষ্ণবদের কোন বিশেষ নির্দিষ্ট জাত ছিল না। কিন্তু বৈষ্ণবদের মধ্যে সম্প্রদায়গত অনেক স্তর ছিল। যেমন রামাদি বৈষ্ণব, নাম দেওয়া বৈষ্ণব, সহজিয়া ভিখারি বৈষ্ণব, জাত বৈষ্ণব (গৃহস্থ বৈষ্ণব) এমন অনেক ভাগ আছে। রামাদি বৈষ্ণবদের পইতে হয় বামুনদের মত। অন্যদের তা হয় না। গৃহস্থ বৈষ্ণবদের ও রামাদি বৈষ্ণবদের বিবাহ হয়, সংসার হয়। তাঁরা নিজেদের গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের ভক্ত বৈষ্ণব বলেই পরিচিত করান। এদের মধ্যে আরেকটি সম্প্রদায় নিজেদেরকে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সম্প্রদায় গোষ্ঠী বলে নিজেদের পরিচিত করান। নিজেদেরকে কখনও কখনও নিছক জাত হারানো ভিখিরি বোষ্টম বলে স্বীকার করতে রাজি থাকেন না। সমস্ত বৈষ্ণবদেরই জাতি আছে, সমাজ আছে, সম্পত্তি আছে। তাদের গৃহস্থ কর্মের রীতিনীতিও মেনে চলতে হয়। সেই সময়েই মহাযান সম্প্রদায় বুদ্ধ ধর্মের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে। বৌদ্ধরা স্তুপ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিল। আর তুলসী বৃক্ষটি বৈষ্ণবদের প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও, কৃষ্ণপূজার প্রধান উপকরণ। অথচ কৃষ্ণপূজায়

তুলসী লাগে না। কিন্তু বিষ্ণুপূজায় তুলসী অগ্রগণ্য। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব সম্প্রদায়, বিষ্ণুপূজা করেন না। তাঁরা কৃষ্ণপূজা করেন। কৃষ্ণনাম-কীর্তন করেন। কৃষ্ণপূজায় তুলসী না লাগা সত্বেও তাঁরা তুলসী মঞ্চ তৈরি করেন, তুলসীর মালাও পড়েন। শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণ উপাসক ছিলেন। অথচ তাঁর প্রচারিত ধর্মমতকে সমাজ বৈষ্ণবধর্ম বলে থাকে। বিষ্ণুমূর্তি বা নারায়ন, শিবলিঙ্গের মতো শিলাময়। যাকে নারায়ণশিলাও বলা হয়। এটি শূন্যবাদের প্রতিভূ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হস্তপদ বিশিষ্ট নরাকার। শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুরই এক অবতার। বৈষ্ণবত্ব কতগুলি গুণের সমষ্টি। গুণগুলি হ'ল – শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি। তার মধ্যে সখিভাবই শ্রেষ্ঠ। কারণ রাধাভাব সকাম অর্থাৎ স্বার্থ ও বাসনাযুক্ত। কিন্তু সখিভাবে আশা-আকাঙ্ক্ষা-কামনা-বাসনা-সুখ-দুঃখ এসব কিছু থাকেনা। শ্রীকৃষ্ণ-রাধার পূর্ণতাতেই ওঁদের পূর্ণতা। তবে নিয়মিত মুন্ডন ও কাছাহীন বস্ত্র বৈষ্ণবদের মতো, বৌদ্ধদেরও জীবনসাধনের অঙ্গ হিসেবে অক্ষুন্ন ছিল। তুলসী মঞ্চ বৈষ্ণব ও বৌদ্ধধর্মের মিলনের ফল। বৌদ্ধরা স্তুপ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন আর তুলসী বৃক্ষটি বৈষ্ণবদের প্রতীক। আবার কৃষ্ণপুজোর প্রধান উপকরণ এই তুলসী বৃক্ষ ছিল। এই স্তুপ এবং মঞ্চ, দুই সম্প্রদায়েরই মিলন প্রতীক হিসেবে তাই গণ্য হতে পারে। সপ্তম শতাব্দীর বেদান্তবাদী গুরু শঙ্করাচার্য এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বৌদ্ধধর্ম কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। কারণ তার আগে থেকেই বৌদ্ধ ধর্মের ব্রতকাঠিন্য ভেঙে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুনীরা প্রায় সাংসারিক জীবন চর্যা শুরু করে দিয়েছিলেন। সময়ের সাথে সাথে বৌদ্ধধর্মে এই মতদ্বৈধতার কারণেই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন 'হীনযান' ও 'মহাযান'। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পতনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে এটিকে মনে করা যেতে পারে। এভাবে যে সমাজ ব্যবস্থা, সমাজের মানুষকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত সমাজের সম্মুখীন করেছে, তাতে যে ধর্মীয় প্রভাবের চিত্র উঠে আসছে, তাতে যা দৃশ্য হচ্ছে তা হ'ল – মানুষ কখনো বঞ্চিত হয়েছে, কখনো রিক্ত হয়েছে, কখনো শক্তি হারিয়েছে, আবার কখনো বিশ্বজনকে দুহাত ভরে ভারতবর্ষের মহাসম্পদ এক বিশ্বসংস্কৃতিকে উজাড় করে দিয়েছে। ঔপন্যাসিক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত **'বহ্নিশিখা রূপমতী'** (২০০১) উপন্যাসে শেষ বসন্তে মান্ডু পাহাড়ে জমে ওঠা বর্ণময় 'নওরোজ' উৎসবের আয়োজন করেছেন উপন্যাসের চরিত্র সুলতান সিং। সেই উৎসবের বর্ণনা প্রসঙ্গে যে চিত্র দৃশ্যায়িত হয়েছে তা হ'ল –

"তামাম হিন্দুস্থান জুড়ে হঠাৎ আরম্ভ হয়ে গেল ইলাহি এক কাণ্ড। বর্ণময় এক উৎসব। ঢোলক বাজছে, ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্। এ উৎসবের নাম 'নওরোজ'। আগে এই উৎসব হিন্দুস্থানে ছিল না। ইসলামের হাত ধরে এখানে এর প্রবেশ। ভারি মজার উৎসব।"

‘বহ্নিশিখা রূপমতী’ (২০০১) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন – উৎসব মিলনের প্রতীক। উৎসবের হাত ধরেই সম্প্রদায়গত ভাতৃত্বের সূচনা। উৎসবের আনন্দে মানুষ ধর্ম-স্থান-কাল-অবস্থা সমস্ত বিস্মৃত হয়ে, শুধুমাত্র মনুষ্যত্বের বা মানবিকতার মিলনের আনন্দে আনন্দিত হওয়ার কারণ খুঁজে পায়। হিন্দু-মুসলমান ধর্ম ভারতবর্ষে বহু বছর ধরে পাশাপাশি একসাথে রয়েছে। হিন্দু-মুসলমান ধর্মের সদর্থক দিকগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে আরেকটি নতুন বর্ণময় উৎসবে, যার ব্যাপ্তি সমস্ত হিন্দুস্থান জুড়ে। সেই উৎসবের নাম ‘নওরোজ’। নববর্ষের উৎসব। পূর্বে এই উৎসব ভারতে বা হিন্দুস্থানে ছিল না। ইসলামের হাত ধরে ভারতে এই উৎসবের প্রবেশ। ইসলামের হাত ধরে এলেও, এই উৎসবে অনেক মজা ও আনন্দের স্পর্শ আছে। এই উৎসব নবীনতার উৎসব, বর্ণের উৎসব, সুবাসের উৎসব। এই উৎসবে কোন বিশেষ ধর্মের গন্ধ পাওয়া যায় না। পারস্য দেশীয় প্রথায় এই উৎসবটি পালিত হয়। এই উৎসবের মূল কথা হ’ল – নতুন জামাকাপড় পরা, নতুন সাজে বাড়িঘর সাজানো, নানা রকম খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করে, সকলে মিলে সারাদিন আনন্দ করে কাটানো। এটি খুব আনন্দের উৎসব। রাজপুতরা, একেই বসন্তের উৎসব মনে করেন। বসন্তের মিষ্টি বাতাসে যখন উত্তপ্ততার স্পর্শ ধীরে ধীরে লাগে, তখন এই উৎসবের আগমন ঘটে। এই উৎসবে চারিদিকে ঢোলকের আওয়াজে, আনন্দে, আমোদে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সমানভাবে মেতে ওঠে। সূচনা হয় মিলনের, আনন্দের ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের।

সমাজে নারীর স্থান

নারীকে সমাজ গড়ার কারিগর হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। নারী যেন সৃষ্টিশীল শিল্পে মগ্ন শিল্পী। তিনি উত্তর প্রজন্মের জন্মদাত্রী। নারীর চেতনায় মিশে থাকে বিশ্বাসের ভিত গড়ার ভাবনাময় অনুভূতি। অথচ আবহমানকাল থেকে পুরুষতন্ত্রের ভাবনায়, ভাবিত হয়ে, পিতৃতান্ত্রিক অনুশাসনে, অর্থনৈতিকভাবে পরাধীনতার গৃহবৃত্তের গণ্ডিতে নিজেকে বন্দী করে, সংস্কারের শিকড়ে জড়িয়ে থেকে বেঁচে থাকার আকুতির কাছে হার মেনেছে নারী বারবার। কিন্তু বর্তমানে ধীরে ধীরে ব্যাক্তিগত জীবনের এই নঙর্থকতাগুলোকে অতিক্রম করে নারী তার সামাজিক জীবনে নিজেদের অস্তিত্বকে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে এক নতুন জীবন ধারায় জাগ্রত হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিক নজরুল ইসলাম লিখিত **‘ভূমিপুত্র (১)’** (২০০২) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র কামাল উপন্যাসের আর এক নারী চরিত্র স্বপ্নার কথা ভাবতে গিয়ে ধর্ম ও বর্ণের ভেদভাবে আচ্ছন্ন হয়ে সে মনুসংহিতা বইটি পড়তে শুরু

করল ও নারীদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে তার উপন্যাসের আর এক চরিত্র অমর মাস্টারের কথাগুলি মনে পরল। অমর মাস্টার বলেছিলেন –

"কোরানে মেয়েদের যে অধিকার দেওয়া হয়েছে পূর্বে হিন্দু মেয়েদের সে অধিকারটুকুও ছিলনা। কামাল মহিলাদের সম্পর্কে মনুর বিধানগুলি দেখতে লাগলো। মনু বলছেন : স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামী মরে গেলে পুত্রের বশে থাকবে – কিন্তু কখনও স্বাধীনভাবে অবস্থান করবে না। (৫-১৪৮)। স্ত্রীলোক পিতা, স্বামী বা পুত্রের সঙ্গ ছাড়া থাকবার চেষ্টা করবে না। থাকলে পিতৃকুল এবং পতিকুল – উভয় কুলই কলঙ্কিত করে থাকেন। (৫-১৪৯)।"

ঔপন্যাসিক নজরুল ইসলাম লিখিত **'ভূমিপুত্র (১)'** (২০০২) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র কামাল মনুসংহিতা পাঠের পর যে তথ্যসত্য প্রাপ্ত হয়েছিল, তা থেকে তার মনে হয়েছিল যে সত্যিই মনুসংহিতার হিন্দু মহিলাদের অবস্থা, কোরানের মুসলমান মহিলাদের থেকে খারাপই ছিল। কিন্তু মনুদের আইন পাল্টে, নতুন করে আইন তৈরি করে, বর্তমানে হিন্দু মহিলাদের পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার বলবৎ করা হয়েছে। যা বর্তমানে হিন্দু মহিলাদের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সম্মানজনক পরিস্থিতি এনে দিতে পেরেছে। তিনি এও মনে করেন যে মহম্মদের ইসলাম ধর্মের আইনেও এই সময়োপযোগী পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত যুগোপযোগী। মুসলিম সমাজের নারীর অবস্থার এক নির্মম দলিল ঔপন্যাসিক সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'এক বর্ণও মিথ্যা নয়'** (২০০১) উপন্যাসে খুব বেদনাদায়কভাবে উঠে এসেছে। এই উপন্যাসের প্রতিটি ছত্রে মুসলিম সমাজের মহিলাদের অপমান, অসম্মান ও কষ্টকর জীবনযাত্রার যে ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন, তাই হয়ে উঠেছে মুসলিম সমাজের নারীদের প্রতি অবমাননার প্রতিবাদ। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের বয়ানে –

"হিন্দু ধর্মের মধ্যে যত গোঁড়ামি ছিল তা ওই পুরোহিততন্ত্রের বিধান। কিন্তু কোন ধর্মগ্রন্থের নয়। পুরুষতন্ত্রই সৃষ্টি করেছিল নানারকম বাধ্যবাধকতা এবং নারীদের অবলা মনে করেছিল, সতীদাহ প্রথা থেকে শুরু করে কুলরক্ষার নামে বাল্যবিবাহ। এ সমস্তই পুরোহিত তন্ত্রের বিধান ছিল, মহম্মদের বিধানের মতন।....সমাজ কেবল নারীকে....নারীর পরিচয়ে বাঁচার অধিকার দেয়নি।....সমাজ অধিকার না দিলেও ধর্ম সে অধিকার দিয়েছে। আর সেই জন্যই আজ সমাজ পরাজিত। সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আংশিক নারী আজ তার অধিকার আদায় করে নিচ্ছে। আরও নেবে। নারী আজ সর্বত্র। পুরোহিত আর আমরা মানি না। মানব না। প্রয়োজনে সৃষ্টিকে রোধ করব। পুরুষ একা সৃষ্টির কাজ করুক।....ইসলাম ধর্মে একসঙ্গে চারটে বিবি রাখতে পারে এবং যত খুশি দাসি রাখতে পারে।....আফগানিস্থানে

তালিবানরা ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই মেয়েদের ওপর ফতেয়া মেয়েরা রাস্তায় বেরোলে বোরখা পরা বাধ্যতামূলক।"

ঔপন্যাসিক সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'এক বর্ণও মিথ্যা নয়'** (২০০১) উপন্যাসে, ঔপন্যাসিক ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়েছেন, এবং তার প্রামান্য দলিল হিসেবে যে সমস্ত তথ্যগুলি তিনি তুলে ধরেছেন, তা সর্বদা অগ্রাহ্য করা যেতে পারে না। তাঁর বক্তব্য অনুসারে মুসলিমরা তাঁকে বিধর্মী হিন্দু বলে ওদের ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করতে চেয়েছিল, মুসলিমদের বক্তব্য – তিনি যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন তাহলেই তিনি পবিত্র হয়ে যেতেন। আবার হিন্দুরা বলছেন, তিনি মুসলিমকে বিয়ে করেছেন বলে তাঁর আর হিন্দু ধর্মে কোন অধিকার নেই। কারণ তাঁর জাত গেছে। ইসলাম ধর্মের কোরানের বাণী তিনি সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন বলে, ইসলাম ধর্মে তাঁর জন্য মৃত্যু ধার্য করা হয়েছিল। আবার ইসলামধর্মীকে বিয়ে করেছিলেন বলে হিন্দুধর্মে তাঁর জন্য অপরিসীম ঘৃণা, অবহেলা, হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে না নেওয়া, মৃত্যু তাঁর শিয়রে দন্ডায়মান থাকা সত্বেও তাঁর দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে না দেওয়ার মত অমানবিকতা দেখিয়েছিল। তাঁর প্রশ্ন ছিল – দুই ধর্মেরই উদ্দেশ্যে যে তাহলে তিনি কোন ধর্মের কাছে আশ্রয় পাবেন, কোন ধর্ম তাঁকে শুধু মানুষ হিসেবে গ্রহণ করবে, শুধুমাত্র একজন সম্মানিতা নারীর আসন দেবে, কোন ধর্মের মানুষের কাছে তাঁর যথার্থ মানবিক মূল্যায়ন হবে। মৃত্যুতেই কি শেষ পর্যন্ত তাঁর সমস্ত প্রতিবাদের সমাপ্তি ঘটবে? শেষ পর্যন্ত ঔপন্যাসিক সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধর্মভিত্তিক পরাজয়কে মেনে নিয়েই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। তবে পরাজয় বোধহয় তাঁর হয়নি। পরাজয় হয়েছিল – ধর্মের নামে মানবিকতার। পরাজয় হয়েছিল – ধর্মের নামে নারী স্বাধীনতার। পরাজয় হয়েছিল – বিশ্বাসের। পরাজয় হয়েছিল – নারীত্বের। এই কথাগুলি উপন্যাস প্রাপ্ত তথ্যের হাত ধরে বলা যেতেই পারে। সমাজে নারী পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার তাঁর **'জীবনটাকে চেখে দেখুন'** (২০০৭) উপন্যাসে স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক পটভূমিকা পরিবর্তনের ফলে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো তাতে মূলত অর্থনৈতিক চাপেই মেয়েদের বাড়ীর বাইরে পা রাখতে হয়েছিল। ফলে বাবা, ভাই, বোন, স্বামীর বাইরে যে একটা জগৎ আছে তার সঙ্গে তারা ক্রমশ পরিচিত হতে সুযোগ পেয়েছিল। পড়াশোনা করাটা শুধুমাত্র আর 'বিবাহ' নামক বৈতরণী পার করার উপায় হয়ে না থেকে, ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে,

নিজেদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে পারল বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের বয়ানে –

“মেয়েরা চাকরিতে এসে ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন, এর প্রভাব সংসারে পড়বেই। যেহেতু গোঁড়া ধর্ম-শৃঙ্খলা তাঁরা পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পাননি সেহেতু ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন তাঁরা বোধ করছেন না। এখন কর্মই তাঁদের কাছে ধর্ম।”

ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার তাঁর **‘জীবনটাকে চেখে দেখুন’** (২০০৭) উপন্যাসে সমাজে নারীর পরিস্থিতির বিবরণ দিতে গিয়ে বর্তমান নারী স্বাধীনতার যে বিবরণ তুলে ধরেছেন, সেই তথ্যানুযায়ী বলা যেতে পারে যে, সকল মানুষের মধ্যে সমতা আনার ক্ষেত্রে ধর্মের অনুশাসন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই ধর্মাচারণ সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য ধর্মপুরুষদের আগমন হয়। মূলত ধর্মগুরুদের দায়িত্ব ছিল – সমাজের মানুষ যাতে ধর্মের বন্ধনে থেকে সুস্থ জীবন যাপন করে, তা পরিচালনা করা। ভারতভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা নিঃস্ব পরিবারগুলির মেয়েদের লড়াই, এদেশের মেয়েদের অনুপ্রাণিত করেছিল। কারণ বঙ্গীয় সমাজ ব্যবস্থায়, মা-ঠাকুমারা তাঁদের পূর্বরমণীদের কাছ থেকে শেখা অন্ধ-সংস্কারের বশীভূত হয়ে, নানারকম কু-সংস্কারকে ধর্মের দোহাই দিয়ে মেনে চলতেন। যেমন – গোবর জল বা গঙ্গাজল ছড়িয়ে শুদ্ধ হওয়া বা শুদ্ধ করা, মাথা নিচু করে শাশুড়ির অত্যাচার সহ্য করা, বিধবা হওয়ার পরে জীবনের সমস্ত উজ্জ্বল রং বর্জন করা, আমিষ খাদ্যদ্রব্যাদি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা, যা বিপত্নীক পুরুষ কখনোই করেনি। কিন্তু গত দশক থেকে বিধবা-সধবার মধ্যের এই পার্থক্য অন্তর্হিত হয়ে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। যার প্রভাবে সমাজের নারী জাতির কাছে পূজা পদ্ধতির নিয়ম-শৃঙ্খলা নয়, কর্মই ধর্ম হয়ে উঠেছে। বর্তমানের নারীজাতি, গোঁড়া ধর্ম-শৃঙ্খলতা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাননি, তাই বলা যেতে পারে নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ ধর্ম নিয়ে তাঁদের চিন্তাভাবনা পরিচালিত হয় না। নারীভাবনার এই বিষয়টিই নারী স্বাধীনতার আহ্বায়ক। কারণ নারী শোষণের মূলেই হল শোষণকারীর উপর নারীর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা। অথচ সমাজ বিকাশের সমস্ত স্তরেই নারীর ভূমিকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ঔপন্যাসিক গৌতম রায়ের **‘বিষকণ্ঠী সুলোচনা’** (২০০৯) উপন্যাসে, উপন্যাসস্থিত চরিত্র দিপু উপন্যাসের আর এক চরিত্র নীলদাকে বলছেন –

“দীপু বলল, – নীলদা ধর্মের নামে বুজরুকিগুলো তো অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। ধর্মকে আড়াল করে প্রতিদিন কত অধর্মীয় কার্যকলাপ চলছে চোখ কান খোলা থাকলে সবই দেখা যায়। এই ভারতবর্ষেই তথাকথিত ধর্মস্থানে কত অত্যাচারের ইতিহাস তুমি শুধু পাবে।

বৃন্দাবনের বিধবা আশ্রম। পুরীর দেবদাসি সিস্টেম।....মানুষের সেবাই হচ্ছে মানুষের একমাত্র ধর্ম।....মানুষকে ভালবাসলেই ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায়।"

ঔপন্যাসিক গৌতম রায়ের **'বিষকন্ঠী সুলোচনা'** (২০০৯) উপন্যাসে ধর্মের নামে নারী শোষণের যে সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে তা হ'ল – ধর্মীয় কার্যকলাপের মোড়কে যে অধর্মীয় কার্যকলাপ সমাজে বহুল প্রচলিত হয়ে থাকে, তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মের মোড়কে পুরুষতন্ত্রের নারী শোষণ, বলা যেতে পারে। ভারতবর্ষের নানান ধর্মস্থানে, অতীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিতার সঙ্গে পুরুষতন্ত্র, নারীশোষণের ধর্মীয় ব্যবস্থা করেছিল। যেমন বৃন্দাবনের বিধবা আশ্রম। অতীতে সাধারণত ব্রাহ্মণ বিধবা ব্যতিরেকে অন্যান্য বর্ণের বিধবাদের বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেওয়া হতো, যেখানে তাঁদের জন্য বরাদ্দ হতো অত্যন্ত অসম্মানের জীবন এবং বৈধব্যের কড়া অনুশাসন। ব্রাহ্মণ বিধবাদের জন্য সাধারণভাবে সেইসময় বরাদ্দ ছিল – সহমরণ। জোর করে সদ্য বিধবাকে তার স্বামীর সাথে এক চিতায় পুড়িয়ে মারার যে রীতি প্রচলিত ছিল তা অত্যন্ত মর্মঘাতী। অন্যান্য বর্ণের বিধবাদের বিধবা আশ্রমে পাঠিয়ে যে অসম্মানের জীবন বরাদ্দ করা হতো, সেই অসম্মানের জীবনে তাঁদের অনেক সময় দেহোপজীবিনীর জীবনও কাটাতে হতো, যা তাঁদের জীবনকে করে তুলত বিষময়। আবার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দেবদাসী প্রথাও এমনই এক ধর্মের আড়ালে নারীশোষণের পন্থা বলে মনে করা যেতে পারে। পুরীর জগন্নাথ দেবের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতেন এই দেবদাসী নারীরা। নৃত্যের মাধ্যমে জগন্নাথদেবকে তুষ্ট করার মোড়কে লুকিয়ে থাকত, সেই দেবদাসী নারীদের ধর্মের নামে ভোগ করার ইতিহাস। যে ইতিহাস বর্তমানে সর্বজনবিদিত বলা যেতে পারে। বর্তমানে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপে এই দেবদাসী প্রথার বিলুপ্তিসাধন করা হয়েছে। বৃন্দাবনে বিধবা আশ্রম বিষয়টি বর্তমানেও কিয়দংশে নারীশোষণের এক হাতিয়ার রূপে আজও বর্তমান বলা যেতে পারে। নারী নির্যাতন বিষয়টিকে সমর্থন করে **'কনকলতার সন্ধানে'** (২০০৩) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যাল লেখকের বয়ানে বলেছেন–

"বাংলাদেশে – না, শুধু বাংলাদেশে নয়, দুই বাংলাতেই মুসলমান নারী সমাজ হিন্দু নারীর তুলনায় অধিক মাত্রায় নির্যাতিতা।....এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে রোকেয়া বেগম সাহেবার (১৮৮০-১৯৩২) কথা। আঠারো বছর বয়সে নারীশিক্ষার উৎসাহী কর্মী সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়; দশ বৎসর পর স্বামী প্রয়াত হলে তিনি মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। ১৯১১ সালে – যে বছর কলকাতা থেকে ইংরেজ সরকার দিল্লিতে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেল – সেই বছর মাত্র ছয়টি বালিকাকে নিয়ে কলকাতায়

রোকেয়া 'সাখওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে সেটি পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেয়েদের স্কুল। তার বয়স যখন চব্বিশ, যখন তিনি সধবা, তখন নবনূর পত্রিকায় একটা প্রবন্ধে রোকেয়া লিখেছিলেন : "আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ কিছু ধর্মগ্রন্থকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।....ধর্মগ্রন্থগুলি ঈশ্বর-প্রেরিত কি না, ঈশ্বরের নির্দেশ কি না, তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না।"

'কনকলতার সন্ধানে' (২০০৩) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যাল বলেছেন – পূর্ববাংলা এবং পশ্চিম বাংলা, দুই বাংলাতেই মুসলমান নারীসমাজ সাধারণত হিন্দুনারীর তুলনায় অধিকমাত্রায় নির্যাতিতা বলেই ইতিহাস দাবী করতে পারে। এই প্রসঙ্গে রোকেয়া বেগম সাহেবার (১৮৮০-১৯৩২) প্রসঙ্গ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আঠারো বছর বয়সে নারীশিক্ষার উৎসাহী কর্মী সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে রোকেয়া বেগম সাহেবার বিবাহ হয়েছিল। বিবাহের দশ বৎসর পরেই তাঁর স্বামী প্রয়াত হলে, তিনি মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কর্মে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। ১৯১১ সালে মাত্র ছয়টি বালিকাকে নিয়ে কলকাতায় রোকেয়া বেগম 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল' – এর প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে সেটি পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেয়েদের স্কুল। রোকেয়া বেগম চব্বিশ বছর বয়সে যখন তিনি সধবা ছিলেন, তখন 'নবনূর' পত্রিকায় একটা প্রবন্ধে লিখেছিলেন – নারীদের অন্ধকারে বা অনুন্নত করে রাখার জন্য পুরুষেরা কতগুলি ধর্মগ্রন্থকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলে প্রকাশ করেছেন। ধর্মগ্রন্থগুলি ঈশ্বর-প্রেরিত কিনা কিংবা ঈশ্বরের নির্দেশ কিনা, তা কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারেনা। যদি ঈশ্বর কোনো দূতকে নারীশাসনের জন্যই প্রেরণ করতেন, তবে সেই দূত কেন শুধুমাত্র এশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, ইউরোপেও তাদের কর্মপদ্ধতির বিস্তার করলো না? আমেরিকা বা সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত ঈশ্বর কেন প্রচার করলেন না যে, নারীকে নরের অধীনেই থাকতে হবে। ঈশ্বর তো শুধু এশিয়ারই ঈশ্বর হতে পারে না। আমেরিকা কি ঈশ্বরের রাজত্বের বাইরে অবস্থিত। এখন আর নারীদের ধর্মের নির্দেশে নত মস্তকে পুরুষের প্রভুত্ব বা অধীনতা মানতে হবে না। রোকেয়া বেগমের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে মুসলমান সমাজের নারীর অবস্থার একটি চিত্র ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যালের উপন্যাসে দৃশ্য হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মেয়েরা যথেষ্ট পরিমাণে বোরখাধারিণী। এই বোরখাধারিনী মেয়েদের এক বৃহদাংশ গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছেন, হিসেব রাখছেন, বৎসরান্তে সুদ পরিশোধ করছেন এবং বেশ কিছু উপার্জনও করছেন। বোরখা মানেই কিন্তু কুসংস্কার নয়। লেখক নারায়ণ সান্যাল তাঁর **'কনকলতার সন্ধানে'** (২০০৩) উপন্যাসে শিক্ষাবিদ আনু মুহাম্মদের বিশ্লেষণ অনুসারে লিখেছেন –

“অনেক ঘটনা, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ করে আমার ধারনা হয়েছে যে, পাঁচটি কারণে বোরখা একজন নারীর জন্য নিয়মিত পোশাক হয়ে উঠতে পারে। যথা : (১) আত্মরক্ষা বা আশ্রয়; (২) বিশ্বাস; (৩) জবরদস্তি; (৪) পছন্দ; (৫)আভিজাত্য অর্জন।”

প্রকৃতপক্ষে প্রথম তিনটি হেতুই মুখ্য। ‘পছন্দ’-এর কারণটা মেনে নিতে অসুবিধা হয় যদি না সেটা বিশ্বাসেরই রকমফের হয়। তেমনি ‘আভিজাত্য অর্জন’ও বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে একটা কারণ হয়ে উঠতে পারেনা। কারণ অভিজাত মহিলারা বর্তমানে আর বোরখা পরে পার্টিতে যান না। বোরখা পরার একটা বিশেষ কারণ বরং বলা যেতে পারে ‘আত্মরক্ষা বা আশ্রয়’। পূর্ব পাকিস্তানের শেষ কয়টি বছর যখন পাকিস্তানি সৈনিক এবং রাজকারেরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার বধূদের ওপর হামলা শুরু করেছিল, তখন অনেক মুসলমান মহিলার মতো হিন্দু মহিলারাও পথে-ঘাটে বের হতে বাধ্য হলে, বোরখার আড়ালে আত্মগোপন করতেন। যাতে তাঁদের রূপ-যৌবন অপ্রকাশিত হয়ে থাকে। ‘বিশ্বাস’ এবং ‘জবরদস্তি’ একই জিনিস কিন্তু দুটির দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। মেয়েরা স্বেচ্ছায় ধর্মীয় নির্দেশ হিসেবে যখন বোরখা পরেন তখন তাকে বলা যায় ‘বিশ্বাস’ আর পুরুষেরা যখন জোর করে নারীঅঙ্গে বোরখা পরতে বাধ্য করে, একই ধারণার বশবর্তী হয়ে – তখন তাকে বলা যায় ‘জবরদস্তি’। ফলে বলা যেতে পারে যে বোরখা শুধুমাত্র কুসংস্কার নয়, অনেক সময় তা ধর্মীয় ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্য ওরফে এক ধর্মীয় প্রথাও বলা যেতে পারে। ভারতবর্ষ তিন টুকরো হয়ে যাওয়া সত্বেও সেই ট্রাডিশন এখনো সমানে বহমান। ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যাল তাঁর **‘কনকলতার সন্ধানে’** (২০০৩) উপন্যাসে অসাধারণভাবে বোরখার প্রসঙ্গকে কিছু মেয়ের কাছে কতখানি প্রয়োজনীয় তা তুলে ধরেছেন, যা ধর্মের প্রথা বা ঐতিহ্যের নিরিখে নয়, জীবনের লজ্জা ঢাকার প্রয়োজনীয়তার নিরিখেও হয়ে উঠেছে বিস্ময়করভাবে প্রাসঙ্গিক। এই বিষয়ে তিনি এক ভ্যানরিক্সাচালকের নিজের কন্যার বয়ানে বলেছেন – বোরখা না পড়লে সকলে জেনে যেত যে তার একটাই জীর্ণ ব্লাউজ আছে। যা লজ্জা নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাছাড়া তার নিজের পরিচয় ও কৌলিন্য নিয়ে কৌতুহলকে প্রতিহত করার, বোরখা এক অসাধারণ হাতিয়ার হয়ে উঠতে পেরেছে। তাই সে প্রচন্ড গরমেও, বোরখার আড়ালে জীর্ণ ব্লাউজে তার লজ্জা ঢাকার প্রচেষ্টাকে, তার পরিচয় ও কৌলিন্যকে বছরের পর বছর লুকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে। এই বিশেষ কারণের জন্যই শেষ পরীক্ষায় পঞ্চম হওয়ায় বিস্ময়কর মেয়েটি বোরখা পরাকে জীবনের অঙ্গ করে তুলেছিল। এছাড়াও মেয়েদের নিজেদের শরীর তাদের প্রধান শত্রু। ‘পুরুষের দৃষ্টিতে’ – পাশ-করা নারী, ও পাশ-না-করা নারী, দুজনেরই শরীরই তাদের শত্রু। ধর্মের ফাতোয়ার নিষ্ঠুরতার হাত

থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বোরখা হয়ে ওঠে সমস্ত রকম মেয়েদেরই এক হাতিয়ার। তাই বোরখাকে শুধুমাত্র মেয়েদের ‘পছন্দ’ – এই কারণটিকে মেনে নিতে অসুবিধা হতে পারে। ইতিহাস প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা জানা যেতে পারে যে, নারীর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সম্পূর্ণতা থাকা সত্বেও, হাজার হাজার বছর ধরে নারীর প্রতি প্রচুর অন্যায়, অবিচার করা হয়েছে এবং হচ্ছে। সমাজের আইনের দর্পণে সমস্ত দেশের সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়। সমাজের নারীজাতির পরাধীনতা ও পদানত অবস্থার চিত্র তাই আইনের আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বর্তমানে পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে, আইনের পরিবর্তন নারীদের অবস্থার পরিবর্তনও সংঘটিত করেছে। সেই কারণে জীবনের যে কোন বিষয়েই নারীরা বর্তমানে আর উদাসীন নয়। তারা তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন।

ধর্মীয় দিক

মানবসমাজের আদিম কাল থেকেই মানুষের মনে একটা অতিমানবিক ও অতীন্দ্রিয় উপস্থিতির ভাব জেগেছিল, যাকে হয়তো ধর্মবোধের সূচনা বলা যেতে পারে। এর একটা সঙ্গত কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, যখনই মানুষ বিপদের সম্মুখীন হতো, তখন সেই অসহায় অবস্থায় মানুষ এক অদৃশ্য রক্ষাকর্তার অনুসন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠতো, সেই অদৃশ্য শক্তির নামকরণ করা যেতে পারে – ঈশ্বর-আল্লা-গড ইত্যাদি। এরপর ধীরে ধীরে নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়ে মানুষের এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বিষয়টি আরও দৃঢ়তা পায়। প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মের ধারণা। প্রতিষ্ঠিত হয় অদৃশ্য শক্তির আধার ঈশ্বর, আল্লা, গড-এর ধারণা। এই ধারনা আধ্যাত্বিক, আবার অপরদিকে এই ধারণার ভিত্তি হলো – সুনীতি ও দুর্নীতির ধারণা, যার ভিত্তি ও উৎসরূপে সমাজকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সমাজে যেখানে ধর্মভাব অত্যন্ত উন্নত, ঈশ্বরের ধারণা যেখানে সম্পূর্ণ বিকশিত, সেখানে ঈশ্বর তখন আর শুধুমাত্র বিধাতা রূপে নয় বা সৃষ্টিকর্তা রূপে নয়, তিনি তখন সমস্ত মানুষের নৈতিক জীবনের নিয়ন্তক হয়ে ওঠেন, যেখানে ধর্ম ও নীতির একটা পারস্পরিক নিগূঢ় সম্পর্ক বর্তমান থাকে। এই সম্পর্ককে যদি সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে নীতিহীন ধর্ম যেমন অবস্থান করতে পারে না, তেমনি নীতিও ধর্মরহিত হতে পারে না। কারণ যা সত্য তাই জগতের নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি ও নৈতিক জগৎ ধর্মধারনার কেন্দ্রস্থলে থাকা অতীন্দ্রিয় পরমশক্তি বা সর্বশক্তির আধার ঈশ্বরের সৃষ্টি। পৃথিবীতে বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্ন ধর্মের ছায়ায় দাড়িয়ে সেই সর্বশক্তিমানকে বিভিন্ন নামে ডাকে, কিন্তু পৃথিবীর সব মানুষের জন্যেই তাঁর একই রকমের ব্যবস্থা। সেখানে কোনো

ভিন্নতাই নেই। ঔপন্যাসিক প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় লিখিত **'কথা'** (২০০৬) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র সাধুবাবার বয়ানে –

"গীতার দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন – যজ্ঞানাং জপোযজ্ঞহস্মি! – অর্থাৎ কিনা দ্রব্যযজ্ঞ, তপযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, কর্মযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ ইত্যাদি যতরকমের ভারী ভারী যজ্ঞ এই পৃথিবীতে সম্ভব, তিনি বাসুদেব স্বয়ং সে সবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জপযজ্ঞটিই। তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয় এটি জানলেই সেই ইচ্ছা তখন আপনিই এসে কল্যাণ করে। সব অভাব তখন আপনিই ঘুচবে।....খানিকটা যেন বিদ্রোহের সুরেই গয়েশ আলি বলে, কিন্তু আমি যতদূর জানি – মানুষের সুখ দুঃখটা তার নিজের হাতেই থাকে।....ধর্মটা আসলে ব্যক্তিগত গোঁড়ামির বিষয় নয় বরং এটা অনেক বেশী দর্শনের কথাই।"

'কথা' (২০০৬) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন – শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞাহস্মি"। অর্থাৎ দ্রব্যযজ্ঞ, তপযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, কর্মযজ্ঞ ও স্বাধ্যায়যজ্ঞ ইত্যাদি যত রকমের যজ্ঞ এই পৃথিবীতে সম্ভব, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম যজ্ঞ হ'ল জপযজ্ঞ। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই মানুষের কল্যাণ হয়। এই সত্যকে উপন্যাসগুলির মাধ্যমে পাঠকের কাছে ঔপন্যাসিকেরা উপস্থিত করতে সমর্থ হন। ফলে ধর্মশাস্ত্রগুলিকে জ্ঞাত হয়ে মানুষ ঈশ্বরাভিমুখী হয়, যা মানুষকে এক সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বপূর্ণ মানুষে পরিণত করে এবং সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যান সাধিত হওয়া সহজ হয়। তাই বলা যেতে পারে, ধর্ম আসলে ব্যক্তিগত গোঁড়ামির বিষয় নয় – এই দর্শনটুকু না বুঝে, মানুষ যে ধর্মই গ্রহণ করুক না কেন, তাতে মানুষের ভেতরের হিংসাই শুধু বাড়ে। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম, মানুষের জীবনদর্শনে সহজেই ভ্রান্ত হয়ে যায়। হিন্দুধর্মে দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, বিবর্তনবাদ, পরিণামবাদ, ভক্তিবাদ, জ্ঞানমার্গ, কর্মকাণ্ড বা স্মৃতি, ধর্মের সমস্ত দর্শন বা প্রশাখা বর্তমান। লেখক প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা **'কথা'** (২০০৬) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র সাধুবাবা বলেছেন যে – হিন্দু ধর্মেও একেশ্বরবাদের উপস্থিতি বর্তমান। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন – "আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কারণ এ জগতের আর নেই। সুতোর মধ্যে দিয়ে মণিরা যেমন করে গ্রথিত থাকে, তেমন করেই এই চোখে দেখা জগতের সবকিছু আমাতেই অনুস্যূত, আমাতেই বিধৃত রয়েছে"। এই কথাটাই একেশ্বরবাদের কথা। বাসুদেব অর্থাৎ কৃষ্ণ গীতায় আরো বলেছেন – "সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরনং ব্রজ" অর্থাৎ "সমস্ত পথ পরিত্যাগ করে কেবল একা আমারই স্মরণ নাও" – একথাও সেই একেশ্বরবাদেরই ঘোষণা। আর হিন্দুরা গীতাকে তাদের সর্বশাস্ত্রসার বলেই মনে করেন। তাই সেই গীতার জ্ঞানযোগ, জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ, অক্ষরব্রহ্মযোগ, রাজযোগ, বিশ্বরূপদর্শনযোগ, পুরুষোত্তমযোগ ইত্যাদি

আঠারোটি অধ্যায় জুড়েই সেই একই একেশ্বরবাদের শিক্ষা। বেদে বলা হয়েছে – “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” – পৃথিবীর সমস্ত সেই এক ব্রহ্ম – একথাও হিন্দুধর্ম স্বীকৃত। সর্বভূতে বাস করেন বলেই শ্রীকৃষ্ণের আরেক নাম বাসুদেব। শ্রীমদ্ভগবদগীতার তৃতীয় স্কন্ধে ঈশ্বররূপ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন – “আমি সর্বভূতে সর্বভূতেরই আত্মারূপে রয়েছি। অথচ সর্বভূতময় সেই আমাকেই অবজ্ঞা করে মানুষ প্রতিমা পুজোর বিরম্বনায় মেতে থাকে”। এভাবেই বেদ এবং গীতায় ‘পৌত্তলিকতাবাদ’ বাদ দিয়ে ‘একেশ্বরবাদ’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন বা ঐশ্বরিক অনুভূতি মানুষের মধ্যে এক একতার বীজ বপন করে, যা মানুষের সাথে মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে গ্রথিত করতে সাহায্য করে। এই একই উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র পীরসাহেব, উপন্যাসের আর এক চরিত্র খোন্দকারকে ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদ নিয়ে যে কথা বলেছেন তা হ’ল–

“ইসলামের একেশ্বরবাদটা নতুন কোনো কথা নয়। পৃথিবীতে এর আগেও সেটা ছিল। বিশেষ করে ভারতবর্ষের ঋষিরা খ্রীষ্টেরও অনেক আগে তাকে পরিপূর্ণ করেই ভেবেছিলেন। ভারতবর্ষের বাইরে একেশ্বরবাদ প্রথম প্রচার হয় মিশরে। সেখানে তখন ফারাওদের অত্যাচার আর অর্থহীন পৌত্তলিকতা দিশাহীন করে দিয়েছিল মানুষকে। সে সময়েই মোসেস আফ্রিকা-ইউরোপ জুড়ে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। তাঁর কাহিনী তৌরাৎ-গ্রন্থেও পাবে। পয়গম্বর মহম্মদ সামান্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করে নিয়ে এই একেশ্বরবাদকেই গ্রহণ করেন। তিনি ছাড়া যে হয় না কিছুই আর। যেহেতু হয়না, সেহেতু সবই তিনি, সবই তাঁর।”

ঔপন্যাসিক প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়ের **‘কথা’** (২০০৬) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র পীরসাহেব, উপন্যাসের আর এক চরিত্র খোন্দকারকে ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদ নিয়ে যে কথা বলেছেন, তাতে প্রমাণিত যে হিন্দু ধর্মের মতই ইসলাম ধর্ম এবং খ্রীষ্টধর্মেও একেশ্বরবাদকে সমর্থন করা হয়। ভারতবর্ষের ঋষিরা খ্রীষ্টেরও বহু আগেই হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদকেই পরিপূর্ণ করে ভেবেছিলেন। আঠারো শতকের মীর্জা মজহর জান-ই-জানান ছিলেন বিখ্যাত শাস্ত্রবিদ আর পন্ডিত। তিনি মীর্জা সাহেব নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। তিনিই প্রথম লিখেছিলেন যে, আর্যহিন্দু এবং একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মরা ‘আল-এ-কিতাব’ বা ইসলাম বিবেচ্য গ্রন্থধারী সম্প্রদায়ের মধ্যেই পড়ে। বেদ আর্যদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আর্যদের কাছে প্রেরিত অবতারকেও তাই পূর্ববর্তী একজন পয়গম্বরের মর্যাদা দেওয়া উচিত ছিল। পৃথিবীর শেষ পয়গম্বর মহম্মদের কাছে তাঁর পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরের নাম ভুলবশত অজ্ঞাত থাকায় উল্লেখ করাই হয়নি। নইলে গীতায় কৃষ্ণ যে জ্ঞানের কথা বলেছেন, তার নিরিখে গীতাকে কিতাব বা গ্রন্থ এবং কৃষ্ণকে অবতার বলে শ্রদ্ধা করলেই

ইসলামের নিরিখে তা একমাত্র যথার্থ হয় বলেই মনে করেছিলেন মীর্জাসাহেব। তিনি আরও বলেছিলেন, বেদ ও গীতায় 'পৌত্তলিকতাবাদ' বাদ দিয়েও 'একেশ্বরবাদ' আছে বলেই ইসলামের পক্ষে একেশ্বরবাদী হিন্দুদের অন্তত গ্রন্থধারী সম্প্রদায় হিসেবে মেনে নিয়ে মর্যাদা দেওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত হতো। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে – "বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন" – শ্লোকে কৃষ্ণ বলেছিলেন, "অর্জুন তোমার এবং আমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে, যোগেশ্বর বলে আমি সেগুলোর সবই জানি, কিন্তু তুমি সামান্য সাধারণ মানুষ বলেই সেসব জানোনা"। এভাবে গীতায় জন্মান্তরবাদের সত্যতাও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এভাবেই উপন্যাসগুলিতে ধর্মশাস্ত্রালোচনা সমাজের মানুষের মধ্যে ইহজন্ম এবং পরজন্মের কর্মফলের ফলাফল ভোগের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করে, মানুষকে নীতিবোধ ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে, ধর্মের পথে থাকতে সহায়তা করেছে, যা সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ক্ষেত্রে এক সদর্থক ভূমিকা পালন করে থাকে। মানুষের অন্তস্থিত এই অন্তরবাহিত শক্তিই মানুষকে নীতিবোধ ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে থাকে। এই অন্তরবাহিত শক্তির প্রতি পূর্ণ আস্থাজ্ঞাপনই – যথার্থ ধর্ম। মানুষই ঈশ্বর। আবার ঈশ্বর সৃষ্টির মূলেও মানুষ। কারণ এমন মানুষও আছেন, যাঁরা ভক্তিভরেই শিবমন্দির, চার্চ, গুরুদুয়ারা, পীরের দরগা, সব জায়গাতেই যান। এই সর্ব ধর্মের প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শনের কাজ করে, যে শান্তি তিনি পান, তা তাঁর একান্তভাবেই নিজের হয়ে থাকে। এই কারণেই হয়তো ঋকবেদ বলেছিলেন, "একং সদ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" – অর্থাৎ তিনি এক এবং সৎ অর্থাৎ নিত্য, তাঁকেই বিপ্র বা ব্রাহ্মণরা বিভিন্ন নামে নামকরণ করে থাকেন। সেই এক পরমেশ্বরকেই নানান নাম, যথা – অগ্নি, যম, ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গের সমর্থনে ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর **'অনলপ্রভ বিদ্যাসাগর'** (২০০৫) উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের বয়ানে বলেছেন –

"হিন্দুধর্মের মূল দর্শন তুলনাহীন। এক মহাবিজ্ঞান। অনন্তে অস্তিত্বের অনুসন্ধান। একের মধ্যে বহুর অবস্থান। রামমোহন আত্মপ্রকাশ করলেন বেদ নিয়ে। গুচ্ছের দেবতা, গুচ্ছের ধর্মমত অবান্তর কলহের অনন্ত উৎস। তিনি এলেন 'ওঁ তৎসৎ' মন্ত্রের উদগতা হয়ে আধুনিক এক শঙ্করাচার্য। 'ওঁ তৎসৎ' – সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা সেই সত্য – 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম' – একমাত্র অদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী নিত্য। পরমেশ্বরই সত্য, সর্ব জীবের নিয়ন্তা। বিশ্বব্রহ্মান্ড, জীবজগৎ সব তার। রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ করলেন, একেশ্বরবাদী, এক ঈশ্বরের বিশ্বাসী। ঈশ্বরে সব আছে, কোন কিছুতেই ঈশ্বর নেই। একমাত্র ঈশ্বরেই ঈশ্বর আছেন।"

ঈশ্বরের আরাধনা প্রকৃতপক্ষে মানুষেরই অন্তস্থিত অভিলাষের বহিঃপ্রকাশ। মহাবিশ্বের সূর্য, গ্রহ, তারা এবং পাহাড় থেকে নদী-নালা, গাছপালা, পাখি সবকিছুই ঈশ্বরময়। ঈশ্বরই এই মহাবিশ্বের প্রকৃত নিয়ামক। প্রাকৃতিক ও মহাজাগতিক প্রভাব প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে – ধর্মের মূল দর্শন তুলনাহীন। এক মহাবিজ্ঞান। অনন্তে অস্তিত্বের অনুসন্ধান। একের মধ্যে বহুর অবস্থান। "ওঁ তৎসৎ" – সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা সেই সত্য, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম' – একমাত্র অদ্বিতীয়, বিশ্বব্যাপী, নিত্যসত্য। লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় প্রথিতযশা মহৎ ব্যক্তিদের বিশ্বাস ও কর্মকে এই উপন্যাসে অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, রামমোহন ব্রহ্মসমাজ গড়লেন। তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম'– কেই 'বিশ্বব্যাপী নিত্য' বলে স্বীকার করেছিলেন, যা একেশ্বরবাদী অর্থাৎ এক ঈশ্বরেই বিশ্বাসী রূপে গণ্য হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরেই সমস্ত কিছু বর্তমান। কিন্তু কোনো কিছুতেই ঈশ্বর নেই। একমাত্র ঈশ্বরেই ঈশ্বর আছেন। যীশুখ্রীষ্ট যে প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন, তার মূলেও সেই একেশ্বরবাদেরই সমর্থন পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসমাজকে, ব্রাহ্মসমাজে রূপান্তরিত করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিশ্বাস করতেন, এক অনাদি-অনন্ত পুরুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তিনি নিয়ন্তা। তাঁরই নিয়মে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে। সমস্ত জীব তাঁতেই প্রকাশিত হয়ে, তাঁতেই লয় হচ্ছে, যেমন জলের বিম্ব জলেতেই মিলায়। প্রকাশ আর অপ্রকাশের মাঝে যে সময়টুকু পড়ে আছে, তারই নাম অস্তিত্ব। অর্থাৎ যতক্ষণ ততক্ষণ। তাই ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বর মন্দিরে থাকেন না। এই বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মেও প্রতিধ্বনিত হয়। এই জগতের চেতন, অবচেতন, উদ্ভিদ, সমস্ত পদার্থই প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর হতে নিঃসৃত। সমস্ত কিছুর সৃষ্টি ঈশ্বর করেছেন। এই কারণেই ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। ঈশ্বর নিরাকার। ঔপন্যাসিকেরা উপন্যাসের সাহায্যে ধর্মের এই শাস্ত্রগ্রন্থগুলির আলোচনা অসাধারণভাবে সমাজের মানুষের সামনে প্রতিফলিত করেছেন, যা মানুষকে ধর্মের সঙ্গে, প্রাকৃতিক ও মহাজাগতিক বিজ্ঞানের সম্পৃক্ততাকে অনুভব করতে খুব সহজ করে দিয়েছে। সাধারণ মানুষ ধর্ম পুস্তক পাঠের পরিবর্তে উপন্যাস পাঠের মাধ্যমে ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে যে জ্ঞান অর্জন করেন, তার মধ্যে এক বিরাট স্থান জুড়ে রয়েছে উপন্যাসপাঠের গ্রহণযোগ্যতা। উপন্যাস হতে প্রাপ্ত ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক তথ্যগুলি, সমাজের মানুষের ধার্মিক অবস্থান এবং সমাজ সংস্করণের কাজে মানুষ কিভাবে ব্রতী হয়ে উঠেছে বা উঠতে পারে, তার এক বিবরণচিত্রের সাথে পরিচয়, পাঠককে এক সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজকে আহ্বান করতে উৎসাহী করে তোলে, যা একই সাথে বিশ্বভ্রাতৃত্বেরও আহ্বায়ক। ধর্মের অর্থ – মন্দিরের-মসজিদের

লড়াই নয়। ধর্মের অর্থ – তঞ্চকতা বা ঠকানো নয়। ধর্মের অর্থ হল – বিচার। ধর্মীয় জীবন যাপন হলো – আদর্শ জীবন যাপন। আদর্শের অর্থ – ক্ষুদ্রতাকে জয় করে জৈবতার উর্ধ্বে ওঠা। মানবসেবাই প্রকৃত ধর্ম। মানুষকে শুধুমাত্র খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের সম্বল জোগাড় করে দেওয়া নয়, মানুষের সামনে নিজের আদর্শ জীবনকে তুলে ধরতে হবে। ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের মতে – সব চালই চাল, তবে গোবিন্দভোগ চাল একটু অন্যরকম। তাই আদর্শই মানুষের সামনে অবতার হয়ে ওঠে। সেই আদর্শ অবতারকে দেখে মানুষের মন বলবে, তার দেবতা দেখা হয়তো হয়নি, কিন্তু দেবতার মত মানুষ সে দেখেছে। ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় **'ভৈরবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ'** (২০০৯) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণকে বলছেন –

"ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। যাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করে অধরা, তুমি তাঁকে ধরে প্রমাণ করে দেবে ঈশ্বর বড় কাছের মানুষ। এই তোমার আমার মতো। ঈশ্বরকে দেখা যায়। অবাঙমানসগোচর বেদে বলেছেন। এর মানে বিষয়াসক্ত মনের অগোচর। এ মনের গোচর নয় বটে, শুদ্ধ মনের গোচর। এ বুদ্ধির গোচর নয় – কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি গেলেই শুদ্ধবুদ্ধি হয়। তখন শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধি এক।"

'ভৈরবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ' (২০০৯) উপন্যাসে, উপন্যাসের তথ্যানুযায়ী বলা যেতে পারে, ধর্ম বিনা চিত্তশুদ্ধি অসম্ভব। ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য। ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু। ঈশ্বরই কর্তা আর সব অকর্তা। এ সংসার মায়া। আর সেই মায়া হ'ল কামিনী-কাঞ্চন। ঈশ্বর মন দেখেন। মানুষ আসে সংসারে, থাকে সংসারে, সংসার থেকেই চলে যায়। সত্য আর সেবাই প্রকৃত ধর্ম। দৈনন্দিন গৃহস্থালির কর্ম, দেব-দ্বিজ-অতিথিসেবা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, কনিষ্ঠদের প্রতি স্নেহপরায়নতা, পরিবারের সেবায় আত্মসমর্পণ, এইসবই ধর্মের অঙ্গ। সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গ। মা সারদা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায়, প্রতিটি মানুষের সাথে, প্রতিটি মানুষের ব্যবহারকে অত্যন্ত প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাই তাঁর বাণী সমাজের প্রতি – "যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন"। এই বাণী যেন সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃত ভিত। সমাজের ধর্মভেদের, জাতিভেদের বিরুদ্ধে, সমাজের মানুষের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী – "যত মত তত পথ"। প্রকৃতপক্ষে সব মত ও পথই এক। সমাজ দর্শনের হিন্দুত্বের এই বোধ, সুস্থ সমাজ চেতনা গড়ে তুলতে এক প্রকৃত সদর্থক ধার্মিক পদক্ষেপ। সমাজদর্শনে হিন্দুত্বের এই উপরোক্ত রূপ ঔপন্যাসিকদের

উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়ে, সাহিত্য ও সমাজের মানুষের সুস্থ চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তার **'উজান বেয়ে যাই'** (২০০৩) উপন্যাসে নিজস্ব বয়ানে বলেছেন –

"আধ্যাত্মিকের পরীক্ষাগারের একমাত্র যন্ত্র তার চিন্তা, বিশ্লেষণ, গণিত। সত্য সব সাজানো আছে। আমরা বলি সত্য নিত্য, ট্রুথ ইটারন্যাল। সেই সত্য পেতে হলে ঐকান্তিকতা চাই। পথ ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দূরত্যয়া। সেই পথ পরিক্রমায় ক্ষুরধার বুদ্ধি নয়, বোধির প্রয়োজন। প্রার্থনার প্রয়োজন।"

ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর **'উজান বেয়ে যাই'** (২০০৩) উপন্যাসে ধর্ম সম্পর্কিত যে সরল সহজ সত্য, অত্যন্ত সহজ ভাষায় তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন তা হলো, শ্রীরামকৃষ্ণের মতে একমাত্র জ্ঞান হ'ল – ঈশ্বরে বিশ্বাস। 'বিশ্বাস' একটা সহজ-সরল মাত্রাহীন শব্দ যা, হয় মানুষ বিশ্বাস করবে, না হয় মানুষ বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী এই দুই শ্রেণীর মানুষই বর্তমান। এই একই উপন্যাসে স্বামীজি বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ এক নতুন মানুষ, এক নতুন ধর্ম, নতুন বেদ। তা প্রকৃতই এক জীবনসত্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নতুন এক বেদ, যার নাম জীবন-বেদ। আদর্শ মানুষ বা অবতার লোকশিক্ষা দেয়। মানুষকে শিক্ষা দিতে হলে সাধারণ মানুষের মধ্যেই, মানুষের মত করেই, জীবন কাটাতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে যে মানুষের সাথে সেই আদর্শ মানুষ বা অবতারের কোন পার্থক্য নেই। সাধারণ মানুষের মতই অবতার বা আদর্শ মানুষও গৃহী, সংসারী। কিন্তু বিচারবোধে, তিনি সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক। বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের যেমন প্রাকৃতিক নিয়মের সত্যাসত্য পরীক্ষা করা হয়, সেভাবেই ভৈরবী মায়ের ডাকা বিচারসভায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা, শাস্ত্রে উল্লেখিত অবতার লক্ষণাদি মিলিয়ে, শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে – শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার ও পরমহংস। কারণ শাস্ত্রও প্রমাণ নির্ভর। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, অন্যকে দেখিয়েছিলেন। শুধুমাত্র 'হয়' বলেই ছেড়ে দেননি, 'হয়েছে' বলে প্রমান দেখিয়েছিলেন। তাই তিনি অবতার পুরুষ, পুরুষশ্রেষ্ঠ। তিনিই এক সংস্কারহীন উদারধর্মের ব্যাখ্যা ও দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, যেকোনো সত্যকে প্রাপ্ত হতে গেলে ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতার একান্ত প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনবেদে 'বেদ' শব্দের যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় তা হ'ল, ঋষিগণের সত্য উপলব্ধি, যা সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ককে, অনন্তকে সাক্ষী রেখে যেন তুলে ধরে। বেদের উপসংহার ভাগকে বলা হয় আরণ্যক, অর্থাৎ অরণ্যজাত। অরণ্য-ভাবনার দুটি ধারা, দুটি কান্ড, দুটি শাখা – কর্ম আর জ্ঞান।

বেদের কর্মকান্ডকে ‘ব্রাহ্মণ’ বলা হয়। আর জ্ঞানকাণ্ড হ’ল ‘উপনিষদ’। হিন্দু ধর্মের সনাতন মুনি-ঋষিরা বেদের জ্ঞানকান্ডের আলোচনায় বলেছেন উচ্চতম ও নিম্নতম উভয় বর্ণের মানুষই সন্ন্যাসধর্মে ব্রতী হতে সক্ষম, কারণ বেদের জ্ঞানকাণ্ডে জাতিভেদের কোন উল্লেখ নেই। সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে উভয় বর্ণই সমান। জাতিভেদ আসলে শুধুমাত্র সামাজিক ব্যবস্থা। ধর্মে জাতিভেদ নেই। শাক্যমুনি সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি বেদের ভিতরের লুকানো এই সত্যকে জগতের সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে, সামাজিক দায়বদ্ধতায় সম্প্রীতি ও সংহতির মানবিক মূল্যবোধকে সঙ্গে করে, যাঁরা উন্মুক্ত হৃদয়ে, প্রেমের বন্ধনে, মিলনের জয়গান করেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে ঔপন্যাসিক রাসমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর **‘পিরালী’** (২০০৯) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র হিন্দু নলিন ও মুসলিম আসিফের বন্ধুত্বের প্রসঙ্গে নিজস্ব বয়ানে বলেছেন –

“নলিনের ঘরে দেবদেবীর পূজা হলেও, নিজেকে সংস্কারমুক্ত করতে পেরেছিল। তার মনে হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। বিবেকানন্দের বাণী – “অন্তরের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশই প্রকৃত ধর্ম। সৎকর্ম ও সৎচিন্তাই প্রকৃত ধর্ম”। কামারপুকুর ও জয়রামবাটীতে সে প্রায়ই যেত। আসিফকে সঙ্গে করে, তেমনি ফুরফুরা শরীফের যেতেও তার দ্বিধা ছিল না। দেশ ও মানুষকে ভালোবাসা, স্বাধীনতার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত আকিঞ্চন – আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে, পরার্থে নিজেকে নিয়োজিত করাই ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।”

‘পিরালী’ (২০০৯) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক রাসমোহন মুখোপাধ্যায়, উপন্যাসের চরিত্র হিন্দু নলিন ও মুসলিম আসিফের বন্ধুত্বের প্রসঙ্গে দুই ধর্ম-কৃষ্টির মহামিলনের যে প্রচেষ্টা করেছেন তাতে বলা যায়, তা উপন্যাসে সমাজের অসাম্প্রদায়িকতার দিককে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তুলে ধরেছে এবং তিনি এই বিষয়টিও বিস্মৃত হননি যে, তা অবশ্যই সমাজে সর্বসম্মতভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। হিন্দু মুসলমানের আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতিতে অনেক বৈষম্য থাকলেও সংস্কৃতিতে কিন্তু অনেক মিল আছে বলা যেতে পারে। ধর্ম-কর্মের বিচারে মানুষকে বিচার করা ঠিক নয়, হৃদয় দিয়ে মানুষের বিচার করা সম্ভব হতে পারে। কেক, পাউরুটি, বিস্কুট খাবার সময় কখনো মানুষ ভাবেনা, কোন ধর্মের মানুষ এগুলো বানাচ্ছে। ইসলাম ধর্মের সত্যপীরের জল, ধর্মাধর্ম বিচার না করে শ্রদ্ধাভরে অনেক মানুষই খায়। হিন্দু-মুসলমান ধর্মের মিলনের এক প্রমাণ – সত্যপীরের এই জলগ্রহণ। হিন্দুসন্ন্যাসী ও মুসলিমফকিরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ধর্ম কেউ ত্যাগ করে না। যে ধর্ম ত্যাগ করে সে বিধর্মী। ইসলামে অবিশ্বাসী বিরোধীকে ‘কাফের’ বলে, আবার হিন্দু ধর্মেও যে হিন্দু, মুসলমানের ঘরের অন্ন খায়, তাকে হিন্দুরা ‘পিরালী’ বলে। যে মানুষ সকল

ধর্মের প্রতি সহমর্মিতাহীন, সকল মানুষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নয়, তার প্রকৃত শিক্ষা এবং প্রকৃত জ্ঞানের অভাব আছে, ধরে নেওয়া যেতে পারে। ধর্মনিষ্ঠার নামে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিরূপ আচরণ, কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কুসংস্কার কখনোই বিশ্বাসযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ছোঁয়াছুঁয়ি, অস্পৃশ্যতা – 'মনের বাতিক' ও 'মনের বিকার' বলে মনে করা যেতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলিম দুই ধর্মাবলম্বীর একটাই পরিচয় – তারা বাঙালি। তাদের কাছে ধর্ম ইসলাম বা হিন্দু হতে পারে, তাদের ভিন্ন ধর্মাচার, ভিন্ন ধর্মমত, তবুও দুই ধর্মের সংস্কৃতির মহামিলনে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, নৈপুণ্য প্রভৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের যে ঐতিহ্য ও ভাবের মিলন, তা সমাজে বহু যুগ ধরে তাদের পরস্পরকে, পরস্পরের হিতৈষী করে তুলেছে। সেই কারণেই হিন্দুর বিয়েতে, মুসলমান সানাই বাদক না হলে নহবতের সুরে মিলনের আবেশ ও আমেজ হারিয়ে যায়। পীরবাবার আশীর্বাদ না পেলে মাঙ্গলিক কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ওস্তাদের কাছে দীক্ষা না নিলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। কোরান ও গীতার মূল বাণী তো প্রকৃতপক্ষে একই। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর মৈত্রী ও প্রেমের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে, দুই ধর্মের মানুষ, ধর্মবিরোধীতা বিস্মৃত হয়ে, সম্প্রদায়গত বৈষম্যকে দূরে ঠেলে, যদি উৎসবে-আনন্দে মেতে উঠতে পারে, তাহলেই তা হবে প্রকৃত মানবধর্ম। মানবধর্মের এই বন্ধনকে ছিন্ন করার অর্থ, মানবধর্মকে অবমাননা করা। কারণ প্রকৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতি মানুষের মনকে মহান করে, সংকুচিত হৃদয় পবিত্র হয়। এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়কে বিধর্মী ভাবলে বৈরিতা পোষণ করতে হয় – এই ধরনের মানসিকতায় চরম অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ই যখন সাম্প্রদায়িকতা ভুলে, ধর্মীয় উৎসবে পরস্পর পরস্পরের সাথে মেতে উঠতে সক্ষম হতে পারবে, আবার ঠিক তেমনি ভাবেই পরস্পর পরস্পরের দুঃখ-শোকে সহমর্মিতা প্রদর্শন করে পাশে থাকতে পারবে, তখনই হয়তো প্রকৃত মানবধর্মের ধর্মাচরণ সার্থক হয়ে উঠতে পারে। মানুষের নিজেকে, প্রকৃত সামাজিকতাপূর্ণ এবং মানবিকতাপূর্ণ এক সম্পূর্ণ মানুষের পরিচয়ে পরিচিত করে তোলা, এক সুস্থ সমাজ গড়ার কারিগরের নামান্তর। এই জাতিভেদ বা ধর্মভেদের প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর পূর্বে উল্লেখিত **'উজান বেয়ে যাই'** (২০০৩) উপন্যাসে যে সত্য তুলে ধরেছেন তা হ'ল, শম্ভুচরণ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বাইবেল শোনাতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, যিশুখ্রীষ্টের ছবির সামনে সমাহিত হয়ে থাকতেন। খ্রীষ্টানদের একদিকে যীশুখ্রীষ্ট ও অন্যদিকে হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী অনেকাংশে প্রায় একই চিত্রের অবতারণা করে। মায়ের বুকের মধ্যে স্নেহ ও রক্ষা

আলিঙ্গনের বাঁধনে বাঁধা পুত্র ভগবান। ছবি একই। ধর্ম পৃথক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট না বলে তাই বলতেন যীশুকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানবসমাজের জাতিভেদ ও ধর্মভেদের এই ধর্মবিরোধী নঙর্থকতাকে, শাস্ত্রোচিতভাবে অস্বীকার করেছিলেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার-বরিষ্ঠ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এভাবেই ধর্মে সাম্যবাদের আগমন ঘটিয়েছিলেন যা ধর্মীয় সমাজতন্ত্ররূপে পরিচিতি লাভ করতে পারে। খ্রীষ্টধর্ম প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার তাঁর **'উৎসারিত আলো'** (২০০৩) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র ফাদার খ্রীষ্টধর্মের সম্পর্কে একশ আটানব্বই জন দরিদ্র কর্মচারীকে যা বলেছিলেন তা হ'ল –

"যীশুর পুরো নাম যেশাস ক্রাইস্ট। তিনি যে ভালোবাসার ধর্ম পৃথিবীতে প্রচার করলেন তার নাম খ্রিস্টধর্ম। এই ধর্মে যারা বিশ্বাস করে ঈশ্বর তাদের পাশে এসে দাঁড়াল। এদের বলা হয় খ্রিষ্টান। তোমরা এমন জায়গা থেকে এসেছো যেখানে কেউ ধর্মের আলো হাতে পৌঁছায়নি। যেখানে সভ্যতা পথ দেখায় নি। তোমাদের সৌভাগ্য যে এখানে আসতে পেরেছ। এখন থেকে ঈশ্বরের পুত্র যিশু, যেশাস ক্রাইস্ট তোমাদের পথ দেখাবেন। আমেন।"

খ্রীষ্টান ধর্মের মূল বার্তা – পিতা আমাদের জীবনের পরম রক্ষাকর্তা। এই পিতৃভাবনাই জীবনের পরবর্তীকালে অনন্ত, অশেষ ঈশ্বরভাবনায় পরিণত হয়। ঈশ্বরোপলব্ধির প্রকাশ নানা দেশে, নানা নামে। কেউ ডাকে প্রভু, কেউ ডাকে পিতা। ভারতবর্ষে শাক্তরা ঈশ্বরকে মধুরতম নামে ডাকে 'মা' বলে। আবার বৈষ্ণবরা দেখে প্রেমিকরূপে। মুসলমান বা ইসলামের কাছে তিনি পরমপুরুষ 'আল্লা'। খ্রীষ্টানদের কাছে তিনিই পরমপিতা 'গড'। খ্রীষ্টানদের জন্ম থেকেই ধর্ম তাদের পথ দেখায়। নামকরণ এবং অন্যবিধ আচরণ বাইবেলের দর্শিত পথ নিয়ন্ত্রিত। গির্জার প্রতি শ্রদ্ধা তাদের ধর্ম সম্পর্কে ভাবনা একমুখী রাখতে সাহায্য করে। খ্রীষ্টান ধর্ম প্রসঙ্গে **'উৎসারিত আলো'** (২০০৩) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র গির্জার ফাদার বলছেন – এই পৃথিবীতে মানুষের অনেক রকম দুঃখ। পরমপিতা এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যখন মানুষের কষ্ট বেড়ে গিয়েছিল, তখন তা দূর করার জন্য পরমপিতা তাঁর সন্তানকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। এই সন্তানের নামই যীশু। যীশু ঈশ্বরের সন্তান। যীশুর পুরো নাম জেসাস ক্রাইস্ট। তিনি যে ভালোবাসার ধর্ম পৃথিবীতে প্রচার করলেন, তার নাম – খ্রীষ্টধর্ম। এই ধর্মে যারা বিশ্বাস করেন, তাদের বলা হয় খ্রীষ্টান। ঈশ্বরপুত্র যীশু তার অনুগামী খ্রীষ্টানদের প্রেমের আলোর পথ দেখান। গির্জার ফাদার আরো বলেন, যীশু সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেই তাদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়ে ঈশ্বরের কথা বলতে শুরু করেছিলেন। সমাজের মানুষের মধ্যে উচ্চ-নিচ ভেদ না করে, ঈশ্বরের

সন্তান বলে অভিহিত করে এবং খুব সহজ-সরল ভাষায় তিনি মানুষের মধ্যে ধর্মের নামে নীতিবোধের শিক্ষা দিয়েছিলেন। খ্রীষ্টধর্মের একটা মৌলিক ধারণা হলো – পাপের ধারণা, সেই পাপ থেকে মুক্তির ধারণা এবং সেই পাপমুক্তির ধারণার নিরাময় হিসেবে অপরাধ স্বীকার করা, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা, নিজের পাপস্খলনের চেষ্টায় সহ্য করা, ক্ষমা ও আনুগত্যের দিকটিও বিনয়ের সঙ্গে প্রকাশ করা, এগুলির কথাই খ্রীষ্টধর্মের বাণীতে উল্লেখিত আছে। খ্রীষ্টধর্মের প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক চিত্তরঞ্জন মাইতির **'ভগ্ন ভাস্কর্য'** (২০০২) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র চাইল্ড স্পেশালিস্ট ডাক্তার দত্ত এবং মাদার টেরেসার 'নির্মলা শিশু ভবন' থেকে দত্তক নেওয়া, ডাক্তার দত্তের কন্যা নতির কথোপকথনের মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্মের সেবার দিকটি ও সেবার প্রতিমূর্তি মাদার টেরেসার যে সেবার ইতিহাস প্রস্ফুটিত হয়েছে তা অনস্বীকার্য। উপন্যাসের চরিত্রদের কথোপকথনের একটি অংশ হ'ল –

"উনিশশো' ছেচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ, দশই সেপ্টেম্বর। এক লরেটো কনভেন্টের নান চলেছেন দার্জিলিঙে 'রিট্রিটে' যোগ দিতে। অশান্ত কলকাতা উত্তাল জাতিদাঙ্গায়। বইছে রক্তস্রোত, হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের।....সেইমুহূর্তে পরমপিতার প্রত্যাদেশ শুনতে পেলেন তিনি। 'তুমি সব ছেড়ে নতুন জীবন গ্রহণ কর। চলে যাও দীন দুঃখীদের ভেতর। দরিদ্রদের মধ্যে যারা দরিদ্রতম, তাদের সেবা কর। মনে রেখো, তাদের সেবার ভেতর দিয়েই তুমি আমারই সেবা করবে। মৃত্যু-পথযাত্রী, আশ্রয়হীন, সহায়সম্বলহীনকে খাদ্য, শুশ্রুষা আর আশ্রয় দিয়ে তুমি সম্পাদন করবে আমারই প্রিয় কাজ।' প্রভুর এ আদেশ তাঁর কাছে এলো অন্তরের অন্তস্তলের আহ্বানরূপে।"

খ্রীষ্ট ধর্মের এক মহান ব্যক্তিত্বের নাম মাদার টেরেসা। মাদার টেরেসা ছিলেন যথার্থ সেবার প্রতিমূর্তি। তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের সঠিক ধর্মবোধটিকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। **'ভগ্ন ভাস্কর্য'** (২০০২) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক চিত্তরঞ্জন মাইতি মাদার টেরেসার জীবন বৃত্তান্ত অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর ধর্ম হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন দরিদ্রতম মানুষদের সেবা করা। এই সেবার মাধ্যমেই তিনি ঈশ্বরসেবা করার ব্রত নিয়েছিলেন। তাঁর প্রতি পরমপিতার এই ছিল আদেশ। মৃত্যুপথযাত্রী, আশ্রয়হীন, সহায় সম্বলহীনকে খাদ্য, আশ্রয়, শুশ্রূষা দিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করবার প্রত্যাদেশ তাঁর কাছে অন্তরের অন্তস্থলের আহ্বান রূপে এসেছিল। সব রকম ধর্মের দীন-দুঃখী মানুষের সন্তানদের পালন করার জন্য তৈরি করেছিলেন 'নির্মলা শিশু ভবন'। এখানে অনাথ শিশুদের সাথে সাথে যে সমস্ত মানুষেরা সন্তান পালনে অক্ষম, তারাও তাদের সন্তানদের মাদারকে দিয়ে যায়। দত্তক নেবার সময় যে ধর্মাবলম্বী পরিবার থেকে শিশুটি এসেছে, বিশেষভাবে সেই ধর্মাবলম্বী

কোন গ্রহীতার হাতেই শিশুটিকে তুলে দেওয়া হয়। এখানে কারো অজ্ঞাতে কিংবা অনিচ্ছায়, কোন মানুষকে খ্রীষ্টান করার কোন প্রশ্নই আসে না। মাদারের কথায় – "যাদের ধর্ম সম্বন্ধে কোন বোধ নেই, যারা সম্পূর্ণ অজ্ঞান, তাদের ধর্মান্তরিত করা প্রভুর অভিপ্রেত বলে আমি মনে করি না। যারা স্বেচ্ছায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে চান কেবল তাদেরই ধর্মান্তরিত করা হয়"। 'নির্মল হৃদয়' – এ মুমূর্ষু বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যাঁরা থাকেন তাঁদের মৃত্যুর পর, তাঁদের নিজেদের ধর্মানুযায়ী তাঁদের সৎকার করা হয়। এমনকি মৃত্যুর লগ্ন আসন্ন হয়ে এলেও তাদের নিজেদের ধর্মানুযায়ী, তাদের ঈশ্বর, আল্লা এবং খ্রীষ্টের নাম স্মরণ করতে উৎসাহিত করা হয়। এমনই মাদারের মুক্তমনের পরিচয়, আমরা লেখক চিত্তরঞ্জন মাইতির লেখা **'ভগ্ন ভাস্কর্য'** (২০০২) উপন্যাসে প্রাপ্ত হই। মাদারের সমস্ত কাজের প্রেরণা অবশ্যই সেবার প্রেরণা। 'নির্মল হৃদয়' মাদারের মুক্তমনের পরিচায়ক। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে 'শিশু ভবন' প্রতিষ্ঠার ঠিক দু বছর পরে কালীঘাটে, মায়ের মন্দিরের পাশেই এই মুমূর্ষু নিবাস 'নির্মল হৃদয়' তৈরি হয়েছিল যা কালী মন্দিরের পাশেই, খ্রীষ্টান মিশনারীদের পরিচালিত এক সেবা প্রতিষ্ঠান। 'নির্মল হৃদয়' মাদারের যথার্থ সেবার প্রতিমূর্তির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। ঔপন্যাসিক চিত্তরঞ্জন মাইতি তাঁর রচনার মাধ্যমে কালীঘাটের 'নির্মল হৃদয়' – এর প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে খ্রীষ্ট ধর্ম এবং খ্রীষ্ট ধর্মের সেবার দিকটিকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে এভাবেই পরিচিত করাতে সক্ষম হয়েছেন। এই রচনাশৈলী সমগ্র পৃথিবীর বর্তমান সমাজকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের আঙ্গিকে সেবার দিকটি দ্বারা, অসাধারণভাবে প্রভাবিত করেছে এবং সমাজের মানুষকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে যা এক সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজের সাথে মানুষকে একাত্ম করাতে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

মানুষের জীবনে বিশেষ সামাজিক ও মানবিক প্রয়োজনে মানুষের আদর্শ ও মূল্যবোধ অনেক সময় এক বিশেষ ধর্মের জন্ম দেয় এবং কালের পদক্ষেপে, তার প্রয়োজনের অন্তে, ওই ধর্মমতের মন্থর অবলুপ্তি ঘটে। তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল বৌদ্ধধর্ম। প্রকৃতপক্ষে বৈদিকধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিবাদীধর্ম হিসেবেই এই মানবিক এবং অন্ধ সংস্কারমুক্ত বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বৌদ্ধধর্মের প্রসঙ্গেই ঔপন্যাসিক কিন্নর রায় **'তুষিত স্বর্গের আলো'** (২০০৫) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র হেমরঞ্জনের, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে পাশ ফিরতে ফিরতে মনে পরল –

"বই-পুস্তকে বহুবার পড়া এই তথ্য মনে পড়ল বুদ্ধজীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে তো পূর্ণিমাতেই। বৈশাখী পূর্ণিমায় তিনটি বড় বড় ঘটনা ঘটে গেছে বুদ্ধ জীবনে। কী

কী? তিনি – ভগবান বুদ্ধ জন্মালেন। বুদ্ধত্ব লাভ করলেন তিনি। আবার তাঁর পরিনির্বাণও এই তিথিতে। আষাঢ়ি পূর্ণিমাতেও বুদ্ধ জন্মের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ঘটনা ঘটে। তা কী কী? তিনি প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন মাতৃজঠরে। গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসের পথে পা বাড়ালেন একই তিথিতে। আর সারনাথে পাঁচজন শিষ্যের কাছে প্রচার করলেন বৌদ্ধ ধর্ম। মাঘি পূর্ণিমা তিথিতে, মাঘি পূর্ণিমা তিথিতে কি হলো? ঘুমে থাকা হেমরঞ্জন বিড়বিড় করতে লাগলেন নিজের মধ্যে।....মাঘি পূর্ণিমা তিথিতে তিনি কোন দিন দেহ ত্যাগ করবেন, তা ঘোষণা করলেন শিষ্যদের কাছে।"

ঔপন্যাসিক কিন্নর রায় **'তুষিত স্বর্গের আলো'** (২০০৫) উপন্যাসে, বৌদ্ধ ধর্মের পরিচিতি প্রসঙ্গে তিনি উপন্যাসের চরিত্র হেমরঞ্জনের স্বপ্নে দেখা তথ্যটিকে তুলে ধরে বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধদেবের জীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি কোন না কোন পূর্ণিমায় সংঘটিত হয়েছে তার বিবরণ দিয়ে পাঠককুলকে এ বিষয়ে জ্ঞাত হতে সাহায্য করেছেন। যেমন ভগবান বুদ্ধ বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বৈশাখী পূর্ণিমাতেই তাঁর বুদ্ধত্ব লাভ হয়েছিল। আবার এই বৈশাখী পূর্ণিমাতেই তার পরিনির্বাণও ঘটেছিল। ঠিক এভাবেই আষাঢ়ী পূর্ণিমাতেও বুদ্ধ জন্মের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। যেমন মাতৃজঠরে তিনি প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছিলেন, এক আষাঢ়ী পূর্ণিমাতেই, তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। এই আষাঢ়ী পূর্ণিমাতেই, আবার প্রথম বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রকল্পে, সারনাথে পাঁচজন শিষ্যের কাছে বসেন এবং আষাঢ়ী পূর্ণিমাতেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম প্রচার করেছিলেন। এবং অত্যাশ্চার্যভাবেই তিনি এক মাঘী পূর্ণিমা তিথিতেই শিষ্যদের কাছে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি বৈশাখী পূর্ণিমাতেই দেহত্যাগ করবেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিটিতে, যে তিথির নাম 'সাঙ্কশ্য', সেই তিথিতে ভগবান বুদ্ধ তাঁর মায়ের কাছে নিজের ধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন। তাই বৌদ্ধরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ও বিনয়ের সঙ্গে এ ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিটিকেও উৎসবের মতো পালন করে। তাই বুদ্ধ জীবনে নানা পূর্ণিমা তিথিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভগবান বুদ্ধ যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তাতে তিনি যে অষ্টাঙ্গিক আর্যামার্গ অবলম্বন করতে বলেছিলেন, তা অবলম্বন করে চললেই শান্তি, মুক্তি ও নির্বাণ আয়ত্ত করা যাবে বলে তিনি প্রচার করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা হ'ল – 'আত্মদীপ ভব'। শাক্যমুনি বারংবার বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করার সময় বলেছেন – 'আত্মদীপ ভব' অর্থাৎ শাক্যমুনি সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে বলেছেন – তোমরা তোমাদের হৃদয়ের সদর্থক আলোটিকে প্রজ্জ্বলিত করো, জ্বালিয়ে রাখো। সেই আলো থেকে অন্য আলোকরেখা এঁকে দাও। এক দীপই, শত সহস্র প্রদীপের প্রজ্বলনের কারণ হয়ে উঠুক। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন – মানুষ মোহাবিষ্ট হয়ে বিপথে গমন করে।

একদিকে বিষয়-লালসা, ভোগাসক্তি আবার অন্যদিকে অনর্থক কঠোর তপস্যায় শরীরপাত৷ তাই তিনি মধ্যপথ আবিষ্কার করেছেন৷ সেই অষ্টাঙ্গিক আর্যমার্গ অবলম্বন করে চললে, সমস্ত দুঃখ-কষ্টের মূলোচ্ছেদ হবে৷ শান্তি, মুক্তি ও নির্বাণলাভ করা যাবে৷ বৌদ্ধ ধর্মে চারটি গভীর তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে৷ প্রথম তত্ত্ব – সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় স্থান৷ জন্ম, রোগ, জরা, মরণ সবই দুঃখময়৷ যা ভালো লাগে না, তার সঙ্গে মিলনে যেমন দুঃখ, ঠিক তেমনি যাকে ভালো লাগে অর্থাৎ ভালোবাসার পাত্রের বিয়োগও দুঃখময়৷ দ্বিতীয় তত্ত্ব – বিষয়তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ৷ তৃতীয় তত্ত্ব – এই বিষয়তৃষ্ণা সমূলে তুলে ফেলাতেই দুঃখ নিবৃত্তি৷ চতুর্থ তত্ত্ব – দুঃখ নিবৃত্তির অষ্টাঙ্গিক পথ আছে৷ সেই পথকে অবলম্বন করে চললেই মানুষ বাঞ্ছিত ফল লাভ করতে পারবে৷ যে আটটি পথের দিশা বুদ্ধদেব দিয়েছেন, তা হ'ল – (১) সম্যকদৃষ্টি, (২) সম্যকসংকল্প অর্থাৎ সংকল্প সঠিক রাখা, (৩) সম্যকবাক্য অর্থাৎ সত্য-সরল-প্রিয় বাক্য বলা, (৪) সম্যককর্মান্ত অর্থাৎ সদাচারণ, (৫) সম্যকআজীব অর্থাৎ সর্বভূতে অহিংসাপূর্ণ, সাধুজীবিকা গ্রহণ করা, (৬) সম্যকব্যায়াম অর্থাৎ আত্মসংযমের মাধ্যমে আত্মোৎকর্ষ সাধনা, (৭) সম্যকস্মৃতি অর্থাৎ ধারণা ঠিক রাখা, (৮) সম্যকসমাধি অর্থাৎ জীবনের সমস্ত তত্ত্বের ধারণা ও নিদিধ্যাসন৷ ধ্যানের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে সংবরণ করতে পারবে৷ ভগবান বুদ্ধ পুরুষদের যেমন ভিক্ষু হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি নারীদেরও ভিক্ষুণী হতে সম্মতি দিয়েছিলেন৷ কারণ তখন মানুষ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অবক্ষয়ের সমস্ত কুসংস্কারের ও কুআচারের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারছিল না৷ কিন্তু ভগবান বুদ্ধের কৃপায় মানুষের মনে ধীরে ধীরে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ হয়েছিল৷ বর্তমানে বুদ্ধকীর্তন তেমনভাবে প্রচলিত নয়৷ কারণ বুদ্ধকীর্তন গাইবার মানুষ কমে যাচ্ছে৷ শোনার মানুষও সেভাবে বাড়ছে না৷ তবুও নতুন বুদ্ধমন্দির তৈরি হচ্ছে৷ দেশ-বিদেশ থেকে ভন্তেরা আসছেন৷ কঠিন চীবর দান করা হচ্ছে৷ দায়করা, ভন্তের ব্যাপারে অনেক বেশি মনোযোগী হচ্ছেন৷ তবে ভগবান তথাগতের প্রথম সন্ন্যাস গ্রহণের পরে, নিজ হাতে কেশকর্তনের বিষয়টির স্মরণে, বাঙালি বৌদ্ধরা প্রবারণাপূর্ণিমা পালন করেন৷ আশ্বিন মাসের লক্ষ্মীপূর্ণিমা বা প্রবারণাপূর্ণিমায় বাঙালি বৌদ্ধরা, আকাশে ফানুস ওড়ান, আলো দেখান৷ মহারাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর শতাধিক বছর ধরে বরেন্দ্রভূমি অরাজগতায় নিমজ্জিত ছিল৷ বরেন্দ্রভূমির জনজীবন বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত ছিল৷ বরেন্দ্রভূমিকে রক্ষা করার জন্যই তখন জনগণ গোপালকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন৷ গোপাল কোনো রাজবংশের সন্তান নন৷ গোপাল বরেন্দ্রের জনপ্রতিনিধি হয়ে বরেন্দ্রভূমিকে দুর্দিনের হাত থেকে রক্ষা করতে সফল হয়েছিলেন৷ সৃষ্টি হয়েছিল বাংলার পাল বংশের৷ গোপালের বংশধরই হচ্ছেন

দেবপাল, মহিপাল। এই বৌদ্ধ রাজাদের সময়ই সৃষ্টি হয়েছিল নানা বৌদ্ধ বিহার। বাংলার বৌদ্ধ রাজাদের জন্যই রক্ষা পেয়েছিল বুদ্ধের সারনাথ। সে সময়ে পাল রাজারা, বরেন্দ্রভূমিতে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণে কাউকেই বাধ্য করতেন না। হিন্দু-বৌদ্ধ প্রজারা মিলেমিশে বসবাস করত। ধর্মকে কেন্দ্র করে কখনোই কোনরকম কলহ বিবাদ হতো না। কিন্তু পাল রাজারা মূলত বৌদ্ধ ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কিন্তু তারা হিন্দু ধর্মের প্রতিও সমানভাবে সম্মান প্রদর্শন করতেন। **'অগ্নিগর্ভ বরেন্দ্র'** (২০০১) উপন্যাসে উপরোক্ত এই ইতিহাস ঔপন্যাসিক দ্বৈপায়ন অন্তত দক্ষতার সঙ্গে ইতিহাসের সত্যতা অক্ষুন্ন রেখে তুলে ধরেছেন। **'অগ্নিগর্ভ বরেন্দ্র'** (২০০১) উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের বয়ানে –

"সে সময় মানুষ বুদ্ধ আর বৌদ্ধ ধর্মের কথা যেমন শুনেছে, হিন্দু ধর্মের কথাও। পাল রাজারা বৌদ্ধ। রাজা-প্রজার সম্পর্ক পিতা-পুত্রের কিন্তু নিজেদের ধর্ম গ্রহণে প্রজাদের বাধ্য করেননি কোন পালরাজাই। ধর্ম গ্রহণের রাজাজ্ঞা কোন দিনই উচ্চারিত হয়নি বরেন্দ্রে। হিন্দু-বৌদ্ধ-প্রজারা মিলে-মিশে বসবাস করে। ধর্মকে কেন্দ্র করে কোনোদিনই কলহ বিবাদ দেখা দেয়নি।"

'অগ্নিগর্ভ বরেন্দ্র' (২০০১) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক দ্বৈপায়ন কথকের বয়ানে যে বৌদ্ধ ইতিহাস তুলে ধরেছেন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব সমাজকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তার এক ইতিহাস সমৃদ্ধ যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা হ'ল – বৌদ্ধ ধর্মের সাফল্যের অন্যতম কারণ – বুদ্ধের মহানুভবতা, চারিত্রিক পবিত্রতা ও সহজ, সরল মর্মস্পর্শী উপদেশ। বৌদ্ধ ধর্মে কোন গোপন মন্ত্র, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও উপনিষদের মত দুর্বোধ্য দর্শনতত্ত্ব নেই। এই কারণে বুদ্ধের উপদেশ ও নির্দেশ সাধারন মানুষের কাছে সহজবোধ্য হয়েছিল। তিনি মধ্যপথের কথা বলেছেন। এই পথ হ'ল এক নৈতিক বিধান মাত্র, যা গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলের পক্ষেই অনুসরণ করা সহজ ছিল। তাছাড়া বুদ্ধের সময় সমাজের কঠোর জাতিভেদ প্রথা, ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে, ক্ষত্রিয়দের ক্ষোভ বৌদ্ধ ধর্মকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। বুদ্ধদেবের শিষ্যদের কাছে বুদ্ধদেবের শেষ বাণী ছিল – "সব বস্তুর মধ্যে ক্ষয় নিহিত রয়েছে। সুতরাং অধ্যাবসায় সহকারে নিজেদের মুক্তির চেষ্টা করো"। তিনি মনে করতেন ধর্ম নয়, মানুষ – ধর্মের মানুষ নয়, মানুষের ধর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জগতে এমন একটা মুহূর্ত নেই যখন সৃষ্টি থেমে গেছে। তাই ঈশ্বর, ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট মানুষ ও মানুষের দ্বারা আবিষ্কৃত ঈশ্বর বা উপলব্ধ ঈশ্বর দুটোই সমান সত্য বলা যেতে পারে। কারণ অনুভূত হওয়ার মুহূর্তে ঈশ্বর যতটা আনন্দ পান, মানুষ যখন তাকে অনুভব করে, সেই

মুহূর্তে মানুষ নিজেও ঈশ্বরের চেয়ে কম আনন্দ পান না। জগতে এই দুটি উপলব্ধি বলা যেতে পারে গাণিতিক নিয়মে সত্য, আবার জগতে কোনো উপলব্ধিকেই এত নির্ভুলভাবে সমানভাগে হয়তো ভাগ করা যায় না। জন্ম-মৃত্যুর সম্পর্কের উপলব্ধিও ঠিক এভাবেই একে অন্যের অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কবির ভাষায় বলা যেতে পারে – 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে।' তাই জন্মের মতই মৃত্যুও জীবনের এক চরম সত্য। তাই বলা যেতে পারে যে জগতের প্রতিটি উপলব্ধি, প্রতিটি ক্রিয়া কোনো না কোনোভাবে ঐশ্বরিক প্রকাশেরই নামান্তর। তেমনই জগতে জন্ম ও মৃত্যুকেও এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা যেতে পারে। এই উপরোক্ত বিষয়ের দিকগুলি অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে ঔপন্যাসিক দেবর্ষি সারগীর **'ভ্রমণসঙ্গী ঈশ্বর'** (২০০৪) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। ঈশ্বরকেই তাঁর নিজের ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে কল্পনা করে ঈশ্বর ও নিজের মধ্যে এক সুন্দর বন্ধুত্বের সৃষ্টি করে, ঈশ্বরের সাথে ধর্মসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে, ঈশ্বরের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে, তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তকে এক অপূর্ব ধর্মীয় চেতনায় সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। **'ভ্রমণসঙ্গী ঈশ্বর'** (২০০৪) উপন্যাসে একদিন ঈশ্বর তার ভ্রমণসঙ্গীকে বলছেন –

"বড় ভুল হয়ে যেত আমার বিশ্ববিধানে যদি মৃত্যুর সম্ভাবনা না থাকতো," শান্ত উদ্বেগে মুখ ভরিয়ে ঈশ্বর একদিন মন্তব্য করলেন। "না, মরার সম্ভাবনা ও আতঙ্ক এই লোকগুলোকে বদ্ধ উন্মাদ করে দিত।" "না, মানুষ অমরতাকে ভয় পায় না। ভয় পায় দুঃখ ও যন্ত্রণাকে। ওটার ভয়েই এরা মরতে চাইছে", একটু ক্ষোভের সঙ্গে আমি বললাম। আমার ক্ষোভে ঈশ্বর হঠাৎ হেসে ফেললেন। বেদনার্ত, স্নেহময় হাসি। "এরপর তুমি জানতে চাইবে জগতে এত দুঃখ ও যন্ত্রণা কেন সৃষ্টি করলাম। আমি ঠিক বলিনি?" কোন উত্তর দিলাম না, কারণ প্রশ্ন বা উত্তর কিছুই এই মুহুর্তের বাস্তবতাকে নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতা রাখে না। জ্ঞানের অসহায়তা সম্পর্কে এত তীব্র বোধ এর আগে আমি কখনও অনুভব করিনি।"

উপরোক্ত **'ভ্রমণসঙ্গী ঈশ্বর'** (২০০৪) উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের মত অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে, জীবনের মতই মৃত্যুও এক মহাসত্য। উপনিষদও এ কথা স্বীকার করেছে বারবার। গীতায় আছে মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নবপরিধান গ্রহণ করে ঠিক তেমনি আত্মাও পূর্বদেহ ত্যাগ করে নতুন শরীর গ্রহণ করে। নতুন শরীরের জন্ম পদ্ধতি অবশ্যই এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। যেমন ডিম্বাণু, শুক্রাণু, ভ্রূণ, জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা, বার্ধক্য ও মৃত্যু। শরীরের উপস্থিতির সাথে শরীরের অভ্যন্তরে আত্মা বা মন বাস করে। **'ভ্রমণসঙ্গী ঈশ্বর'** (২০০৪) উপন্যাসের ঔপন্যাসিক দেবর্ষি লিখেছেন – প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর সম্ভাবনা না থাকলে প্রতি মুহূর্তে ভালোবাসার সম্ভাবনা থাকে না। যদি মানুষের কখনোই না মরার সম্ভাবনা থাকতো,

তবে সে জীবনকেও কখনো ভালবাসত না। মৃত্যুতে যদি সব শেষ হয়ে যায়, তবে জীবন অর্থপূর্ণ হতে পারে না। বিশেষ করে এটা যখন অনিবার্য যে – মৃত্যু একদিন হবেই। জীবনের অর্থহীনতায় মানুষ যাতে কষ্ট না পায় সেই কারণে মৃত্যুকেও অর্থপূর্ণ করে তুলতে হবে। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করার মুহূর্তেই, তার স্বভাবে এই বোধ ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে – সে অমর। এই বোধ থেকে মানুষের মৃত্যু নেই। মানুষ যদি মৃত্যুকে বিস্মৃত হতো, তাহলে সে আবিষ্কারের আনন্দ হারাতো, বিস্ময়ের আনন্দ হারাতো। মানুষের সঙ্গে পশুর তফাৎ এখানেই কারণ পশুর ভেতরে কোন আবিষ্কার বা বিস্ময়ের আনন্দ নেই। বিশ্ববিধানে যদি মৃত্যুর সম্ভাবনা না থাকতো, তাহলে মানুষ দুঃখ-যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত হয়ে হয়তো বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যেত। তাই ঈশ্বর ভালোবাসার স্বার্থেই মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন। শরীরের তথাকথিত মৃত্যু ঘটলেও মানুষের চেতনার কখনোই মৃত্যু ঘটে না, কারণ চেতনার মৃত্যু মানেই ঈশ্বরের মৃত্যু। চেতনা থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি। এমনকি তথাকথিত মৃত্যুরও সৃষ্টি চেতনার থেকেই। তাই মৃত্যু বলেও কিছু নেই, আবার জন্ম বলেও কিছু নেই। অথচ আপাত অর্থে – জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, ধ্বংস আছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এইসব কিছুই নেই। আছে শুধু আনন্দ। নারকোলের গভীরে সজল শাঁস থাকার মতো। এই আনন্দ থেকেই ঈশ্বর ও জগত উদ্ভূত। মৃত্যুতে জীবনের সব অর্থ শেষ হয়ে যায় না। আবার মৃত্যু অনিবার্য, মৃত্যু একদিন হবেই। তাই মৃত্যু ছাড়া জীবন অর্থপূর্ণও হতে পারে না। বৌদ্ধ ধর্মেও ভগবান বুদ্ধও মৃত্যু সম্পর্কে একই কথা বলেছেন। বৌদ্ধ দর্শনে মৃত্যু সম্পর্কে ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় লিখিত **‘আহাম্মক’** (২০০৪) উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের বয়ানে –

> **“বৌদ্ধ দর্শনে মৃত্যুর সংজ্ঞা খুব সহজ নয়। সেখানে জীবের জীবন ও মৃত্যু দুটো আলাদা অধ্যায় নয়! এক। শুধু এঘর থেকে ওঘরে যাওয়া। মৃত্যু হল জীবনের আর এক অবস্থা। মৃত্যু একটা দর্পণ। যেখানে বেঁচে থাকার সমস্ত অর্থ প্রতিফলিত হয়। মরতে শেখো, তা না হলে পরিপূর্ণ বাঁচা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না।”**

জীবনের আর এক অবস্থার নামই হ’ল মৃত্যু। মৃত্যু জীবনের সেই আয়না যেখানে বেঁচে থাকার সমস্ত অর্থ প্রতিফলিত হয়। যে কোনো কাজের শেষটা জ্ঞাত হলে, কাজে একটা ছন্দ আসে। পরিপূর্ণ ভাবে বাঁচতে চাইলে মৃত্যু সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত হতে হবে। মৃত্যুর পরে এবং পুনরায় জন্ম গ্রহণের পূর্বের অবস্থাকে বৌদ্ধরা ‘বার্দো’ নামে অভিহিত করেছেন। বৌদ্ধমতে জীবন থেকে মৃত্যু ও মৃত্যু থেকে জীবন – এই সম্পূর্ণ বৃত্তটাকে তাঁরা চারটি বার্দো অবস্থায় বিভক্ত করেছেন। (১) জীবন অর্থাৎ বেঁচে থাকা, স্বাভাবিক একটা বার্দো অবস্থা। (২) যন্ত্রণাময়

মৃত্যু, এটিও একটি ভয়ঙ্কর বার্দো অবস্থা। (৩) দেহ ছেড়ে দিয়েছে, অথচ আরেকটি দেহ তখনও প্রাপ্ত হয়নি, জ্যোতির্ময় এই যতি বা স্থিতি আর একটি বার্দো – এর নাম ধর্মতা। (৪) আমি পুনরায় জন্মাচ্ছি – এই বার্দো অবস্থার নাম হল 'কর্মিক বার্দো'। আত্মা দেহেই থাকেন যা জন্মানও না মরেনও না। মানুষের বোধের অতীত এক অতিশয় জটিল উপাদান। তাই বৌদ্ধধর্মে জীবনকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হতে গেলে, মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হতে হবে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, বৌদ্ধ দর্শনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক দর্শন হ'ল ''মরতে শেখো''। উপন্যাসপ্রাপ্ত তথ্যগুলি থেকে মৃত্যু সম্পর্কে যে সদর্থকতার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যেতে পারে, তা থেকে জীবনের মতো মৃত্যুও মানুষের কাছে, বিয়োগ-ব্যথার এক বিশেষ অনুভূতির বিষয় হয়ে থাকে না। সম্পূর্ণ জীবন জ্ঞাত হতে গেলে মৃত্যুও এক অসাধারণ উপলব্ধি, যেখানে আত্মা এবং পরমাত্মার মিলনের এক মূহুর্ত, মানুষের কাছে পরম অভিপ্রেত হয়ে উঠতে পারে। উপরোক্ত উপন্যাসগুলির তথ্যের সমর্থনেই যেন ঔপন্যাসিক জাহানারা সিদ্দিকী তাঁর **'সবুজ অরণ্যে জ্বলে হায়েনার চোখ'** (২০১০) উপন্যাসে লেখকের বয়ানে –

''বার্মার লোকজনও তো বৌদ্ধ। তারা আরো গভীরভাবে আত্মাকে বিশ্বাস করে।....আত্মা আছে কি নেই কে জানে? সত্যি বলতে কি আত্মার অস্তিত্ব তো আমাদের মস্তিষ্কের কল্পনা,''

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা গভীরভাবে আত্মাকে বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ মন সত্যদর্শন করতে সহায়তা করে। চিন্তায় স্বচ্ছতা আনতে পারে। দেহ হ'ল মন আর ইন্দ্রিয়ের একসাথে বসবাসের স্থান। ইন্দ্রিয় ও মনের ভাব প্রকাশ এক নয়। মন হ'ল আধ্যাত্মিক, ইন্দ্রিয়ের জগতও আধ্যাত্মিকতাশূন্য নয়। তবে মন থেকেই বোধ আর বোধ থেকেই বোধি। এই বোধি হ'ল অনন্ত ও শাশ্বত এক চেতনা, যে সমস্ত অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমস্ত প্রাণকে সত্যের সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করে। এই পথ গৌতম বুদ্ধেরও। ঔপন্যাসিকেরা, উপন্যাস রচনার মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের এই মৃত্যুকে সমাজের মানুষের সামনে এক অভিপ্রেত সত্যরূপে পরিবেশন করেছেন, যা ধর্ম, আত্মা ও আত্মবোধকে বা ঈশ্বরবোধকে এক সুতোয় গেঁথে ফেলেছে। মৃত্যু মানুষের কাছে আর ভয়াবহ বিষয় নয় বরং জন্মগ্রহণের আনন্দের মতই বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠতে সক্ষম হতে পারে। মানুষ জীবনের মত মৃত্যুকেও ভালোবাসতে পারলে স্ব-নিয়ন্ত্রণে থাকা অনেক সহজ হয়ে ওঠে। নীতিবোধ এবং মূল্যবোধের তুলাদন্ডে প্রত্যেক মানুষকে সাম্যতার চোখে দেখা অনেক সহজ হয়ে যায়। এর ফলে সমাজে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব, সমাজকে

প্রভাবিত করতে হয়তো সমর্থ হবে না। ঔপন্যাসিকদের রচিত উপন্যাসপ্রাপ্ত তথ্যগুলি থেকে এও জ্ঞাত হওয়া যাচ্ছে – বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে অহিংসার বাণী প্রাধান্য পেয়েছে এবং তা সমগ্র পৃথিবীর মনুষ্য সমাজকে এক অহিংসক, ভাতৃত্ববোধের সূত্রে গ্রথিত করতে সক্ষম হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান সম্প্রদায়ের বিবর্তনের যাঁরা মাথা বা নেতা ছিলেন, বৌদ্ধ ঐতিহ্যে তাঁরাই সিদ্ধ বা সিদ্ধাচার্য রূপে পরিচিত ছিলেন। এই সিদ্ধাচার্যরা মূলত সহজযানে বিশ্বাসী ছিলেন। সহজযান হ'ল – বৌদ্ধ ধর্মের এক নতুন ধারণা যাতে দেবদেবীর কোন স্বীকৃতি যেমন নেই, তেমনই মন্ত্র, পূজা, আচার-অনুষ্ঠানেরও কোনো প্রচলন নেই। অর্থাৎ সহজযানের কাছে ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানের কোনো মূল্য ছিলনা। সহজযানেদের মূল বক্তব্য হ'ল, তারা শূন্যতাকে 'প্রকৃতি' ও করুণাকে 'পুরুষ' বলে মনে করে, এবং এই দুইয়ের মিলনে বোধিমনের যে পরমানন্দ অবস্থার প্রাপ্তি হয়, তাকেই তারা মহাসুখ, ধ্রুবসত্য উপলব্ধি বলে মনে করে থাকে। এই উপলব্ধি থেকেই সংসারজ্ঞান, আত্মপরভেদ ও সংস্কার বিনষ্ট হয়ে মনের যে স্থিত অবস্থার সৃষ্টি হয়, তার নামই সহজ অবস্থা। বৌদ্ধ ধর্মের সিদ্ধাচার্যদের সহজযানের হাত ধরেই বাংলার সহজিয়া ধর্মের আগমন। মধ্যযুগীয় বাংলায় সহজিয়া ধর্মের আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি হলেন বড়ু চন্ডীদাস। সেই কারণেই তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বৌদ্ধ সহজযানের মূল সূত্রগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিক পরেশ ভট্টাচার্যের লেখা **'রামী চন্ডীদাস'** (২০০৮) উপন্যাসে এই সহজিয়া ধর্মের ধর্মীয় সমাজের ইতিহাস অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে, যা বর্তমান গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে গ্রাহ্য হতে পারে। ঔপন্যাসিক পরেশ ভট্টাচার্যের লেখা **'রামী চন্ডীদাস'** (২০০৮) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র চন্ডীদাস, রাজার নির্দেশে চন্ডীদাস ও রামীকে নানুর ত্যাগ করে চলে যাওয়ার বিরোধিতা করে, সমাজের মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন–

"মানবধর্মের মূল কথাই তো প্রেম।....প্রেমই জগৎ, জগৎই প্রেম। আর প্রেমের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ। আমি মনে করি, প্রেমহীন মানুষ জড়ের সমান। যে মানুষের হৃদয়ে-মনে প্রেম নেই, তারাই মানব সমাজে শরীর সর্বস্ব মানুষ। হৃদয় মন্দিরে অধিষ্ঠিত যে প্রেমময় ঈশ্বর – তোমরা একবার হৃদয়ের বন্ধ আগল খুলে সেই পরমাত্মার সন্ধান করো। কথার শেষে চন্ডীদাস উদাত্ত কন্ঠে দু'হাত তুলে গেয়ে উঠলো।

'শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।' "

সহজিয়া একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়, যারা সহজ পথে সাধনা করে। যা সঙ্গে সঙ্গে জন্মায় তাকেই ‘সহজ’ বলা হয়। জীব ও জড়ের বাইরের রূপের সাথে সাথে তার অন্তরেও একটি শাশ্বত সুন্দর স্বরূপ জন্মলাভ করে। এই শাশ্বত স্বরূপই ‘সহজ’। এই সুন্দর উপলব্ধির মাধ্যমেই যাবতীয় প্রাণী ও বস্তুর উপলব্ধি হয়। আর এই সুন্দর উপলব্ধির পদ্ধতি হ’ল সহজপথ। বৈষ্ণব সমাজে সতেরো শতকে ও বাউল সমাজে আঠারো শতকে সহজিয়া ধর্মমতের প্রসার হয়। বৌদ্ধ সহজিয়াদের মতোই, বৈষ্ণব ও বাউল সহজিয়ারা, সাধনার এই পথেই জীবনের স্বরূপ উপলব্ধিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের এই উপলব্ধি ও বিশ্বাস তারা কৃষ্ণকীর্তন ও বাউলগানে তুলে ধরেছেন। বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের প্রবর্তক হলেন চতুর্দশ শতকের কবি বড়ু চন্ডীদাস। রামী নামের এক রজকিনীর সাহচর্যে তিনি এই তত্ত্ব-দর্শন আবিষ্কার করেন। পরে খ্রীষ্টীয় সতেরো আঠারো শতকে বৌদ্ধ সহজিয়াদের অনুকরণে সমাজে এই ধর্মমত ছড়িয়ে পড়ে। যারা এই মতানুসারী, তারা নিজেদের ‘রসিক’ বা ‘সহজ পথের পথিক’ বলে পরিচিত করান। এখানে সহজপথ মানে প্রেম, যা মানুষের সহজধর্ম। এই প্রেমসাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য মানবদেহই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ও প্রেমই মানুষের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ, বৈষ্ণব সহজিয়াদের মত ও সাধন পদ্ধতি থেকে পৃথক। বৈষ্ণব সহজিয়ারা বিশ্বাস করে যে মানুষের দেহই সব তত্ত্ব দর্শনের আবাসস্থল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা পরকীয়া প্রেমকে বাস্তব জীবনে গ্রহণ করে না, তারা তাকে সাধনার রূপক হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু সহজিয়া সাধকগণ বাস্তব জীবনেও পরকীয়া প্রেমে বিশ্বাসী এবং এই পথই সিদ্ধিলাভের পথ বলে তাঁরা মানেন। চন্ডীদাস ছিলেন কবি, স্রষ্টা। রাধাকৃষ্ণের ঐশী প্রেমলীলাই তাঁর পদের বা গানের মর্মবাণী ছিল। তিনি কবি, রাধাকৃষ্ণের সেবক, সহজিয়া সাধক। তাই তিনি পাপ পূণ্য, ন্যায়-অন্যায়ের উর্ধ্বে আর রামী, তিনি রজককন্যা হলেও সহজিয়া-সাধিকা। চন্ডীদাসের মত কবিরাই আলোর পথ দর্শায়। মানুষ যখন মন্দিরে-মন্দিরে, ঈশ্বর-ঈশ্বর করে ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু আপন হৃদয়পুরটা খুঁজে দেখে না, তখন ঈশ্বরের নাগাল পাওয়া যায় না। সহজিয়া সাধক-সাধিকার জীবনের সত্য হ’ল – অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত না হ’লে, সেই অচেনা ঈশ্বরকে চেনা যায় না। চন্ডীদাস ভাবুক হলেও যথেষ্ট আত্মসচেতন এবং যুক্তিবাদী। তিনি মনে করেন প্রেম-ভালোবাসা যদি পাপ হয়, তাহলে পুণ্য বলে তো কোন কিছু থাকতে পারে না। মানবধর্মের মূল কথাই তো প্রেম। যে জীবনে প্রেম-ভালোবাসা নেই, সে জীবন তো মিথ্যা। চন্ডীদাস সমসাময়িক সমাজচিত্র দেখে, সমাজজীবনের স্থবিরতা হয়তো অনুভব করতে পেরেছিলেন। তার মনে হয়েছিল হিংসা-বিদ্বেষ, অবিশ্বাস মানুষকে ধর্মহীন করে তুলছে। ধর্মের নামে সমাজে যা চলছিল, তা ধর্ম নয়।

যথার্থ ধর্ম, জীবনে জীবন জড়াতে উৎসাহিত করে। কিন্তু চন্ডীদাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে সমাজচিত্রটা ছিল তা হ'ল – ব্রাহ্মণ বা অন্য উচ্চবর্ণীয়দের রক্ষণশীলতা, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভেদাভেদ, ছুঁৎমার্গ, অশিক্ষা, অজ্ঞতা, মিথ্যাচার, কুসংস্কার সমাজকে শেষ করে দিচ্ছিল। মুসলমান শাসকদের অত্যাচারে দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি বিপন্ন হয়েছিল। চন্ডীদাস মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে এদেশের চিরন্তনধারাকে আবার উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। প্রেমহীন সমাজকে আবার প্রেমরসে সিক্ত করতে চেয়েছিলেন। চন্ডীদাস বাংলার মাটির কবি। এদেশের মানুষের কবি। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকীর্তনের মধ্যে দিয়ে তিনি মানুষের জাগরন চেয়েছিলেন। শুধু মানুষের নয়, সমগ্র জীবজগতের সঙ্গে মানুষের মেলবন্ধন চেয়েছিলেন। চন্ডীদাস বলতেন – জগত সংসার তো শুধু মানুষের জন্য নয়। ছোট কীটপতঙ্গ, এমনকি একটি তৃণেরও এখানে ভূমিকা বর্তমান। সৃষ্টির যা কিছু রহস্য, সবকিছু দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে মানুষের। সৃষ্টিকর্তা মানবহৃদয় মন্দিরেই অধিষ্ঠিত থাকেন। মানুষের মন, প্রকৃতির সঙ্গে যখন একাত্ম হয়, তখনই সহজিয়া ধর্মমতে ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয়। সহজিয়া ধর্মের সাথে, ইসলামের সুফি ধর্মের মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। শিখ ধর্মের সৃষ্টির মূলে ভক্তি আন্দোলন ও সুফি মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব দৃশ্য হয়। শিখ ধর্মের ইতিহাস পাঁচশত বছরেরও কম। শিখ ধর্ম মূলত হিন্দু ধর্মেরই একটি রূপান্তর। ভক্তি আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিকাশের ফলেই এই ধর্মের সৃষ্টি বলা যেতে পারে। শিখ ধর্ম প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক কালীপ্রসন্ন দত্ত তাঁর **'বিজয়'** (২০০২) উপন্যাসে শিখ ধর্মের যে ইতিহাস তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এক ধর্মভিত্তিক বর্ণনা বলা যেতে পারে। ঔপন্যাসিকের বয়ানে –

"শিক সম্পূর্ণ পৃথক রূপ জিনিস। যাহারা গুরু নানকের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারাই শিক বলিয়া অভিহিত হইত। প্রথমতঃ শিক একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বিশেষের নাম ছিল।"

শিখ ধর্ম প্রসঙ্গে নানান উপন্যাসে ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের যথাযথ মন্তব্যকে তুলে ধরেছেন, যা শিখ ধর্মের এক সম্পূর্ণ চিত্র সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে তুলতে সক্ষম। **'বিজয়'** (২০০২) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কালীপ্রসন্ন দত্ত লিখেছেন – শিখ সম্পূর্ণ পৃথক একটি সম্প্রদায়। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গুরু নানকের কথাই বলা হয়। ইনি শিখদের দশজন গুরুর প্রথম গুরু ছিলেন। 'শিখ' কথাটির অর্থ 'অনুগামী'। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্য ও হিন্দু ধর্মের আচারসর্বস্বতা এবং ইসলামের আগ্রাসী অনুপ্রবেশ এই সমস্ত সামাজিক ধর্মীয় পরিস্থিতির প্রতিবাদস্বরূপ সমাজের প্রয়োজনেই শিখ ধর্ম গড়ে উঠেছিল। শিখ ধর্মাবলম্বীরা প্রধানত সামরিক ক্ষমতার মনোভাবাপন্ন এক ধর্মীয় সম্প্রদায় বলা যেতে পারে। প্রথমত শিখ একটি ক্ষুদ্র

সম্প্রদায় বিশেষের নাম ছিল। কোনো দেশে, কোনো নতুন ধর্ম প্রচারিত হ'লে, উচ্চবংশীয় মানুষেরা প্রথমে সেই ধর্ম গ্রহণ করেন না। কারণ ক্ষত্রিয় যুবক শিখ হ'লে তাকে লোহার, সুতার প্রভৃতি নীচ শুদ্রজাতির সঙ্গে একত্রে খাওয়া-দাওয়া, ওঠাবসা করতে হবে, যা তার পক্ষে খুব একটা প্রলোভনের বিষয় হওয়ার কথা নয়। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর অস্পৃশ্য অর্থাৎ সামান্য শুদ্র যারা, তারা ক্ষত্রিয়দের সাথে, একসাথে ওঠাবসা, আহারাদি করতে পারলে নিজেদের উচ্চশ্রেণীর বলে ভাবতে পারে। তাই প্রথমে অতি নীচ শ্রেণীর মানুষেরাই গুরু নানকের ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তারপরে গুরু অর্জুন ও গুরু গোবিন্দ যখন নিজেদের দক্ষতা ও ক্ষমতাবলে শিখ সম্প্রদায়কে, একটা ক্ষমতাশীল জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হলেন, তখন অনেক উচ্চবংশীয় মানুষেরাও শিখেদের ধর্মধ্বজাকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। শিখ জাতি এভাবেই মিশ্র ধাতুতে গঠিত হলো। শিখ ধর্মে যে শক্তিশালী জাতির সৃষ্টি হয়, তারা মিলিটারিদের মতই সর্বদা ধর্মরক্ষায় রত থাকে। এদের একতা, সমাজের সমগ্র শিখজাতিকে একসূত্রে গাঁথতে, সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করে। সমকালীন উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কালীপ্রসন্ন দত্ত তাঁর উপন্যাস রচনার মাধ্যমে শিখজাতির সমাজ ও ধর্ম, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ দ্বারা কতখানি প্রভাবিত এবং তা সমাজব্যবস্থায় কতখানি সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে ও তাঁদের কৃষ্টিকে যে সর্বাংশে সমূহ প্রভাবিত করতে সক্ষম, তার এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছেন। শিখধর্ম দ্বারা শিখসমাজ প্রতিনিয়ত প্রভাবিত হয়ে, শিখকৃষ্টিকে সমাজে প্রতিফলিত করে থাকে। উপন্যাসপ্রাপ্ত তথ্য থেকে পাঠকেরা শিখসমাজ, শিখধর্ম ও শিখকৃষ্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হন যা তাদের এক কুসংস্কারহীন, জাতিভেদহীন মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হতে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। ঔপন্যাসিক গৌতম রায় তাঁর **'বিষকণ্ঠী সুলোচনা'** (২০০৭) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র মহাচার্য অঘোরানন্দের প্রসঙ্গে উপন্যাসের আর এক চরিত্র দিব্যানন্দ বলছেন –

"মহাচার্য অঘোরানন্দ প্রেমানন্দজির শিষ্য হলেও তিনি ব্যক্তিগত একটি আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্রচলিত কোন মতেই বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর আরাধ্য হচ্ছেন জগতের স্রষ্টা যিনি। তিনি পরমব্রহ্মে বিশ্বাসী ছিলেন। আদি অকৃত্রিম যে মহাশক্তি তিনিই হচ্ছেন পরমপদার্থ। সেই নিরাকার পরমপদার্থের সাধক ছিলেন মহাচার্য অঘোরানন্দ। তিনি বলতেন, মানুষের সেবাই হচ্ছে মানুষের একমাত্র ধর্ম। তাঁর মতে মানুষকে ভালবাসলেই ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায়।"

ঔপন্যাসিক গৌতম রায় তাঁর **'বিষকণ্ঠী সুলোচনা'** (২০০৭) উপন্যাসে, মহাচার্য অঘোরানন্দ মানুষের সেবাকেই মানুষের পরমধর্ম রূপে গণ্য করেছেন। তাঁর

মতে মানুষকে ভালবাসলেই ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয়। কারণ মানুষের হৃদয়েই নীতিজ্ঞান স্বরূপ ঈশ্বরের বাস। মানুষের হৃদয়ে প্রকৃত নৈতিকবোধের জাগরন হলে একজন মানুষ আর একজন মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পান না। তাই প্রতিটি মানুষের কাছে তখন প্রতিটি মানুষের একটাই পরিচয় প্রধান হয়ে ওঠে – যার নাম মনুষ্যত্বপূর্ণ মানুষ। আর এই মনুষ্যত্বপূর্ণ মানুষই ঈশ্বরের নামান্তর। প্রতিটি মানুষ যখন মনুষ্যত্বের তাগিদে মানুষের সেবার কাজে উদ্যোগী হয়ে ওঠে, তখন তা ঈশ্বর সেবারই নামান্তর হয়ে বিশ্বভাতৃত্বের পথকে সুগম করে। জন্ম হয় বিশ্বজনীন ধর্মের। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত **'জনগণ (দ্বিতীয় পর্ব)'** (২০০৫) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র করিম সাহেব উপন্যাসের আর এক চরিত্র মিহিরকে বলছেন –

"পড়বি। পড়লে মুক্তমনের অধিকারী হবি।....এবং সেই ঈশ্বর তুই নিজে। মানুষই ঈশ্বর। ঈশ্বর সৃষ্টির মূলেও মানুষ।....মনুষ্যত্বই ঈশ্বর।....নিজের উপর বিশ্বাস রাখবি। ভাববি তুই নিজেই ঈশ্বর। আমরা যে ঈশ্বরের আরাধনা করি, সে তো সব আমাদেরই অভিলাষ। ধর্ম সম্পর্কে স্বামীজির বিস্ময়কর সব মন্তব্য আছে। ঈশ্বরানুসারি সেই মন্তব্যের জরুরী কথাগুলিও মনে রাখবি – ধর্ম কখনও কোনও মানুষের শর্তাধীন বিষয় নয়। ধর্ম আর ঈশ্বর এক নয়। ধর্ম হলো মানুষের ধর্ম। কোনও অভিলাষ পূর্ণ হলে তবেই ধর্মচর্চা শুরু হবে বা অব্যাহত থাকবে এমনটি কখনও হতে পারে না। ধর্ম নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতোই স্বতঃসিদ্ধ নিত্য প্রবহমান।"

ঔপন্যাসিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত **'জনগণ (দ্বিতীয় পর্ব)'** (২০০৫) উপন্যাসে করিম সাহেব ধর্ম সম্পর্কে যে কথাগুলি মিহিরকে বলছেন, তাতে ধর্মের যে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায় তা থেকে বলা যেতে পারে যে, তিনিও বিবেকানন্দের মতই একই সুরে বলেছেন নিজের উপর বিশ্বাসই ঈশ্বরত্বের প্রকাশ। তিনিও আনুষ্ঠানিক ধর্মের থেকে মনুষ্যত্বের ধর্মকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম বলে মনে করেছেন। ধর্ম হলো মানুষের ধর্ম – এই কথার অর্থ বলা যেতে পারে, মানুষের অন্তঃস্থ মনুষ্যত্ব যখন প্রতিটি মানুষের সেবার ক্ষেত্রে জেগে ওঠে এবং প্রতিটি মানুষ যখন প্রতিটি মানুষের সঙ্গে প্রকৃত মনুষ্যত্বের তাগিদে, একে অন্যের সহায় বা অবলম্বন হয়ে ওঠে তখনই তাকে প্রকৃত 'মানবিক ধর্ম' নামে নামাঙ্কিত করা যেতে পারে। কারণ মনুষ্যত্বের ধর্ম মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো, প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হলে, ধর্মীয় মৌলবাদের অবসান হওয়া হয়তো সহজ হয়ে যেতে পারে, কারণ মানুষের জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্ম আর মানুষের মনুষ্যত্বরূপ ঐশ্বরিক ধর্ম দুটি পৃথক। কারণ জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্ম মানুষকে নিজে থেকে অর্জন করতে হয় না, কিন্তু মনুষ্যত্বরূপ ঐশ্বরিক ধর্ম মানুষকে

স্ব-হৃদয়ে নৈতিকতাকে আশ্রয় করে, প্রতিমুহূর্তে অনুশীলনের মাধ্যমে, অর্জন করতে হয়। হিন্দুদের বেদান্ত দর্শনে ব্যক্তিসত্ত্বার সঙ্গে বিশ্বসত্ত্বা এক ও অভিন্ন। কারণ প্রতিটি জীবের আত্মাই সেই পরম ব্রহ্মাত্মার অংশ বলেই স্বীকৃত। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এই অভিন্নতাবোধ যদি জাগ্রত হয়, তাহলে বলা যেতে পারে, মানুষের অন্তর্বাহিত বিরাজমান সেই পূর্ণশক্তির প্রতি মানুষের পূর্ণাস্থা বা ভরসা জ্ঞাপনই প্রকৃত মনুষ্যত্বের ধর্ম হয়ে উঠতে পারে। আর একেই 'মানবিকতার ধর্ম' রূপে পরিচিতি দেওয়া যেতে পারে।

ধর্ম ও নীতিবোধ একে অন্যের পরিপূরক বা সমার্থকও বলা যেতে পারে। ধর্মের সমর্থন না থাকলে নীতিবোধের ভিত্তি স্থায়ী হয় না। যদিও মানুষের নীতিবোধ সর্বদাই যুক্তিনির্ভর ও বিচার-সাপেক্ষ, কিন্তু ধর্ম, যুক্তির সীমা সাধারণত অতিক্রম করেই যায় একথা বলা যায়। কারণ ধর্ম ভক্তি ও বিশ্বাসের বস্তু বলা যেতে পারে এবং নীতি যুক্তির দ্বারা বিচার করা হয়। তাই সময়সাপেক্ষে নীতিবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অনেক সময়েই ধর্ম পরিবর্তিত হতে পারে। আবার সমাজের নৈতিক চাপেও ধর্মকে পরিশোধিত করা হতে পারে। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের হাত ধরেও সমাজের প্রয়োজনে ধর্ম পরিচালিত হতে পারে। আবার অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে কোনো কোনো মানুষ ধর্মবিশ্বাসী হয়েও নীতিহীনতার পরিচয় দিচ্ছেন। তবে সাধারণত এইরকম মানুষের সংখ্যা কমই হয় কারণ ধর্মজ্ঞান, নীতিজ্ঞানের স্রষ্টা বলা যেতে পারে। তাই ধর্মজ্ঞানের সঙ্গে নীতি সংযুক্ত হলে, ধর্মবোধ স্থিতিশীল হতে পারে, কারণ মানুষের রুচি পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মবোধের পরিবর্তন হয়না। প্রত্যেক মানুষ যদি নিজস্ব রুচি অনুযায়ী নৈতিক আদর্শ নিজেরাই ঠিক করে নিতো, তাহলে সেই আদর্শের কোন স্থায়িত্ব হত না এ কথা বলা যেতেই পারে। তাহলে হয়তো সময়ের সাথে, একসময়ে ধর্মের সঙ্গে, নীতিগত আইনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যেতে পারে। তখন গোটা সমাজেই একটা গভীর আত্মিক সংকটের সৃষ্টি হতে পারে, যা সমাজের নীতি সম্বলিত ধার্মিক কাঠামোর ক্ষেত্রে একেবারে অভিপ্রেত, বলা যেতে পারে না। কারন সমাজের মানুষের আত্মিক সংকট, সাম্প্রদায়িকতার আহ্বায়ক হয়ে উঠতে পারে। আর এ কথা বলা যেতেই পারে যে, সাম্প্রদায়িকতা ভাতৃত্ববোধের পরিপন্থী। তাই ধর্মের সঙ্গে সময়োপযোগী নীতিবোধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেই, সমাজের মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পক্ষে তা এক সদর্থক পদক্ষেপ হয়ে উঠতে পারে এ কথা বলা যেতে পারে।

তৃতীয় পর্ব (সময়কাল : ২০১১ - ২০১৭)

ইতিহাস

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতক থেকে একটা নতুন ধারার সংযুক্তিকরণ ঘটে, যার নাম দেওয়া যেতে পারে ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদী ধারা। প্রথম থেকেই এই ধারাটিই বজায় থাকা সত্বেও উপনিষদ প্রাপ্ত ব্রহ্ম তত্ত্বের ঈশ্বরবাদী ব্যাখ্যা এবং ভগবদ্গীতার সহায়তায় এই ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদী ধারা একটা বিশেষ মাত্রা অর্জন করে। একেশ্বরবাদী ভক্তি মার্গীরাই সময়ের সাথে সাথে ভাগবত নামে পরিচিতি পান। প্রথমে বেদের বিষ্ণুকে এবং শিবকে পরমেশ্বর রূপে কল্পনা করেই বৈষ্ণব এবং শৈব এই দুটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে শাক্ত, সৌর, গাণপত্য সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হয়েছিল। এই পাঁচটি একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের একসাথে অবস্থানকেই 'পঞ্চোপাসনা' নামকরণ করা হয়েছিল, যা বর্তমানের হিন্দু ধর্মের প্রায় সমার্থক বলা যেতে পারে। এই বিশেষ ধারাটিকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে পুরাণগুলির অবদান অনস্বীকার্য। এই সমস্ত একেশ্বরবাদী ধর্মের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রথমদিকে সাংখ্য দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সত্ত্বেও, পরবর্তীকালে বেদান্তের ঈশ্বরবাদী ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়ে, শেষ পর্যন্ত উপরোক্ত পঞ্চোপাসনার চালিকাশক্তি ভক্তিবাদই হয়ে উঠেছিল। ঔপন্যাসিক বাণী বসু লিখিত **'কৃষ্ণ'** (২০১৫) উপন্যাসে উপরোক্ত ইতিহাসের বর্ণনা অসাধারণভাবে তিনি নানান পুরাকালীন চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। যার প্রধান চরিত্র পরাশর একাধারে ঋষি এবং মুনি, এই দ্বৈতসত্তার অধিকারী। 'ঋষি' অর্থাৎ যিনি তাঁর সামনে প্রতিভাত হওয়া মন্ত্রকে রচনা করে থাকেন। আর 'মুনি'-র অর্থ যিনি সন্ন্যাসী না হওয়া সত্বেও, ধ্যান এবং বিদ্যার্জনে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে মনন বা জ্ঞানচর্চা করেন। মহর্ষি পরাশর মুনি, মহর্ষি বশিষ্ঠ মুনির শিষ্য ছিলেন। এই মহর্ষি পরাশর মুনিরই পুত্র হলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাস। যিনি পূর্বজদের শ্রুতিধার্য জ্ঞান সংকলনের কাজ শুরু করেছিলেন। ঔপন্যাসিক বাণী বসু লিখিত **'কৃষ্ণ'** (২০১৫) উপন্যাসে উপন্যাসস্থিত চরিত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাস তাঁর পিতা মহর্ষি পরাশর মুনিকে বলছেন –

"পিতা আমি ক'দিন ধরেই একটা কথা ভাবছি। এতদিন যা কান-থেকে-কানে বয়ে এসেছে, পূর্বজদের সেই শ্রুতিধার্য জ্ঞান আমি সংকলনের কাজ শুরু করেছি অনেক দিন ধরেই, একেকটি ধারা একেকজনকে দিয়ে করাই। এখন ভাবছি রীতিমত একটি কর্মকাণ্ড চাই এ জন্য। আর একজন নয়, বেশ কয়েকজন মিলে একেকটা কাজ করবে। পিতা, আমি

সর্বপ্রথম নিজের বশে আপনার বলা গল্পকাহিনী আর আলোচনার একটা লিপিবদ্ধ রূপ দিতে চাই। নাম দিচ্ছি 'বিষ্ণুপুরাণ'। 'বেদসংহিতা'-র কাজ পাশাপাশি চলবে, আমি সেটা পরিচালনা করব, 'বিষ্ণুপুরাণ'টি কিন্তু আমি করব নিজে-নিজে।

– বেশ তো! এ তো খুব ভালো কথা!

লাজুক গলায় কৃষ্ণ বলল – পিতা, আমার হাতে যদি গল্পকাহিনীগুলির কিছু হেরফের হয়ে যায়, তাতে কি খুব ক্ষতি হবে?

–আমি যেভাবে শুনে এসেছি সেইভাবেই তাদের বলেছি, এখন তুমি বলতে গেলে যদি অন্যরকম হয়, তা হলে তো সত্যের অপলাপ হবে, তাই না?

–তার মানে এসবই সত্য? কল্পনা নয়? ওই সমুদ্র মন্থন...বাসুকি নাগ হলেন রজ্জু, মন্দার পর্বত মন্থনদন্ড...এসব...

–শোনো কৃষ্ণ, এটাই আমাদের রীতি। সমুদ্র হলো সকল নিধির আকর। সুরাসুর, জগতে ক্রিয়মান দুই শক্তি। না হলে জগতের বিচিত্র সব সম্ভার এলো কোথা থেকে? কে আনল? এই সব জ্ঞানের অতীত পূর্বঘটনার কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা, আমরা বিচার করতে পারি না, মিথ্যা কিছুই নেই। কিন্তু কল্পনাশক্তি কোনও ঘটনাকে কিভাবে বিবৃত করেছে তার পুরো হদিশ আমরা পাই না। তাই কিছু অদলবদল ঘটানোটা উচিত নয়।"

ঔপন্যাসিক বাণী বসু লিখিত **'কৃষ্ণ'** (২০১৫) উপন্যাসে উপন্যাসস্থিত চরিত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাস ও তাঁর পিতা মহর্ষি পরাশর মুনির কথোপকথনে যে ইতিহাসের তথ্য উঠে আসছে তা হ'ল – কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, পূর্বজদের পদচিহ্ন ধরে, 'সূত' বা মাগধদের বর্ণিত কাহিনীকে অবলম্বন করে, বিভিন্ন রাজবংশের, ঋষিবংশের ইতিহাস ও প্রচলিত পুরাণকথা বিশ্লেষণ করে, বিভিন্ন মন্বন্তর বা মনুকালের নির্ভুল বর্ণনার ইতিহাসের অন্তঃস্থ সত্যকে উপেক্ষা না করে, বর্তমানে যাকে হিন্দুধর্মের ইতিহাস বলে অভিহিত করা হচ্ছে, তা লিখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এভাবেই তিনি লক্ষ্মীকে মানুষের সামনে সম্পদ বা বিত্ত হিসেবে শুধু নয়, লক্ষ্মীর মধ্যস্থ 'শ্রী'– কে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'ধন্বন্তরি' আরোগ্য হলেও তার এক হাতে ঔষধি ও আর এক হাতে থাকে বিষ। তিনি বিষকেও নিরাময়ের উপায় হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। বিশ্বময় যে বিপুল ওষধির আয়োজন রয়েছে, তার মধ্যে বিষ ও অমৃত দু'এরই পাশাপাশি সহবস্থান রয়েছে, তাদের চিনে নিতে পারেন শুধুমাত্র নিরাময়ের দূতরূপ মানুষেরা। এছাড়া 'গতিবেগ'-এর প্রতীক উচ্চৈঃশ্রবা এবং 'রাজকীয় চলন'-এর ঐরাবত এই দুটি বাহনের অন্তঃস্থশক্তিকে মানুষ যদি আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়, তাহলে মানুষ অনেক অসাধ্যসাধন করতে পারবে বলেই, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের বিশ্বাস ছিল। অপরূপ স্বর্গপুষ্প পারিজাত যা কখনো কোনদিনও শুকায় না বা গন্ধহীন হয়ে যায় না, এই পুষ্পের মত মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার গুণাবলীর কল্পনাকেও তিনি

সত্যে পর্যবসিত হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। অবতারগুলিকে তিনি যুগ অনুযায়ী সাজিয়েছেন। তাই সত্যযুগে একটিমাত্র অবতার মীনাবতার। মৎস্যরূপে যিনি জলোচ্ছ্বাসের মহাপ্লাবনের মহাপ্রলয় থেকে বিপন্ন মনুকে উদ্ধার করেছিলেন। তিনি ছিলেন জলের প্রাণী মীন। মহামীন। এরপরে ত্রেতাযুগে তিনটি অবতার – সবাই পশু। কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ। দ্বাপরযুগে অবতার হলেন পরশুরাম আর শ্রীরামচন্দ্র। এছাড়াও বামন, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি অবতারের উল্লেখ পাওয়া যায়। লক্ষণীয় যে, দশাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ নেই। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে সকল অবতারই ভগবানের অংশবিশেষ, কিন্তু শ্রীমৎভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভগবান। তাই দশাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নামের উল্লেখ নেই। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মনে করেন যে, মানুষের জীবন ঈশ্বরের জন্যই সমর্পিত। মানবাত্মা বিভিন্ন জন্মের মধ্যে দিয়েই আবর্তিত হয়ে মোক্ষাভিমুখী হয়ে চলেছে, অর্থাৎ মোক্ষলাভই জীবনের লক্ষ্য। তাই হিন্দুধর্মের সব শাস্ত্রই হ'ল মোক্ষমুখী। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদসংহিতাকে বিশ্লিষ্ট করেছিলেন বলেই তাকে বেদব্যাস বলা হয়। তিনি বেদকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন। ঋগ্, সাম, যজুঃ,অথর্ব। চিরাচরিত দৃষ্টিতে প্রাচীনতম পাঠ হলো ঋগ্বেদ। ঋকবেদের সম্পূরক হিসেবে সংযোজিত হয়েছে আরো তিনটে বেদ যাদের নাম সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ। সামবেদে দেবতাদের স্তুতিবাক্যকে সংগীতের মূর্ছনায় গাওয়া হয়। তাই বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসের একেবারে প্রথম রচনা হিসেবে সামবেদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর ঐতিহাসিক সত্যতার তেমন কোন তাৎপর্য নেই। যজুর্বেদের প্রথম অংশে শুধুমাত্র প্রার্থনামন্ত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। কৃষ্ণ যজুর্বেদে নানা আচার-অনুষ্ঠানের রীতিপদ্ধতির বর্ণনা গদ্যাকারে রচিত হয়েছে। এই পাঠগুলিকে 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত করা হয়েছে অর্থাৎ আক্ষরিকভাবে যার অর্থ হলো 'একজন ব্রাহ্মণের উচ্চারণ'। অথর্ববেদে যে বিপুল পরিমাণ জাদুমন্ত্র বা জাদুকরী সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তা থেকে বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন বৈদিকসাহিত্যের মধ্যেও এই জনপ্রিয় 'জাদু' ধারণাটির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ঋকবেদে 'জাতি' শব্দের পরিবর্তে 'বর্ণ' শব্দের প্রচলন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এভাবে ঔপন্যাসিক বাণী বসু লিখিত **'কৃষ্ণ'** (২০১৫) উপন্যাসে আলোচিত হিন্দুধর্মের প্রাচীন ইতিহাস, বর্তমান গবেষকের গবেষণার কার্যক্রমকে, ঐতিহাসিক তথ্য সরবরাহ করে অত্যন্ত সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উপরোক্ত উপন্যাসের ইতিহাসতথ্যের সূত্র ধরেই যেন শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মের

সারল্য প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের **‘প্রাণসখা বিবেকানন্দ (২)’** (২০১৬) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র বিদ্যুৎকে, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন –

“সকল বন্ধন অপেক্ষা মনের বন্ধন বড় দৃঢ়, বললেন বিবেকানন্দ। কেন দৃঢ়? বিবেকানন্দ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন, কারণ লোকের ভয় যমের ভয় অপেক্ষাও বেশি। সেই ভয় থেকে বেরোতে হবে। মন যেন অন্তত মুহূর্তের জন্যেও বুঝতে পারে, লোকের মতামতের থেকে অন্তর্যামী প্রভুর কথা শোনাই ভালো। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে বুঝতে পেরেও মন ভুলে যায় কেন? স্বামীজি উত্তর দিলেন, মন আবার মেঘে ঢাকে, এই তো মায়া।....তাহলে যথার্থ শাস্ত্র কাকে বলব? কোথায় পাব সঠিক আশ্রয়? স্বামীজি জানালেন গভীর প্রত্যয় থেকে, উপনিষদ ও গীতাই যথার্থ শাস্ত্র। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীর, এঁরাই যথার্থ অবতার। কারণ, এঁদের হৃদয় আকাশের ন্যায় অনন্ত, সংক্ষেপে বললেন স্বামীজি।”

‘প্রাণসখা বিবেকানন্দ (২)’ (২০১৬) উপন্যাসের প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বলা যেতে পারে যে, শম্ভুনাথজির বৈঠকখানায় স্বামীজীর কথা শোনার জন্যে, প্রত্যেকদিন নতুন নতুন মানুষের ভিড় হয়। সেখানে স্বামীজির বক্তৃতা মতে, ভারতবর্ষে নানা রকমের, নানা ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ও চরিত্রের মানুষ বর্তমান। তাদের মধ্যে কেউ শৈব, কেউ বৈষ্ণব, কেউ শাক্ত সম্প্রদায়ের হিন্দু। আবার মুসলমান শ্রোতাদের মধ্যেও কেউ শিয়া, কেউ সুন্নি। কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র। কেউ উচ্চবর্ণের, কেউ হীন। কিন্তু প্রকৃত ধর্মের একটি শব্দের উচ্চারণ সমস্ত বক্তৃতার যেন সারমর্ম হয়ে উঠেছিল। শব্দটি হ’ল – ‘সচ্চিদানন্দ’। বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করলেন শব্দটিকে। ‘সৎ’ অর্থাৎ অস্তিত্বের সত্য। অর্থাৎ অস্তিত্বকে সত্যের একটি মুখ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এরপরের শব্দটি হ’ল ‘চিৎ’। অর্থাৎ সত্যের আর এক মুখ চেতনার সত্য। এরপরে মানুষ যেখানে পৌঁছবে, তাকে শিখর হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। সেখানে শুধুই ‘আনন্দ’। তাহলে বিষয়টি হলো – যা অস্তিত্বের সত্য অর্থাৎ সৎ, তাই চেতনার সত্য অর্থাৎ চিৎ, আর এই দুই সত্য মিলিত হয়ে মানুষকে পৌঁছে দেয় প্রশান্তি স্বরূপ আনন্দে। এইজন্যেই ‘ব্রহ্ম’ – কে পরম সত্য হিসেবে সৎ-চিৎ-আনন্দ – ‘সচ্চিদানন্দ’ বলা যেতে পারে। ইনিই ব্রাহ্মণ, ইনিই সমগ্র, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সারাৎসার। সচিদানন্দ সর্বত্র বিরাজিত, কিন্তু তিনি বহু নন। তিনি সমস্ত কিছুর আত্মাস্বরূপ এক একক ও অদ্বৈতসত্তা। তিনি বিপুল ব্রহ্মান্ডের সর্বত্র শোভমান হয়ে সমস্ত কিছুকে একসূত্রে একটি মালার মতো গেঁথে রেখেছেন। স্বামীজি আরেকটি সংস্কৃত শব্দ ‘ভূমা’ – কে হিন্দু ধর্মের বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বলে বর্ণনা করেছিলেন। ‘ভূমা’ শব্দের অর্থ হ’ল – যার উপর সমস্ত কিছুর অবস্থান। সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ অদ্বৈতসত্তা ব্রহ্ম হলেন ভূমা। এই ব্রহ্মের ওপরই সমস্ত কিছুর অবস্থান। এই

ভূমা থেকেই সমস্ত কিছুর সৃষ্টি। আবার এই ভূমাতেই সমস্ত কিছুর প্রত্যাবর্তন। স্বামীজি ঈশ্বরপ্রচারকে জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কর্ম বলে মনে করেছেন। কারণ ঈশ্বরের প্রচার না করলে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরমুখীনতা আসবে না। মানুষের কাছে ঈশ্বরই যে একমাত্র সত্য বস্তু, এই বার্তাটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে যে অর্থ মেলে, সেটাই শাস্ত্রের ভেতরের কথা। ঈশ্বরের মুখের কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন – সবকিছুকেই সহজ করে ভাবতে হবে। তাহলেই সব সহজবোধ্য হবে। ব্রহ্মজ্ঞানী রাজা জনক, এক হাতে লাঙ্গল ধরেছেন আর অন্য হাতে ধরেছেন বেদ। অর্থাৎ বেদান্তকে কার্যে পরিণত করছেন। প্রকৃত বেদান্তবাদী হ'ল – যখন কোনো মানুষ নিজের মধ্যে সকলকে এবং সকলের মধ্যে নিজেকে সহজেই অনুভব করতে সক্ষম হবে, তখনই সেই মানুষ প্রকৃত বেদান্তকারী, ব্রহ্মজ্ঞানী। বেদান্তবাদীর জীবনে জ্ঞান, ভক্তি আর কর্ম – এই তিনটি স্রোত মিলেমিশে এক হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বেদান্ত ব্যাখ্যার কথা খুব সহজ করে বলেছিলেন – তিনি প্রভু, আমি তাঁর দাস। তিনি পূর্ণ, আমি তার অংশ। তিনিই আমি, আমিই তিনি। এ এক গভীর বার্তা। অথচ তার ভাষা অত্যন্ত সহজ। বেদ, উপনিষদ প্রসঙ্গেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধুমাত্র এই বার্তাই দিয়েছিলেন যে – উপনিষদ শুদ্ধ পথের প্রদর্শক। উপনিষদ যে পথ দেখায়, সেটাই পবিত্রপন্থা। বেদে অনেক আচার-ব্যবহার, অনেক রীতিনীতি। উপনিষদ বুঝতে অসুবিধা নেই। উপনিষদের সবচেয়ে বড় ঘোষণা – ব্রহ্ম সমগ্র জগতে ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে আছেন। তিনি সর্বব্যাপী, অদ্বিতীয়, অশরীরি, অপাপবিদ্ধ, বিশ্বের মহানকবি, শুদ্ধ, সর্বদর্শী। শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যকথন ছিল – কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। মানুষ যাকে নিরাকার বলে মানে, তিনি কালীরূপে সাকার হয়েছেন। কালী আদ্যাশক্তি। কালীকে বাদ দিলেই সৃষ্টি লোপ পাবে। আদ্যাশক্তিই সৃষ্টির মূলে। এই আদ্যাশক্তি যখন নিশ্চুপ, কোনোভাবেই ক্রিয়ারত নয়, তখন সে ব্রহ্ম। আর যখন এই আদ্যাশক্তি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করছে, তখন সে কালী। মানুষ যাঁকে ব্রহ্ম বলে জানে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকেই কালী বলছেন। ব্রহ্ম এবং কালী অভেদ। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে – শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ। একটা বাইরের অর্থ আর একটা ভেতরের অর্থ। অর্থাৎ শব্দার্থ আর মর্মার্থ। ভেতরের অর্থটুকু নিতে হবে, বাকিটা ছিবড়ে। কিন্তু সাধারণ মানুষ বাইরের অর্থটুকুই নেন। তাই এত তর্কের অবতারণা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে – পরোপকারই পরম ধর্ম। বাকি যাগযজ্ঞ সব পাগলামো। শুধু স্ব-মুক্তির চেষ্টা, যা অন্যায়। যে পরের জন্য সব দিয়েছে – সেই মুক্ত। মানুষের এই মুক্তি বা মোক্ষের লক্ষ্যেই জৈন ধর্মের অবতারণা। জৈন ধর্মের ইতিহাসে যক্ষ যক্ষিণীর উপস্থিতি তীব্রভাবে বর্তমান। তাই ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন

তাঁর **'দিদারগঞ্জের যক্ষী'** (২০১৫) উপন্যাসে পুরাতত্ত্ব-প্রত্নতত্ত্বের, যক্ষ-যক্ষিণীর বিষয়টির ইতিহাস তুলে ধরেছেন। **'দিদারগঞ্জের যক্ষী'** (২০১৫) উপন্যাসে উপন্যাসস্থিত চরিত্র অধ্যাপক দাশগুপ্ত, মিঃ শ্রীবাস্তবকে বলছেন –

"যক্ষ এবং যক্ষী,বুঝলেন মিঃ শ্রীবাস্তব,আমাদের সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে ব্যাপকভাবে পাবেন। বাল্মিকী রামায়ণে আছে,শুরুতে ব্রহ্মা প্রথমে জল সৃষ্টি করলেন। তারপরে অন্যান্য প্রাণী সৃষ্টি করে সেই জলে তাদের স্থান দিলেন। সেই প্রাণীদের মধ্য থেকে একদল তখন বলে উঠল, আমরা যক্ষ। আমরা তোমার পুজো করব। ব্রহ্মা বললেন, তথাস্তু, তাহলে তোমাদের নাম হোক যক্ষ। সংস্কৃত সাহিত্যে যক্ষকে ধরা হয় দেবযোনি বিশেষ। পালি সাহিত্যে তাদের রাক্ষস স্থানীয় মনে করা হলেও স্বাভাবিকভাবেই একটা পার্থক্য চোখেও পড়ে। তবে সংস্কৃত সাহিত্যে দশবিধ দেবযোনির মধ্যেই যক্ষদের স্থান।"

'দিদারগঞ্জের যক্ষী' (২০১৫) উপন্যাসে উপন্যাসপ্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে, পুরাতত্ত্ব-প্রত্নতত্ত্ব অনুযায়ী যা পাওয়া গেছে তা হল, যক্ষ অনার্য সংস্কৃতি থেকেই আর্য সংস্কৃতিতে এসেছে। বিস্ময়ের বিষয় হলেও একথা সত্য যে, ভাগবত, জৈন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতিতেই যক্ষ-যক্ষী প্রচুর পরিমাণে আছে। জৈন তীর্থঙ্করদের প্রত্যেকেরই একজন করে যক্ষী বর্তমান আছে। বাইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের যক্ষী হলেন পদ্মাবতী। জৈন যক্ষী পদ্মাবতীর মূর্তির সাথে হিন্দু ধর্মের মনসা দেবীর প্রচুর মিল আছে। হিন্দুধর্মের একটি তন্ত্রের বইতে মোট ছত্রিশজন যক্ষীর নাম আছে। যেমন – বিচিত্রা, বিভ্রমা, ভীষণী, মদনা, লক্ষ্মী, কপালিনী, কামেশ্বরী ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে অনেকেই দেবীত্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন। জৈন ধর্মের চব্বিশজন যক্ষীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁদের নামও আলাদা। গৌরী, কালী, মহাকালী, অম্বিকা, পদ্মাবতী, এইরকম অনেক যক্ষীই সর্বভারতীয় দেবীত্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তরভারতের যক্ষীদের সঙ্গে দক্ষিণভারতের যক্ষীদের একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। উত্তরভারতের যক্ষীরা সাধারণভাবে মানুষের প্রতি মঙ্গলময়ী, কল্যাণী, মূর্তিময়ী জননী রূপে পরিচিতা হন, কিন্তু দক্ষিণের যক্ষীরা তেমন নয়। তারা প্রায়ই নানাভাবে মানুষকে পথভ্রান্ত করে, ভুলিয়ে বিপথগামী করে হত্যা করে এবং বিভ্রান্ত মানুষের রক্ত পান পর্যন্ত করে থাকে বলেই লোকবিশ্বাসে প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষের লৌকিক ধর্মের ইতিহাসবোধের কল্পনাকে আশ্রয় করেই, সেই ধর্মীয় কাঠামোর সূত্র ধরেই, ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের **'মনের মানুষ'** (২০১৪) উপন্যাসে, উপন্যাসস্থিত চরিত্র লালন ফকিরের সাথে, উপন্যাসের আর এক চরিত্র কালুয়ার যে কথোপকথন প্রস্তুত হয়েছে, তার রেশ ধরেই লালন ফকিরের, অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক

জিজ্ঞাসা হয়ে উঠেছে – নারীজাতির সঠিক ধর্ম কি! এই প্রসঙ্গে লালন ফকির বলছেন–

“লালন বলল, চেহারা দেখলেই কি জাত ধর্ম বোঝা যায়? কালুয়া বলল, তা কিছু কিছু বোঝা যায় তো বটে। লালন বলল, এইটাই তো বুঝি না আমি। হিন্দুরা গলায় মালা দেয়। আর মোছলমানরা দেয় তছবি। ছুন্নত দিলে মোছলমান হয়, আর বামুনের গলায় থাকে পইতা। কিন্তু বামনিদের গলায় তো কিছু থাকে না আর মোছলমান মাইয়াদেরও ছুন্নত হয় না। তাইলে স্ত্রীলোকের কি জাতধর্ম নাই?”

‘মনের মানুষ’(২০১৪) উপন্যাসে লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লালন ফকিরের জীবনী ও প্রসঙ্গ অসাধারনভাবে তুলে ধরে বাউল সম্প্রদায়ের ধার্মিক প্রসঙ্গটিকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছেন, যা সমাজের মানুষের কাছে বা পাঠকের কাছে অসাম্প্রদায়িকতার এক জীবন্ত দলিল। কুষ্টিয়ারই কোনো এক গ্রামে লালনের জন্ম এক কায়স্থ পরিবারে হয়েছিল। শৈশবেই পিতৃহীন ও অল্প বয়সেই বিবাহিত। বিধবা মা ও স্ত্রীকে নিয়ে সামান্য অবস্থায় দিনাতিপাত করতেন। একসময় একটি দলের সঙ্গে জুটে গিয়ে লালন গঙ্গাস্নানের পূর্ণ অর্জন করার জন্য বহরমপুরে যান এবং ভয়ঙ্কর বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গীরা তাঁকে মৃত মনে করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে গ্রামে ফিরে তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে দেন। কিন্তু তখন লালনের মৃত্যু হয়নি। জীবন্মৃত অবস্থায় তাকে এক মুসলমান রমণী সেবা-শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলেন। এই মহীয়সী রমণীর নামের উল্লেখ কোথাও নেই। লালন বেশ কিছুদিন পরে বাড়ি ফিরে আসেন, কিন্তু গ্রামবাসীদের অভিমত অনুযায়ী, মুসলমানের গৃহে অন্নগ্রহণ করার ফলে লালন হিন্দু ধর্মচ্যুত হন। তাঁর মা এবং স্ত্রীও তাঁকে মুক্তমনে গ্রহণ করতে পারেননি, তখন ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে লালন ইহকালের মত গৃহত্যাগ করেন। লালন লেখাপড়া শেখেননি, অক্ষর জ্ঞান ছিল না, কিন্তু নিজের চেষ্টায় ও ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় ইসলাম, হিন্দু ও বৈষ্ণব শাস্ত্র সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি অনেকাংশে সুফিদের সঙ্গেও সহমত ছিলেন। তাঁর স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান রচনার বিস্ময়কর প্রতিভা ছিল। কিন্তু তিনি কোন বিশেষ ধর্মের রীতিনীতি পালনে আগ্রহী ছিলেন না। সব ধর্মের বন্ধন ছিন্ন করে মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। জীবনে এইজন্য তিনি গোঁড়া হিন্দু এবং শরিয়তপন্থী মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই চক্ষুশূল হয়েছিলেন। কিন্তু সমাজের নিম্নশ্রেণীর এবং নিপীড়িত অনেক মানুষই লালনের অনুগামী হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের কোন বিভেদ ছিলনা। আত্মানুসন্ধান এবং মনের মানুষকে খোঁজা এবং ঈশ্বর বা আল্লার সঙ্গে ভয়-ভক্তির বদলে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপনের ধারা আমাদের সাহিত্যে ও দর্শনে অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। লালন তারই

একজন সার্থক উত্তরসূরি। তাঁর গানেই তাঁর জীবনদর্শন প্রতিফলিত। ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত **'মনের মানুষ'** (২০১৪) উপন্যাস থেকে বাউল সম্প্রদায় এবং বাউলগীতি সম্পর্কে যে তথ্যগুলি পাওয়া যায়, তা থেকে পাঠকসমাজ বাউলগীতি বা বাউলগান সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বাউল সংস্কৃতি সম্পর্কে নানা বিষয়ে জ্ঞাত হতে পারা যায়। লালন ফকিরের জীবন এবং গান অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ও গ্রহণযোগ্য। তাঁর গানের কথা, ধর্মের অনেক গূঢ় রহস্যকে, শ্রোতার কাছে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাবে তুলে ধরতে সক্ষম। গানের কথায় তিনি মানবাত্মাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বাউল লালন ফকির অনেক অসাধারণ জীবনসত্যকে দ্ব্যর্থকভাবে, শ্রোতার সামনে সুরের মূর্ছনায় তুলে ধরে জীবনরহস্যকে অসাধারণ সারল্যের মোড়কে মুড়ে মানুষকে উপহার দিয়েছেন। কথিত আছে যে তিনি প্রায় এক হাজার গান রচনা করে, নানান জীবন সত্যকে সমাজের মানুষের মধ্যে মুখে মুখে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি কিছুটা রামপ্রসাদী গানের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব এবং বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম ধর্ম সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। যা তাঁর এই বাউলগানে জীবনের নীতিবোধ ও মূল্যবোধের কথা ও সুর, সমাজের সংস্কৃতিতে বা কৃষ্টিতে এক অভিনব পালকের সংযোজন করেছে এবং সমাজকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছে। গানের মাধ্যমে সমাজস্থিত মানুষকে, জীবনবোধের ক্ষেত্রে, প্রেমকে প্রাধান্য দিয়ে, মানুষের নীতিবোধ ও মূল্যবোধকে জাগরিত করেছেন যা সমাজের কাছে এক সদর্থক পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

রাজনৈতিক দিক

সংস্কৃতির বিকাশের সাথে সাথেই মানুষের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ হয়। ভারতবর্ষ বহু ধর্মের মানুষের বাসভূমি। কাজেই সহিষ্ণুতা এখানে অভিপ্রেত বিষয় হিসেবে মান্যতা পেতেই পারে। মানুষে-মানুষে বৈষম্যতা ভারতবর্ষের শান্তির আবহাওয়াকে বিনষ্ট করতে পারে। তাই বৈষম্যতা সকল মানুষের ক্ষেত্রেই সর্বদা বর্জনীয়, এ কথা বলা যেতে পারে। স্বয়ং পরমেশ্বরও যখন সমস্ত বিশ্বকে আলোকধারায় স্নান করান বা বারিবর্ষণে জগতকে সিক্ত করেন, তখন তিনিও সততা ও ন্যায়বিচারের সাথেই কোন ভেদভাব না করেই, সকল মানুষ এবং সকল স্থানের জন্যই একইরকমভাবে তা করে থাকেন। ভারতবর্ষে সর্ব ধর্মের সহাবস্থান থাকার কারণে ও সর্বধর্মকে সমান মান্যতা দেওয়ার কারনে, এক এমন মৈত্রীর বাতাবরণকে তৈরি করতে হতে পারে, যা রাজনীতির ক্ষেত্রেও এক সর্বাঙ্গীণ বিকাশের বার্তা বহন করে আনতে পারবে। তাই ঐক্যবিরোধী কোনো মনোভাবকে প্রাধান্য দিলে তা

ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অকল্যাণকর পদক্ষেপ হতে পারে, বলে মনে করা যেতে পারে। ভারতীয় সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা বোধহয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকা একটি ধারণা, যাকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ফেলা, সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রাধান্য দেওয়ার সামিল বলা যেতে পারে। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে একটা সুষম ও সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা ও রক্ষা করার ক্ষেত্রে, মানুষেরই তৈরি করা কিছু নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত আইনকে প্রাধান্য দেওয়া বোঝায়, যা কখনোই কোন ঐশ্বরিক প্রভাবে প্রভাবিত বা ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের দ্বারা পরিচালিত, এ কথা বোধহয় বলা যেতে পারে না। কারণ যুক্তি ও সংবেদনশীলতার উপর ভিত্তি করে, সহনশীলতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের ভাবনার ওপরে ভরসা করেই, সামাজিক মূল্যবোধের কর্তৃত্বকে হাতিয়ার করে, এই নৈতিকতার ধারণাগুলি কোন একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়, জাত অথবা শ্রেণীর জন্য নয়, সমগ্র সমাজের মানুষের, সামগ্রিক কল্যাণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে বলা যেতে পারে। তাই জাত-ধর্ম নির্বিশেষে, সকলের ক্ষেত্রেই এই আইনের নিজস্ব সদর্থক ও সমভাবনার ক্ষমতা আছে। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক ডঃ দীপক চন্দ্র তার **‘ঘটোৎকচের প্রার্থনা’** (২০১১) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র বর্ব্বরীক তার পিতা ঘটোৎকচকে বলছেন –

“পিতা নীতিসূত্র ছিন্ন হলে বিবেক মনুষত্ব ছিন্ন হয়ে যায়। নীতির দুটো দিক আছে। একটা আদর্শবাদী আর একটা ব্যবহারিক। তাই নীতি নির্বাচনের পথ সর্বদা এক হয় না। আদর্শবাদ আঁকড়ে থাকার জন্য একজন মানুষকে অনেক দাম দিতে হল।....আর ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্র অসুবিধের রহস্যময় খেলায় যখন যেমন তখন তেমন নীতি নির্ধারণ করে। আদর্শ, সততা কিংবা ধর্মের ধার ধারে না।”

মানুষের জীবনে নীতির প্রয়োজনীতার প্রসঙ্গে **‘ঘটোৎকচের প্রার্থনা’** (২০১১) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র বর্ব্বরীক তাঁর পিতা ঘটোৎকচকে যা বলছেন, তার রাজনৈতিক মূল্যায়ন অত্যন্ত গভীর বলা যেতে পারে। উপন্যাসপ্রাপ্ত এই তথ্যাদি বর্তমান গবেষণার অগ্রগতির কাজে অত্যন্ত সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে তা বলা যেতে পারে। বর্ব্বরীক তাঁর পিতা ঘটোৎকচকে বলছেন – নীতির দুটো দিক আছে। (১) আদর্শবাদী নীতি, (২) ব্যবহারিক নীতি। তাই নির্বাচনের পথ সব সময় সমান হয় না। একজন মানুষ যদি আদর্শবাদকেই জীবনের প্রধান বলে মনে করেন, তাহলে সেই মানুষকে তার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়। কারণ তাঁর কাছে সবার ঊর্ধ্বে নীতি ও আদর্শ। এঁরা সততা, ধর্ম ও আদর্শের জন্য কোন কিছুর সাথে আপোষ করেন না। এঁদের মধ্যে মিথ্যাচার কখনোই থাকে না। রাজা হরিশচন্দ্র এই আদর্শবাদী নীতির

উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যিনি আদর্শের জন্য, সত্যরক্ষার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। আর ব্যবহারিক নীতি হ'ল – স্বার্থ ও সুবিধামতো এক রহস্যময় কার্যকলাপ যা 'যখন যেমন, তখন তেমন' – নীতি মেনে চলে। যা আদর্শ, সততা, কিংবা ধর্মের ধার ধারে না। এই নীতির মানুষদের মন ও মুখ এক হয়না। যত আনুগত্যের কথাই এরা মুখে বলুক না কেন, তা প্রকৃতপক্ষে লোকদেখানো মিথ্যাচারই হয়। এরা অনৈতিক কাজ, অসততার কর্ম, ধর্মের ভেক ধরে করে থাকে। ধর্মের রাজনীতি করে, নীতিভঙ্গের খেলাই এদের প্রিয় হয়। আদর্শবাদী বিষয়টিকে নিজের জীবন থেকে একেবারে বাদ দিয়ে, এরা নিজের সঙ্গে ও সবার সঙ্গেই আদর্শবাদী সেজে থাকাকেই বেশি পছন্দ করে। ঘটোৎকচপুত্র বর্ব্বরীক আরো বলেছেন – ব্যবহারিক নীতির মানুষেরা মানুষ হয়ে জন্মে, মানুষের যা কর্তব্য যেমন – অন্যায়ের প্রতিবাদ, ন্যায়ের সমর্থন, ধর্মের প্রতিষ্ঠা কখনোই করে না। এরা নিজের অজান্তেই মনুষ্যত্বহীন, বিবেকহীন মানুষ নামেই পরিচিত হন, সমগ্র মানব সমাজের কাছে । মানুষের মনুষত্বই সমাজে, সংসারে, জীবনে মূল অশান্তির কারণ। মনুষ্যত্বহীন মানুষের কোনো মানসিক অশান্তি থাকেনা। তাই মনুষ্যত্বকে বারবার আত্মদীনতার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। প্রকৃত মানুষের অন্তঃমনুষ্যত্বই মানুষকে সাবধান বাণী শোনাতে থাকে অহরহ। আদর্শবাদী নীতি মানুষকে সত্যে ও ধর্মে সুন্দর হতে উপদেশ দেয়। মানুষকে বিশ্বাস করে, অসত্যকে ত্যাগ করে, পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলতে পারে একমাত্র মানুষই। নীতিহীনতা মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ এবং ঘৃণার সৃষ্টি করতে পারে, যা কখনোই কোন মানুষেরই সর্বাঙ্গীণ কল্যানসাধন করতে পারেনা, একথা যে সর্বৈব সত্য তা বলা যেতেই পারে। এই নীতিহীনতার প্রসঙ্গের ভাবনা থেকেই ঔপন্যাসিক গৌরকিশোর ঘোষ লিখিত **'প্রতিবেশী'** (২০১৫) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র শামিম তার বাবাকে বলছেন–

"আজ হিন্দু আর মুসলমানকে আপন ভাবে না, মুসলমানও ঠিক করে ফেলেছে যে, হিন্দুই তার শত্রু। এই কারণেই আজ এত বিদ্বেষ এত ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে। আমি জানতে চাই, ঘৃণা যে সন্তানের জন্ম দেয়, সে কি কারও কোনও কল্যান করতে পারে?।....বাবা বললেন, 'না, ঘৃণাই যে সন্তানের জনক সে কারও মঙ্গল করতে পারেনা শামিম। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই বিদ্বেষ উভয়েরই ক্ষতির কারণ হবে।"

'প্রতিবেশী' (২০১৫) উপন্যাসপ্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বলা যেতে পারে যে, হিন্দু মুসলমান আর পরস্পর পরস্পরকে বোধহয় আপন ভাবে না। সাম্প্রদায়িকতার এই নীতিহীনতায় উভয় পক্ষই উভয়পক্ষকে নিজেদের শত্রু রূপেই গন্য করে, এই

কারণেই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এত বিদ্বেষ, এত ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে। আর সাম্প্রদায়িকতার এই নীতিহীনতার ঘৃণা যে সন্তানের জন্ম দেয়, সেই সন্তান কখনো কারোর কল্যাণ করতে পারে না। যা ভারতবর্ষের মত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক ভয়াবহতার সৃষ্টি করতে পারে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ উভয়েরই ক্ষতির কারণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১১ সালেই বলেছিলেন – "এখন জগৎ জুড়িয়া এ সমস্যা নহে যে কি করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইবো কিন্তু কি করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন হইবে সে কাজটা কঠিন কারণ, সেখানে কোন প্রকার ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়।" ভারতবর্ষে মুসলমান স্বতন্ত্র থেকেও যে নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করছে তা ভারতবাসীর পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং অসুবিধাজনক হোক, একদিন হিন্দু-মুসলিমের যথার্থ মিলনসাধনের এটাই প্রকৃত উপায় হতে পারে। হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের তীব্রতা ভারতবর্ষে রাজনীতির কারণে সৃষ্টি হয়েছে – এ তথ্য সঠিক নয়। ব্রিটিশ, হিন্দু-মুসলমানের মনে বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছে শুধুমাত্র এই কথাটাও সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা বিরোধ ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছে। ভারতে মুসলমান আসবার পর থেকেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ সম্পর্কে ভারতবাসীরা প্রথম থেকেই সচেতন ছিল। ঔপন্যাসিক গৌরকিশোর ঘোষ লিখিত **'প্রতিবেশী'** (২০১৫) উপন্যাসে, এগারো শতকের পলিটিশিয়ান বা রাজনীতিজ্ঞ অল্ বিরুনীর বিবরণপ্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, হিন্দুরা সর্বাংশে মুসলমানদের চাইতে পৃথক। অতএব এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে হিন্দু-মুসলিম ভেদ সম্পর্কে ভারতবাসী সচেতন ছিলনা এবং সেই ট্রাডিশন এখনো পর্যন্ত সমানে চলেছে। একদিকে ধর্মের গোঁড়ামি আরেকদিকে আচার-বিচারের গোঁড়ামি, হিন্দু-মুসলমানকে আলাদা করে রেখেছে। ঠিক তেমনি প্রকাশ্য স্থানে গো-কোরবানি করলে হিন্দুরা, ধর্ম নষ্ট হচ্ছে বলে মনে করে, তাই প্রকাশ্য স্থানে গরু জবাই করাই যেন মুসলমানের পরম ধর্ম। মুসলমানেরা পৌত্তলিকতা মানেনা বলে দাবি করে, কিন্তু তারা মসজিদ মানে। ঔপন্যাসিক গৌরকিশোর ঘোষ লিখিত **'প্রতিবেশী'** (২০১৫) উপন্যাসের তথ্যানুযায়ী, মহাজ্ঞানী এব্নে রোশ্দ্ বলেছেন, অধিকাংশ ধর্মই পৌত্তলিকতার নামান্তর মাত্র। অসীমকে সসীম করে দেখা মানেই, তাঁকে রূপ দেওয়া। তাঁকে কোন আধারে ধরতে যাওয়া মানেই, তাকে রূপ দেওয়া। মসজিদের চৌহদ্দির মধ্যে আল্লাকে ভরতে যাওয়ার নামই তাকে সীমার মধ্যে এনে ফেলা। তাঁর মহিমাকে খর্ব করা। এব্নে রোশ্দ্ বলেছেন – "ধর্মের সত্য আমার মাথার মানিক কিন্তু কোনো বিশেষ রূপ আমি স্বীকার করতে পারিনে। মানুষ মন্দির ভেঙে

গির্জা গড়ছে, গির্জা ভেঙে মসজিদ গড়ছে, খোদার সান্নিধ্য পাবার আশায়”। সেই খোদার সান্নিধ্যের জন্য এত গণ্ডির প্রাচীর দাঁড় করাবার কোন প্রয়োজন নেই। ধর্মের এই রাজনীতি দেশের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপনে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলার মুসলমানের কাছে ইমান যদি সত্যই বোধগম্য হোতো, তবে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার নামে মুসলমানেরা এত দাঙ্গা-ফ্যাসাদে যেত না, কারণ তারা তবে বুঝতে পারত যে আল্লা একমাত্র পবিত্র, মসজিদ নয়। এই ভেদ রক্ষা করে যে মিলন তারই বাস্তব পন্থা ছিল – দেশবন্ধুর বেঙ্গল প্যাক্ট। দেশবন্ধুই প্রথম সাহস করে মুসলমানদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দেশবন্ধুর এই সদর্থক রাজনীতি বোধহয় তেমন করে অসাম্প্রদায়িকতাকে তুলে ধরতে সক্ষম হতে পারেনি বলা যেতে পারে।

স্বর্গীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর ভূস্বর্গ কাশ্মীর। তার সৌন্দর্যে আপামর বিশ্ববাসী মোহিত এবং উচ্ছ্বসিত। কিন্তু এই সৌন্দর্যের পেছনে কাশ্মীরের যে কত ক্ষত, বেদনা, হতাশা ও সর্বোপরি যে অসহায়তার গল্প উঠে এসেছে, তাতে কাশ্মীরের সৌন্দর্য প্রাধান্য পায়নি, প্রাধান্য পেয়েছে মানুষের এক অসহায় বিপন্নতা। ঔপন্যাসিক সায়ন্তনী পূততুন্ড **‘শিশমহল’** (২০১৬) উপন্যাসে কাশ্মীরের যে রাজনৈতিক ইতিহাস তুলে ধরেছেন, তাতে একেবারে পুরাণ কাহিনী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত, কাশ্মীরের সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবরণ উঠে এসেছে। উপন্যাসের চরিত্র স্বরাজকে উপন্যাসের আর এক চরিত্র লালা তার চোখ পাকিয়ে যে তথাকথিত ‘কৌম’- এর দোহাই দিচ্ছে সে ব্যাপারে স্বরাজ এর মত হ’ল –

“সত্যি বলতে কী, তেমন কোনও নির্দিষ্ট ‘কৌম’ ছিল না কাশ্মীরে! নির্দিষ্ট কোনও ধর্ম ছিল না। একদম প্রাথমিক ঘটনাবলি সম্পর্কে ইতিহাস অবশ্য নীরব, কিন্তু পুরানে কিছু উল্লেখ আছে।....আবার সেই কৌম! আবার সেই উগ্র জাতীয়তাবাদ!....সে জন্যই কি ষোল থেকে বাইশ বছরের সদ্য তরুণরা ভালবাসতে শেখার আগেই ঘৃণা করতে শিখে গিয়েছে?....গোয়ার্তুমি অন্ধবিশ্বাসের নিরিখে জরিপ করে সবকিছু। যুক্তি, বুদ্ধি, তার সামনে অসহায়! ‘কৌম’ সেখানে একটা খোঁড়া অজুহাত ছাড়া আর কিছুই না! এমনকী তার দলের ‘জিহাদি’ তরুণদের মুখেও ‘মজবুরি’ ছাড়া কিছু খুঁজে পাইনি স্বরাজ।....তখনো শৈব, বৌদ্ধ ধর্মের কোনটাই কাশ্মীরের মাটিতে জমিয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসতে পারেনি তার আগেই একজন পবিত্র মানুষের পা চুপিচুপি স্পর্শ করেছিল কাশ্মীরকে....কাশ্মীরেরই কোন এক প্রত্যন্ত প্রদেশে বরফে ঢাকা এক প্রাচীন গুপ্ত গুহা। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক অদ্ভুত শান্ত অথচ দীপ্তময় পুরুষ! চেহারাটা চেনা-চেনা। অথচ চিনতে পারছে না। “ইনি কে?” প্রফেসর স্মিত হাসেন, “জেসাস ক্রাইস্ট। সাহেবদের ভগবান। চিনিস? নাম শুনেছিস?” স্বরাজের

ছোট্ট দেহে খেলে যায় বিদ্যুতের শিহরণ....সেই জেসাস ক্রাইস্ট, তথা গুরু ইশাও এসেছিলেন কাশ্মীরে! ”

ঔপন্যাসিক সায়ন্তনী পূততুন্ডের **‘শিশমহল’** (২০১৬) উপন্যাস অনুসারে কাশ্মীরে কোন নির্দিষ্ট ধর্ম ছিল না। সময়টা ২৪৪৮ খ্রিস্টপূর্ব। সেই সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস তুলে ধরা ‘রাজতরঙ্গিনী’ – তে বলা হয়েছে, প্রথমদিকে কাশ্মীরের অধিপতি ছিলেন অনার্য এক রাজা। প্রথম গোনন্দ। গোনন্দ মহাভারতখ্যাত জরাসন্ধের বংশধর ছিলেন। পরবর্তীকালে গোনন্দের ছেলে প্রথম দামোদর, কৃষ্ণের হাতে পরাজিত হওয়ায় কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করে নেন পান্ডুবংশ। মহাভারতের পঞ্চপান্ডবের বংশধররাই কাশ্মীরাধিপতি হয়েছিলেন। অনার্য শাসককে সরিয়ে আর্য শাসন প্রথম পদক্ষেপ রাখল ভূস্বর্গে। আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলন হল। শুরু হ’ল হিন্দু ধর্মের সাম্রাজ্য। কিন্তু প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হল। হিন্দু ধর্মের একচ্ছত্র প্রভাব ব্যাহত হ’ল বৌদ্ধ ধর্মের হস্তক্ষেপে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হওয়ার ফলে, সন ২৬৮ খ্রিস্টপূর্বে কাশ্মীরের রাজদণ্ড চলে গেল সম্রাট অশোকের হাতে। ভগবান বুদ্ধের অমৃতবাণী শুনতে পেল কাশ্মীর। গড়ে উঠলো বহু ‘বিহার’ এবং ‘স্তুপ’। অশোকের সন্তান জালুক আবার ভয়ঙ্কর শৈব ছিলেন। ফলস্বরূপ যে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হ’ল, তাতে করুণাঘন তথাগতের প্রভাবকে অকরুণভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করল শৈবশক্তি। প্রচন্ড উগ্র শৈবধর্ম কাশ্মীরকে গ্রাস করতেই চলেছিল, কিন্তু আবার কুষাণ বংশের হাত ধরে, নম্র অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে প্রবেশ করলো বৌদ্ধধর্ম। সম্রাট কনিষ্ক ফিরিয়ে আনলেন বৌদ্ধধর্মকে। তাঁর আমলেই বৌদ্ধধর্ম দারুন বিস্তৃতি লাভ করল। এরপর কাশ্মীরের জমিতে অদ্ভুতভাবে বৌদ্ধধর্ম আর শৈবধর্ম যেন এক লুকোচুরির রাজনৈতিক খেলা শুরু করেছিল। রাজা ও রাজবংশের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় ধর্মমতও। কখনও শৈব ধর্মাবলম্বীরা বৌদ্ধধর্মকে তাড়াতে বদ্ধপরিকর, আবার কখনও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা শৈবধর্মকে অগ্রাহ্য করে, গৌতমবুদ্ধের পতাকাকে তুলে ধরে সম্মানের আকাশে। কখনও উগ্রচন্ড শৈবধর্ম ত্রিশূল হাতে কাশ্মীরের সিংহাসনে কায়েম হয়, আবার কখনও বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা, কুংফুর প্যাঁচে ধরাশায়ী করে শৈব ধর্মাবলম্বীদের। এই বিষম রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে কাশ্মীরকে রক্ষা করলেন রাজা ললিতাদিত্য। এর কিছুদিন পরেই ৭২৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা ললিতাদিত্য মুক্তিপদ কাশ্মীরের সিংহাসনে বসলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শৈব ও বৌদ্ধ ধর্ম এবার হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি চলতে শুরু করলো। এই প্রথম ধর্মের ইতিহাসে ধর্ম কোনরকম বিরোধিতা না করেই সুখী সহাবস্থানে গোটা কাশ্মীরে বিরাজ করেছিল। ‘কারকোটা’ বা ‘কর্কটা’ রাজবংশের রাজত্ব চলাকালীনই পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ

কাশ্মীরে এসেছিলেন। বর্তমানে কাশ্মীরবাসী বেশিরভাগ মানুষই এখনও ইসলাম ধর্ম বলতে সুফিধর্মই বোঝে। যা সমাজের রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে এক বিশেষ প্রভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম বলা যেতে পারে। আর সুফিধর্মের নিয়মানুযায়ী ঈশ্বরই আসলে প্রিয়তম। ঈশ্বরের সঙ্গে তাই ভক্তের মাশুক-আশিক সম্পর্ক। সুফিধর্ম, বাউলধর্মের মতোই। এই ধর্মেও কোন জাতের ভেদাভেদ নেই। এরাও সুফিগানের মাধ্যমে আল্লার প্রতি তাদের প্রেমাকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। এরা সাদা রংয়ের আলখাল্লায় শরীর মাথা আবৃত করে রাখে, যা চরম পবিত্রতার বস্ত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়। সুফিবাদের মাধ্যমে সমাজে বসবাসকারী মানুষেরা সম্প্রদায়মুক্ত ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত এক সমাজ উপহার দিতে সক্ষম হয়। যেখানে ঈশ্বর বা আল্লা, মানুষের প্রেম, সুফিগানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে পবিত্রতা, উদারতা ও আত্মিক ভাতৃত্বের বীজ বপন করে। ফলে সমাজে মনুষ্যত্বের বিকাশে এই ধর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ধর্ম সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে ও সকল ধর্মের প্রতি উদার হওয়ার বার্তা দিয়ে, সমাজকে এক সুস্থ রাজনৈতিক পথে পরিচালিত হতে সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করে। এইভাবে সমাজের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুফিধর্মের সহজ সুন্দর মনুষ্যত্ববোধ বা মানবিকতাবোধ, নৈতিকতাবোধ এবং মূল্যবোধের দিকটি সঠিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে কতটা সহায়ক তার সদর্থক দিকটি তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক সায়ন্তনী পূততুন্ড। ধর্মের মূল কথা মানুষের সেবা করা। মানুষের মঙ্গলের জন্যই যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরপুত্র হওয়া সত্ত্বেও, হাসিমুখে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মানুষের মঙ্গলের জন্যই বা মানুষের হিতার্থে, দেহের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও তিনি দান করে গিয়েছেন। উপন্যাসের তথ্য অনুযায়ী তেমন কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে জেসাস ক্রাইস্ট কাশ্মীরে এসেছিলেন। অনেকেই বলে থাকেন যে, জেসাস ক্রাইস্টও কাশ্মীরে এসেছিলেন। ধর্মের উদারতার দিকে দৃষ্টিপাত আকর্ষণ করে, ঔপন্যাসিক সায়ন্তনী পুততুন্ড এই বার্তা দিতে চেয়েছেন তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে যে, ধর্ম অপেক্ষা বিজ্ঞানকে আরো একটু বেশি গুরুত্ব দিলে সমাজের মানুষ হয়তো অনেক বেশি উপকৃত হতে পারত বলা যেতে পারে। ঔপন্যাসিক সায়ন্তনী পূততুন্ড তাঁর **'একদিনের ঈশ্বর'** (২০১৬) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র রবিনসন উপন্যাসের আর এক চরিত্র বন্ধু সৌম্যদীপকে বলছেন –

" "খুদা, ভগবান আর গডের সঙ্গে এ ঝগড়া মিটবে না বুঝলি?" বড় মায়ায় আবিষ্কৃত যন্ত্রের উপর হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন রবিনসন। তার চোখে অকৃত্রিম অপত্য স্নেহ, "এদিকে আমার মতো কতশত মানুষ একটা ল্যাবরেটরির অভাবে মরছে। ওদিকে নতুন ল্যাবের বদলে গুচ্ছ-গুচ্ছ মন্দির, মসজিদ, গির্জা গড়ে উঠছে। সেদিন মনে মনে হিসাব

করছিলাম, এ দেশে যে ক'টা মন্দির, মসজিদ, গির্জা আছে, সেগুলোর বদলে ওই টাকায় কতগুলো ল্যাবরেটরি তৈরি হতে পারে। মাত্র পনেরো মিনিট অঙ্ক করেছিলাম। তাতেই দেখি, না হওয়ার ল্যাবরেটরির সংখ্যা লক্ষ ছাড়িয়ে কোটির দিকে চলেছে," তিনি হতাশায় মাথা ঝাঁকালেন, "অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়েছি।" সৌম্য সজোরে হেসে উঠলেন।....ড. রবিনসন একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, "এটা হাসির ব্যাপার নয় সৌম্য। যে লোকটা নেই, তার পঞ্চাশরকমের প্রক্রিয়ায় নানাভাবে পুজো হচ্ছে। লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি টাকা ছড়ানো হচ্ছে তার পায়ে। অথচ যা সত্যি আছে, তার দিকে কোনও খেয়ালই নেই!" "তুই নাস্তিক বলে সকলকে নাস্তিক হতে হবে এমন কোনও কথা আছে?" সৌম্য বললেন, "এই আমাকে দ্যাখ না। রোজ সূর্যোদয়ের সময় ফিল করি, কেউ আছে। যখন আকাশের দিকে তাকাই, যখন মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যাই, তখন অনুভব করি, কেউ আছে। কেউ আছে যে একা টগবগে ফুটন্ত গোলাকে পিটিয়ে সব নিখুঁত ভাবে তৈরি করেছে। আমি প্রতিটা দিনের জন্যই তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।" "

'একদিনের ঈশ্বর' (২০১৬) উপন্যাসে দুই বন্ধুর কথোপকথনে যে তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যাচ্ছে তা হ'ল, ক্ষমতাশালী মানুষেরা সর্বদাই নিজেদের আখের গোছায়। নিজের স্বার্থ, নিজের সুবিধা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। রাজনীতিকজ্ঞদের বদলে, কোন বিজ্ঞানীর হাতে দেশটা পরলে, হয়তো তাহলে আর কোন অসুবিধা হতো না। কারণ বিজ্ঞানীরা, বিজ্ঞানের উন্নতির দিকেই বেশি মনোযোগী হতেন। তাহলে দেশের প্রগতিশীল উন্নতির কাজে, দেশের অর্থ নিয়োগ করা সহজ হতো। কিন্তু বর্তমানে তার বদলে জনগণ মন্দির, মসজিদ, গীর্জা এগুলো তৈরি করাতে অর্থ প্রয়োগ করছে, অর্থাৎ জনগণের অর্থ শুধুমাত্র ধর্মে নয়, সামগ্রিক জনগণের উন্নতির ক্ষেত্রে তেমনভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। ভারতবর্ষে মন্দির, মসজিদ, গীর্জা একসাথে যতগুলো আছে, সেগুলোর একীভূত টাকায়, লক্ষাধিক বিজ্ঞানের কর্মশালা তৈরি হতে পারত। মানুষ প্রত্যহ যখন সূর্যোদয় অবলোকন করে, উদার আকাশের দিকে তাকিয়ে, দিগন্তবিস্তৃত মাঠের উপর দিয়ে যখন হেঁটে যায়, তখন অবশ্যই সে অনুভব করে, কেউ একজন আছে, যে সমস্ত প্রকৃতিকে নিখুঁতভাবে তৈরি করেছেন। তখনই সেই মানুষের কাছে এই মহান, বৃহৎ দেশ ঈশ্বরের নামান্তর হয়ে ওঠে। কোথাও যেন ঈশ্বর এবং দেশ একাকার হয়ে যায়। এভাবেই মানুষের মধ্যে ঔপন্যাসিকেরা উপন্যাস রচনার মাধ্যমে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছেন, যা নানান ধর্মের বিভিন্নতা থাকা সত্বেও, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সরব হতে দেশের মানুষকে সাহায্য করছে। ধর্মের বিভিন্নতা এক দেশে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে যেমন সাম্প্রদায়িকতা জাগায়, ঠিক তেমনই জাগায় নীতিবোধ, মূল্যবোধ, বিজ্ঞানবোধ ও সামগ্রিকভাবে কর্মের প্রতি একাত্মতা। এই একাত্মতাই প্রকৃত ধর্মের সহজাত সংস্কৃতি বা কৃষ্টি। ভারতবর্ষের মতো

পরম্পরায় বিশ্বাসী দেশে ধর্মীয়তত্ত্বের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে অনেক কুসংস্কার বিরাজ করে একথা বলা যেতে পারে। তাই ভারতবর্ষে দ্রুত ব্যাপক গণশিক্ষার মাধ্যমে – বিবেকবুদ্ধিতে, মননশীলতায়, বিজ্ঞানাসক্তি বৃদ্ধি করতে পারলেই, এই কুসংস্কারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করা যেতে পারে। ঔপন্যাসিক আবুল বাশার **'বকুলের হাসি বকুল মুসকান'** (২০১৩) উপন্যাসে, তাঁর নিজস্ব বয়ানে –

"মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলমান সংখ্যাগুরু। দাশপুরের চারপাশ মুসলমানে ভরা, হিন্দু কম। দাসপুরের এই নিষিদ্ধপল্লি খুব ক্ষুদ্র। কুড়িঘর পতিতা। একটা ঘর একজনের। ঘরে একখানা চৌকি ধরে।....এদের যারা নিকটবর্তী গ্রাম থেকে এসেছে, তারা মাঝে-মাঝেই গ্রামে বাপ-মায়ের কাছে যায়। যারা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে অর্থাৎ রাজশাহী থেকে এসেছে, তারা কখনও কোথাও যায় না। কুড়িজনের ১৪ জনই মুসলিম। অন্নপূর্ণা রাজশাহীর সংখ্যালঘু। অর্থাৎ হিন্দু।"

ঔপন্যাসিক আবুল বাশার **'বকুলের হাসি বকুল মুসকান'** (২০১৩) উপন্যাসে, নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়েদেরকে যে ধর্মীয় রাজনীতির শিকার হতে হয়, তার ইতিহাস উপন্যাসের মাধ্যমে অত্যন্ত মর্মভেদী করে তুলেছেন। এখানে দাশপুরের এক ক্ষুদ্র নিষিদ্ধপল্লীর কুড়িজন পতিতাদের মধ্যে চোদ্দজনই মুসলমান বলে উল্লেখ করেছেন। উপন্যাসের চরিত্র নিষিদ্ধ পল্লীর অন্নপূর্ণা রাজশাহীর সংখ্যালঘু হিন্দু। আবার রাসসুন্দরী মুসলিম। অন্নপূর্ণা ধর্ম বলতে যা বোঝে তা হ'ল রোজ মাকালীর ছবিতে একটি করে লাল জবা অর্পণ করা। রাসসুন্দরী তার নিজের জীবনের কলুষতার উপরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নামাজ পড়েন না বা খোদাকে ডাকেন না। কারণ একবার মুসলমানি ক্যালেন্ডারে ও হিন্দু পঞ্জিকায় একই দিনে ঈদ আর দোল পড়ায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়েছিল সে বছর। তবে এ শিশুপাচার চক্রের পান্ডা, দাদু বা ঠাকুরদা সেজে, দাসপুরের এই বেপাড়া দিয়ে এ গণিকা বা ও গণিকার ঘরে, চুরি করা শিশুকে নিয়ে রাত্রিবাস করে, রাত শেষে, আসার আগে পাঞ্জাব-লরি ধরে শিশু চালান করতো। তার কারণ দাসপুরে রাত্রিবাস করার মত কোন হোটেল ছিলনা। তাছাড়া হোটেলের শিশু নিয়ে রাত্রিবাস করে লরি ধরে পাচার কর্ম করা অত্যন্ত ঝুঁকির কাজ ছিল। কিন্তু এর পেছনে যে রাজনীতি তা হ'ল, হিন্দু-খেপানি রাজনীতি ও মুসলমান-খেপানি রাজনীতি অথবা হিন্দু-মুসলমান ভাগাভাগি, সংখ্যালঘু-সংখ্যালঘু খেলা। ওই সময়েই ধর্ম খোয়া যাওয়ার ভয়ে, কন্যা খোয়া যাওয়ার ভয়ে – অনেক হিন্দু মায়েরা তাদের মেয়েদের মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। সেই মায়েদের মতানুযায়ী লেখক বলেছেন – যে ধর্ম খেতে দেয়, ইজ্জত দেয়, থাকতে দেয়, পুণ্য জীবন দেয় – তাহলে সেই ধর্মই

সত্য ধর্ম। তাই উপরোক্ত এই সম্মানগুলি পাওয়ার জন্যেই, প্রচুর হিন্দু মেয়ে এই সময় ভক্তিতে নয়, ভয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, মুসলমান কন্যায় পরিবর্তিত হয় এবং এর সাথে তাদের অনেককেই এই হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার নঙর্থক ফল হিসেবে নিষিদ্ধপল্লীতে, হিন্দু হয়েও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, পতিতাবৃত্তি করে, জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। তাই বলা যেতে পারে, এই নিদারুণ ব্যথাতুর কাহিনী ধর্মের রাজনীতি অথবা রাজনীতির ধর্মকে জীবনধারণের শর্ত হিসেবে যেন উপস্থাপিত করেছে। তাই একথা বলা যেতেই পারে যে পরিস্থিতিসাপেক্ষে এবং শর্তসাপেক্ষে ধর্ম পরিবর্তনশীল হয়ে যেতে পারে। এ কথার রেশ ধরেই যেন ঔপন্যাসিক সৌরভ মুখোপাধ্যায় **'প্রথম প্রবাহ'** (২০১৭) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র যোজনগন্ধা স্বকর্ণে ঋষিদের বিধান শুনতে পান–

"আপৎকালে শপথভঙ্গ দূষণীয় নয়, রাজ্যরক্ষার্থে ও বংশরক্ষার্থে প্রতিজ্ঞা উলঙ্ঘনও চলতে পারে, স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানই যথেষ্ট!"

মানুষের জীবনে সমস্ত রকমের ঔচিত্য-অনৌচিত্যবোধ, ধর্ম-অধর্মবোধ, পাপ-পুণ্যবোধের নানানরকম সরল ও বক্র ব্যাখ্যা বর্তমান। কিন্তু সারবত্তা অত্যন্ত স্পষ্ট। পরিস্থিতি সাপেক্ষে ও শর্তসাপেক্ষে ধর্ম পরিবর্তিত হয়। পুরাণের ঋষিরাও বিধান দিয়েছেন যে আপদকালীন শপথভঙ্গ দূষণীয় নয়, রাজ্য রক্ষার্থে ও বংশ রক্ষার্থে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করা ধর্ম বিরোধী কর্ম নয়, প্রয়োজন শুধু স্বল্প প্রায়শ্চিত্তের। যখন মানুষের অপরাধমূলক কাজের জন্যে, দেবতার কাছে তা অসন্তুষ্টির কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়, তখন সেই দেবতাকে সন্তুষ্ট করার কারণেই, পূর্ব কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তের প্রার্থনা বিধানের ব্যবস্থা শাস্ত্রে বর্তমান। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বিরাগভাজন দেবতার সাথে সন্ধি করার বিষয়টি মানুষের কাছে অত্যন্ত গ্রাহ্য হয়ে ওঠে কারণ তাতে দেবতার অনুগ্রহ থেকে তাকে আর বঞ্চিত হতে হয় না। ঈশ্বরের কাছে প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রার্থনা করা এক সর্বজনীন ধর্ম বৈশিষ্ট্য। ধর্মের সঙ্গে প্রার্থনার একটি ওতপ্রোত সম্পর্ক বর্তমান। অন্তরের প্রার্থনাই হল প্রকৃত ধর্ম। প্রার্থনার ধর্মীয়চেতনাকেই, নৈতিকচেতনা বা নান্দনিকচেতনা রূপেও নামকরণ করা যেতে পারে। প্রায়শ্চিত্তের এই নান্দনিক প্রার্থনায় পরিস্থিতিসাপেক্ষে ও শর্তসাপেক্ষে মানুষের ধর্মের বিবর্তনের রাজনৈতিক ইতিহাস, অন্তরশুদ্ধি ও দেবতার সান্নিধ্যলাভের আদর্শকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে ও তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়কের ভূমিকা পালন করে একথা বলা যেতে পারে। ধর্মের রাজনৈতিক বিবর্তনের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার সময় ক্রমশ ধর্মের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে

ধর্মের সূচনাকাল থেকেই, ধর্ম প্রচ্ছন্নভাবে আধ্যাত্মিক বিষয়, একথা স্বীকার করা যেতেই পারে। বহির্জগতের আত্মিকশক্তিকে মানুষ যখন নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারে, তখন ধর্ম আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হতে পারে। তাই যে কোন ধর্মের সঙ্গে সঠিকভাবে আত্মিক সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকলেই মানুষ উদার হতে পারে, ফলে সাম্প্রদায়িকতার মত নঙর্থকতাকে জয় করতে পারে বলে, মনে করা যেতে পারে। এই উপরোক্ত কথার সূত্র ধরেই ঔপন্যাসিক ইন্দু সাহা **'গোপনপুরের উপকথা'** (২০১১) উপন্যাসে লেখকের নিজস্ব বয়ানে সেজদার হাতের লেখা চিঠির উদ্দেশ্যে লিখেছেন–

"আরাম গদিতে বসে হয়তো সাহিত্য করা যায়, কিন্তু প্রাণের সুরটি তাতে মূর্ত হয় না। মানুষের কাছে যেতে হবে। নানা পেশার কথা বুঝতে হবে। নানা ঘরানার ভেতর থেকে সারবস্তুটি কুড়িয়ে আনতে হবে। তাহলেই একদিন জ্বলজ্বল ক'রে উঠবে জীবনের নানা মণিমুক্তো। আর নিজেকে গড়ে তুলতে হবে অসাম্প্রদায়িক আদর্শে তবেই সার্থক হবে লেখকের সৃষ্টি।....প্রেমের ধর্মই তো সত্য। সব ধর্মের মূল কথা, প্রেম।"

উপন্যাসপ্রাপ্ত সেজদার অমূল্য চিঠিটি থেকে যে নির্যাস প্রাপ্ত হওয়া গেল তা হ'ল – 'অসাম্প্রদায়িকতা' শব্দটি, যা ধর্মের নেতিবাচক দিক থেকেই জাত হয়, বলা যেতে পারে। যে কোন ধর্মের সঙ্গে ধর্মীয় সম্পর্কে সম্পর্কিত থেকে, সেই ধর্মের প্রতি বিশ্বাস বা আনুগত্য থাকলেই, মানুষ আর অসাম্প্রদায়িক থাকতে পারে না বলা যেতে পারে। কারণ জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্মপরিচয় শুধুমাত্র যখন পরিচিতির বাহন হয় এবং মানুষ যখন সেই ধর্মপরিচিতির ধর্মীয় সম্পর্কে অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাসের সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে অসম্মত হয়, তখন তা এক দ্বিচারিতাময় চরিত্রের প্রকাশ করে, যেখানে সেই ব্যক্তি জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মপরিচয়কে কর্মের নিরিখে প্রাধান্য দিলেও, প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসে নিস্পৃহ থাকে। ফলে বলা যেতে পারে, তার জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্মের প্রতি কোন গভীর প্রেম বা বিশ্বাস তৈরি হতে সক্ষম নয়। যে ব্যক্তি নিজ ধর্মের প্রতি সেভাবে প্রেমাসক্ত বা বিশ্বস্ত হতে অপারক বা যে ব্যক্তি মাত্রাতিরিক্ত ধর্মের গোঁড়ামির শিকার হয়, সে বিধর্মীর প্রতিও সম্মান প্রদর্শনে অপারক হলেও হতে পারে এ কথা বলা যেতে পারে। সৃষ্টি হতে পারে মানুষে-মানুষে সাম্প্রদায়িকতার, অবিশ্বস্ততার, প্রেমহীনতার। যা সমাজের ধর্মীয় রাজনীতিতে একেবারেই অনভিপ্রেত বলা যেতে পারে। জীবনের নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমেই মানুষ এই চরম সত্যটি উপলব্ধি করে থাকে। প্রেমের ধর্মই সত্যের রূপ। সব ধর্মের মূল কথাই প্রেম। প্রেমের ছবি, কল্পনার স্মারক হয়ে ওঠে – আখড়া। সেখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমযুগল মূর্তি স্থাপন

করা হয়। কোন পূজার্চনা হয়না, কোন ধর্মাচরণ হয়না। প্রেমসঙ্গীত হয়। মানবতার সংগীত। বিশ্বাসের সংগীত। এখানে ফকির, দরবেশ, আউলিয়া, বাউল সবাই আসে। গল্পকথা, কুশল বিনিময়, খাওয়া-দাওয়া হয়। কৃষ্ণ-কীর্তন হয়। গাইতে গাইতে বৈষ্ণবেরা শিশুর মতো কাঁদে, পরস্পর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়। কৃষ্ণের নাম-জয়গানে মুখর হয়ে ওঠে। তারপর ফিরে যায় আপন আবাসে। সৃষ্টি হয় এমন এক মানবিক বিশ্বাসের যা সাম্প্রদায়িকতার নিরাময় করতে এক সদর্থক পদক্ষেপ নিতে পারে। সৃষ্টি হতে পারে বিশ্বভ্রাতৃত্বের। সৃষ্টি হতে পারে নতুন ধর্মীয় জীবনবোধের। ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে যে তথ্য জ্ঞাত হওয়া গেছে এবং পরবর্তীকালে ধর্মের রাজনীতি বা রাজনীতির ধর্ম সম্পর্কে যা অবগত হওয়া গেছে, তা থেকে যে সত্য উপস্থাপিত হতে পারে তা হ'ল, পরবর্তীকালে ধর্মকে মানুষ শাসন-শোষণের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে, অর্থাৎ শাসিত ও শোষিত মানুষ ধর্মে তার অস্তিত্বের মিথ্যে আশ্রয় খোঁজার কাজে, ধর্মকে ব্যবহার করতে পারে। কারণ ধর্মের বিকল্প ব্যবস্থার যথার্থতা না আবিষ্কার হওয়া পর্যন্ত এবং যে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক কারণে ধর্মের নানান আচার-আচরণ, ধর্মচেতনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই ধর্মমোহকে অস্বীকার করা সম্ভব নাও হতে পারে – একথা আংশিক হলেও সত্য। তাই মানুষের মন থেকে ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কিত অজ্ঞতা ও শাসনস্বার্থে ধর্মের ব্যবহার সম্পর্কে অসচেতনতা দূর করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় একথা বলা যেতেই পারে। ধর্ম যে মানুষেরই প্রয়োজনে, মানুষের দ্বারাই সৃষ্ট এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা যে মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি নির্ভেজাল কৃত্রিম ব্যবস্থা, এ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা, মানুষেরই প্রকৃত ধর্ম হয়ে উঠলে, ঈশ্বর-বিশ্বাসের আশ্রয় নেওয়া ও ধর্মীয় আফিমের নেশায় মানুষের মনুষ্যত্বের নিষ্ক্রিয়তা এবং আচ্ছন্ন হয়ে থাকার প্রয়োজন হয়তো আর নাও পড়তে পারে, এ কথা বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক সন্তোষ কুমার ব্রহ্ম তাঁর **'বাবুঘাটের খেয়া'** (২০১১) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র বিনায়ক সেন, উপন্যাসের আর এক চরিত্র মোহিত গাঙ্গুলীর স্ত্রী ইন্‌গ্রিডকে বলছেন –

> **"ধর্ম আফিম, – মার্কস সাহেবই বলে গেছেন। আমাদের দেশের মানুষ ধর্ম নিয়ে যা করে, তাতে রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগবে কি করে? আমি মার্কস-এর এই কথাটা মানি।....ধর্মের নামে এতো শোষণ, নির্যাতন আর ভন্ডামি আর কোথাও এত আছে বলে আমি জানিনা। সাধারণ খেটে-খাওয়া-মানুষগুলিকে এই ধর্মের নামে কুসংস্কারের জন্য সচেতন হতে দিচ্ছে না।"**

ঔপন্যাসিক সন্তোষ কুমার ব্রহ্মের **‘বাবুঘাটের খেয়া’** (২০১১) উপন্যাসের তথ্যানুযায়ী বলা যেতে পারে যে, ধর্ম যতদিন শাসকগোষ্ঠী ও বৃহত্তর জনসাধারণের প্রয়োজন মিটিয়েছে, ততদিনই ধর্মের বিকাশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্ভব হয়েছে৷ তাই বলা যেতে পারে যে, ধর্মের প্রয়োজনের প্রসার হ্রাস হলেই, হয় ধর্মের প্রসার কমেছে, নাহয় ধর্মের অবলুপ্তি ঘটেছে৷ আর এ দু’টির কোনোটিই না হলে ধর্ম পরিমার্জিত হয়ে, অন্য ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে৷ নাস্তিকতার অস্তিত্বের সঙ্গে মানুষের সত্য উপলব্ধির প্রক্রিয়াটি সাধারণভাবে জড়িয়ে থাকে একথা বলা যেতে পারে৷ ভারতবর্ষে প্রকৃত রাজনৈতিক ধর্মচেতনা জাগ্রত হওয়ার জন্য, এমন এক সমাজের প্রয়োজন, যেখানে অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং জাতিভেদ তার নিজস্ব ভিত্তি কায়েম করার ক্ষমতা রাখতে অপারগ হতে পারে৷ কারণ সমাজের সাধারণ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং বৈষম্যের জন্য, জাতিভেদ ও কুসংস্কারের অন্ধকার এবং অজ্ঞতার স্থায়িত্বকে সুষ্ঠু বিকাশের অন্তরায় বলে মনে করা যেতে পারে৷ কুসংস্কারমুক্ত ও শিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের প্রকৃত সচেতনতার জোরে, সাধারণ মানুষের মধ্যে যখন ধর্মের বিকল্প ব্যবস্থা, যাকে ‘মানবিক মূল্যবোধ’ নামকরণ করা যেতে পারে তা জাগ্রত করা সম্ভব হবে, তখন সমগ্র মানুষের সামগ্রিকভাবে নিজেদের শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে এক সুস্থ ধারণার সৃষ্টি হতে পারে, যা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত, সুস্থ সমাজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অভিপ্রেত তা বলা যেতে পারে৷

সামাজিক দিক

সমাজের সাধারণ মানুষের বাস্তবধর্মী চিন্তায়, সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের একটা নির্দিষ্ট সহজবোধ্য অনুপ্রেরণা কাজ করে৷ সেই কারণেই মানুষ সামাজিক মূল্যবোধকে পাথেয় করে, সমাজের প্রয়োজনীয় আচরণবিধিকে মান্যতা দিয়ে থাকে৷ মানুষের কাছে ঈশ্বর সমাজেরই এক মূর্ত প্রতিভূ৷ ঈশ্বরের শক্তির প্রতিফলন সমাজেরই শক্তির প্রতীক বলা যেতে পারে৷ সমাজ না থাকলে ধর্ম, ধর্মীয় জীবন, সবই অর্থহীন একথা বলা যেতে পারে৷ কারণ ঐশ্বরিক শক্তির প্রতীক হিসেবে সমাজেরই কোন মানুষকে কখনো মহাপুরুষরূপে, কখনো অবতাররূপে, আবার কখনো দেবদেবীর কল্পিতরূপে প্রতিমায় প্রতীয়মান হতে, বাস্তবে দেখা যেতে পারে৷ তাই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মের উপরোক্ত বাস্তব আধারগুলি সমাজেরই সামাজিক অভিব্যক্তি হিসেবে মনে করা যেতে পারে৷ সমাজের ইতিহাসে ধর্মীয় আদর্শের নামে যে যুদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে থাকে, তাতে যে অগনিত মানুষের

প্রাণহানি হয়ে থাকে, তাকে বলা যেতে পারে ধর্মের আড়ালে-আবডালে থাকা মানুষের বর্বরতা, অন্ধ-কুসংস্কার, মনুষ্যত্বহীনতা ও ব্যভিচারের এমন এক নির্মম রূপ, যার দ্বন্দ্ব মননশীল মানুষের সংবেদনশীলতাকে আন্দোলিত করতে পারে। জাত্যাভিমান, জাতিভেদ, অসাম্যতা, ইত্যাদি বিষয়গুলি সমাজের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে সামাজিকভাবে বাস্তবায়িত করে থাকে। ভারতবর্ষে ধর্মীয় সংগঠনের শুভচিন্তকগণ সমাজের প্রচলিত আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতেই, সমাজে ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাধারণত সচেষ্ট থাকেন। তাই সামাজিক পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন, সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে অনেকসময় সংশোধন করতে বাধ্য হতে পারে, কারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাস অনেক সময়েই মানুষের আত্মশক্তিকে বিস্মৃত করিয়ে, মানুষকে ঈশ্বর-কৃপা-নির্ভরশীল করে তুলতে পারে। ফলে মানব সভ্যতার গতিবেগ মন্থর হয়ে যেতে পারে। ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর **'কমলিকা'** (২০১২) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র বংশী উপন্যাসের আর এক চরিত্র মসিরুলের কাছে প্রশ্ন করে –

"আচ্ছা চাচা, তোমাদের মোছলমানদের মধ্যে তো বড় জাত, ছোট জাত নেই। তবে আমাদের হিন্দুদের মধ্যে এত জাতের বিচার কেন? এক গাঁজাখোর সঙ্গে সঙ্গে ফস করে বলে উঠলো, ওই রোগেই তো হিন্দুদের মরণ!....খালেদ বলল, আরে বংশী,আমরা তো আর আরব দেশ থেকে আসিনি। আমাদের বাপ-দাদাদেরও আগের পুরুষেরা বোধহয় হিন্দুই ছিল। বামুন-কায়েতদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যই তো আমরা ইসলাম ধর্ম নিয়েছি। যেখানে সবাই সমান।....মসিরুল বলল, চুপ মার। কে বলেছে, আমরা সবাই সমান! আমি কামারুজ্জমান সাহেবের বাড়িতে গেলে আমাকে বাবুদের মতন খাতির করে কোনওদিন বৈঠকখানায় বসতে দেবে? না বাইরের দাওয়ায় বসিয়ে রাখবে ঘন্টার পর ঘন্টা।....মসিরুল একইরকম গলায় বলল, সে সব কথা বাদ দে! আসলে মনে রাখবি, দুইটাই জাত আছে। গরীব আর বড়লোক। শক্তিমান আর দুর্বল, এরা কখনও সমান হতে পারে না, তা সে যে ধর্মেরই হোক।"

সমাজের ইতিহাসে ধর্মীয় আদর্শের নামে যে যুদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে থাকে, তাতে যে অগনিত মানুষের প্রাণহানি হয়ে থাকে, তাকে বলা যেতে পারে ধর্মের আড়ালে-আবডালে থাকা মানুষের বর্বরতা, অন্ধ-কুসংস্কার, মনুষ্যত্বহীনতা ও ব্যভিচারের এমন এক নির্মম রূপ, যার দ্বন্দ্ব মননশীল মানুষের সংবেদনশীলতাকে আন্দোলিত করতে পারে। জাত্যাভিমান, জাতিভেদ, অসাম্যতা, ইত্যাদি বিষয়গুলি সমাজের মানুষের মধ্যে, সাম্প্রদায়িকতাকে সামাজিকভাবে বাস্তবায়িত করে থাকে। ভারতবর্ষে ধর্মীয় সংগঠনের শুভচিন্তকগণ সমাজের প্রচলিত

আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতেই সমাজে ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাধারণত সচেষ্ট থাকেন। তাই সামাজিক পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে অনেকসময় সংশোধন করতে বাধ্য হতে পারে, কারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাস, অনেক সময়েই মানুষের আত্মশক্তিকে বিস্মৃত করিয়ে, মানুষকে ঈশ্বর-কৃপা-নির্ভরশীল করে তুলতে পারে। ফলে মানব সভ্যতার গতিবেগ মন্থর হয়ে যেতে পারে। **'কমলিকা'** (২০১২) উপন্যাসের তথ্যানুযায়ী – মুসলমানদের মধ্যে জাতের ভেদাভেদ নেই, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে অনেক জাত-বিচার আছে। অনেক মুসলমানের বাপ-দাদাদের আগের পুরুষেরা বোধহয় হিন্দু ছিল। কারণ হিন্দুধর্মের বামুন-কায়েতদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ইসলাম ধর্মে সবাই সমান। ইসলাম সাম্যের ধর্ম। যদিও ইসলাম ধর্মের মধ্যেও শিয়া-সুন্নি, আহমেদিয়া বর্তমান, তবু তারা মনে করে মানুষের মধ্যে দুটোই জাত বর্তমান। গরিব-বড়লোক ও শক্তিমান-দুর্বল। এরা কখনোই সমান হতে পারে না, তা সে যে ধর্মেরই হোক না কেন। মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুদের মতন জাতিভেদ-বর্ণভেদ ও সম্প্রদায়ভেদ নেই। ইসলাম ধর্মে কোরান অনুযায়ী, আল্লার ধারণা নিরাকার। তাই ইসলাম ধর্মে মূর্তি গড়াও নিষেধ, কারণ তারা ঠাকুর-দেবতা মানে না। আর শুধুমাত্র ঠাকুর দেবতা নয়, মানুষের মূর্তি গড়াও বারণ আছে। তাই মানুষে-মানুষে সাম্যতা বা সাম্যের আদর্শের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, মানুষের মধ্যে মহাবিশ্বচৈতন্যবোধ জাগ্রত হওয়া একান্ত প্রয়োজন এ কথা বলা যেতেই পারে। সাম্যের আদর্শ প্রতিটি ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রায় মূল কথা। কিন্তু তার প্রকৃত বাস্তবায়ন যদি পৃথিবীর সব ধর্মেই সম্ভব করা যায়, তাহলে সাম্প্রদায়িকতার মত বিষবৃক্ষের বীজকে বিনষ্ট করা সম্ভব হতে পারে। **'কমলিকা'** (২০১২) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসস্থিত চরিত্র মসিরুলের গলায় উপরোক্ত ভাবনারই প্রতিধ্বনি যেন ধ্বনিত হচ্ছে। তার কথা অনুযায়ী শুধু সম্প্রদায়গত জাতিভেদ নয়, প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যস্থিত মানুষের মধ্যেও উচ্চ-নিচ, বড়লোক-গরিবলোক, শক্তিমান-দুর্বল ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক বিভক্তিকরণও প্রাধান্য পাওয়ার কারণেই সাম্প্রদায়িকতা এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়, যা সমাজের মানুষকে, মানুষের থেকে পৃথক করার নঙর্থক কর্মে ব্যাপৃত হয়ে পড়তে পারে, যা সুস্থ সমাজের সামাজিকতাকে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হতে পারে। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর **'দুনিয়াদারি'** (২০১৫) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র রহমত ডাক্তার এবং উপন্যাসের আর এক চরিত্র আকিলকে বলেছেন –

“মানুষ হ’ল ‘আশরাফুল মাখ্‌লুকাত’। আল্লাহ্‌তালা-র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সেই মানুষের হেফাজত করি আল্লারই ইচ্ছায়।....আকিল ভাবে ‘ভালো’ কাজ কীই-বা করেছে জীবনে? নমাজটাও ঠিকমত পড়া হয় না, হায়-হায়। ক্বাজা-ও করে না। রোজাও ভেঙ্গে যায়।....একজন বলেছিল গরিবের আবার রোজা! খোজা-র আবার ছেলে! গরিবের রোজ-ই রোজা। ওগুলি কাজের কথা নয় – আকিল জানে। ‘রোজা’ করার সওয়াবের কাজ সেটাও আকিল জানে। কিন্তু হয় না। হয়তো রোজার মাসে কোনও হিন্দু বাড়িতে জন খাটতে গেছে। দুপুরে ভাত দিয়েছে, গরম ভাত, গরম ভাতের গন্ধে মাথা ঠিক থাকে না। হিন্দু-মজুররা পাতপেড়ে-বসে ভাতের মাঝখানে গর্ত করে ডাল ঢেলেছে, তখন ‘হে আল্লা, গুনাহ মাফ করে দ্যাও’ বলে নিজেও বসে গেছে।....মনুষ্যত্ব হল ধর্ম ও জাতির ঊর্ধ্বে।”

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর **‘দুনিয়াদারি’** (২০১৫) উপন্যাসের উপরোক্ত তথ্য থেকে যে তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যাচ্ছে তা হ’ল – মানুষের ধর্মের ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলার পশ্চাতে তার উদরপূর্তির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এ কথা বলা যেতে পারে। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ ধর্মের রীতিনীতির কাছে হার মেনে, ধর্মীয় মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে পিছুপা হয়না। এই উপন্যাসে রহমত ডাক্তার আল্লার কথা স্মরণে রেখেই মূল্যবোধকে সঙ্গী করে আল্লার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েই মানব সেবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। কিন্তু দরিদ্র জনমজুর আকিল হিন্দুবাড়িতে জনখাটার সময়ে ‘রোজা’ চলাকালীন, অন্যান্য জনমজুরদের পেটভরা গরম ভাতের মাঝখানে গর্ত করে গরম ডাল ঢালতে দেখে আর মাথা ঠিক রাখতে পারে না। বিস্মৃত হয় রোজার উপবাস রাখার ধর্মসম্মত প্রতিবিধানকে। কারণ সে দরিদ্র। প্রতিদিন পেটভরা ভাত তার কপালে জোটে না। তাই প্রায় প্রতিদিনই তার ধর্ম বিধানের বাইরেও ‘রোজা’ রাখতে হয়। তাই মুখের সামনে পাওয়া পেটভরা গরম ভাতকে আকিল ধর্মের অনুশাসনের কারণে উপেক্ষা করতে পারে না। তাই সে আল্লা বা খোদার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। সে জানে আল্লা তাকে মাফ করে দেবেন। ইসলাম ধর্মে, মন দিয়ে দিনে পাঁচবার নামাজ পড়তে হয়। নইলে নামাজ কবুল হয় না। নামাজ ভুল হলে কিংবা বাদ গেলে, ক্বজা নামাজ পড়তে হয়। নামাজ না পড়লেও মানুষের উপকারের জন্য যদি কোন মানুষ কাজ করেন, সেটাও সঠিক এবাদত। কারণ মানুষের হেফাজত করা আল্লারই পরম ইচ্ছা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ধর্ম বা ধর্মের অনুশাসনের মান্যতা মানুষের পরিস্থিতিনির্ভর বিষয়। এভাবেই সমাজের দরিদ্র, সংখ্যালঘু, নিম্নবর্ণীয়দের ধর্মীয়চেতনা, ধর্মনির্ভরের তুলনায় অনেক বেশি উদরনির্ভর। দরিদ্র নিম্নবর্ণীয়দের আত্মসংকট তাই তাদেরকে অনেক সময়েই সাম্প্রদায়িকতার সাথেও পরিচিত করাতে পারে যা সমাজের সুস্থ সামাজিকতা বজায় রাখার পরিপন্থী বিষয় হিসেবেই গ্রাহ্য হতে পারে। সুস্থ সমাজব্যবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সমাজে

সামাজিকতারূপ, ধর্মীয় পরিস্থিতি বা সঠিক মূল্যবোধের ধারকরূপ, মানুষের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে। সমাজের সামাজিক ও মানবিক প্রয়োজনে মানুষের মূল্যবোধের ও আদর্শের বিকাশে ধর্ম এক বিশেষ স্থান গ্রহণ করে থাকে এ কথা বলা যেতে পারে। ধর্ম বা ধর্মের অনুশাসনের মান্যতা, মানুষের পরিস্থিতিনির্ভর বিষয় – এই প্রসঙ্গের সমর্থনে ঔপন্যাসিক অরুণোদয় সাহা **'নিদ নাহি আঁখিপাতে'** (২০১৬) উপন্যাসে অতুলপ্রসাদ সেনের যে জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত প্রাঞ্জল। তাতে অতুলপ্রসাদ সেন ও পিতা রামপ্রসাদ সেনের বিবরণ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের বয়ানে –

> **"বাবা রামপ্রসাদ সেন ঢাকার পাগলা গারদের ডাক্তার। রামপ্রসাদ ভীরু এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। পাড়াপড়শিরা তাঁকে সবাই জানে, পাগল ডাক্তার হিসেবে। পাগল ডাক্তার আর পাগলের ডাক্তারের মধ্যে যে কী বিরাট পার্থক্য তারা নিজেরা বুঝতে পারে কিনা কে জানে। অতুলপ্রসাদের মামার বাড়িকে লোকেরা বলে, পাগল ডাক্তারের শ্বশুরবাড়ি, অতুলপ্রসাদের মাকে বলে, পাগল ডাক্তারের বউ আর অতুলকে বলে পাগল ডাক্তারের পাগল ছেলে।"**

'নিদ নাহি আঁখিপাতে' (২০১৬) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক অরুণোদয় সাহা লিখেছেন – সংসার এক বিচিত্র স্থান। সেই সময়কার সামাজিক অবস্থার এক বাস্তবসম্মত চিত্র ঔপন্যাসিক অত্যন্ত ব্যুৎপত্তিতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন, যেখানে শ্বশুর কালীনারায়ন গুপ্ত, জামাই ডাক্তার রামপ্রসাদকে পুত্রসম স্নেহ করতেন এবং ঘরজামাই করে রেখে দিয়েছিলেন। এই কালীনারায়ন ছিলেন ব্রাহ্ম আচার্য। জামাইও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। সেই সময়ে সংখ্যাল্পতার জন্যে ঢাকাতে ব্রাহ্মরা একঘরে হয়ে পড়েছিল। শ্বশুর কালীনারায়ন, জামাই রামপ্রসাদ আর দৌহিত্র অতুলপ্রসাদ ঊষাকালে ব্রাহ্মসংগীত সুর করে, করতাল সহযোগে গাইতেন। জামাই-শ্বশুর দুজনেই ব্রাহ্মসংগীত শুধু গাইতেনই না, ব্রাহ্মসংগীত রচনাও করতেন। কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজে ফাটল দেখা দেওয়ার কারণে, কেশব চন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে এসে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রামপ্রসাদ নববিধান ব্রাহ্মসমাজে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ঈশ্বর নিয়ে মতান্তর হলেও শ্বশুর জামাইয়ের মধ্যে কখনো সেই সময়ের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম বিষয়ে মনান্তর ঘটেনি। শ্বশুর কালীনারায়নের জামাই, রামপ্রসাদ সেন ঢাকার পাগলা গারদের ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু সেই সমসাময়িক সমাজেও রামপ্রসাদের মত ভীরু এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকেও পাড়াপড়শিরা 'পাগল ডাক্তার' নামে নামকরণ করেছিলেন। যা সেইসময়ের মানুষের সামাজিক অশিক্ষিততার পরিচয় বহন করে, এ কথা বলা যেতে পারে। কারণ 'পাগল ডাক্তার' এবং 'পাগলের ডাক্তার' এই দুই বিশেষণ এর মধ্যে

একজন ব্যক্তির যে বিশাল ব্যক্তিত্বের পার্থক্য, তা সঠিকভাবে বোঝার মত মানসিকতা হয়তো সমাজের মানুষের ছিল না, এ কথা বলা যেতে পারে। শ্বশুর-জামাই-দৌহিত্র তিনজনেই ঊষাকালে ব্রাহ্মসংগীত করতাল বাজিয়ে গাইতেন। শ্বশুর-জামাই দুজনেই ব্রাহ্মসংগীত রচনাও করতেন। তাই বলা যেতে পারে যে অতুলপ্রসাদ সেনের রক্তে সংগীতের ধারা বংশ-পরম্পরার হাত ধরেই এসেছিল এবং অবশ্যই এ কথা বলা যেতে পারে যে, তা কখনোই ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া হয়তো সম্ভব ছিলনা। পরবর্তীকালে অতুলপ্রসাদী গান অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তিনি মূলতঃ দেশাত্মবোধক সংগীত, ধর্মসংগীত ও স্বরচিত প্রেম পর্যায়ের গান রচনা করেছেন এবং সুরারোপও করেছেন। তাঁর রচিত ও সুরারোপিত সংগীতে একাকীত্ব বা বিরহ প্রধানত প্রাধান্য পেতো। অতুলপ্রসাদের বাবা অসময়ে চলে যাওয়ার কারণে সংসারে যে টালমাটাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকে তাঁর উত্তীর্ণ হওয়ার দিশা না খুঁজে পাওয়ায়, তিনি যেন খুব অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময়ে অতুলপ্রসাদের মা হেমন্তশশী চিকিৎসার জন্য, কিছুদিনের জন্যে, কলকাতায় তাঁর নিজের মামাবাড়িতে এসে উঠেছিলেন। সেখানে বিপত্নীক আইনজীবী ও সমাজ সংস্কারক চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যাঠামশাই দুর্গামোহন দাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও পরিণয় হয়েছিল। সেই সময়ের সমাজে একজন বিপত্নীক, ছয় সন্তানের জনক আর অন্যজন বিধবা, চার সন্তানের জননী সমাজের রক্তচক্ষুকে অবহেলা করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। সেই সময়ের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই দুর্গামোহন দাস অসাধ্য সাধন করেছিল। তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর পর, তাঁর বিমাতাকে আবার বিবাহ দিয়েছিলেন। সেই সময়ের সামাজিক পরিস্থিতিতে এই বিষয়টি নিয়ে প্রচুর শোরগোল হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সেইসময় দুর্গামোহন দাসকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সঙ্গদান করেছিলেন। সেই সময়ের সামাজিক পরিস্থিতিতে পিসতুতো দাদা অতুলপ্রসাদ ও মামাতো বোন হেমকুসুম সমাজের তোয়াক্কা না করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই বিবাহ সেই সময়কার সামাজিক পরিস্থিতিতে একেবারেই নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হতো। তাই তারা দুজন সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পরামর্শ মতো স্কটল্যান্ডের গ্রেটনা গ্রীনে গিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন কারণ সেখানেই এইরকম অসম বিয়ে আইনসম্মত ছিল। ঔপন্যাসিক অরুণোদয় সাহা লিখিত **'নিদ নাহি আঁখিপাতে'** (২০১৬) উপন্যাসে অতুলপ্রসাদের এই কাহিনী সেই সময়কার সামাজিক অবস্থায়, ধর্মের মোড়কে মোড়া ধর্মীয় ও সামাজিক নীতির বিরুদ্ধাচারণ করে যে কার্য সাধন করেছিলেন, তাতে বলা যেতে পারে ধর্ম বা সামাজিক নীতি নয়, মনুষ্যত্ব, কর্তব্যবোধ, সর্বোপরি বাগদানের বিশ্বস্ততাকে, প্রকৃত ধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। অতুলপ্রসাদের প্রতিটি

গানে পূজা এবং প্রার্থনা প্রাধান্য পেত। যা ধর্মকে এক বিশেষ সামাজিকতার শিখরে নিয়ে গেছে যেখানে ধর্ম নয়, সম্পর্ক নয়, মনুষ্যত্বই প্রাধান্য পেয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্মেই মনুষ্য সৃষ্ট শ্রেণীভেদ ও জাতিভেদকে অস্বীকার করে, সমস্ত মানুষকে সেইসময়কালীন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সমমর্যাদার অংশীদার করে, তাদের মুক্তি-পথের সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম ঘোষণা করেছিল প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে অনন্ত শক্তির উৎস। আত্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সেই শক্তি প্রকাশিত হওয়া সম্ভব বলে মনে করা যেতে পারে। ঔপন্যাসিক মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্যের লিখিত **'অন্তপ্রহর'** (২০১১) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র মহানাম লিখছেন –

"অধুনা সদ্ধর্ম লৌকিক হয়েছে। সঙ্ঘের শাসন নিয়ন্ত্রণ কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। ধর্মাচরণে ব্যক্তির ভূমিকাই এখন প্রবল। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি এই তিনের মধ্য ধর্মের উচ্চারণটুকুই অনেকে নিয়ম বলে গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধ অনুচ্চারিত, সঙ্ঘ লুপ্ত বা বিস্মৃত। এতে রাজরোষের ভয় নেই। ধর্ম তো ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রগ্রন্থেও বহুল রূপে বিরাজমান।"

বৌদ্ধ ধর্ম আকস্মিকভাবে তৈরি হওয়া কোনো ধর্ম নয়, এই ধর্ম সেইসময়কালীন অধঃপতিত ব্রাহ্মণ্যধর্মেরই প্রতিবাদ ও এক উন্নত সংস্কার। বুদ্ধদেব বা তথাগত ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম জাতপাতহীন, প্রত্যেকের কাছে উন্মুক্ত, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য না দিয়ে, মানুষের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের এক গুরুত্বপূর্ণ পথ, এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারমুখী হওয়ার কারণে, তৎকালীন সারা জগতে সম্প্রসারিত এক নীতিসম্মত ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্ম সেই সময়ের সমাজের বিচ্ছিন্ন ধর্মবোধের সামাজিক অবস্থার পরিস্থিতিতে এক মানবদরদী ধর্ম, যে ধর্মে সমস্ত মানুষই সমান আত্মিক শক্তির অধিকারী। বৌদ্ধ ধর্মে ত্রিশরণ মন্ত্রের মধ্যে, মধ্যম মন্ত্রে, ধর্মের উচ্চারণটুকুই অনেকে নিয়ম বলে গ্রহণ করেছেন। তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে বৌদ্ধ ধর্মে মদিরা পান নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু আয়ুর্বেদাচার্য 'চরক সংহিতা' নামক গ্রন্থে বলেছেন – স্বাস্থ্যের কারণে অনেক ক্ষেত্রে মদিরা পান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আয়ুর্বেদাচার্যরা প্রায়শই মদিরা পানের নিদান দিয়ে থাকেন। মাত্রাতিরিক্ত পান অবশ্যই ঘৃণার্হ এবং বুদ্ধিনাশক হয়। তবে মদিরা পান নিয়েও সঙ্ঘে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে ভিক্ষুর সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। তাঁরা বিহারের কয়েকটি চীবরের সমাহারকেই শয্যা হিসেবে ব্যবহার করতেন। পরবর্তীকালে তারা কর্ম উপলক্ষে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েন। ফলে ইচ্ছা বা

অনিচ্ছায় তারা বিহারের বাইরে কিছুটা পরিপাটি শয্যায় শয়ন করতেও বাধ্য হন। অনেক সময় প্রান্তভাগে সীবন কর্ম করে মুড়ে দেওয়া হয়েছে এরূপ বস্ত্রের শয্যাও তাঁরা ব্যবহার করতে বাধ্য হন। প্রাচীনপন্থীরা এই বিষয় নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত করলেন। স্বর্ণ এবং রৌপ্য গ্রহণ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর পক্ষে বর্জনীয়। কিন্তু তাঁরা যখন দেশান্তরে যান, তখন সমুদ্র তরণীর পাথেয় থেকে শুরু করে আহার্য সংগ্রহের জন্যও মুদ্রার প্রয়োজন হয়। এই গৌড়বঙ্গ থেকেও কোনো ভিক্ষুক যেতে চাইলে, তাঁকে বিধর্মীদের তরণীতেও আরোহন করতে হয়। স্বর্ণ বা রৌপ্যের স্পর্শ করার অনুমতি না থাকলে, তাঁকে বন্দরে স্থানুভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই মৃত্যু বরণে ভিক্ষু বা সংঘের মধ্যে কার মোক্ষলাভ হবে, এই বিতর্কে সংঘে বহুমতের সৃষ্টি হয়ে বিভাজন ঘটে। আচার্যরা বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করে বহু অমূল্য দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলি পাঠ করে সদ্ধর্মীরা ঋদ্ধ হন, প্রজ্ঞাবান হন। কিন্তু সদ্ধর্মীদের সংসারে রুচি নেই। সহজ জীবনই তাঁদের লক্ষ্য। তাঁদের সহজ জীবনের ধারণা হ'ল – জগৎ-সংসার, প্রকৃতি এবং পুরুষের লীলামাত্র। শাশ্বত শূন্য এবং শাশ্বত করুণার অভিপ্রকাশ। এই সাধকেরা দেবদেবীর মূর্তি আরাধনায় বিশ্বাস করেন না। বৌদ্ধ সংঘের আচার-নিয়ম, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পালনীয় ও গৃহীদের জন্য নির্দেশিত ত্রিশরণ বা অন্যান্য ধর্মাচরণ, তাঁরা বাহুল্যবোধে বর্জন করেছেন। তাঁরা সমাজত্যাগী তো বটেই, তার সাথে সর্বাংশে আচারত্যাগীও। আহার-বিহারের শৃঙ্খলা, স্নান, শৌচ, বেশভূষার পারিপাট্য, গৃহমার্জনার আচার কিছুই তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না। কিন্তু সহজ ও স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়ভোগ তাঁদের অবশ্য কর্তব্য। সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচনের বিষয়েও তাঁরা ব্রাহ্মন্য বা বৌদ্ধ সংস্কার মানেন না। তাঁরা বিশ্বাস করেন – শরীরের মধ্যেই বোধিচিত্তের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। যে সন্ধান পাবে, সেই ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্ত হবে। কালচক্রযানের উদারনীতি এভাবেই সদ্ধর্মের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। বৈষ্ণবরা বুদ্ধকে নবম অবতার রূপে পরিণত করেছে। তাই বৈষ্ণবরা মনে করেন বুদ্ধের স্বতন্ত্রভাবে পূজিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। বিষ্ণুর পূজাই বুদ্ধের পূজা। তাই অবতার হিসেবে বুদ্ধের কাজ ছিল 'মার' বা অশুভ শক্তিকে তার নিজস্ব পথে পরিচালিত হতে দেওয়া। জগদ্দল মহাবিহারীয় আর্যভিক্ষুসংঘ আজ পর্যন্ত ওই ভ্রান্ত ধারণাকে খন্ডন করার কোনো চেষ্টা করেনি। কোথাও এ নিয়ে তর্ক সভাও অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই তর্ক প্রয়োজনীয়তাও ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে। এতে ধীশক্তির কার্যকারিতা ক্রমে কমেছে। উদ্ভাবনের ক্ষমতাও ক্রমশ লুপ্ত হয়েছে। ভিক্ষুণী, সুহিতা অন্ধঅনুকরণে, কখনো ধীশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না। ধীশক্তিকে তর্কের মাধ্যমে দুদিকে ধারবিশিষ্ট তলোয়ারের মতো নিত্য শাণিত করতে হয়, নচেৎ তা অকৃতকার্য

হয়। অধুনা সদ্ধর্ম লৌকিক হয়েছে। সংঘের শাসন নিয়ন্ত্রণ কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। এখন ধর্মাচরণে ব্যক্তির ভূমিকাই প্রবল। ফলে বুদ্ধ অনুচ্চারিত, সংঘ লুপ্ত বা বিস্মৃত। কারণ রাজরোষের ভয় অন্তর্হিত। এখন ধ্যানমগ্ন নিশ্চল বুদ্ধমূর্তির চেয়ে, সৃষ্টিতে পারঙ্গম যোগীকে অধিক গ্রহণযোগ্য মনে করা হচ্ছে। আজ হীনযান, মহাযান ও তার বহু শাখা-প্রশাখার তর্ক-বিতর্ক স্তব্ধ হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে ধী-শক্তির অবমাননা ও অবনমন প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মের পতনের পথ সহজ করে দিয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে চোরাবালির মতো বিভিন্ন অযৌক্তিক মতামতের সৃষ্টি হয়েছিল, যার নঙর্থক দিক বৌদ্ধ ধর্মের সদর্থকতাকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে অনেক ক্ষেত্রেই অসমর্থ হয়েছিল। ঔপন্যাসিক মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য লিখিত **'অন্তপ্রহর'** (২০১১) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র মহানাম গ্রন্থের নাম দিলেন 'সদ্ধর্মদীপিকা'। এই গ্রন্থটি সংস্কৃত বা পালি ভাষায় লিখিত নয়। পূর্বী প্রাকৃত ও ভঙ্গ সংস্কৃতে লিখিত হয়েছিল। সেই সময়ও এই ভাষার ব্যাকরণ তৈরি হয়নি। কিন্তু এই ভাষা তখন অধিকাংশ মানুষের কথ্যভাষা ছিল। গৌড়-বঙ্গ-রাঢ়-সমতট-মগধ-মিথিলা, সব জায়গার মানুষই এই ভাষা বুঝতো। উপরোক্ত উপন্যাসে তৎকালীন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সমাজের যে চিত্রকাঠামো প্রাপ্ত হওয়া গেল, তা থেকে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা ও পরিস্থিতির যে বাস্তবসম্মত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা বর্তমান সময়ের পাঠককুলকে সমৃদ্ধ করতে পারে। তাই বলা যেতে পারে যে, ইতিহাস সমাজের সামাজিকতা জ্ঞাত হওয়ার ক্ষেত্রে সেই প্রতিভার পরিচয় রেখেছে।

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী লিখিত **'লালবাঈ'**(২০১৫) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র কৃষ্ণমোহন ও রহস্যময়ীর কথোপকথনে ধর্মের যে অনবদ্য ছবি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা হ'ল –

"কৃষ্ণমোহনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল এক রহস্যময়ী। কন্ঠে তার সুমধুর সঙ্গীত, হৃদয়ে উজ্জ্বল সাধনা। তার মুখের দিকে বিস্ময়ে ফিরে তাকিয়ে ছিল কৃষ্ণমোহন। প্রশ্ন করেছিল, কে তুমি?

– আপনার শিষ্যা, সঙ্গীতগুরু। উত্তর দিয়েছিল সেই ছায়াশরীর।

– তোমার ধর্ম?

– সঙ্গীত।

মৃদুহাস্যে কৃষ্ণমোহন বলেছিল, না শিষ্যা, সঙ্গীত নয়। রাগ রাগিনী শুধুই পথ দেখায়। ধর্ম এক, ধর্ম মানবতা – প্রেম প্রীতি অনুরাগ। বলেছিল, স্নেহ, প্রীতি-ভালবাসাই একমাত্র ধর্ম।"

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী লিখিত **'লালবাঈ'** (২০১৫) উপন্যাসে ধর্মের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতায়, ধর্মকে উপন্যাসের চরিত্র কৃষ্ণমোহন শুধুমাত্র স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসা ও অনুরাগের অনুভূতিকেই প্রকৃত ধর্ম বলে বিশ্লেষন করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী দিব্যজ্ঞানী মানুষের শরীরে সাধারণত হিংসা-দ্বেষ ও ক্রোধ বসবাস করতে পারে না। দিব্যজ্ঞানী মানুষ কখনো কাউকে হিংসা করে না বা হত্যা করে না। প্রত্যেক মানুষের মন কার্যকারণের শৃঙ্খলবদ্ধ। সমাজের মানুষের সামাজিক দিক বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে যে মুসলমানের হিন্দুবিদ্বেষ ও হিন্দুর মুসলমানবিদ্বেষ অকারনে সৃষ্টি হয়নি। সদর্থকতা ও নঙর্থকতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ যে ভেদাভেদের উত্তাপ পরিবেশিত হয়েছে, তাতেই জন্ম নিয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ। কারণ প্রতিটি মানুষই নিজস্ব সম্মানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন। সেই কারণেই ধর্মের ঘোমটার আড়ালে বঞ্চিতা, প্রতারিতা নারী সম্মানের অন্বেষণ করে। বিধর্মীর অন্যায়-আচরণকে মানুষ ধর্মের দাড়িপাল্লায় বিচার করে, যেখানে সমাজনীতির নিয়ম নির্বাক দর্শক হয়ে থাকে। ধনীর ধর্ম তার নিজস্ব ইচ্ছা সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল হলেও হতে পারে, কিন্তু দরিদ্রদের ধর্ম চিরকালীন ন্যায়বোধ বলা যেতে পারে। সাম্প্রদায়িকতা বোধের ধারক, দুই পক্ষই চালিত হয় রাজনীতির যে অস্ত্র দ্বারা, তার নাম দেওয়া যেতে পারে – ধর্ম। সমাজের মানুষের ধারণা ধর্ম একত্র করতে পারবে, দারিদ্রতা দূর করতে পারবে, অপশাসনের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে পারবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের এই ধারণা সঠিক প্রমাণিত নাও হতে পারে। ফলে সাম্প্রদায়িকতা বোধের ভাবনায় ভাবিত দুই পক্ষই অত্যাচারিত হয়। বলা যেতে পারে সমাজের মানুষের এক বিরাট ভ্রম হ'ল সমাজে ধর্মের কারণে মানুষ নয়, মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রয়োজনেই ধর্ম। উদাহরণস্বরূপ উপন্যাসে বলা হয়েছে যে কখনো কখনো সন্ন্যাসীরা যেমন গন্তব্য বিস্মৃত হয়ে পথপ্রেমে নিমজ্জিত হয় এবং প্রেম যেমন অনুরাগকে বিস্মৃত হয়ে ইন্দ্রিয়সুখের আকর্ষণকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে, ঠিক তেমনই সমাজ তার সামাজিক পরিস্থিতিতে মানুষকে ভুলে ধর্মকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ত্যাগের জন্যই ত্যাগ নির্বাচন করা নয়, মানুষের সমাজে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য যে ত্যাগ তা অত্যন্ত মূল্যবান বলা যেতে পারে। তাই সারা পৃথিবীর সামাজিক মানুষের মনে মানবতার আলো ও প্রেম-প্রীতি-অনুরাগ মাধুর্য গঙ্গার স্রোতধারার মত যদি বহমান করে দেওয়া যায়, তাহলে হয়তো মানুষের জীবনের ধর্মের সামাজিকতায় এক সার্থক সাধনায় সিদ্ধিলাভ হতে পারে বলে মনে করা যেতে পারে। প্রতিটি সিদ্ধির পশ্চাতে লুকিয়ে আছে যুগ-যুগান্তরের বহু সাধকের সঞ্চিত কর্মফল। এক দীপ থেকে যেমন আর এক দীপ প্রজ্বলিত হয়, ঠিক তেমনি এক প্রতিভা আর এক প্রতিভাকে প্রস্তুত

করতে যোগসূত্রের কাজ করে থাকে। তাই সমাজের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য এ কথা বলা যেতে পারে। ধর্মের রাজনীতির সঙ্গে সামাজিক প্রথার একটা সম্পর্ক বর্তমান। খাদ্য আন্দোলন, জমি আন্দোলন মানুষকে কিছুটা সচেতন হতে সাহায্য করেছিল বলা যেতে পারে। উঁচু জাতের মানুষেরা নিচু জাতের মানুষদের দমন করে রাখবে, এ যেন সমাজের এক সামাজিক নিয়মের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। এই বিষয় নিয়েই ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর **'একলা চলো রে'** (২০১৬) উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের বয়ানে বলেছেন –

"এই চামারপাড়া হরিনামে সদামুখর। অনেকের গলাতেই বৈষ্ণবজনোচিত মালা। তুলসীর বা অন্য কাঠের। বয়স্কাদের কেউ রসকলিও করেছে। কীর্তনে লাগে, কিংবা কীর্তন ব্যতিরেকেও অন্যান্য দেবদেবীর স্তুতিমুখর গীতবাদ্যেও এসব চামড়া-নির্মিত বাদ্যযন্ত্র দরকার হয়। কখনও কাঠের খোলে, কখন পোড়ামাটির খোলে চামড়া আচ্ছাদিত করা হয়। কয়েক ঘর চামার আছে, যারা বাদ্যযন্ত্র তৈরি করে না, তবে এজন্য প্রয়োজনীয় চামড়া প্রস্তুত করে। গরু এবং ছাগলের কাঁচা চামড়া এরাই লবণ, ফটকিরি ইত্যাদি দিয়ে নমনীয় করে। এ পাড়ায় ঢুকলেই একটা বোটকা গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু যখন দেব আরাধনা হয়, ধুপ-ধুনো, চন্দন, অগরু এসব মিলে যে উচ্চমার্গীয় গন্ধ তৈরি হয়, তারই মধ্যে শ্রীখোলে হরেকৃষ্ণ ধ্বনি, সেখানে ওই বোটকা গন্ধের স্মৃতিটুকুও থাকে না।"

ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর **'একলা চলো রে'** (২০১৬) উপন্যাসে উপন্যাসপ্রাপ্ত যে তথ্য প্রাপ্ত হওয়া গেছে তা থেকে বলা যেতে পারে যে, মানুষের আত্মশক্তি হল সেই শক্তি, যা মানুষের ভবযন্ত্রনা জয় করার বাসনাকে তীব্র করে তুলতে পারে। মানুষের নিরাপত্তাবোধের অভাব, উৎকণ্ঠা সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই সৃষ্টি হয়। আর এই সমাজ ব্যবস্থা মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষের এই সৃষ্টিময় সৃষ্টিশীলতাকে স্তব্ধ করে দিতে পারার ক্ষমতা রাখে একমাত্র ধর্ম, এ কথা বলা যেতে পারে। তাই নিপীড়িত, অবহেলিত, শোষিত মানুষ সমাজের প্রভু শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ না করে, ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করাকেই জীবনের সহজ পন্থা বলে মনে করে থাকে। সেই কারণেই ধর্মকে দলিত শ্রেণীর আফিম এবং মানব মুক্তির প্রতিবন্ধক হিসেবে ভাবা যেতে পারে। কারণ নিরাপত্তাহীনতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ ধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়। বিষয়টা ঠিক যেন শৈশবকালের পিতা-মাতার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের সাথে সমার্থক মনে করা যেতে পারে। কিন্তু সমাজের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যখন সামাজিক নিরাপত্তাবোধের সন্ধান করে, তখন সে তার শৈশবে প্রাপ্ত বাবা-মায়ের কাছ থেকে পাওয়া সেই নিরাপত্তা আর পায়না। কারণ পিতা-মাতা তখন হয় মৃত বা বয়সের ভারে অশক্ত। তাই বলা যেতে পারে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময়

চক্রবর্তীর **'একলা চলো রে'** (২০১৬) উপন্যাসে, দলিত শ্রেণীর হরিনাম সংকীর্তনের সঙ্গে, নিজেদের হাতে তৈরি করা সৃজনশীল কর্ম, গরু-ছাগলের চামড়ার আচ্ছাদনে তৈরি বাদ্যযন্ত্র থেকে ওঠা সুর-তাল, তাদের দারিদ্র্যের ও সামাজিক পরিচিতির যন্ত্রণাকে বিস্মৃত হতে সাহায্য করে। তাদের আত্মনির্ভরতার সাথে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নাম-সংকীর্তন করাতে, তারা যেন সামাজিকভাবে আবার নিজেদের নিজেরাই আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়, যা সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর, প্রতিটি ব্যক্তির, ব্যক্তিগত ইপ্সারূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আর এই কার্যে সমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য এ কথা বলা যেতেই পারে।

সমাজে নারীর স্থান

প্রাগার্য সমাজব্যবস্থায় নারীর স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা ইতিহাসে বহু আলোচিত বিষয়। প্রাগার্য সমাজব্যবস্থায় নারীস্থান অত্যন্ত উন্নততর ছিল। এই সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। কিন্তু আর্যদের সময় থেকেই সমাজ মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল। ঋকবেদে সমাজ ধারণের নির্দেশ বর্ণিত রয়েছে। ঋকবেদে কয়েকজন নারী-ঋষি বা ঋষিকার নাম প্রাপ্ত হওয়া গেলেও তাকে আর্য সমাজের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। বৈদিককালে উপাসনার প্রধান বিষয় ছিল – গোষ্ঠীগতভাবে যাগ-যজ্ঞ করা। ধীরে ধীরে এই যাগযজ্ঞ করা বিষয়টি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। আর্য সমাজও, বৈদিক সমাজে পরিবর্তিত হয়ে, বর্ণধর্ম সমাজব্যবস্থায় প্রবেশ করার কারণে, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের আগমন ঘটে। যাগযজ্ঞে ব্রাহ্মণদের দান-দক্ষিনা হিসেবে তখন থেকেই গরু, ধনরত্ন, বস্ত্র, শস্য ও নারী প্রদান করা হতো। অর্থাৎ বস্তুর ন্যায় সমাজে নারীকে গণ্য করা হতো। দানপ্রাপ্ত সমস্ত নারী ভোগের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো না। তখন সেই উদ্বৃত্ত নারীদের পণ্যরূপে ও দাসীরূপে বিক্রি করে দেওয়া হতো। এভাবে নারীরা দাসীরূপে একই জীবনে বহু প্রভুর সম্পদে পরিণত হতো। তাহলে বলা যেতে পারে যে, এই সময় থেকেই নারীর সম্মানের অবনমন শুরু হয়েছিল। ইতিহাসের শুরু থেকেই সমাজের কাঠামোর পরিবর্তন হওয়া সত্বেও, নারী ও শ্রমজীবী মানুষকে একই শ্রেণীভূক্ত মনে করে শোষণ করার প্রচলন চলে আসছে। পরবর্তীকালে ক্রমে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতার উদয় হলেও, নারীদের সচেতনতা সেভাবে বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণে, তারা বংশপরম্পরায় দাসত্ব করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যা বর্তমানকালেও

অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে করা যেতে পারে। ঔপন্যাসিক তাপস রায় **'পোড়ামাটির দেউল'** (২০১৬) উপন্যাসে উপন্যাসস্থিত চরিত্র ছিদাম সূত্রধরের বয়ানে –

"নতুন বউ ঘরবার-ঘরবার করছে আজ। কেন যে কেউ নেই। কত্তামশাই সেই সকাল দশটায় বেরিয়েছেন, দিনের আলো ঝরে গিয়েছে কখন, কিন্তু এখনও তো দেখা নেই। মাস ছয়েক হয়েছে বিয়ে হয়েছে। বাপের খুব ন্যাওটা ছিলো সে। এতোটা বয়স হয়েছে, বিয়ে দিতে পারেনি বলে বাপটার তেমন কোনও চিন্তা ছিল না। তারা তো আর কুলীন ব্রাহ্মণ নয়, শূদ্র। ফলে বিয়ে নিয়ে মনুর বিধিনিষেধ তাদের জাতে তেমন করে বেড়া তুলে রাখেনি।"

ভারতবর্ষে মনু হলেন সবচেয়ে আলোচিত শাস্ত্রকার। মনুসংহিতা ভারতবর্ষের ধর্মশাস্ত্র গুলির মধ্যে এক অন্যতম প্রধান শাস্ত্র। কিন্তু মনুর নিদানে সেকালের বাংলার উচ্চ সমাজে 'গৌরীদান' এর হিড়িকে গোটা বাংলা ভেসে গিয়েছিল। 'গৌরীদান' অর্থাৎ অষ্টমবর্ষীয়া শিশুকন্যাকে বিবাহ দেওয়ার রীতি। এই রীতি শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের মেয়েদের জন্যই প্রচলিত ছিল। নিম্নবর্ণের মেয়েদের জন্য গৌরিদানের রীতিটি প্রচলিত ছিল না। মনু রচিত জেলখানায় বাংলার উচ্চবর্ণের মেয়েরা অন্ধকারের বাসিন্দা হয়ে থেকেছে। মনুর নিদানে 'কন্যাপণ' বিষয়টিকেও সেখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল যার নঙর্থক পরিনাম বর্তমান সমাজব্যবস্থাতে আজও উপস্থিত। সমাজে নারীর স্থানকে উল্লেখ করে, ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন **'মৌসুমী সমুদ্রের উপকূল'** (২০১২) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র প্রমথনাথ, উপন্যাসের আর এক চরিত্র ত্রিপুরাকে বলছেন–

"সমাজে কৌলিন্য প্রথার কঠোরতায় দেশে উচ্চবর্ণীয়দের অনেকেরই বিয়ে করা দায় হয়ে উঠেছে। কুলীন পাত্রদের বিবাহ-ব্যবসা সমাজে একটা নৈরাজ্য তৈরি করেছে। একজন কুলীন ব্রাহ্মণের শতাধিক স্ত্রী গ্রহণও কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয় এখন। এমনও দেখা যায় যে বারো বছরের কুলীন পুত্র পনেরোটি কুলীন কন্যার কুল রক্ষা করেছে যাদের কয়েকজন তার মায়ের বয়সি। কৌতুকের গল্প এমনও শোনা যায় যে কোনো কুলীন বালকের স্ত্রীরা তাদের বরের মুতো কাঁথাও ধোয়, নাওয়ায়, খাওয়ায় এবং ঘুম পাড়ায়।....সেই কিশোর বয়সে ত্রিপুরার দুই দিদি এবং দুই পিসির, যারা আবার বৈবাহিক সূত্রে পরস্পরের সপত্নী ছিল, একত্রে সতী হয়ে পুড়ে মরার দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। উঃ। কী বীভৎস দৃশ্য।"

উপরোক্ত উপন্যাসে সেকালের সমাজের নারীশোষণের বিষয়টি অত্যন্ত মর্মভেদী হয়ে উঠে এসেছে। সেকালের সমাজে কৌলিন্য প্রথার কঠোরতার কুঠার দেশের উচ্চবর্ণীয় কুলীন কন্যাদের কাছে যেন একপ্রকার মৃত্যুর পরোয়ানার মতন

বিষয় ছিল। কুলীন পাত্রদের বিবাহ-ব্যবসা সমাজে একটা নৈরাজ্য তৈরি করেছিল। একজন কুলীন ব্রাহ্মণের শতাধিক স্ত্রী গ্রহণও সেকালের সমর্থনযোগ্য বিষয় ছিল। এমনও দেখা গেছে যে বারো বছরের পুত্র পনেরোটি কুলীন কন্যার কুল রক্ষা করেছে, যাদের কয়েকজন তার মায়ের বয়সি। এই সমস্ত বিবাহিত নারীদের কোনো সুস্থ বিবাহিত জীবন থাকত না। তারা নামমাত্রই বিবাহিতা বলে পরিচিতা হতেন। সেকালের বাল্যবিবাহ প্রথার মতই, এই কৌলিন্যরক্ষার বিবাহও, একটি হৃদয়বিদারক ও নারী অসম্মানের প্রথা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। আরেকটি মনুষ্যত্বহীন ও মর্মভেদী প্রথা ছিল – সতীদাহ প্রথা। এই সতীদাহ প্রথায় উপন্যাসবর্ণিত যে ঘটনাটি প্রাপ্ত হওয়া যাচ্ছে তা হ'ল, এক জরাজীর্ণ পুরুষ মৃতদেহের সঙ্গে জীবন্ত ছ'জন নারীকে, যারা সেই মৃতদেহের স্ত্রী বলে পরিচিতা, সতীদাহের নামে তাদেরও পুড়িয়ে মারা হবে। এই ছ'জনের মধ্যে তিনজনই যুবতি। সেইকারণে চারিদিকে অসংখ্য মানুষ জড়ো হয়েছেন, সেই অমানবিক দৃশ্যকে অবলোকন করবেন বলে। প্রায় জনাত্রিশেক ঢাকি একনাগাড়ে, সারিবদ্ধভাবে ঢাক বাজিয়ে চলেছে। ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রোচ্চারণ করে তাদের তথাকথিত ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপে ব্যস্ত হয়ে আছে। এয়োস্ত্রীরা সিঁদুর, আলতা, উলুধ্বনি, শঙ্খ-ঘন্টা বাজিয়ে চলেছে। এর মধ্যেই জ্বলে উঠেছে সেই নরকরূপ চিতা। সেই চিতায়, ওষুধ প্রয়োগে নেশাগ্রস্ত মৃতব্যক্তির স্ত্রীদের আগুনে ঠেসে ধরে পোড়ানো হচ্ছে। যাতে তারা পালাতে না পারে, সেইকারণে তাদের দেহে বাঁশ দিয়ে আঘাত করে, পুনর্বার আগুনে ফেলে ঠেসে ধরে রাখা হচ্ছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ না হয়ে যাচ্ছে। এই বীভৎসতাকে 'ধর্মীয়' আখ্যা দিয়ে ধর্মীয় মাহাত্বে পরিণত করার প্রচেষ্টাকে, সেইসময়ে জমায়েত হওয়া কোনো মানুষেরই তীব্রভাবে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা প্রদর্শনের ক্ষমতা ছিল না। কারণ সমাজ তাকে মান্যতা দিয়েছে। যেকোনো কদাচার, জিঘাংসা, বিকৃতকামচর্চা, প্রাণবধ এই পাপাচারগুলিকেও সমাজে সেকালে মান্যতা দিতে ও সর্বসাধারণের আরাধ্য করে তুলতে, উপরোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে ধর্মকে জুড়ে দেওয়া হতো। আর এই উপরোক্ত ধর্মীয় বিষয়গুলিতে ধর্মের নামে নারীশোষণই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, বলা যেতে পারে। নারী শোষণের কথা উল্লেখ করে ঔপন্যাসিক হাসান আজিজুল হক তাঁর **'সাবিত্রী উপাখ্যান'** (২০১৪) উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের বয়ানে –

"বামুনের মেয়ে সাবিত্রী মোসলমানের হাত থেকে মোসলমানের হাতে বদল হচ্ছে, যতদূর জানা গিয়েছে তার শঙ্খ-নোয়া কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সিঁদুর মুছে দেওয়া হয়েছে, গোমাংসও খাওয়ানো হয়েছে।....মেয়েরা এমনিতেই পৈতৃক সম্পত্তির কোন ভাগ পায় না।"

ঔপন্যাসিক হাসান আজিজুল হকের **'সাবিত্রী উপাখ্যান'** (২০১৪) উপন্যাসে, যে তথ্য উঠে আসছে তা থেকে বলা যেতে পারে যে, সেইকালে নারীদের নারীত্বকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কখনোই সম্মান প্রদর্শন করেনি। নারীর অস্তিত্বের ক্ষেত্রে কোনো নীতিবোধ কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে, পুরুষতন্ত্র তেমনভাবে মনে করত না। নারীদের স্বধর্মীয় ও বিধর্মীয়দের হাতে সমানভাবে অসম্মানিত ও অপমানিত হতে হতো। সাধারণত সমাজে নারীরাই সব রকম ধর্মীয় কুসংস্কারের শিকার হয়ে থাকে এবং স্বেচ্ছায় নিজেদের সমস্ত রকমের প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতের যন্ত্রে পরিণত করে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন, সংকীর্ণমনা পুরুষরাই, নারীদের তথাকথিত প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতের যন্ত্রে পরিণত হওয়ার কারণে দুঃখ প্রকাশ করে থাকেন বটে, কিন্তু যে কারণে নারীদের এই অসন্মানজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তা দূর করার জন্য তারা নিজেরা সেভাবে কোন সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। কারণ তারা নিজেরাও, নিজেদেরকে তাদের নিজেদের অজান্তেই বা সচেতনভাবেও প্রকৃত সংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিরূপেই গণ্য করে থাকেন, এ কথা বলা যেতে পারে।

ধর্মীয় দিক

ধর্ম এবং ধর্মীয় ভাবের মাধ্যমেই মানুষের চেতনবৃত্তি বা মনের প্রকাশ ঘটে। তাই ধর্মের স্বরূপ জানতে গেলে মানুষের মনের স্বরূপ এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ। ধর্ম ও মানুষের জীবন এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্বন্ধিত। আদিম মানুষের ধর্ম ও সভ্য মানুষের বিবর্তিত ধর্মের মধ্যে সমতা না থাকলেও তাদের মধ্যে এক যোগসূত্র বা ঐক্যসূত্র বর্তমান, যাকে মনস্তাত্ত্বিক যোগসূত্র বলা যেতে পারে। মানুষের মনের অনুভূতি, আবেগ, প্রবৃত্তি, ধারণা – এই সহজাত মানসিক উপাদানগুলিই ধর্মের উৎসরূপে গণ্য হতে পারে। মানুষের ষষ্ঠেন্দ্রিয় মনকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। চেতন মন, অবচেতন মন। চেতন মনের প্রবৃত্তিগুলি, অবচেতন মনের সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। তাই বলা যেতে পারে মানুষের অবচেতন মনের স্বাভাবিক চিন্তনক্রিয়ার কারনেই, মানুষের মনে ধর্মভাব জাগ্রত হয় এবং এর থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়। ফলে ধর্মভাব যদি মানুষের মধ্যে সহজাত বৃত্তি বলেই মেনে নেওয়া যায়, তাহলে একথা স্বীকার করতে হতে পারে যে, ধর্মভাব মানুষের স্বভাবের মধ্যেই সুপ্ত অবস্থায় নিহিত থাকে। সেই কারণেই স্বাভাবিকভাবেই মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মের আশ্রয়কে গ্রহণ করে থাকে। এখন মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ধর্মের প্রকৃত অর্থ কি? ঔপন্যাসিক কল্পনা রায় ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপণের

ক্ষেত্রে তাঁর **'সেই সময় পেরিয়ে'** (২০১২) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র ডেভিড স্কট তার বন্ধু বিডনকে বলছেন –

" – বলতো ধর্ম মানে কী? বিডনকে নীরব দেখে বললেন, 'ধৃ' একটি সংস্কৃত ধাতুরূপ। বিডন কথাটিতে গুরুত্ব দিলেন না।....ডেবিট কি আজকাল সংস্কৃত পড়ছে? বিডন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন....স্কট গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলে যাচ্ছেন.....ধর্ম শব্দটি সংস্কৃত 'ধৃ' থেকে এসেছে। যেমন Riligion শব্দটি ল্যাটিন Religard শব্দ থেকে। ইংরেজি রিলিজিয়ান কথাটির প্রতিশব্দ ধর্ম। বিডনকে অবাক হয়ে তাকাতেই দেখে স্কট বললেন Religion relays psychophysical co-ordinating strength of the people and makes them interested.মানসিক ও শারীরিক অবস্থিতি একই সঙ্গে......কিন্তু সেই Religion এর বাংলা এসেছে 'ধৃ' ধাতু থেকে। যার মানে, ধরে থাকা 'Hold'।"

উপরোক্ত উপন্যাসপ্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, যে বিধান, যে নীতি অস্তিত্বকে ধরে রাখে তাই ধর্ম। আর নীতির অস্তিত্বকে ধরে রাখে মানুষের মন। উপনিষদেও বলা আছে, মূর্খরাই অনুষ্ঠানকে ধর্ম বলে বিবেচনা করে। অথচ সেই আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিষয় নিয়েই সমাজে ধার্মিকতার প্রচার প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থহীন কুসংস্কার, লোকাচার, আনুষ্ঠানিক পুজো-আচ্চায় ধর্মকে বিকৃত করে রাখা হয়েছে বলা যেতে পারে। হিন্দুধর্ম কোনও একক মানব প্রচারিত ধর্ম নয়, অগণিত ঋষিদের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অনুভব আর অনুভূতির জ্ঞানের সমষ্টিগত রূপই হ'ল হিন্দুধর্ম। সকল মানুষের সমানভাবে অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার এখানে স্বীকৃত। তাই প্রকৃত ধর্মের ধারক হ'ল মানুষের মন। মানুষের মনেই ঈশ্বরের বাস, বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর **'সাধের ময়না'** (২০১৫) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র অভয়ানন্দ উপন্যাসের আরেক চরিত্র পরমেশ্বরকে মৃত্যু প্রসঙ্গে বলছেন –

"আপনি যে পথে এগোচ্ছেন, সেই পথে এগিয়ে ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। সেল্‌ফ আর সোলকে তিনি আলাদা করে ফেলেছিলেন। আত্মবোধ মানে আত্মা নয়। যদি কেউ বলেন আমার দেহে আত্মার অবস্থান, সেই আত্মা আমাকে পরিচালিত করছেন, আমার চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করছেন তাহলে তিনি ভুল বলছেন। দিস ইজ এ রং ডকট্রিন, লিভিং টু কনফিউশন অ্যান্ড ডার্কনেস। তাহলে কি আছে দেহে! আছে মন। এই মনকে যদি কেউ আত্মা বলে মানেন আর মনের অবস্থানকে স্বীকার করেন, তাহলে তাঁর সত্যদর্শন সম্ভব।"

দেহের সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে দেহের সঙ্গে মন এবং ইন্দ্রিয় এই দুই সত্ত্বাকেই স্বীকার করতে হবে বলা যেতে পারে। কারণ মানুষের ইন্দ্রিয় দিয়ে যা বোধগম্য হয়, মন দিয়ে সেই বিষয়েই আর এক প্রকার বোধগম্যতা আসে। মন হলো আধ্যাত্মিক চেতনার আধার। ইন্দ্রিয়ের জগতও একেবারে আধ্যাত্মিকতা শূন্য নয়। মন

থেকেই বোধির উৎপত্তি। এই বোধি মানুষের সমস্ত অস্তিত্বের নিয়ন্ত্রণকারী এক বিশাল সত্যসন্ধানী, মননশীল চেতনা। মৃত্যু এক মহাসত্য যা একই সাথে দেহ ও অস্তিত্ব হারানোর ভয়ে ভীতিপ্রদ। এই ভয় থেকে মুক্তি পেতে হলে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, শঙ্করের দর্শন মায়াবাদের আশ্রয় নিতে হতে পারে। শঙ্কর বুদ্ধের ভাবনারই দর্পণ। বুদ্ধ বলেছেন, সমস্ত কিছুই ক্ষণজন্মা। শঙ্কর বলেছেন, জগত সংসার সাময়িক। আত্মদর্শন অর্থাৎ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া যিনি অবস্থান করছেন তিনি হলেন অবিনাশী আত্মা বা ব্রহ্ম। এই আত্মা অবিনাশী। তাই সেই আত্মাকে মন বা চেতনা যাই বলা হোক না কেন, তার বিনাশ নেই। গৌতম বুদ্ধ 'সেলফ্' আর 'সোল'– কে আলাদা করে ফেলেছিলেন। 'আত্মবোধ' মানে 'আত্মা' নয়। যদি কেউ মনে করেন তাঁর দেহে আত্মার অবস্থান, সেই আত্মাই তাঁকে পরিচালিত করছেন, তাঁর চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করছেন, তাহলে তিনি সঠিক ভাবনায় ভাবিত নন। দেহে অবস্থান করে মন। এই মনকে যদি কেউ আত্মা বলে মানেন, আর মনের অবস্থানকে স্বীকার করেন, তাহলে তাঁর সত্যদর্শন সম্ভব হতে পারে। বৌদ্ধধর্মেও বলা হয় মনই চেতনা। এই চেতনারূপ আত্মা, পরমাত্মার সকাশে যখন মহানন্দে অনন্ত আকাশে ওড়ে, তখন মৃত্যু আর ভীতিপ্রদ থাকেনা। মৃত্যুই তখন একমাত্র কাম্য হয়ে ওঠে। বৌদ্ধ ধর্মেও ভগবান বুদ্ধ তাই বলেছেন – "মরতে শেখো"। এই মৃত্যুর অর্থ শুধুমাত্র দেহত্যাগ নয়। মৃত্যুর অর্থ আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন। সচ্চিদানন্দ সাগর অর্থাৎ সৎ-চিৎ-আনন্দ সাগরের মধ্যে মানুষের অস্তিত্বের 'আমি' নামক জলপূর্ণ ঘটটি রয়েছে। যতক্ষণ এই ঘট রয়েছে ততক্ষণ যেন দু ভাগ জল। অর্থাৎ ঘটের ভেতরে একভাগ, বাইরে আর একভাগ। ঘট ভেঙ্গে গেলে ভেতরের জল ও বাইরের জল একাকার। অর্থাৎ ভেতরের জলরূপ আত্মা ও বাইরের বিশাল সাগরের জলরূপ পরমাত্মার মিলন। এই ঘট ভাঙ্গা প্রক্রিয়াটি হ'ল মৃত্যু। তাই বলা যেতে পারে মৃত্যু এক অসাধারণ ও অপূর্ব জীবনবোধ। কারণ মৃত্যুকে বলা যেতে পারে – অংশের সাথে পূর্ণের মিলন। এই মিলনে চিত্তশুদ্ধি এক প্রধান উপাচার। ঔপন্যাসিক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় তাঁর **'জ্যোতির্গময় ও সুনয়নী'** (২০১৩) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র সমীর তার বাবার কাছে জানতে চায়–

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহি।।

– ওসব কি সত্য, বাবা? আমার তো বিশ্বাস হয় না – সমীর অকস্মাৎ বলে বসলো। বাবা হাসলেন। বললেন,– বিশ্বাসের কথা তো নয় বাবা, এসব অনুভবের বস্তু। তবে আমাদের সাধারন লোকের অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করার জন্য শাস্ত্রোপদেশ।"

'জ্যোতির্গময় ও সুনয়নী' (২০১৩) উপন্যাসে যে তথ্য জ্ঞাত হওয়া যায় তা হ'ল – সাধারণ মানুষের অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করার কারণেই শাস্ত্রোপদেশ। মানুষের মনের অবিশ্বাসের ময়লা পরিষ্কার করে – জ্ঞান। সেই জ্ঞানের প্রথম সোপান – শাস্ত্রোপদেশ অর্থাৎ ন্যয়, দর্শন, বেদ-বেদান্ত। যে সমস্ত মুনি-ঋষিগণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা এই শাস্ত্রোপদেশ দিয়ে গেছেন তাঁরা বিশ্বাস করতেন, মানুষ মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকেন। কারণ শরীরের মৃত্যু হলেও আত্মা অবিনশ্বর। তাই তাঁরা পার্থিব জীবনের ভোগ-সুখের দিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত দৃষ্টি দেননি। তাঁরা জীবনের পর জীবন – অর্থাৎ অনন্ত জীবন প্রবাহের কল্যাণের দিকেই মূল দৃষ্টি দিয়েছিলেন। আর সেই কল্যাণের পথও আবিষ্কার করে গেছেন। সেই পথ হল যোগের পথ। কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ। সেই জ্ঞানময়কে জ্ঞাত হলেই সমস্ত অজ্ঞানতার নাশ হবে এবং জীব চিদানন্দ লাভ করে, সেই 'সচ্চিদানন্দ' স্বরূপে মিশে যেতে পারবে। জীবের স্থূল শরীরের মৃত্যু হয় মাত্র। সূক্ষ্ম শরীরের মৃত্যু বা বিনাশ হয় না। স্থূল শরীর জীবাত্মা পরিত্যাগ করে। জীবাত্মার মৃত্যু হয় না, জীবাত্মা অমর। জীবাত্মার শেষ পরিণতি ব্রহ্মলাভ। জীবের কর্মফল, সংস্কার, অভিমান, 'আমিত্ব'– এর কারণেই জীবকে ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করতে হয় বলা যেতে পারে। ঈশ্বরই বিশ্বাস করান, অনুভূতি জাগান, জ্ঞান প্রদীপ জ্বেলে দেন। জ্ঞানময়কে জ্ঞাত হলেই মানুষ জ্ঞাত হবে, মৃত্যু নয়, আছে লোক থেকে লোকান্তরে অভিযান। যথা – দেবযান, ধূমযান, ঐশ্বীযান। যার যেমন কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান – সে সেইরকম লোক থেকে লোকান্তরের অভিযানের শেষে, সেই পরব্রহ্মলোকে যাবেই, ঈশ্বরের এটাই লীলা। মুণ্ডক শ্রুতি বলেন – বাক্য, মেধা বা শাস্ত্রচর্চায় ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ভক্ত হৃদয়ে ঈশ্বর প্রকট হন। ঈশ্বর নির্গুণ অবস্থায় ব্রহ্ম, আবার সগুন অবস্থায় ঈশ্বর। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, শিব, কালী, দুর্গা অনন্ত কোটি নাম উপাধিধারী একই ঈশ্বর। সবেতেই তিনি, তিনিই সব। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই পরব্রহ্মের জন্যই কোটিকল্প ধরে তপস্যা করেছেন। ঔপন্যাসিক সুজিত কুমার ঘোষ তাঁর **'ব্রজেশ্বরী'** (২০১৩) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র অর্জুন এবং কৃষ্ণের মধ্যে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, মহানুভব গুরুজনদের নিজ হাতে হত্যা করার প্রসঙ্গে, ধর্ম ও অধর্ম পৃথক করার উপায় হিসেবে যে কথোপকথন হয়েছিল, তা থেকেই শ্রীকৃষ্ণের মহামূল্যবান উপদেশ বা শ্রীমদ্ভাগবতগীতার সৃষ্টি। সেই উপদেশের কিছু অংশ হ'ল –

"অর্জুন বলল, হে মধুসূদন, পূজনীয় ভীষ্ম কিংবা আচার্য দ্রোণকে আমি কিভাবে শরাঘাত করব? মহানুভব গুরুজনকে হত্যা করার চেয়ে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়। আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছি, কোনটা ধর্ম কোনটা অধর্ম তা পৃথক করার ক্ষমতা আমার লোপ

পেয়েছো। তুমি আমাকে বল কেশব, কেন আমি আত্মীয়স্বজন ধ্বংসকারী ভয়ংকর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব? কৃষ্ণ বলল, যারা অশোচ্য তাদের জন্য শোক করছো, আবার জ্ঞানের কথা ও বলছ। শোনো পার্থ, মৃত বা জীবিত কারোর জন্য জ্ঞানীরা কখনও শোক করে না। তুমি মনে রেখো, দেহধারী আত্মার যেমন এই দেহে কৌমার যৌবন জরা আসে, সেইভাবে দেহান্তর প্রাপ্তিও ঘটে। ধীর ব্যক্তি তাতে মোহগ্রস্ত হয় না। আত্মা সমগ্র বিশ্বে ব্যপ্ত, তাকে অবিনাশী জেনো।"

হিন্দুধর্মে ঈশ্বর, আত্মা, কর্মফল,পরলোক ও জন্মান্তর বিশ্বাস বর্তমান। মানুষ যেমন জন্মগ্রহণ করে, ঠিক তেমনিই মৃত্যুর পর তার দৈহিক অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে, একথা সর্বৈব সত্য। আর মানুষের অভিজ্ঞতা তাকে জ্ঞাত করায় যে, দেহের রোগ, জরা ও মৃত্যু অনিবার্য। তাই বলা যেতে পারে যে, মানুষের অবধারিত মৃত্যুর জন্যে, মানুষের জীবন-বিচ্ছেদের যে ভীতি, তার থেকে মুক্তির উপায় হল – আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করা। সেই কারণেই হয়ত প্রাচীনকাল থেকেই শাস্ত্রকারগণ মানুষের অনন্তকাল বেঁচে থাকার সীমাহীন সুপ্ত বাসনাকে চরিতার্থ করার উপায় হিসেবেই আত্মা, পাপ-পুণ্য, কর্মফল ও জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব, আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উপনিষদের সময় থেকেই আত্মা, পরমাত্মা ও জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছে। মনুস্মৃতি, শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, এমনকি রামায়ণ ও মহাভারতেও আত্মার অস্তিত্ব ও জন্মান্তরের কথা স্বীকৃত। বিশেষত শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, বিষাদগ্রস্ত অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অমোঘ বাণীগুলিতেও আত্মার অবিনশ্বরতাকে স্বীকার করা হয়েছে। তাই অনিবার্যভাবে আগত মৃত্যুর সামনে দণ্ডায়মান মানুষের কাছে আত্মার অবিনশ্বরতার তত্ত্ব সাদরে গৃহীত হয়েছে। তবে এই জন্মান্তরবাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে পাপ-পুণ্য এবং কর্মফলের বিষয়টি। অর্থাৎ ইহজন্মের পুণ্যফলে মানুষ স্বর্গ অথবা নরকবাসী হবে এবং সঞ্চিত পুণ্যক্ষয় বা পাপক্ষয়ের পরে স্বর্গবাস বা নরকবাস কাটিয়ে, আবার নতুন জীবন ধারণ করে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে। এভাবেই মানুষের জন্ম-মৃত্যু চক্র প্রবহমান। উপন্যাসে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, যে জন্মেছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং একইভাবে মৃত ব্যক্তিও পুনরায় জন্ম গ্রহণ করবেন। কিন্তু আত্মা কখনোই জন্মগ্রহণ করেন না বা মৃত হন না। আত্মা জন্মহীন, নিত্য, অক্ষয়, অনাদি পরমাত্মার অংশবিশেষ। মানুষ যেমন জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করে নতুন পরিধান পরিগ্রহ করে থাকে, ঠিক তেমনি নবজন্মের মাধ্যমে আত্মা জীর্ণদেহ ত্যাগ করে নবকলেবর ধারণ করে থাকে। সেই কারণেই জন্মের মত অপরিহার্য মৃত্যুকে নিয়ে শোক করার কোনো অর্থ হয় না এ কথা বলা যেতে পারে। আবার একথাও বলা যেতে পারে যে প্রত্যেকটি জীব আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত,

মৃত্যুর পরে আবার অব্যক্ত। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সাধুগণের পরিত্রাণ আর দুষ্কৃতগণের বিনাশের সঙ্গে ধর্ম সংস্থাপনের কারণেই তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। – শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনকে ৭ নম্বর ও ৮ নম্বর শ্লোকে উপরোক্ত কথারই উল্লেখ করেছেন।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।।৭

হে ভারত! যখনই ধর্মের হানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি এবং সাকাররূপে জনসমক্ষে প্রকট হই। ৭

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।।৮

সাধুদের রক্ষার জন্য, পাপীদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ৮

ঔপন্যাসিক নবকুমার বসুর **'শ্রীময়ী মা'** (২০১৪) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা মায়ের মধ্যে, ভৈরবী মায়ের চোখের জল ফেলা প্রসঙ্গে যে কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে তা হ'ল –

"হ্যাঁ গা, মনটা ভালো নেই, না? সারদা কিছু না বলে প্রথমে ঘাড় নাড়ল। তারপর বলেই ফেলল, মা ঠাকরুণ চোখের জল ফেলতে ফেলতে চলে গেলেন...। ওহ্, সেই কথা! সামান্য হাসলেন রামকৃষ্ণ। সারদা বলল, তিনি খুব জ্ঞানী, ভক্তিমতী, অথচ...শেষ করতে না দিয়েই রামকৃষ্ণ বললেন, সেই জন্যই কেঁদেছেন। তাঁর কাছে যে কাঁদতে হয়। মনের ময়লা ধুয়ে গেলে তাঁর দর্শন হয়। তিনি তো সন্ন্যাসিনী, তাঁর মনে কি ময়লা থাকতে পারে? তা কি করে বলব বাপু! তবে এই বুঝি, মনটি আমাদের যেন মাটি মাখানো লোহার ছুঁচ, আর ঈশ্বর হচ্ছেন চুম্বক। ছুঁচের মাটি সরে গেলেই, ঈশ্বর চুম্বক তাকে টেনে নেবেন। অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হলেই ঈশ্বরদর্শন হবে।"

'শ্রীময়ী মা' (২০১৪) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদার মধ্যে ভৈরবী মায়ের চোখের জল ফেলা প্রসঙ্গে যে কথোপকথন প্রাপ্ত হওয়া গেল, তার সারাৎসার হিসেবে বলা যায় যে, চিত্তশুদ্ধিই ঈশ্বর দর্শনের পথ। সংসারে থেকেও ঈশ্বর উপলব্ধি ও চৈতন্য সম্ভব। ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে সংসারের কাজ করতে হবে। অর্থাৎ কর্ম ও ধর্মকে মেলাতে হবে। ঈশ্বর বাইরে কোথাও নেই। তিনি মানুষের অন্তরেই বাস করেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি, তিনিই অন্তঃসত্ত্বা। ঈশ্বর মানুষের

অন্তরেই যখন থাকেন তাহলে মানুষের বাসনা, অহংকার, ভয়, হিংসা, লোভ, সংশয় এসব এসে মানুষের জীবনকে, মানুষেরই হাতছাড়া করে কিভাবে? ঠাকুর বলেছেন – এরই নাম আত্মবিস্মৃতি। ঈশ্বর মানুষের আত্মপুরুষ। মানুষের মনই তাঁর বাসস্থল। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়াই হচ্ছে যোগ, সাধনা। সঠিক যোগ করতে পারলে ঈশ্বরও অন্তরে নিজের অবস্থান দৃঢ় করবেন। একই দেহগাছের দুটি ডালে, দুটি পাখির মত বসে আছে জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মা ভোগী, শক্তিহীন। পরমাত্মা, শুধু দর্শক। পরমাত্মার সেবা, উপাসনা করলে যে আনন্দ হয়, তাই হ'ল যোগসাধনা। এভাবেই পরমাত্মার সাথে জীবাত্মা এক হয়ে যায়। ঔপন্যাসিক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত **'প্রানসখা বিবেকানন্দ'** (২০১৭) উপন্যাসে, উপন্যাসস্থিত চরিত্র নরেন ওরফে নরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেন। কারণ নরেন মন থেকে যুক্তিবাদকে মেনে নিয়েও নিজের মন থেকে অভাববোধ, শূন্যতা, রিক্ততা কোনকিছুকেই মুছে ফেলতে পারছেন না। তাঁর শুধু একটি কথাই বারবার মনে হচ্ছে মনুষ্যজন্মে যদি ঈশ্বরের দেখা না পান, তাহলে আর কি লাভ! তাই এই প্রসঙ্গে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরো অনেক সাধক, যোগীকেই সরাসরি প্রশ্ন করলেন যে, তাঁরা ঈশ্বরকে দেখেছেন কিনা! সকলেই এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শুধুমাত্র নীরবতাই উত্তর দিলেন। এরপরে তিনি দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপরোক্ত প্রশ্ন নিয়ে ছুটে গেলেন। "আপনি কি ঈশ্বরকে কখনও দেখেছেন?" সহজ সরল উত্তর পেলেন –

"– ভগবানকে কখনও দেখেছি কি রে? তার সঙ্গে তো ঘর করি। তাকে তো সবসময়ে দেখছি।
– কীভাবে দেখছেন? নরেনের মুখ থেকে আবার বেরিয়ে এল প্রশ্ন।
– তার সঙ্গে কথা বলেন? নরেনকে জানতেই হবে। ভগবানের সঙ্গে কথা বলা যায়?
– হ্যাঁ রে, যার সঙ্গে ঘর করি, তার সঙ্গে কথা না বলে থাকি কী করে?
– কিন্তু ভগবান কি আপনার সঙ্গে কথা বলে?
– দ্যাখ দেখি, ভগবানও তো আমার সঙ্গে ঘর করে। আমার সঙ্গে কথা তো তাকে বলতেই হবে। আমাদের মা ব্যাটার সম্পর্ক। শুধু কি কথা? মান-অভিমান, রাগ আদর ভালোবাসা এসব নিয়েই তো মা-ছেলের রোজের সংসার। নরেনের আর কোনও প্রশ্ন নেই।"

'প্রানসখা বিবেকানন্দ' (২০১৭) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন – ব্রাহ্মধর্ম ভগবান লাভের একটি যুক্তিসম্মত পথ দেখাবার চেষ্টা করেছে। এই ধর্ম আচার নির্ভর নয়। এই ধর্ম নৈতিকতার উপর জোর দেয়। নিয়মিত ভজন, প্রার্থনা, স্বাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গ। ব্রাহ্মধর্মে গুরুবাদ বা অবতারবাদের স্থান নেই। শাস্ত্রের দোহাই নেই। আছে যুক্তিবাদ। কিন্তু এখানেও নরেন তাঁর মনের প্রশ্ন –

“আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন কি” – তার যথার্থ উত্তর পাননি। তাই অনেক মহর্ষি, সাধু-যোগী সবার কাছে যখন তাঁর প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে, তিনি দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন এবং সরাসরি এই প্রশ্ন করে, যে উত্তর পেয়েছিলেন, তাতে বলা যেতে পারে যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভারতবর্ষের এমন একজন মানুষ, যিনি নিরাকারকে শুধু উপলব্ধি করেননি, তিনি দেখতেও পেতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণদেব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন। লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু জ্ঞানী। তিনি সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে এই জ্ঞানলাভ করেছিলেন। এমন সাধনালব্ধ আলো ভুবনে দুর্লভ। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যান্য জ্ঞানীদের, যোগীদের মতো ঈশ্বরদর্শনের প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন না। তিনি ঈশ্বর দর্শনের প্রশ্নে, অত্যন্ত সহজ-সরল ভাবে উত্তর দিতেন। তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলেন, এমনকি ঘরও করেন। ঈশ্বরও তাঁর সঙ্গে ঘর করেন। আর সেই কারণেই, ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জানিয়েছিলেন, কিভাবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। তিনি শিশুর সারল্যের সঙ্গে বলেছিলেন, ঈশ্বরকে চাইলেই পাওয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বরকে চাওয়ার মানুষ পাওয়া যায় না। মানুষ বিপদে পড়লে মন্দিরে পুজো দেয়, মানত করে, কিন্তু সেটা প্রকৃত ঈশ্বরচাহিদা নয়। মানুষ নিজের আপনজনদের জন্য কাঁদে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কখনো কাঁদে না। সরলভাবে ঈশ্বরের জন্য কাঁদলে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই দেখা দেবেন। ঈশ্বর ঐশ্বর্যের বশ নন। তিনি ভক্তির বশ। ঈশ্বর ভক্তের কাছে – ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য এইগুলিই চান। ঈশ্বর পাওয়ার অর্থ ঈশ্বরে মিশে যাওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দের বক্ষস্থল কোমলভাবে স্পর্শ করে, তাঁকে সমাধিস্থ হতে সহায়তা করেছিলেন। বিবেকানন্দের নয়ন সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়েছিল সৃষ্টির আদি রহস্যের সত্য। আড়াল সরে গিয়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন ঈশ্বর। বিশ্ব-ভুবন জুড়ে তখন কোথাও বিচ্ছেদ, মৃত্যু, অন্ত নেই। প্রতিটি মানুষ সকল মানুষকে স্পর্শ করে আছে যেন। সকলেই একই মালার এক একটি ফুল। বিবেকানন্দের তৃতীয় নেত্র এই সমস্ত অবস্থা অবলোকনের জন্য যেন উন্মীলিত হল। তিনি দেখতে পেলেন বিশ্বের সর্বত্র, সমস্ত কিছুর মধ্যেই, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নেই। ঈশ্বর, ঈশ্বরকে চালাচ্ছেন। তিনি ঢেউ, তিনি স্রোত, তিনি আলো, তিনি গতি, তিনি মাঝি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, ব্রহ্ম আর ভগবানে কোন তফাৎ নেই। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান। শুধু মাত্র তফাৎ হ’ল, ব্রহ্ম হ’ল সাধাসিধে চেহারার। আবার এই ব্রহ্ম যখন সেজেগুজে বাইরে বেরুচ্ছেন, তখন তিনি ঈশ্বর বা ভগবান। ব্রহ্ম গুণাতীত, ভগবান গুণময়। যদি কোন মানুষ ব্রহ্মকে বেছে নেন, তাহলে তিনি নির্গুণ দেউলেকে বাছলেন, যাঁর প্রকাশ করার মত কোন ঐশ্বর্যই নেই। আর যদি কোন মানুষ ভগবানকে

ভালোবাসেন, তাহলে সেই ভগবানের ঐশ্বর্য্যের শেষ নেই। চতুর্দিকে যদি মানুষ অবলোকন করে, তাহলে দেখতে পাবে, সবদিকেই ঈশ্বরের আধিপত্য। তিনি রাজবেশে সর্বত্র বিরাজ করছেন। ব্রহ্মের মত দীনহীন নন। ব্রহ্ম ষড়ভাবশূন্য। ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। ব্রহ্ম হ'ল বীজ, সেই বীজ থেকে গাছ, পাতা, ফুল, ভগবানের প্রকাশ। মাঠ না থাকলে ফসল পাওয়া যায় না। ব্রহ্ম নিরাকার। তাঁকে দেখা যায় না। ভগবান বা ঈশ্বর সাকার। তিনি ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে দেখা দেন। স্ব-সিংহাসন থেকে নেমে আসেন। সাকার-নিরাকার উভয়ই সত্য। ব্রহ্ম আর ঈশ্বর বা ভগবান – একই শক্তির দুই রকম প্রকাশ। এই দুই শক্তির মধ্যে কোন কলহ নেই। ঈশ্বরের কাছে মানুষের একটিই প্রার্থনা – মানুষ যেন প্রকৃতির হাতে সদ্যোনিঃসৃত শিশুর মত পবিত্র থাকতে পারে। কারণ পবিত্রতার শক্তিই ঈশ্বরশক্তি। এই ঈশ্বরশক্তির পরিচয় করাতে যে আধ্যাত্ম মার্গের পথপ্রদর্শক ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন এবং তারপরে ভারতবর্ষের সনাতন, সার্বভৌম ধর্মের সত্যের প্রচার সারা বিশ্বজুড়ে করেছিলেন, তিনি হলেন – শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে স্বামী বিবেকানন্দ। এই স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম ধারণার যে বিবরণ ঔপন্যাসিক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তার **'প্রাণসখা বিবেকানন্দ (৩)'** (২০১৫) উপন্যাসে দিয়েছেন, তার বহুমূল্য তথ্যানুযায়ী যে সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তা হ'ল –

" 'ব্রহ্মবাদিন্' -এ লিখলেন ব্রুকলিনের হেলেন হস্টিংটন – 'ভগবানের অনেক দয়া, তিনি আমাদের কাছে ভারত থেকে একজন আধ্যাত্মমার্গের পথপ্রদর্শক পাঠিয়েছেন।....এই মানুষটির প্রভাব ও পবিত্রতা অসামান্য। তিনি আমাদের চোখের সামনে খুলে দিয়েছেন আধ্যাত্ম জীবনের এক অত্যুচ্চ মান। তিনি দিলেন এমন এক ধর্মের সন্ধান যা সার্বভৌম। যে ধর্মে কোন কৃপণতা নেই পরম সহনশীলতা ও সহানুভূতির। যে ধর্মের কেন্দ্রে বৈরাগ্যের দর্শন। এবং যে-ধর্ম মানুষের সমস্ত সদ্ভাবের দ্বারা সুশোভিত। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের কাছে এমন এক ধর্ম প্রচার করেছেন যা বিচারশূন্য বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এই ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য, মানুষের মনের উন্নতি করা।"

'প্রাণসখা বিবেকানন্দ (৩)' (২০১৫) উপন্যাসের যে আধ্যাত্ম প্রবাহের তথ্য প্রাপ্ত হওয়া গেল তা হ'ল, হিন্দুধর্ম প্রধানত বিশ্বাস করে মানবাত্মার স্বাভাবিক দেবত্বে। আত্মা পূর্ণস্বরূপ। আর ধর্মের লক্ষ্য হ'ল, মানুষের এই সহজাত পূর্ণতার বিকাশ ঘটানো। মানুষের মধ্যে ভালো এবং মন্দ – দুই প্রবৃত্তিই বর্তমান। সৎ সংস্কার মানুষের মধ্যে বলবান হলে, সে উর্দ্ধতর গতি লাভ করে। অসৎ সংস্কারের প্রাধান্যে মানুষ নিম্নগামী হয়। ধর্মের উদ্দেশ্য – মানুষকে উন্নত করা। অধর্ম মানুষের অধঃপতন ঘটায়। হিন্দু ধর্ম অধ্যাত্মজীবনের এক অত্যুচ্চ মানের সন্ধান দেয় যা সার্বভৌম। হিন্দু ধর্মে

সহানুভূতির এবং সহনশীলতার কোন কৃপণতা নেই। ধর্মের কেন্দ্রে বিরাজ করে বৈরাগ্যের দর্শন, যা মানুষের সমস্ত সদ্ভাবের দ্বারা সুশোভিত। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে সারবস্তু বর্তমান – তার নাম ধর্ম। ধর্মের কাছে সম্প্রদায়, মন্দির, চার্চ তুচ্ছ। প্রতিটি মানুষের মধ্যে সারবস্তু অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা যতই তা বিকাশিত হবে, ততই জগতের কল্যাণ করবার শক্তিও বৃদ্ধি পাবে। ধর্ম হ'ল আধ্যাত্মিক অনুভূতি। যারা এই আধ্যাত্মিকতা অনুভব করেছে, তারাই অন্যের কাছে সেই ভাবটি ঠিক ঠিক বহন করে পৌঁছে দিতে পারে। যাঁরা নিজেরা প্রকৃত ধর্মলাভ করেছে, তাঁরাই অন্যের মধ্যে ধর্মভাব সঞ্চালিত করতে পারে। তাঁরাই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আচার্য হতে পারে। তাঁরাই কেবল জগতে শক্তির আলো। সমকালীন বাংলা উপন্যাস থেকে প্রাপ্ত ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ উপরোক্ত এই তথ্যগুলি সমাজের মানুষেরা প্রাপ্ত হয়ে, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে বা সমাজে ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে বা সমাজ ধর্ম দ্বারা কতটা প্রভাবিত সেই সম্পর্কে এক স্ফটিক স্বচ্ছ সম্যকজ্ঞান আহরণ করেন। সেই জ্ঞানের আঙ্গিকে তাঁরা প্রতিনিয়ত তাঁদের ধর্ম সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে, এক স্বচ্ছ চিন্তাধারা প্রস্তুত করতে পারে, যা সমাজের আগামী প্রজন্মকে সর্বধর্মসমন্বয় সম্বলিত পথের সন্ধান দিতে পারছে। কারণ মানুষ যত ধার্মিক হয়, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যত মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং প্রকাশ হয়, ততই মানুষ একে অন্যকে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধতে সক্ষম হয়। যা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজপ্রাপ্তির এক গুরুত্বপূর্ণ, আলোকোজ্জ্বল সরণী। তাই বর্তমান গবেষক এই গবেষণার মাধ্যমে ঔপন্যাসিকদের মহামূল্যবান উপন্যাসগুলির থেকে প্রাপ্ত, তথ্যগুলি দ্বারা, বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়ে ধর্মের সত্যানুসন্ধান, নীতিবোধ ও মূল্যবোধের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম মানবিকতা বা মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই সমাজে একমাত্র ধর্ম – মানবিকতা বা মনুষ্যত্ব। যা সাম্প্রদায়িকতা দূর করে, মানুষ মানুষে ভাতৃভাব প্রকাশিত করার চাবিকাঠি। এভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঔপন্যাসিকেরা উপন্যাস সৃষ্টির মাধ্যমে সুস্থ ও সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা ও প্রকৃত ধর্ম – 'মনুষ্যত্ব'-এর প্রচার নীরবে করে চলেছেন।

জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা সাহিত্যে আলোচিত হতে পারে না। জগতের পরিবেশগত বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে মানুষের বিস্ময়বোধের অন্ত নেই। এই জীবন জিজ্ঞাসার উত্তরের সন্ধানেই দুটি ধারার জন্ম। প্রথমটি ধর্মবিশ্বাস, দ্বিতীয়টি বিজ্ঞান। এই বিশ্বপ্রকৃতির অপার রহস্য মানুষকে করে তুলেছে একইসাথে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঈশ্বরধারণামুখী ও পরবর্তীকালে বিজ্ঞানমুখী। এই ধারণার অভিব্যক্তি ঘটেছে সাহিত্যেও। ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানের সহাবস্থান প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর **‘বাসযাত্রা’** (২০১১) উপন্যাসে লিখেছেন। এই উপন্যাসে উপন্যাসস্থিত চরিত্র সোমনাথদা, মিহির ও রঙ্গনের সঙ্গে বিজ্ঞান ও ঈশ্বর সম্পর্কে যে কথোপকথন করছেন তা থেকে যে তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যাচ্ছে তা হ’ল –

“যেখানে বিজ্ঞান শিক্ষার শেষ ঈশ্বরের আশ্চর্য মহালীলা সেখান থেকেই শুরু।....রঙ্গন বলেছিল, দাদা আইনস্টাইন তো ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন।....কারণ তাঁর মনে হতো আইনস্টাইন ধ্রুব সত্যের অধিকারী। তিনি তার অনুসরণকারী। ঈশ্বরে তাঁরও অমোঘ বিশ্বাস আছে।....সোমনাথদা শুরুই করলেন, মিহির তোমরা তো নাস্তিক – ঈশ্বর বিশ্বাস কর না। আত্মাপরমাত্মা বিশ্বাস কর না – আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানীদেরও সারা-জীবনের বিজ্ঞান চর্চার নির্যাস সেই এক প্রশ্ন জুড়ে – ঈশ্বর আছেন কি নেই!....প্রাণ সৃষ্টির জন্যই এই ব্রহ্মাণ্ড। ঈশ্বর নিজেও ইচ্ছে করলে এই ব্রহ্মাণ্ডকে অন্যভাবে গড়তে পারতেন না। বিজ্ঞানের নিয়ম শৃঙ্খলার বাইরে যাওয়ার অধিকার কারও নেই।”

ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানের সহাবস্থান প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের **‘বাসযাত্রা’** (২০১১) উপন্যাসের থেকে যে তথ্যসার প্রাপ্ত হওয়া গেল, তা বিজ্ঞান এবং ঈশ্বরের মাঝের সম্পর্ককে, এক নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করা হয়েছে বলা যেতে পারে। যেখানে বিজ্ঞান শিক্ষার শেষ, ঈশ্বরের আশ্চর্য মহানলীলা সেখান থেকেই শুরু। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, সারা জীবন বিজ্ঞানের কারণ থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্বেষণ করেছেন। কৌতুহল আছে বলেই, বিজ্ঞান মানব সভ্যতার এত কাছে এসে পৌঁছেছে। আইনস্টাইন ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। আইনস্টাইন ধ্রুবসত্যের অধিকারী ছিলেন। আইনস্টাইন ধ্রুবসত্যের অনুসরণকারী বলা যেতে পারে। ঈশ্বরে তাই তাঁর অমোঘ বিশ্বাস। প্রাণের উৎস হ’ল আনন্দ। এই প্রাণ সৃষ্টির জন্যই ঈশ্বর। পরমেশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ হ’ল – প্রাণ। প্রাণ সৃষ্টির জন্যই এই ব্রহ্মাণ্ড। ঈশ্বর নিজেও ইচ্ছে করলে এই ব্রহ্মাণ্ডকে অন্যভাবে গড়তে পারতেন না। বিজ্ঞানের নিয়ম শৃঙ্খলার বাইরে যাওয়ার অধিকার স্বয়ং ঈশ্বরেরও নেই। আইনস্টাইনের সারা জীবনের বিজ্ঞান চর্চার নির্যাস, অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদেরও ঈশ্বর ও বিজ্ঞানের প্রতি কৌতুহলী করে তুলেছিল। আইনস্টাইন বিজ্ঞানের হেতু থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সারাজীবন খুঁজে বেরিয়েছিলেন, কারণ তাঁর কাছে বিশ্বাস আর অন্ধবিশ্বাস সমার্থক নয়।

ঔপন্যাসিক আবুল বাশারের **‘নতুন মনসামঙ্গল’** (২০১৬) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র শঙ্কর গারুড়ী ও বটেশ্বরের মধ্যে, ইসলাম ধর্মের বিষয়ে যে কথোপকথনপ্রাপ্ত তথ্য পাওয়া গেল তা হ’ল –

"শুধু হজরত রসুলে হবে না বাবু। 'আল্লা' ছাড়া অন্য কোনও 'আল্লা' নাই। কথাটি সহি বাবা হে! ফের রসুল মহম্মদ ছাড়া আরও রসুল থাকলেও আল্লার সবচেয়ে প্রিয় নবি ওই হজরত মহম্মদ। তিনিই আল্লার 'সেরা প্রতিনিধি'।"

'নতুন মনসামঙ্গল' (২০১৬) উপন্যাসপ্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী – ইসলাম ধর্মে 'আল্লা' ছাড়া অন্য কোন 'আল্লা' নেই। রসুল মহম্মদ ছাড়া আরও রসুল থাকলেও আল্লার সবচেয়ে প্রিয় নবি হজরত মহম্মদ। তিনি আল্লার 'সেরা প্রতিনিধি'। হজরতের পরেও একজন আছেন। তিনি হজরত আলি। আলির অনুসারীরাই শিয়া। এই মহা খালিফাকে বাদ দিয়ে ইসলাম সম্পূর্ণ নয়। সুন্নিরা হজরত আলিকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ধর্মের আমলনামায় আলিকে তারা নেয়না। হজরত মহম্মদেই সুন্নির ইসলাম পূর্ণ হয়েছে, আর শিয়ারা মনে করেন, হজরত আলিতেই ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। শুধু মহম্মদে ইসলাম শেষ হয়নি। শিয়া সম্প্রদায়রা আলিকে প্রায় পয়গম্বরের আসন দেয়। ঔপন্যাসিক গৌরকিশোর ঘোষের লেখা **'প্রেম নেই'** (২০১৬) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র ফটিক ফকিরের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করছে –

"চাদর ঢাকা দেওয়া চেরাগে ফকিরের মৃত শীতল দেহটার দিকে চেয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করল ফটিক, কিছুক্ষণ আগেও যে দেহটা উষ্ণ ছিল তার কোলের উপর, যার তখনও একটা পরিচয় ছিল, ফকির, চেরাগে ফকির। কিন্তু এখন? এখনও তো সেই হাত সেই পা, সেই চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক- সবই আছে। নেই শুধু ফকির, চেরাগে ফকির। এখন এই শীতল দেহটা শুধু মুর্দা। আচ্ছা, এই মুর্দাটা এখন কী? হিন্দু না মুসলমান? একটা দেহ কতক্ষণ হিন্দু থাকে, কতক্ষণই বা মুসলমান? ফকির গোরে যাবে। মিশে যাবে মাটিতে। সেই মাটি কি মুসলমান? হিন্দুর মড়াদাহ হবে, ভস্মরাশি মিশে যাবে বাতাসে অথবা ধুয়ে যাবে জলে। সেই বাতাস, সেই জল কি হিন্দু?"

'প্রেম নেই' (২০১৬) উপন্যাসের তথ্যাদিপ্রাপ্ত বিশ্লেষণ হ'ল – মৃত্যু মানুষের ধর্মকে আচার-আচরণ দ্বারা পৃথক করলেও, পঞ্চভূতে দেহতত্ত্ব সর্বাংশে মিশে যাওয়ার পরে ধর্মের আর আলাদা করে কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না এ কথা বলা যেতে পারে। কারণ মানুষ যে কোন সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, মৃত্যু এক এমন প্রক্রিয়া যা সমস্ত মানুষের পার্থিব দেহকে, জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে, জগতের পঞ্চভূতেই বিলীন করে থাকে। মৃত্যুর পরেও যার অস্তিত্ব বজায় থাকে তা হ'ল, মানুষের আদর্শ। মৃত্যুর পূর্বে, মানুষের আদর্শ তার আত্মারূপ মনে অবস্থান করে। আত্মা অবিনশ্বর। তাই আদর্শও অমর। সেই কারণেই হয়ত যে সমস্ত মুনি-ঋষি ও মহানুভব ব্যক্তিরা যেসব ধর্মীয় আদর্শের কথা প্রচার করে গেছেন, তা আজও প্রাসঙ্গিক ও বর্তমান। তাই বলা যেতে পারে, মানুষের মৃত্যু মনুষ্যত্ব বা আদর্শের মৃত্যু নয়। মৃত্যু

শুধুমাত্র দেহ থেকে দেহান্তরে গমন। মৃত্যুর পর আত্মার কোন পৃথক পরিচয় থাকে না। মৃত্যুর পর সকল আত্মারই আর কোন ধর্ম পরিচয়, লিঙ্গ পরিচয়, সম্প্রদায় পরিচয়, ধনী-দরিদ্র পরিচয়, কোন বিশেষ পদাধিকারীর পরিচয় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সে তখন শুধুমাত্র পরমাত্মার এক অংশবিশেষ।

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

উপসংহার

মানবজীবনের প্রেক্ষাপটে একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্মের উপস্থিতি সর্বজনগ্রাহ্য। বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের নানান উপন্যাস রচনার মাধ্যমে, মানুষের মেধা ও মননে ধর্ম ও সমাজের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে, সুসংস্কৃত হতে সহায়কের ভূমিকা পালন করছে। কারণ মানব জীবনের সাথে ধর্ম ও সমাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাহিত্য সমাজ ভাবনার দর্পণ। বিভিন্ন উপন্যাসপ্রাপ্ত অতীত ও বর্তমান সমাজ ও ধর্ম প্রসঙ্গে, প্রাসঙ্গিক তথ্য, পাঠককে অতীত ও বর্তমান যুগের ধর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানারোহণে সক্ষম করে তোলে। নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ করে ভবিষ্যতের মানুষকে সমাজোপযোগী ধর্ম প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হতে সাহায্য করে, যা সমাজঘঠিত অবিচার, অত্যাচার, শোষণ রূপ ধর্ম থেকে সমাজকে মুক্ত করে, সমাজকে এক নৈতিকতা সমৃদ্ধ সমাজ উপহার দেওয়ার অব্যর্থ ও সদর্থক পদক্ষেপ হতে পারে। নৈতিকতাই মূল্যবোধের জন্মদাতা। আর এই সঠিক ও উদার মূল্যবোধই সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজ উপহার দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই বর্তমান গবেষক সমাজের প্রত্যেক মানুষের মধ্যে উপন্যাসপাঠকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে, সঠিক ও সদর্থক মূল্যবোধসম্পন্ন ধর্মজ্ঞান আহরণের আর এক স্বচ্ছন্দ মাধ্যম – উপন্যাস পাঠ, এই সত্যানুসন্ধানে এই গবেষণায় ব্রতী হয়েছেন।

মানবসভ্যতার ক্রমোন্নতির বাহন ও সমাজের মানুষের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র হ'ল সাহিত্য। জাতির উন্নতি, সাহিত্যচর্চার অনুশীলন ছাড়া সম্ভব নয়। উপন্যাস সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। উপন্যাস মানবজাতির সামাজিক হিত-অহিত, লোকাচার, ধর্ম, নৈতিকতা ও কৃষ্টির দলিল। বাংলা উপন্যাস রচনার মাধ্যমে ঔপন্যাসিকেরা সমাজের সমকালীন ধার্মিক, সামাজিক ও কৃষ্টিগত পরিস্থিতিকে, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার আঙ্গিকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে তাই সামাজিকভাবে দায়বদ্ধতা, সদেচ্ছায় গ্রহণ করে থাকেন। সাহিত্যই জাতির গৌরব ও গর্বের প্রতীক। বাংলা উপন্যাস নীতিবোধ, মূল্যবোধ, আদর্শ, চেতনায় ও জীবনচর্চায় পরিবর্তন ঘটাতে এক সদর্থক পদক্ষেপ। সময়ানুযায়ী ন্যায়-নীতি-আদর্শবোধ-মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল। তাই বিভিন্ন বাঙালি ঔপন্যাসিকদের দ্বারা রচিত, বিভিন্ন বাংলা উপন্যাস এই গবেষণায় গ্রহণ করা হয়েছে। সেই উপন্যাসগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই বর্তমান গবেষক, তাঁর গবেষণাকে অগ্রসর করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমান গবেষণার শিরোনাম '**বাংলা উপন্যাসে ধর্ম : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ**'। বর্তমান গবেষকের গবেষণাটির সময়কাল ভারতবর্ষের বিশ্বায়ন পরবর্তী হওয়ার

কারণে ১৯৯১ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত উপন্যাসনির্ভর তথ্যসমূহ থেকেই গবেষণার সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মানুষের সাধারণ ধর্মকে গোষ্ঠী, জাতি ও রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে, বিশ্বজনীন ধর্মের ধারণায় পরিণত করার ভাবনা থেকেই বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়কে বর্তমান গবেষক, সময়ের নিরিখে, উপযুক্ত সময় বলে মনে করেছেন। ধর্মকে বিশ্বধর্মে রূপান্তরিত করে, বিশ্বের সকল প্রান্তে এক সর্বজনীন ধার্মিক বার্তা উন্মুক্ত করে দেওয়ার কারণে এই ভাবনার অবতারণা, যা সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে, বিশ্বভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে, এক সদর্থক বার্তা হয়ে উঠতে পারে। তাই বলা যেতে পারে যে, 'বিশ্বায়ন' এমন একটি প্রক্রিয়া, যা আন্তর্জাতিক স্তরে একুশ শতকের প্রারম্ভে, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে উন্মুক্ত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কে সম্পর্কিত পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে নিবিড় করে, পারস্পরিক সহযোগিতাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এই বিশ্বায়নে ধর্মের স্থানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে বিবেচ্য হয়।

বর্তমান গবেষণায় সাহিত্য পর্যায়ভুক্ত উপন্যাস স্থান-কাল-সময়ের অভিজ্ঞান। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসে ধর্মের চালচিত্রের পরিচয় পেতে, বর্তমান গবেষণাকর্মে গৃহীত বিশ্বায়নের পরবর্তী ১৯৯১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়পর্বকে যে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে সেগুলি হ'ল, প্রথম পর্ব (১৯৯১-২০০০), দ্বিতীয় পর্ব (২০০১-২০১০) ও তৃতীয় পর্ব (২০১১-২০১৭)। তবে এক্ষেত্রে গবেষণাকালকে বিষয়ভিত্তিকগতভাবে বিভক্তিকরণ করা হয়নি, কেবলমাত্র গবেষণাকার্যের সুবিধার্থে সচেতনভাবেই গবেষণাকালের নিরিখে, উপন্যাসগুলিকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। এই বিশেষ সময়কালগুলিতে লিখিত বিভিন্ন উপন্যাসগুলি যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা সমাজের সমস্থানীয় নন। তাঁদের নিজস্ব অবস্থান ভিন্ন, তাঁদের রুচি-পছন্দ ভিন্ন, সর্বোপরি তাঁদের আদর্শও ভিন্ন। তা সত্বেও তাঁরা উপন্যাস রচনার মাধ্যমে, ধর্মের যে রূপ তুলে ধরেছেন এবং সমাজের নানান আঙ্গীকে ধর্মের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা পাঠকের কাছে সঠিক ব্যাখ্যা হয়ে উঠছে কিনা – তা বিচার্য বিষয়। ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যালের **'কনকলতার সন্ধানে'**(২০০৩) উপন্যাসে ধর্মকে মানুষের একান্ত নিজস্ব, ব্যক্তিগত সম্পদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সৃষ্টজীবের যোগাযোগের সেতু হচ্ছে ধর্ম। আর সাহিত্য হচ্ছে মানুষে মানুষে মেলবন্ধনের মাধ্যম। সেটা জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নিরপেক্ষ। তিনি বলেছেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্বেও, তিনি শুধুমাত্র ব্রাহ্মসংগীত লিখে থেমে থাকেননি, হিন্দু দেবদেবীর নানান কাহিনী, বৌদ্ধগাথা প্রভৃতি থেকে সংগ্রহ করে গেছেন তাঁর সাহিত্যের উপাদান। কারণ রবীন্দ্রনাথ মনে করেননি এতে তাঁর ব্রহ্মধ্যানের কোনো

অসম্মান হচ্ছে। এই একই বিষয়, কাজী নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলেই প্রমাণিত। সাহিত্যিকদের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রবহমানতা নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও তার ছায়া তাঁদের সাহিত্যকে প্রভাবিত করেনা। তাই ঔপন্যাসিকদের মতামত, বিভিন্ন উপন্যাসগুলিতে কখনো কখনো এক হয়ে যাচ্ছে আবার কখনও কখনও তাঁদের মধ্যে মতবিরোধও পাওয়া যাচ্ছে। সর্বদা হয়ত তাঁদের এই মানসিকতা, তাঁরা নিজেরাও সমর্থন করেন না। তবু জাতীয় স্বার্থের কথা স্মরণে রেখে, উপন্যাসগুলিকে শুধুমাত্র নিজধর্মের আঙ্গীকে নয়, সমগ্র বিশ্বমানবিকতার ঐক্য রক্ষার ভাবনায় পুষ্ট করার চেষ্টা করেছেন, যা বিশ্বায়নের সদর্থকতাকেই দৃশ্য করে তুলেছে। তাই এই ছাব্বিশ বছরের বাংলা উপন্যাসগুলিতে, ঔপন্যাসিকেরা ধর্মের প্রসঙ্গ কিভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন এবং ধর্মের সদর্থকতা ও নঙর্থকতাগুলিকে মানুষের মূল্যবোধের আয়নায় কিভাবে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন, তাই গবেষকের কাছে বিচার্য বিষয়। কারণ মানুষের মনন বিশ্বব্যাপী শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার নীতিকে গ্রহণ করার এক সদর্থক পদক্ষেপ।

এই সময় পর্বের গৃহীত উপন্যাসগুলির প্রায় সর্বত্রই ধর্মের পদচিহ্ন বেশ স্পষ্ট। একবিংশ দশকের দ্বারে যে সমাজ ও সময় করাঘাত করছে, তার বেশির ভাগটায় ধর্মের উপস্থিতি সমাজের প্রয়োজনেই উঠে এসেছে। বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে ধর্মের যে চিত্র উপন্যাসে উঠে এসেছে, তাতে যে প্রশ্ন সবার আগে ভাবিত করে, তা হ'ল – ধর্ম বিষয়টি কি? ধর্মের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সম্পর্কে সুসংহত জ্ঞানই ধর্ম সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করে। মানব সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, ধর্মের উত্থান-পতনের যে পর্যায়ক্রমের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভব হয়, তা থেকে ধর্মের দর্শনসম্মত আলোচনা হয়তো সম্ভবপর নয়। কারণ সমাজের সামাজিক বিবর্তন, ধর্মের পরিবর্তনকে আহ্বান করে। তাই সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্মের ধারাবাহিক বিকাশকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ গোষ্ঠী ধর্ম, দ্বিতীয়তঃ জাতীয় ধর্ম, তৃতীয়তঃ বিশ্বজনীন ধর্ম। গোষ্ঠী ধর্ম কখনোই কোনো ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম হতে পারে না। গোষ্ঠী ধর্মের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর আচার-বিচার, প্রথা, নিয়মাবলীকে নির্দ্বিধায় অনুসরণ করে, ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে প্রায় মূল্যহীন ও অবান্তর করে, গোষ্ঠীর একান্ত নিজস্ব সম্পদ হিসেবে ধর্মকে মেনে চলাই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হয়। জাতীয় ধর্মের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, যখন অনেকগুলি গোষ্ঠী বা উপজাতি একত্রে, একে অন্যের সাথে ভাব বিনিময় করে, ব্যক্তিগত মানসিকতার সংকীর্ণতাকে লংঘন করে, সম্মুখে অগ্রসর হয়, তখন তাদের

মধ্যে যে নৈতিক গুণগুলির প্রকাশিত হয়, সেই নৈতিক গুণের প্রতিভূ হিসেবে ঈশ্বরের আগমন ঘটে। ফলে সৃষ্টি হয়, জাতির। আর এই জাতির উন্মেষে, সমাজ ব্যবস্থায় যে রূপান্তর আসে, তা সমাজের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায়ও রূপান্তর ঘটায়, কারণ ধর্ম, সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। তবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, গোষ্ঠীধর্মের ছায়াস্বরূপ, জাতীয় ধর্মেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা সেভাবে প্রাধান্য পায় না। কারণ জাতীয় ধর্মে মুখ্য বিষয় হ'ল – জাতি। অর্থাৎ জাতির ধর্মই হ'ল ব্যক্তির ধর্ম। ব্যক্তি জাতীয় ধর্মের উত্তরাধিকার, তার জন্মসূত্রে লাভ করে থাকে। তাই বলা যেতে পারে যে, জাতীয়ধর্ম নির্বাচনে ব্যক্তির কোন ভূমিকা তেমনভাবে কার্যকর হয় না। বিশ্বজনীন ধর্মে, জাতীয় ধর্মের বিধি-নিষেধ কার্যকর হয় না। বিশ্বজনীন ধর্মে ব্যক্তির রুচি ও পছন্দকে ধর্ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই ব্যক্তি তার ইচ্ছানুসারে পছন্দসই ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। তাই বলা যেতে পারে বিশ্বজনীন ধর্ম বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে, তার দ্বার উন্মুক্ত করে রেখেছে। বিশ্বজনীন ধর্মে, ধর্মের বিস্তার সাধারণত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই হয়ে থাকে। তাই একে প্রচারমূলক ধর্মের তালিকাভুক্ত করা যেতেই পারে। কোন একটি বিশেষ ধর্মকে, যখন সারা বিশ্বের মানুষের কাছে প্রচারের মাধ্যমে গ্রাহ্য করে তোলার প্রয়াস করা হয়, সেই বিশেষ ধর্মের বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠার কারণে, তখন তাকে বিশ্বজনীন ধর্মরূপে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। গোষ্ঠী যখন জাতিতে পরিবর্তিত হয়, তখন বলা যেতে পারে তা সমাজের ধর্মের ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত অভূতপূর্ব অগ্রগতি। জাতীয় ধর্মের অগ্রগতির ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বলা যেতে পারে, প্রথমতঃ, তথাকথিত দেবতাদের মধ্যে নৈতিক গুণারোপ, দ্বিতীয়তঃ একেশ্বরবাদের সমর্থন। ধীরে ধীরে দেবতাদের মধ্যে আরোপিত নৈতিক গুণগুলি, মানুষেরা নিজেদের জীবনের আদর্শ এবং নৈতিক গুণরূপে গ্রহণ করতে শুরু করে। এভাবেই একটা জাতির জীবনের আদর্শ ও মূল্যবোধ, জাতীয় ধর্মের দেবতার মাধ্যমে প্রকটিত হয়। ক্রমে জাতীয় জীবনের জটিলতায় সমাজে শ্রমবিভাগের সৃষ্টি হয়। আর এই শ্রমবিভাগের বৈশিষ্ট্য মানুষের ধ্যান-ধারণাকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়। প্রাচীনকালের বহুদেবতাবাদ, ক্রমে একেশ্বরবাদের দিকে অগ্রসর হয়। এই একেশ্বরবাদকে তিনভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, বহু দেবতার ভেতর থেকে, কোন একজন দেবতাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা, একেশ্বরবাদের সৃষ্টি করতে সমর্থ হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের অন্তরের এক দেবপ্রধান মনোভাব, একেশ্বরবাদের জন্ম দিতে সক্ষম হতে পারে। তৃতীয়তঃ, সমস্ত দেবতার অস্তিত্বই এক পরমশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, মানুষের এই উচ্চ ভাবনাও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করতে, খুব সহজেই,

সরলভাবে একেশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠা করার সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। তৃতীয় একেশ্বরবাদের ধারণায়, মানুষের জন্য মানুষের অন্তরের শুভপ্রার্থনাকেই 'ধর্ম' নামকরণ করা যেতে পারে। মানুষের জন্য, মানুষের এই আন্তরিক প্রার্থনা, শুধুমাত্র নৈতিক চেতনাকেই সমর্থন করে তা হয়তো বলা যেতে পারে না, বরং এই প্রার্থনাকে এক নান্দনিক চেতনারূপে গ্রাহ্য করা যেতে পারে, যা এক বিশ্বজনীন ধর্মের নীতিনিষ্ঠরূপ হয়ে উঠতে সমর্থ হতে পারে। বর্তমানে ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন করার নামে, যে নঙর্থক পদক্ষেপ সাম্প্রদায়িকতার হাত ধরে উঠে আসছে, তা সর্বদা সমাজের মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বর্তমান গবেষকের সংগৃহীত উপন্যাসগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী কিন্তু সমান্তরালভাবে, একটা বিকল্প পথেরও দিশা দিচ্ছে। এই বিকল্প পথ কিন্তু বিভিন্ন ঔপন্যাসিকদের লেখা উপন্যাসগুলিতে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সাধারন পথ হয়ে উঠেছে। যদিও প্রতিটি উপন্যাসই, ঔপন্যাসিকদের পৃথক মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত এক জীবন কাহিনী। তাঁদের কাছে প্রতিটি ধর্ম পৃথক হলেও, তাঁরা কোথাও এক মানবতার বার্তা প্রকাশ করেছেন, যা সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারে। গত ১৯৯১ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত এই ছাব্বিশ বছরের উপন্যাসগুলিতে, ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যাচ্ছে, ঔপন্যাসিকেরা পুরনো ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, সমাজদেহ থেকে মুছে ফেলে মানুষের মধ্যে একটা নতুন জীবনবোধের সম্পর্ক, যুক্তিবাদী মনন, মনুষ্যত্বের নতুন শৃঙ্খলা, প্রকৃত স্বাধীনতাবোধ, ব্যক্তির মধ্যে পরম স্বাধীনতার সাহস, প্রতিষ্ঠা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

মানুষের চিন্তনের বিবর্তনের ইতিহাসে ধর্মের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষের ভাবনার রূপান্তরের সাথে সাথে ধর্মের স্বরূপেরও রূপান্তর হয়েছে। আদিম মানুষের জীবনে ধর্মের উপস্থিতি থাকলেও 'অসীমতা'-র কোন সুস্পষ্ট ধারণা তাদের তেমনভাবে ছিল না। তাই বলা যেতে পারে প্রাচীনকালের মানুষের জীবন সংরক্ষণের প্রয়োজনেই, অচিন্তনীয় এক বৃহত্তর সত্তার আরাধনাই ধর্মবোধের সূচনা করে। কিন্তু আদিম মানুষের জীবন রক্ষার্থে 'প্রকৃতিপুজো' ধর্মের সঙ্গে, পরবর্তীকালের কোন একটি বিশেষ ধর্মের পার্থক্য এমনই যে, তাদের কোন একটা বিশেষ সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ বিভিন্ন ধর্মের নানান বৈশিষ্ট্যকে, সেই ধর্মের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যরূপে নির্ধারণ করা হয়। তাই বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্বর্তী কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে উল্লেখ করে 'ধর্ম' শব্দটিকে কোন একটি সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নাও হতে পারে। যেমন কোন

ধর্মে ঈশ্বরের প্রতিভূ আবশ্যিক, আবার কোন ধর্মে ঈশ্বরের প্রতিভূ অনাবশ্যক। কোনো কোনো ধর্ম, সমাজের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিতে পারে, আবার কোনো কোনো ধর্ম, একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতে পারে। কোনো ধর্ম মানুষের অন্তরকে প্রশান্তিতে ভরে দিতে পারে, আবার কোনো ধর্ম মানুষের মনকে অশান্ত করে তুলতে পারে। এই নানান বৈশিষ্ট্য থাকা সত্বেও, প্রতিটি ধর্মই এক 'ধর্ম পরিবার'-এর অংশ হওয়ার কারণে তাদের স্বতন্ত্রধর্ম রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেমন – ঔপন্যাসিক প্রতিভা বসুর **'সমুদ্র হৃদয়'**(১৯৯২) উপন্যাসে এক অসাধারণ তথ্য প্রাপ্ত হওয়া গেছে তা হ'ল, মানুষের দেহের বয়স বাড়ার জন্য, কোন প্রচেষ্টা করার প্রয়োজন পড়ে না, সে তার নিজের ছন্দেই বেড়ে চলে। কিন্তু মানুষের মনের প্রসারতার বৃদ্ধির জন্য, মানুষকে মনুষ্যত্বের সাধনা করতে হয়। কারণ মানুষের মানসিক বৃদ্ধি, মানুষের মানবিক মননের পরিবর্তন ঘটায়, যা প্রকৃত ধর্মবোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। ১৯৯১ সালের পরবর্তীকালে সাহিত্যে যে ধর্মবোধের প্রকাশ লক্ষণীয়, তাতে ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে, সমসাময়িক সম্প্রদায় কেন্দ্রিকতাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলা উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা তীব্রভাবে লক্ষণীয়। বলাবাহুল্য গবেষণায় গৃহীত বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়কালের (১৯৯১-২০১৭) যে উপন্যাসগুলি লিখিত হয়েছে তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা যেতে পারে, ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মভাবনা, আচার সর্বস্ব ধর্ম – ধর্ম নয়, ধর্মের নামে দ্বন্দ্ব ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব, সমাজে ধর্মের নিরিখে নারীর প্রকৃত অবস্থান ও প্রকৃত ধর্মবোধ এই বিষয়গুলি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্ম ভাবনা

বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়কাল (১৯৯১-২০১৭) ভারতবর্ষের সমাজ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, একদিকে বিশ্বায়ন অন্যদিকে সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মীয় উন্মাদনা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যার প্রতিচ্ছবি উপন্যাসের দর্পণে প্রতিফলিত। এছাড়াও এই সময়কালের উপন্যাসগুলিতে স্বাধীনতা পরবর্তীকালেরও সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন, দেশভাগের যন্ত্রণা, চৌষট্টির বাল দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, রাজনৈতিক হত্যা, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা ও তার কুফল, ধর্মের নামে নারীশোষণ ও নারীনির্যাতন, দেশবাসীর মধ্যে সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে এক মিশ্র ধারনার অবতারণা করেছে। বর্তমান গবেষণায় গৃহীত এই

ছাব্বিশ বছরের ভারতবর্ষের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামোগত পরিবর্তন, প্রশাসনিক পরিবর্তন, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন স্বতন্ত্রভাবে মানবমননে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। সেই কারণেই বর্তমান গবেষণায় সমকালীন পরিস্থিতি জনিত ধর্মের সাথে শিক্ষা, সমাজ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে। এভাবে নানান ঘটনা, ঘটনার পরিবর্তন, ও ঘটনার ভবিষ্যৎ ভাবনার পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত ধর্ম ও সমাজ অগ্রসর হয়েছে।

মানবসভ্যতার ক্রমোন্নতির বাহন ও সমাজের মানুষের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র হ'ল সাহিত্য। জাতির উন্নতি সাহিত্যচর্চার প্রতিফলন ছাড়া সম্ভব নয়। উপন্যাস সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। উপন্যাস মানবজাতির সামাজিক হিত-অহিত, লোকাচার, ধর্ম, নৈতিকতা ও কৃষ্টির দলিল। বাংলা উপন্যাস রচনার মাধ্যমে ঔপন্যাসিকেরা সমাজের সমকালীন ধার্মিক, সামাজিক ও কৃষ্টিগত পরিস্থিতিকে, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার আঙ্গিকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে তাই সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ। সাহিত্যই জাতির গৌরব ও গর্বের প্রতীক। বাংলা উপন্যাস নীতিবোধ, মূল্যবোধ, আদর্শ, চেতনায় ও জীবনচর্চায় পরিবর্তন ঘটাতে এক সদর্থক পদক্ষেপ। সময়ানুযায়ী ন্যায়-নীতি-আদর্শবোধ-মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল। তাই বিভিন্ন বাঙালি ঔপন্যাসিকদের দ্বারা রচিত, বিভিন্ন বাংলা উপন্যাস এই গবেষণায় গ্রহণ করা হয়েছে। সেই উপন্যাসগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই বর্তমান গবেষক তার গবেষণাকে অগ্রসর করতে সক্ষম হয়েছেন। উপন্যাসের প্রকারভেদের কারণে, সময়ের বিভিন্নতার কারণে, নানান ঔপন্যাসিকের নানান মনোভাবের কারণে, উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচন ও রচনাশৈলীতে প্রকৃতিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা গেলেও সমাজ, ধর্ম, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এগুলির উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমমত পোষণ করেছেন যা সমাজ, ধর্ম ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির, এক সত্যদর্শনকে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় গৃহীত উপন্যাসগুলি শুধুমাত্র উপন্যাস লেখার কারণেই উপন্যাস লিখিত হয়নি, কারণ এই উপন্যাসগুলির প্রেক্ষাপটে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, পরিস্থিতির পরিবর্তনকে এবং সেই পরিবর্তনের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের মন কিভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়েছে, তার প্রতিফলন প্রবলভাবে উঠে এসেছে। বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়ের ভারতবর্ষে ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, সামাজিক পরিস্থিতির সাপেক্ষে, এই বিষয় সংক্রান্ত উপন্যাসগুলি তাই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

বিশ্বায়নের পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে ধর্ম বিষয়টি সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে একই ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে। কারণ আধুনিক শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত মানুষের মনে যুক্তিবাদী ধর্মের সাথে জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিষয়ও গুরুত্ব পাওয়ার কারণে, উপন্যাসগুলিতেও তার প্রভাব অপরিহার্যভাবে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। তাই সুস্থ সমাজে, ধর্মের সাথে উন্নয়নমূলক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। এই প্রসঙ্গে **'ধর্মের গ্রহণ'**(১৯৯২) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আবুল বাশার ইসলাম ধর্মের এক বিশেষ ধর্মীয় দিককে তুলে ধরেছেন। মানুষের মন, মানুষের ধার্মিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের জন্মসূত্রে যে ধর্মপ্রাপ্তি হয়, সেই ধর্ম অনুসরণে সেই ব্যক্তি যদি সম্মত নাও হয়, তাহলেও তার মানসিক বৃত্তিগুলির বিকাশে কোন ঘাটতি নাও হতে পারে। যেমন বলা যেতে পারে, ধর্ম মানুষের মধ্যে সহিষ্ণুতা, দয়া, মায়া, মমতা এই বৃত্তিগুলির সৃষ্টি করবেই, এমন কথা নাও প্রমাণিত হতে পারে। অথচ কোন বিশেষ ধর্মকে না মানা সত্বেও, মানুষের মধ্যে সহিষ্ণুতা, দয়া, মায়া, মমতা এই বৃত্তিগুলির উপস্থিতি থাকলেও থাকতে পারে। এই বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল, মানুষের মন। ধর্ম, মানুষের মন বা মানসিকচেতনা নির্ভর – এ কথা বলা যেতে পারে। ভারতবর্ষে ধর্মের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। ধর্মের ইতিহাস থেকেই মানুষের মানসিক চেতনা বা মন, ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হয় ও একইসাথে প্রভাবিত হয়ে থাকে। বৃহৎ উপন্যাস বা মহান উপন্যাস বর্তমান গবেষকের কাছে অনেকটা ইতিহাসেরই নামান্তর। ইতিহাস মানুষের অতীত সম্পর্কে ভুল ধারণা ও বোধহীন দৃষ্টিশক্তিকে দূর করতে সক্ষম। সমগ্র পৃথিবীর শুভাশুভ, কালের নিরিখে সৃষ্ট, কালেতেই লয়প্রাপ্ত এবং আবার কাল থেকেই জাত হচ্ছে। তাই সময়কে অতিক্রম করা অসম্ভব। কালকূট-এর **'পৃথা'**(১৯৯১) উপন্যাসে ইতিহাসের পথ ধরে চলতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, পার্থিব যা কিছু অতীত ও বর্তমান তা সকলই, নানা নামের জাতির মানুষেরই কীর্তি। ইতিহাস সাক্ষী, সংহিতা যুগের সমাজে বর্ণপ্রথা সেভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। জন্ম দ্বারা বর্ণ অর্জন করা যেত না, তা প্রতিভার দ্বারা অর্জন করতে হতো। বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়গুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

বিশ্বায়ন পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে, ধর্মের যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে, তার মাধ্যমে যে কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে তা হ'ল, ঔপন্যাসিকেরা শুধুমাত্র বিভিন্ন ধর্মের স্বতন্ত্রতাকে উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তা নয়, ধর্মের সার্বিক এবং বিশ্বজনীন দিকটিকেও সমানভাবে

গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন। যেমন উপন্যাসগুলিতে স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন ধর্মের উত্থান পতন, ইতিবাচক ভূমিকা, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, ধার্মিক পরিস্থিতির উন্নতি ও অসাম্প্রদায়িকতার নিরিখে ধর্মের অগ্রগতি এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যা অসাম্প্রদায়িকতার মোড়কে, সুশিক্ষিত সমাজমনস্ক মানুষেরা, ধর্মের অগ্রগতির জন্য যে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করবেন, তা সুস্থ সমাজ গঠনে অপরিহার্য এবং সর্বজনস্বীকৃত হতে পারে।

মানুষের মানসিক বৃদ্ধির ক্রমউন্নয়ন, মানুষকে সমাজের কাছে 'ধার্মিক' নামের এক বিশেষ পরিচয়ে পরিচিত করায়। যা কখনোই বিশেষ ধর্ম, লিঙ্গ-পরিচয়, ইত্যাদিকে সমর্থন না করে, মানুষের মনুষ্যত্বকে প্রাধান্য দিয়ে, একজন মানুষকে, আরেকজন মানুষের কাছে, মান-হুঁশ সম্পন্ন মানুষ করে তোলে, তখনই সেই মানুষকে প্রকৃত ধার্মিক মানুষ বলা যেতে পারে। মানুষের মানসিক চেতনাকে স্বীকৃতি দিয়ে **'বোকা প্রপিতামহ কথা'**(১৯৯৯) উপন্যাসে হিন্দুধর্ম সনাতন, হিন্দুধর্ম ত্রিবিধ স্বীকার করা হয়েছে। হিন্দুধর্মে ভগবান অন্তরাত্মায়, মানসিক জগতে ও স্থূল জগতে এই ত্রিধামে প্রকৃতিসৃষ্ট, মহাশক্তিচালিত বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই ত্রিধামে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টাই সনাতন ধর্মের ত্রিবিধ তত্ত্ব। হিন্দুধর্মের জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিন স্বতন্ত্র বা মিলিত উপায়ে আত্মশুদ্ধিই হ'ল ত্রিমার্গগামী গতি। সত্য, প্রেম ও শক্তি দ্বারা ত্রিমার্গে এগিয়ে যাওয়াই সনাতন হিন্দুধর্মের ত্রিকর্ম। ধর্মকে, সত্যকে অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সত্য ও ধ্যানপ্রকৃতি এই বিশ্বজগতকে ধারণ করে আছে। তাই সত্য বিস্মৃত হাওয়াই ধর্মচ্যুত হওয়া। উপরোক্ত উপন্যাসের মতো প্রায় একই সুরে, উপরোক্ত ঔপন্যাসিকের সমকালীন ঔপন্যাসিক অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের **'শ্রীকৃষ্ণের শেষ প্রহর'**(১৯৯৯) উপন্যাসে ধর্মে মানুষের মনকে গুরুত্বপুর্ণ উপকরণ বলা হয়েছে। ধর্মাধর্মের জ্ঞান মানুষের জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। এই ধর্মাধর্মের জ্ঞানের আধার হ'ল মানুষের মন। মানুষকে স্ব-উন্নয়নের জন্যে, নিজেকেই নিজে অধর্ম থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, নিজের মনের মানসিক শক্তির দ্বারাই, নিজেকে বিপথগামীতা থেকে রক্ষা করতে হবে। উপরোক্ত উপন্যাসগুলির মত একই কথার রেশ, ঔপন্যাসিক প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়ের **'কথা'**(২০০৬) উপন্যাসে পাওয়া যাচ্ছে। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। তাই ধর্মশাস্ত্রগুলিকে জ্ঞাত হয়ে, মানুষের মন ঈশ্বরাভিমুখী হলে, মানুষ এক সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বপূর্ণ মানুষে পরিণত হতে সক্ষম হতে পারে এবং সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হওয়া অনেক সহজ হয়ে যেতে পারে। ঔপন্যাসিক পরেশ ভট্টাচার্যের লেখা

'রামীচন্ডীদাস'(২০০৮) উপন্যাসেও ঔপন্যাসিক, উপরোক্ত ঔপন্যাসিকদের বক্তব্যকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেছেন। তাঁর উপন্যাস প্রাপ্ত, সমৃদ্ধ তথ্যাবলী যে সত্যের সম্মুখীন করেছে তা হ'ল – মানুষের মন যখন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়, তখনই বৈষ্ণব ধর্মের সহজিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মমতে, ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটে। কারণ সৃষ্টিকর্তা মানুষের মনমন্দিরেই অধিষ্ঠিত থাকেন। এই একই বক্তব্যের রেশ ঔপন্যাসিক জাহান আরা সিদ্দিকীর **'সবুজ অরণ্যে জ্বলে হায়নার চোখ'**(২০১০) উপন্যাসে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। উপন্যাস প্রাপ্ত তথ্য যে দিকদর্শন করছে তা হ'ল, বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্বাসভাবনা, মানুষের মনকে সত্যদর্শন করতে সাহায্য করে। মানুষের ভাবনায় পরিছন্নতা, স্বচ্ছতা আনয়নের সহায়ক হ'ল মানুষের মন। মানুষের দেহেই মন ও ইন্দ্রিয়ের সহাবস্থান। ইন্দ্রিয় এবং মনের ভাব প্রকাশের ধরন পৃথক। মানুষের মনের থেকেই বোধ ও বোধের থেকেই বোধির জন্ম। আর এই বোধি হ'ল অনন্ত ও শাশ্বত এক চেতনা যা মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের নিয়ন্ত্রণকারী। মানুষের মনই মানুষকে সত্যের সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। ঔপন্যাসিক কল্পনা রায়ের **'সেই সময় পেরিয়ে'**(২০১২) উপন্যাসে ধর্মকে উপরোক্ত উপন্যাসগুলির মত প্রায় একই সংজ্ঞায়, সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যে নীতি, যে বিধান মানুষের অস্তিত্বকে ধরে রাখে, তাকেই ধর্ম বলা যেতে পারে। আর মানুষের অস্তিত্বকে ধরে রাখে মানুষের মন। উপনিষদেও স্বীকৃত যে মূর্খরাই অনুষ্ঠানকে ধর্ম বলে বিবেচনা করে। অর্থহীন কুসংস্কার, লোকাচার, আনুষ্ঠানিক পূজা-অর্চনা অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মকে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করতে পারে। কারণ হিন্দু ধর্ম কোন একক মানব প্রচারিত ধর্ম নয়। অগণিত মহর্ষিদের আধ্যাত্মিক অনুভব, অনুভূতির জ্ঞানের সমষ্টিগত রূপই হ'ল, হিন্দু ধর্ম। এই ধর্মে সকল মানুষের সমানভাবে অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার স্বীকৃত। তাই প্রকৃতপক্ষে বলা যেতে পারে, প্রকৃত ধর্মের ধারক হলো মানুষের মন। মানুষের মনই ঈশ্বরের প্রকৃত বাসস্থান। এই সত্যকে যদি মেনে নেওয়া যায়, তাহলে বলা যেতে পারে যে, প্রতিটি মানুষের মনের অন্তঃস্থ প্রাণশক্তিই মানুষকে প্রাণবন্ত বা আত্মিক শক্তির উত্তরাধিকারী করে তোলে। যে শক্তির কারণে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি মানুষের কাছে সসম্মানে গ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারে। তখন সেই ধর্মকে মেনে চলতে আর কোনো প্রতিভূর প্রয়োজন নাও পরতে পারে, বরং মিলনাত্মক ধর্মীয় উৎসবগুলি ধর্মের নামে, মানুষের সাথে মানুষের মিলনের আহ্বানে মানুষের কাছে হয়ে ওঠে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। মানুষের মনের মানসিক শক্তির, শক্তি প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের **'সাধের ময়না'**(২০১৫) উপন্যাস যে সত্যকে তুলে ধরেছে তা হ'ল, দেহের সম্পূর্ণ বর্ণনায় মন এবং ইন্দ্রিয় এই দুই সত্ত্বাকেই স্বীকৃতি দিতে হবে।

কারণ মানুষের ইন্দ্রিয় দ্বারা যা গ্রাহ্য হওয়া সম্ভব হয় না, তা অনেক সময়েই মনের দ্বারা বোধগম্য হয়ে উঠতে পারে। কারণ মন হ'ল আধ্যাত্মিক চেতনার উৎস। এই মন থেকেই বোধির সৃষ্টি। এই বোধির পরিচয় হ'ল, মানুষের সমস্ত অস্তিত্বের নিয়ন্ত্রণকারী এক বৃহৎ সত্যসন্ধানী, মননশীল চেতনা – যা চিত্তশুদ্ধির এক প্রধান উপকরণ।

বর্তমান গবেষণায় গৃহীত বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়কালের (১৯৯১-২০১৭) বিভক্তিকরণের দ্বারা সৃষ্ট তিনটি পর্বেরই, উপরোক্ত ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণে, ধর্মের একটি প্রধান উপকরণ হিসেবে, মানুষের মন প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজের মানুষের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, বিনোদন, সৃজনশীলতা সমস্ত কিছুর প্রকাশই মানুষের মনের দ্বারা সম্পাদিত হয়। তাই সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে এবং ধর্মে যে উন্নত মানসিকতার বিপ্লব দেখা দিয়েছে, তা সর্বাংশেই মানুষের মন দ্বারা প্রভাবিত ও নির্ধারিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মে ধর্মে যেমন সাম্প্রদায়িকতা উঠে এসেছে, ঠিক তেমনি ধর্মে ধর্মে সাঙ্কর্য বা মিশ্রনও প্রতিভাত হয়েছে। যার মূলে মানুষের মনের প্রাধান্যই প্রকটিত হচ্ছে। এই সাঙ্কর্য বা ধর্ম মিশ্রণের বিষয়টিই ধর্মকে বিশ্বায়নের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে থাকে, যার মূলে মানুষের মনই প্রধানত এক সদর্থক কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এই কারণে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ধর্মের বিবর্তনে মানুষের মন বা মানসিক চেতনার অস্তিত্ব এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

ধর্মে একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, প্রাচীনকালের ধর্মের অগ্রগতির লক্ষণ হিসেবে যা প্রকাশ পায় তা হ'ল, যখন মানুষ বৃক্ষ, পর্বত, আগুন, মেঘ, আকাশ, গুহা, সমুদ্র, নদ-নদী ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে, রহস্যময় বিশালত্বের অদৃশ্যশক্তির এক দেহাতীত আত্মার ধারণাকে, এক তীব্র আবেগ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল, এবং ক্রমে তা বহুদেবতাবাদ বা বহুদেবত্ববাদে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ক্রমশঃ সেই বহুদেবত্ববাদ, হয়তো মানুষের উন্নত মানসিক চেতনার কারণেই একেশ্বরবাদের দিকে অগ্রসর হয়। একেশ্বরবাদের সমর্থনে **'সারেং মিঞা'**(১৯৯২) উপন্যাসের যে প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ইসলাম ধর্মে 'আল্লা' এমন এক একক উপস্থিতি, যাঁর কাছে ধর্মের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কোন বিভেদ নেই। এই কথার ওপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে যে ইসলাম ধর্মেও একেশ্বরবাদকে সমর্থন করা হয়েছে। মানুষের বিভেদ শুধু মানুষের চারিত্রিক গুণের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। তাই **'সারেং মিঞা'**(১৯৯২) উপন্যাসে উপন্যাসের চরিত্র সারেং মিঞা অবলীলায় বলতে পারেন, আল্লার কাছে হিন্দু-

মুসলমান-কেরেস্তানের কোনো পৃথক পৃথক অস্তিত্ব নেই। উপরোক্ত উপন্যাসের সমর্থনে ঔপন্যাসিক আবুল বাশার তাঁর **'ধর্মের গ্রহণ'**(১৯৯২) উপন্যাসে অত্যন্ত কবিসুলভভাবে একেশ্বরের ধারণাটিকে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর উপন্যাসস্থিত চরিত্র বেলাল রাতের অন্ধকারের নিরাকার আকাশের নক্ষত্রলোকের দিকে তাকিয়ে, আদিগন্ত আকাশপ্রমাণ শূন্যতায়, নিরাকার বিশালতাকে 'ঈশ্বর' নাম দেয়। এই আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বেলালের যে মন-কেমন করার অনুভূতি অনুভব হয়, বেলাল তাকেই 'ঈশ্বরানুভূতি' নাম দেওয়ার পক্ষপাতী হয়ে দাঁড়ায়। আদিগন্ত আকাশপ্রমাণ শূন্যতার নিরাকারের বিশালতা, আল্লার শতাধিক নামকে লঙ্ঘন করে যে অন্য এক ব্যাপ্তিকে নির্দেশ করে, যা ঈশ্বরেরই নামান্তর। এই নিরাকার অনিশ্চয়তার মধ্যে হারিয়ে যাবার যে আনন্দ, সেই আনন্দ প্রকৃতপক্ষে অব্যক্ত কাব্যিক আনন্দরূপে প্রতিভাত হতে পারে, কারণ এই আনন্দ মানুষের মনই শুধুমাত্র অনুভব করতে পারে। কারণ মানুষের প্রেমানুভূতি এতটাই শক্তিশালী এবং তা যে কোন ধর্মের উর্ধ্বে। এই একেশ্বরবাদের পরমশক্তিমান, অথচ অগাধ আনন্দের ধারক সেই ঈশ্বর বা আল্লা, যিনি অস্তিত্বের নিরিখে একমাত্র একক, এক অপার আনন্দের অনুভূতিমাত্র। এই একই অনুভূতির ধারক হিসেবে ঔপন্যাসিক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের **'করোয়ার পানি'**(১৯৯৭) উপন্যাসে, উপন্যাসের চরিত্র যবন হরিদাস বলছেন, ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন। প্রত্যেক মানুষেরই নিজের ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরকে যে কোনোভাবে আরাধনা করার অধিকার আছে। অর্থাৎ মুসাফির হরিদাস ইসলাম ধর্মের মানুষ হয়েও, হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং তিনি হিন্দু ধর্মের একেশ্বরবাদ ও ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদকে যেন, এক একক একেশ্বরে পরিণত করেছিলেন। যেখানে আল্লা ও ঈশ্বর একাকার হয়ে গেছেন। এই একেশ্বরের সমর্থনে ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের **'অনলপ্রভ বিদ্যাসাগর'**(২০০৫) উপন্যাসে উল্লেখিত সত্য হ'ল, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের আরাধনা হ'ল, মানুষের অন্তরের অন্তস্থিত সদর্থক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। ধর্মের মূল দর্শন তুলনাহীন এক মহাবিজ্ঞান। বলা যেতে পারে, অনন্তে অস্তিত্বের অনুসন্ধান। একের মধ্যে বহুর অবস্থান। "ওঁ তৎসৎ" – সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা সেই সত্য, একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম – একমাত্র অদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী নিত্যসত্য। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মেও একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মকেই 'বিশ্বব্যাপী নিত্য' বলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একেশ্বরবাদী অর্থাৎ এক ঈশ্বরেই সমস্ত কিছু বর্তমান অথচ কোন কিছুতেই ঈশ্বর নেই। একমাত্র ঈশ্বরেই ঈশ্বর আছেন। একেশ্বরবাদের সমর্থনে **'কথা'**(২০০৬) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় বেদের কথাকে উল্লেখ করেছেন। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" – অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত সেই এক ব্রহ্ম – একথা হিন্দু

ধর্ম স্বীকৃত। সর্বভূতে বাস করেন বলেই শ্রীকৃষ্ণের আরেক নাম বাসুদেব। শ্রীমদ্ভাগবতগীতার তৃতীয় স্কন্ধে ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন – “আমি সর্বভূতে সর্বভূতেরই আত্মারূপে রয়েছি। অথচ সর্বভূতময় সেই আমাকেই অবজ্ঞা করে, মানুষ প্রতিমাপুজোর বিরম্বনায় মেতে থাকে।” এভাবেই বেদ এবং গীতায় পৌত্তলিকতাকে ব্রাত্য করে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জগতের সমস্ত কিছুতে ঈশ্বর দর্শন, ঐশ্বরিক অনুভূতি, অনুভব করার ফলে মানুষের মধ্যে এক সামগ্রিক একতার বীজ রোপিত হয় যা মানুষের সাথে মানুষকে এক একক ধর্মের ভিত্তিতে গ্রথিত করার ক্ষমতা রাখতে পারে। মানুষের অন্তঃস্থিত নীতিবোধ, মূল্যবোধের অন্তর্বাহী শক্তির প্রতি, প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত পূর্ণাস্থার, পূর্ণাঙ্গ প্রকাশই যথার্থ ধর্মরূপে গণ্য হতে পারে। কারণ যথার্থ নৈতিকবোধ ও মূল্যবোধের ধারক মানুষই ঈশ্বর। আবার ঈশ্বর সৃষ্টির মূলেও মানুষের মনই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। তাই **‘কথা’**(২০০৬) উপন্যাসে ‘ঈশ্বর সৃষ্টির মূলেও মানুষ’ এই কথাটিকে অত্যুক্তি বলা নাও যেতে পারে। ‘অদ্বৈতবাদ’ কথাটির অর্থ হ’ল, যেখানে দুটো জিনিস শেষ পর্যন্ত মিলে এক হয়। যেমন সমুদ্র ও নদী বাস্তবে পৃথক। কিন্তু যখন নদী সমুদ্রে গিয়ে মিশে যায়, তখন সেই নদীর জলকে আর আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। আদিতে বা প্রথমে দুটি পৃথক থাকাই বাস্তবসম্মত। অথচ মিলনের পর এক সমুদ্রে একাধিক নদী একাকার হয়ে যায়। তখন আর তাদের পৃথক অস্তিত্ব বর্তমান থাকেনা। একথার মাধ্যমেও একেশ্বরবাদকেই সমর্থন করা হচ্ছে। অর্থাৎ নানান ধর্মরূপ নদীগুলি যখন এক একেশ্বররূপ সচ্চিদানন্দসাগরে মিলিত হয়, তখন আর আলাদা করে কোন ধর্মরূপ নদীগুলিকে পৃথক করা সম্ভব হয় না। **‘কথা’**(২০০৬) উপন্যাসে ইসলামের একেশ্বরবাদও উল্লেখিত হয়েছে। ইসলামের একেশ্বরবাদকেও ধর্মের কোনো নতুন পথ নয় বলেই বিবৃত করা হয়েছে। পৃথিবীতে ইসলামের আগেও একেশ্বরবাদের অস্তিত্ব ছিল। প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ভারতবর্ষের ঋষিরা খ্রীষ্টেরও অনেক আগে একেশ্বরবাদের প্রসঙ্গকে পরিপূর্ণ করেই চিন্তা করেছিলেন। ভারতবর্ষের বাইরে মিশরে প্রথম একেশ্বরবাদ প্রচারিত হয়েছিল। কারণ তখন সেখানে ফারাওদের অত্যাচার ও সীমাহীন পৌত্তলিকতার প্রচলন মানুষকে দিশাহীন করে তুলেছিল। সেই সময়েই মোসেস আফ্রিকা, ইউরোপ জুড়ে একেশ্বরবাদের প্রচার করেন। তৌরাৎ-গ্রন্থে এই কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পয়গম্বর মহম্মদ সামান্য কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কারের পরে একেশ্বরবাদকেই সর্বাংশে গ্রহণ করেছিলেন। গীতার জ্ঞানযোগ, জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ, অক্ষরব্রহ্মযোগ, রাজযোগ, বিশ্বরূপ দর্শন যোগ, পুরুষোত্তম যোগ, এইরকম আঠারোটি অধ্যায় জুড়েই সেই একই একেশ্বরবাদের শিক্ষা বর্তমান।

কোরানের সুরা 'জারোয়াত'- এ যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য ঈশ্বর নির্ধারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তেমন করেই হিন্দুদের বৃহন্নারদীয় পুরানেও স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, যেহেতু ঈশ্বর নেই এমন কোন জায়গা নেই, সেহেতু তিনি পাষাণেরও আছেন – এই ধারণা থেকেই অজ্ঞ মানুষেরা ভুল করে ভাবে যে মূর্তি বা প্রতিমাই সত্য ভগবান বা ঈশ্বরের প্রতিভূ। ঔপন্যাসিক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের **'জ্যোতির্গময় ও সুনয়নী'**(২০১৩) উপন্যাসেও মৃত্যুর প্রসঙ্গকে স্বীকৃতি দিয়ে একেশ্বরবাদকেই সমর্থন করা হয়েছে। জীবাত্মার শেষ পরিণতি ব্রহ্মলাভ। কারণ জীবের পার্থিব শরীরের মৃত্যু হলেও জীবাত্মা অমর। মুণ্ডক শ্রুতি অনুযায়ী, ঈশ্বর নির্গুণ অবস্থায় ব্রহ্ম, আবার সগুণ অবস্থায় ঈশ্বর। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, শিব, কালী, দুর্গা অনন্তকোটি নাম উপাধিধারী দেব-দেবীরা আসলে একই ঈশ্বর। এভাবে তিনিও তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে একেশ্বরবাদের সমর্থনকেই তুলে ধরেছেন। ঔপন্যাসিক সুজিত কুমার ঘোষের **'ব্রজেশ্বরী'**(২০১৩) উপন্যাসেও আত্মাকে জন্মহীন-নিত্য-অক্ষয়-অনাদি পরমাত্মার অংশবিশেষ উল্লেখ করে পরোক্ষে একেশ্বরবাদকেই সমর্থন করা হয়েছে। ঔপন্যাসিক নবকুমার বসুর **'শ্রীময়ী মা'**(২০১৪) উপন্যাসে উল্লেখিত আছে, পরমাত্মার সেবা-উপাসনায় যে আনন্দ, তাই যোগসাধনার উৎস। আর এই যোগসাধনার দ্বারাই পরমাত্মায়, জীবাত্মা লীন হয়ে যায়। একথাও পরোক্ষে একেশ্বরবাদেরই উপস্থিতিকে সর্বতোভাবে সমর্থন করে। ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের **'সাধের ময়না'**(২০১৫) উপন্যাসে মৃত্যুর অর্থকে, বৌদ্ধ ধর্মের অনুসরণে, আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মৃত্যু এক অসাধারণ, অপূর্ব জীবনবোধরূপে অবস্থান করে। মৃত্যুকে 'অংশের সাথে পূর্ণের মিলন' বলে উল্লেখ করে হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে এক মতৈক্যের রেখা টেনে দেওয়া হয়েছে, যেখানে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে, দুই ধর্মই, পরমলক্ষ্য হিসেবে, একেশ্বরবাদেরই সমর্থক হয়ে উঠেছে। আর এই অংশের সাথে পূর্ণের মিলনে প্রধান উপকরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে – চিত্তশুদ্ধিকে। ঔপন্যাসিক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'প্রাণসখা বিবেকানন্দ'**(২০১৭, সপ্তম মুদ্রণ) উপন্যাসে খুব সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে ব্রহ্ম ও ভগবানের বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বক্তব্য অনুযায়ী, ব্রহ্ম আর ভগবানে কোন তফাৎ নেই। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান। তফাতটা হ'ল, ব্রহ্ম হ'ল সাদাসিধে চেহারার, আবার এই ব্রহ্ম যখন সেজেগুজে বাইরে বের হচ্ছেন, তখন তিনি ঈশ্বর বা ভগবান। ব্রহ্ম গুণাতীত আর ভগবান গুণময়। ব্রহ্ম ষড়ভাবশূন্য। ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। ব্রহ্ম বীজ। সেই বীজ থেকেই গাছ-পাতা-ফুল ইত্যাদির উদয় হ'ল ভগবানের প্রকাশ। ব্রহ্ম নিরাকার, ভগবান বা ঈশ্বর সাকার। সাকার-নিরাকার উভয়ই সত্য। ব্রহ্ম আর ঈশ্বর

বা ভগবান একই শক্তির দুইরকম প্রকাশ। এই দুই শক্তির মধ্যে কোন কলহ নেই। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বলা যেতে পারে এও এক একেশ্বরবাদের বর্ণনা। অর্থাৎ মা কালীর উপাসক শ্রীরামকৃষ্ণদেব একেশ্বরবাদেরই পূর্ণ সমর্থক ছিলেন।

বর্তমান গবেষণায় গৃহীত বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়কালের (১৯৯১-২০১৭) বিভক্তিকরণের দ্বারা সৃষ্ট তিনটি পর্বেরই, উপরোক্ত ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধর্মের এক বিশেষ সর্বজনীন সিদ্ধান্ত, যা বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে বর্তমান গবেষক মনে করেন তা হ'ল, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধর্মেই একেশ্বরবাদ স্বীকৃত। প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আচার-বিচার, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, রুচি, সংস্কৃতি, ইত্যাদি পৃথক হওয়া সত্বেও প্রতিটি ধর্মই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে একেশ্বরকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। তৎসত্ত্বেও বিস্ময়ের বিষয় হ'ল – ধর্মের আচার-ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে ধর্মে ধর্মে সাম্প্রদায়িকতা ও বিভেদের ধর্মের অবতারণা হয়েছে বারবার, যা সমাজের মানুষের মননে প্রকৃত ধর্মবোধকে ক্ষুন্ন করে। ধর্মে ধর্মে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িকতার বীজ মহীরুহ হয়ে ওঠার চেষ্টা করলেও, ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের উপন্যাস রচনার মাধ্যমে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুস্পষ্ট বার্তা দিয়ে, সমাজে একেশ্বরবাদের সমর্থনে, বারংবার এক বিশ্বজনীন ধর্মের আবাহন করতে চেয়েছেন। ধর্ম মানুষের সামাজিকতার একটা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সমাজের সম্পূর্ণ ও সুন্দর অগ্রগতির জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন স্থিতধী সৎ মানুষের। মানুষের ধর্মচেতনা, মানুষের জীবনের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মানুষকে সৎ পথে ধরে রাখতে সাহায্য করে। ধর্মই মানুষের ইহজন্ম-পরজন্মেও মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার নৌকার নোঙরের মতো। ধর্মীয়বোধ বা ধর্মীয় নীতিবোধ মানুষকে ঈশ্বরবোধের সঙ্গে ও সত্যবোধের সঙ্গে সংলগ্ন করে। ধর্ম মানব সভ্যতার মননে অবস্থান করে। সমাজের মানুষের প্রকৃত ধর্মবোধ ব্যর্থ হলে, মানব সভ্যতা বিপন্ন হতে পারে।

আচার সর্বস্ব ধর্ম, ধর্ম নয়

ধর্ম ও নীতিবোধ একে অন্যের পরিপূরক বা সমার্থক বলা যেতে পারে। যদিও মানুষের নীতিবোধ যুক্তিনির্ভর। কিন্তু ধর্মের প্রেক্ষাপট হ'ল, ভক্তি ও বিশ্বাস। আর নীতিকে যুক্তির তুলাদন্ডে বিচার করা হয়। এই পার্থক্যের মধ্যেই ধর্ম ও নীতিবোধের সম্ভাব্য দ্বন্দ্বের বীজ নিহিত আছে। সমাজে কখনো কখনো নীতিবোধের সাথে সমীচীনতা বজায় রেখে ধর্মের অবস্থান্তর করা হয়। এই অবস্থান্তরে ধর্ম কখনো

নীতিবোধকে সমর্থন করে, আবার কখনো কখনো নৈতিকচাপে ধর্মের পরিশোধন হয়। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের ব্যাপ্তির কারণে অতীতের গ্রাহ্য ধ্রুব ধার্মিকবোধ, কালের পদার্পণে সামাজিক নীতিজ্ঞানে উন্নীত হয়েছে। যার সর্বোচ্চ প্রকাশ, প্রকাশিত হয় মানব-ধর্মের সুউচ্চ ধারণায়। নীতিজ্ঞান, নৈতিকআদর্শ ধর্মের মধ্যে থেকেই সামাজিকরূপ অর্জন করেছে, বলা যেতে পারে। সেই কারণেই সমাজভেদে, সেই রূপ পরিবর্তিত হতেই পারে। কিন্তু মানব চরিত্রের কতগুলো নৈতিক আদর্শ যা দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে ধর্মের ছত্রছায়ায় শাশ্বতরূপ ধারণ করে থাকে, এই শাশ্বত রূপকেই 'মানুষের ধর্ম' বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই ধর্মে কোন নৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকতে পারেনা। উপরোক্ত বক্তব্যগুলিকে ধর্মের আদর্শের কথা রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ধর্মের একটা ব্যবহারিক দিকও বর্তমান আছে। এই ব্যবহারিক দিকের কতগুলি আচার-বিচারের প্রচলন আছে, যা কখনো কখনো মানুষের মনকে ধর্মীয় রীতি-নীতির প্রতি আকৃষ্ট করে, আবার কখনো কখনো এই আচার-বিচারকে 'যুক্তিহীন কুসংস্কার' নামেও অভিহিত করা যেতে পারে। যেমন অতীতের নরবলি, সতীদাহ প্রথা, দেবদাসী প্রথা, জোর করে ধর্মান্তরিতকরনের প্রথা – এগুলি কখনোই সমর্থনযোগ্য ধর্মীয় আচার-বিচার রূপে প্রতিপন্ন হতে পারে না। তাহলে বলা যেতে পারে যে, ধর্ম এক অতীন্দ্রিয় পরম শক্তি বা সর্বশক্তিধর ঈশ্বরের ধারণা। এই ধারণাকে আধ্যাত্মিক বিশেষণে বিশেষিত করা যায়। অন্যদিকে নৈতিক আদর্শের ভিত্তি হ'ল, সুনীতি-দুর্নীতির ধারণা, যার উৎস মূলত সমাজের সামাজিক পরিস্থিতি। তাই বলা যেতে পারে ধর্ম যেমন পাপ-পুণ্যের ধারণাকে জন্ম দেয়, তেমনি নীতিজ্ঞান বা নৈতিক আদর্শ ভালো-মন্দের ধারণাকে সৃষ্টি করে। সমাজে ধর্মভাব সুউন্নত হ'লে, ধর্ম এবং নৈতিক আদর্শের পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। তখন উপলব্ধি করা যেতে পারে যে নীতিহীন ধর্ম যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনি নীতিও ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। এভাবে দেখা যেতে পারে যে, নৈতিক জগতের ভিত্তি হলো সততা, আর এই নৈতিক জগতের সৃষ্টিকর্তা হলেন ঈশ্বর বা ভগবান। কারণ ধর্ম এবং নীতি এই দুটি বিষয়ই মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলের অন্তর্লীন উপলব্ধি। আর নীতিহীনতা, সমাজ জীবনের বিকৃত মানসিকতার এমন এক পরিণাম যা সমাজের ধ্বংসের পথ সুগম করে। ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বের সকল ধর্মের আদর্শের প্রতি সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাশীল। ধর্মের পরিকাঠামোর ওপর দাঁড়িয়েই, বলা যেতে পারে যে, শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশই মানুষের জীবন থেকে অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হতে পারে। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক আনন্দময় বড়ুয়ার **'অন্বেষণ'**(১৯৯৪) উপন্যাসে ধর্মের আচার-আচরণের ব্যবহারের যে দিকটির কথা

প্রাধান্য পেয়েছে তা হ'ল, জাতি-ধর্ম, নারী-পুরুষ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষই সমাজে যে সম্মানের অধিকারী তার নাম, প্রকৃত মানবাধিকার। ধর্মীয় কু-প্রথা কখনোই উদার সমাজব্যবস্থার বা সমাজ প্রগতির উপায় হতে পারে না। এই একটি বক্তব্যের রেশ ধরে ঔপন্যাসিক আব্দুল জব্বারের **'আগুনের সাঁকো'**(১৯৯৬) উপন্যাসে মানুষের সাথে মানুষের মধ্যবর্তী একতা এবং পরস্পর নির্ভরশীলতার বিষয়টি উঠে এসেছে। পরস্পর নির্ভরশীলতার বিষয়টিকেই সামাজিক সম্পর্কের মূল ভিত বলে গণ্য করা যেতে পারে। কারণ ধর্ম যখন মানুষকে সমাজবদ্ধ করে, তখন তাকে ধর্মের সদর্থক প্রয়াস বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু ধর্ম যখন কোন ধর্মমতের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাকে ধর্মের নঙর্থক প্রয়াস বলে নামকরণ করা যেতে পারে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্বের বিকাশের ফলে মানুষ তার নিজের মানবিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে সক্ষম হতে পারে। মানুষের যথার্থ মানবিক অধিকারই মানুষকে তার প্রাপ্য সম্মান পেতে সাহায্য করে। উপরোক্ত বক্তব্যকে সমর্থন করেই ঔপন্যাসিক আব্দুল জব্বারের **'স্বপ্নের পরকলা'**(১৯৯৬) উপন্যাসের বক্তব্য অনুযায়ী, যে ধর্মের আচার-আচরণে মানবিক অধিকার ক্ষুন্ন হয়, সেই ধর্ম মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করতে অক্ষম হতে পারে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মের কতগুলো আচার-আচরণই, প্রকৃত সঠিক ধর্মের ক্ষেত্রে অন্তিম সিদ্ধান্তরূপে গণ্য হতে পারেনা। এই আচার-আচরণগুলি যে সম্প্রদায়ভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নির্ণয় করার ক্ষমতা রাখে, তার দ্বারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা সম্ভব নাও হতে পারে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার সবচেয়ে বড় উপাচার হ'ল, সম্মানের সঙ্গে প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া। সমাজের মানুষের নৈরাশ্য সম্পর্কে ঔপন্যাসিক নিমাই ভট্টাচার্যের **'আকাশ-ভরা-সূর্য-তারা'**(১৯৯৭) উপন্যাসের উল্লেখিত বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রয়োজন, সামাজিক সংহতি। সমাজের বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন প্রথা, নানান রীতিনীতি, একচ্ছত্র আধিপত্য ও তার নিয়ন্ত্রণ, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অবদমন ও ধর্মের প্রথা ও নীতির মাধ্যমে মানুষকে শোষণ, সমাজের মানুষের মধ্যে নৈরাশ্য ও ব্যর্থতাকে আহ্বান করে, যা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের ক্ষেত্রে কোন শুভবার্তা বহন করে আনতে অক্ষম। তাই ধর্মের গোঁড়ামির সংস্কারকে বিস্মৃত হয়ে, মানুষে মানুষে সামাজিক ঔদার্যের সম্পর্ক, মানুষের জীবনকে আশাব্যঞ্জক করে তোলে। সমাজের মানুষের ধর্মের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়টি আব্দুল জব্বারের **'ভরাকোটাল'**(১৯৯৮) উপন্যাসে উঠে এসেছে। সমাজস্থ মানুষের অন্তরের গভীরে থাকা সুখভোগের নৈরাশ্যই মানুষের মনে হীনমন্যতার বা

হতাশার জন্মদাতা। সাধারণ মানুষের কাছে, সাধারণত ধর্মই হ'ল সংস্কৃতি, আবার শিক্ষিত মানুষের কাছে, সাধারণত সংস্কৃতিই হলো ধর্ম। কারণ প্রকৃত সংস্কৃতি সাম্প্রদায়িকতার পরিপন্থী। তাই ধর্মে ধর্মে, ধর্মীয় গোঁড়ামির আচার-বিচারের ব্যবহার সাম্প্রদায়িকতার আহ্বায়ক হয়ে উঠতে পারে। হয়তো এই কারণেই যে কোন ধর্মের মৌলবাদীদের মনস্তত্ত্বে শিক্ষা এবং সংস্কৃতি অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকতে দেখা যেতে পারে। এই বক্তব্যের ভাবনার ছায়া ঔপন্যাসিক রামকৃষ্ণ সাঁতরার **'ভরা কোটাল'**(২০০০) উপন্যাসে পাওয়া যায়। মানুষের মতো মানুষের বেঁচে থাকাটাই মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই মানবিকতার মহাধর্মে কখনোই কোনো বিশেষ সম্প্রদায়,পৃথক আনুকূল্য পেতে পারে না। মানুষের ধর্ম হ'ল, মনুষ্যত্বপূর্ণ এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে বাঁচা, যাঁর মান-হুঁস অন্য মানুষকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে, তাঁকে উদ্যোগী করে তুলবে। বাকি সবই একান্তভাবে বাহ্যিক বিষয়রূপে গণ্য হতে পারে। অর্থাৎ ধর্মের আচার-বিচারের বিষয়টিকে একান্ত বাহ্যিক বিষয়রূপে গণ্য করে, ধর্মে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টিকেই বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহের **'স্বপনে নিভৃত স্বপনে'**(২০০৩) উপন্যাসে স্বীকার করা হয়েছে যে একমাত্র মানুষ ছাড়া ইতর প্রাণীদের জীবনে সম্ভবত সেই অর্থে 'ধর্ম' বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব হয়তো থাকতে পারে না। মানুষের ধর্মীয় চেতনার শিকড় হ'ল, জৈবিকবোধ বা জীবনসংগ্রাম। এক সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার প্রস্তুতির জন্য মানুষের ষষ্ঠেন্দ্রিয় মনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই মন বা বিবেক মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়কে সদর্থক বা নঙর্থকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। পবিত্র সদর্থক মনে, অনর্থক নিষেধের অনুশাসন বা ভেদাভেদের সংকীর্ণ রীতিনীতি কখনোই বাস করতে পারে না। ফলে এ কথা বলা যেতে পারে যে, পবিত্র সদর্থক মনের অধিকারী মানুষ কখনোই বিবেকবিরোধী কর্মোদ্যোগী হতে পারে না। **'ভূমিপুত্র(২)'**(২০০৬) উপন্যাসে খুব সহজভাবেই তুলে ধরা হয়েছে যে, প্রতিটি মানুষেরই নিজের ইচ্ছানুসারে ধর্ম পালন করার অধিকার আছে। যে কোন অজুহাতেই, কোনো মানুষকেই, যেকোনো ধর্মের যেকোনো রীতি-নীতি মানতে বাধ্য করা যায় না। যেমন – মাইক বাজিয়ে আজান দেওয়া বা সারা রাত্রিব্যাপি হরিনাম সংকীর্তন করা। ধর্মে ধর্মে বিরোধের প্রধান কারণ – বাহ্যিক ধর্মীয় আচার-আচরণের বৈপরীত্য। যেমন হিন্দুদের মূর্তিপুজো ইসলামের কাছে পাপ আবার ইসলামের গরুকাটার বিরোধিতায় হিন্দুরা সরব। ফলে জন্ম হয় সাম্প্রদায়িক বিরোধের। তাই যে কোনো ধর্মের প্রথা বা রীতিনীতি সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে গ্রাহ্য নাও হতে পারে। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর **'পরবাসী'**(২০০৮) উপন্যাসে উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়। উপন্যাসের তথ্য অনুযায়ী, হিন্দু ধর্মে

একটি দেবীমূর্তি ইসলাম ধর্মাবলম্বীর স্পর্শে অপবিত্র হয়ে গেলে, একজন মানুষ সেই দেবীমূর্তিকে শুধুমাত্র গোমূত্র, গোবর, গরুর দুধ দিয়ে শোধন বা পুনঃপবিত্র করার ক্ষমতা কিভাবে অর্জন করতে পারেন, এই বিষয়টি অত্যন্ত বিস্ময়বোধক এবং মানবিকতা বিরোধীও বলা যেতে পারে। কারণ যে ধর্মের স্থান মানুষের মননে বা বিবেকে, সেই ধর্মই একজন মানুষকে শুধুমাত্র বিধর্মীয় বলে, তার স্পর্শকে ধর্মের নামে অপবিত্র বলে ঘোষণা করছে যা একেবারেই মননশীলতার পরিপন্থী এবং বিবেকবিরোধী। ঔপন্যাসিক আবুল বাশারের **'আমি লালন কবীর'**(২০০৯) উপন্যাসে ধর্মের রীতিনীতির সাথে এক সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের দিক তুলে ধরা হয়েছে, যা ধর্মের রীতিনীতিকে সৌন্দর্যায়নের এক অসাধারণ উপকরণ করে তুলতে পারে। সেই নবাঙ্গিক দিকটি হ'ল, মানুষের সাথে মানুষের ভাষার মধুময়তা। সমাজের ভাষার মধুময়তাকে গ্রাহ্য করে তুলতে পারলে হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মের অসাম্প্রদায়িকতাকে আলিঙ্গন করা সামাজিকভাবে সম্ভব হলেও হতে পারে। কারণ ধর্ম ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ভাষার দ্বারাই অক্ষুন্ন রাখে এবং একাধিক ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তাকে, প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে স্বতন্ত্র করে তুলতে সক্ষম হতে পারে। তাই পূর্ণকুম্ভের মেলায় কোটি কোটি মানুষের মিলন যেন এক অসাম্প্রদায়িকতাকেই বরণ করার উৎসব রূপে প্রতিপন্ন হয়। এ যেন বিশ্বভাতৃত্ববোধের এক প্রতীকী ভাবনা হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিক নজরুল ইসলামের **'ভূমিপুত্র(১)'**(২০০২) উপন্যাসে উপরোক্ত বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল থেকেই নানান ধর্মগ্রন্থে যে সমস্ত বিভিন্ন প্রচলিত আচার-আচরণ, রীতিনীতি উল্লেখিত আছে, তা ক্রমশ হিন্দু ধর্মের পরিচয় হয়ে উঠেছে। হিন্দু ধর্মের আচার-আচরণকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের প্রভাব অপরিসীম ছিল। তবে এই সমস্ত রীতিনীতি বা আচার-আচরণ অনেক সময় পরস্পরবিরোধীও হয়ে থাকে। তবে পরবর্তীকালে স্থান-কাল-পাত্রের হাত ধরে এই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-নীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সদর্থক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়েছে। সেই হিসেবে বলা যেতে পারে হিন্দু ধর্মের নানান আচরণের বিধিনিষেধ থাকলেও হিন্দু ধর্মের চরিত্র নমনীয়। কারণ নানান ধর্মাচার্যেরা নিজেদের ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে, দৈনন্দিন সহজ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে, মানুষের প্রয়োজনে, সেই নিয়ম-নীতিগুলিকে পরিবর্তনে সক্ষম হতে পেরেছিলেন। ইসলাম বা খ্রীষ্ট ধর্মের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া সম্ভব নয়। কারণ ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা জন্ম থেকেই ধর্মাশ্রয়ী এবং তাদের ধার্মিক রীতিনীতি পরিবর্তন করা সহজসাধ্য নয়। ঔপন্যাসিক মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্যের **'অন্তপ্রহর'**(২০১১) উপন্যাসে বৌদ্ধধর্মের জাতপাতহীন, প্রত্যেক মানুষের কাছে উন্মুক্ত, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য না

দেওয়া ও মানুষের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের গুরুত্বপূর্ণ পথকে এক মানবদরদী ধর্মরূপে গণ্য করেছেন। কারণ বৌদ্ধধর্মে সকল মানুষকে সমআত্মশক্তির আধার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই অর্থে আচার-আচরণহীন এই বৌদ্ধ ধর্মের পতনের মূল কারণ হ'ল, কালচক্রযানের উদারনীতি। যে নীতিতে আহার বিহারের শৃঙ্খলা, স্নান, শৌচ, বেশভূষার পারিপাট্য, গৃহ মার্জনার আচার কোন কিছুকেই মান্যতা দেওয়া হতো না। তাঁরা কোনরকম সংস্কার মানতেন না। ফলে মানুষের জীবনযাত্রায়, সাধারণ জীবনযাপনের নীতিসম্মত আচার-আচরণ যে কত প্রয়োজন সেই বিষয়টি এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ এই বিশৃংখল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ক্রমশ তাদের ধী-শক্তিকে অর্থাৎ জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এক শর্ত ধৈর্যকে হারিয়ে, চিন্তাভাবনা উদ্ভাবনের শক্তিকেও বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। এতে সঙ্ঘের শাসন নিয়ন্ত্রণ যেন অপহৃত হয়েছিল। যার ফলে বৌদ্ধ ধর্মের পতনের পথ সহজ হয়ে গিয়েছিল। ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের **'কমলিকা'**(২০১২) উপন্যাসে ধর্মীয় আচার-আচরণ ও রীতিনীতি আঁকড়ে সমাজে যে সম্প্রদায়গত জাতিভেদ ও প্রতিটি সম্প্রদায়স্থিত মানুষের মধ্যে উচ্চ-নিচ, গরিব-বড়লোক, শক্তিমান-দুর্বল এই সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে তা সমাজের সুস্থ সামাজিকতাকে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হতে পারে। তাই পরিমিত জীবনধারণের প্রয়োজনীয় রীতিনীতি, নিয়ম-শৃঙ্খলা বা সু-প্রথা জীবন সৌন্দর্যায়নের কার্যে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণতাও অর্জন করে থাকে। কিন্তু কু-প্রথা, কুসংস্কার, প্রকৃত রীতিনীতি বা নিয়ম-শৃঙ্খখলার অন্তর্গত বলা যেতে পারে না। তাই সুস্থ সমাজব্যবস্থা আবাহনের এক প্রধান শর্ত – সমাজের গ্রাহ্য সুস্থ রীতিনীতি বা নিয়ম-শৃঙ্খলার আলিঙ্গন।

বর্তমান গবেষণায় গৃহীত বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়কালের (১৯৯১-২০১৭) বিভক্তিকরণের দ্বারা সৃষ্ট তিনটি পর্বেরই উপরোক্ত ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণের পরে সামাজিক ন্যায়-নীতি, নিয়ম-শৃঙ্খলার যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তাতে সামাজিক ন্যায়-নীতির প্রধান উদ্দেশ্য, সমাজের জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন। সমাজের সমস্ত স্তরের জনসাধারণের মানবাধিকার সুনিশ্চিত করা ও মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হলে তা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সমাজের সামাজিক ন্যায়-নীতির ও নিয়ম-শৃঙ্খলার ধারণার মধ্যেই সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্ববোধের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়ে মানুষের সাথে মানুষের ভাষার মধুময়তা এক গুরুত্বপূর্ণ সদর্থক পদক্ষেপ হয়ে

উঠতে পারে। কারণ সুমধুর ভাষার ব্যবহার মানুষের সুন্দর মনের পরিচয়। যা মানুষকে একে অন্যের কাছে গ্রহণীয় করে তুলতে সক্ষম হয়। তাই সুমধুর ভাষার ব্যবহারকে অসাম্প্রদায়িকতার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মান্যতা দেওয়া যেতে পারে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায়, সাধারণ জীবনযাপনের নীতিসম্মত আচার-আচরণ, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। মানবিকতার মহাধর্মে কখনোই কোন নীতিহীনতা বা সাম্প্রদায়িকতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠতে পারে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে উপরোক্ত বিষয়গুলিতে তিনটি পর্বের লিখিত উপন্যাসগুলির ঔপন্যাসিকরা বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন মানসিকতায়, বিভিন্ন সময়ের আঙ্গিকে উপন্যাসগুলি লেখা সত্বেও, সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের স্বার্থে, ধর্মের নীতিসম্মত নৈতিকবোধের ক্ষেত্রে, একে অন্যের সাথে সহমত পোষণ করেছেন। মানুষের আচার-আচরণের নীতিহীনতা ও ভেদাভেদের রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতার আবাহনে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে। ধর্মের গোঁড়ামি, কুসংস্কার, কু-প্রথা এগুলি বিশ্বভাতৃত্বের অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে। বিশ্বায়নের হাত ধরে বলা যেতে পারে যে আন্তর্জাতিক নিয়ম বা আইন মানুষের প্রকৃতিগত আচার-আচরণের, ন্যায়-নীতিবোধ থেকেই উদ্ভূত হয়। আর এই ন্যায়নীতিবোধরূপ, মানবিকতাবোধ সারাবিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের কাছেই অত্যন্ত অভিপ্রেত বিষয়রূপেই গণ্য হয়। স্বাধীনতা মানব জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। এই স্বাধীনতাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাই নিয়ম-নীতি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি সমানভাবে কার্যকর হলে সাম্প্রদায়িকতার নঙর্থক পরিবেশ থেকে সারা বিশ্বজুড়ে মানব সমাজকে রক্ষা করা সহজসাধ্য হয়ে যেতে পারে।

সমাজে ধর্মের নামে দ্বন্দ্ব ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব

বিশ্বায়ন অথবা নব বিশ্বব্যবস্থায় আধুনিক পুঁজি, মুক্তবাজার অর্থনীতি, বেসরকারিকরণ ও উদারীকরণের ধারণাগুলি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকে। তাই বলা যেতে পারে যে, বিশ্বায়নের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীকে একটি বিশ্বব্যাপী গ্রামে পরিণত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেখানে মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপগুলো পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ওপর দণ্ডায়মান। বিশ্বায়ন ধারণার বশবর্তী হয়ে যে বিশ্বজনীন ধর্মের জন্ম হতে পারে তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই যে কোন ধর্মের সম্প্রসারণ ঘটাতে পারে। ধর্মের এই সম্প্রসারণ কখনো মানবিক চেতনার হাত ধরে আবার কখনো বা অস্ত্রবলের দ্বারা

ভীতিপ্রদর্শনের হাত ধরেও সম্পাদিত হয়। তবে বিশ্বজনীন ধর্ম, যে কোন ধর্মের ক্ষেত্রেই, সেই ধর্মের ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে, বিশ্বস্তরে সর্বজনীন হয়ে ওঠার মানসিকতায় স্নাত হয়। বিশ্বস্তরে মানুষের সামাজিকতায় ধর্মের বিকাশ স্থায়ীভাবে প্রভাবিত হয়। কারন যখনই এক দেশের ধর্ম আর এক দেশে প্রবর্তিত হয়, তখন তা সেই দেশের সংস্কৃতির ওপর ধর্মের প্রভাব-নির্ভরতাকে প্রকাশ করে। সংস্কৃতির অগ্রগতি যে কোনো দেশের ক্ষেত্রেই ধার্মিক বা ন্যায্য চিন্তার বিশুদ্ধতা ও মানুষের মানসিক আধ্যাত্মিকতার সদর্থক বিকাশ করে থাকে, এ কথা বলা যেতে পারে। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের যুদ্ধে অর্জুনকে যে গীতার বাণী শুনিয়েছিলেন তা হ'ল – "পার্থ, ক্লৈব্যং মা গম", অর্থাৎ ক্লীব হয়ো না। ধর্মের এই মর্মবাণী শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়, এই বাণী সমস্ত ধর্মের মানুষের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মে এভাবেই ধর্ম ও কর্মের সমমর্যাদার, সুসমন্বয় করা হয়েছিল। অর্থাৎ মানুষের কর্মই মানুষের ঈশ্বর আরাধনা হয়ে উঠতে পারে। মানুষের কর্মই পরম ঈশ্বর অনুভূতির এক প্রকৃষ্ট ধর্মপথ। কিন্তু বিশ্বব্যাপী 'কর্মই ধর্ম'-এই বাণীর স্বপক্ষে, বিশ্বব্যাপী ভাতৃত্ববোধ বা সৌহার্দ্যবোধের সামাজিক ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শর্ত বলে বিবেচ্য হতে পারে। আর এই ভাতৃত্ববোধ বা সৌহার্দ্যবোধের প্রতিষ্ঠার এক সহজ ও সুন্দর পন্থা হিসেবে, সদর্থক রাজনৈতিক চেতনার বিশ্বব্যাপী উন্মেষ ঘটানোর প্রচেষ্টা করতে হতে পারে। বর্তমান গবেষণায় একদিকে বিশ্বায়ন অপরদিকে ধর্মীয় উন্মাদনার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, সমাজের মানুষের সামাজিক ঐক্যচেতনার বা ধর্মীয় যুক্তিহীন উচ্ছৃংখলতার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তার কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে গবেষণায় গৃহীত ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসপ্রাপ্ত তথ্যাবলীর প্রাপ্য। মানুষ যখন বিশ্বভাতৃত্ববোধের দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়, তখন সেই পরিস্থিতিকেই সঠিক রাজনৈতিক দিক বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। রাজনীতির অর্থ জাগরন। জাগরনের উন্মেষ হয় জ্ঞানে। প্রকৃত শিক্ষা ধর্মের গোঁড়ামি ও মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে সমাজকে আড়াল করে রাখতে সক্ষম হতে পারে। কারণ যুক্তিহীন নীতিহীনতা, ধর্মসমার্থক নয়। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের **'হরপার্বতী সংবাদ'**(২০০২) উপন্যাসে এই যুক্তিহীন নীতিহীনতার প্রসঙ্গে যে তথ্যাবলী প্রাপ্ত হওয়া গেছে তা থেকে বলা যেতে পারে যে, দুর্নীতিই নীতিহন্তক। তাই রাজনীতির 'নীতি'-কে যদি হত্যা করা হয় তাহলে শুধুমাত্র 'রাজ' কথাটিকেই প্রাধান্য দিতে হয়, সেক্ষেত্রে প্রকৃত ধর্মবোধক রাজনীতি কখনোই হয়তো সম্ভব হয়ে উঠতে পারে না। কারণ নীতিহীন, বিবেকহীন, ধর্মহীন কাজের জন্য, নীতিহীন মানুষদের কোনো অনুতাপ বা মনোকষ্ট হয়না।

নীতিহীন মানুষেরা নিজেদের কর্মের ক্ষেত্রেও স্বার্থগত বিচার-বিশ্লেষণই করে থাকেন। এই বিষয়ে উপন্যাসিক ডাঃ দীপক চন্দ্রের **‘বিভীষণ’**(২০০৫) উপন্যাসের তথ্যানুযায়ী বলা যেতে পারে যে, স্বার্থ-দুর্বলতা এবং স্বার্থ-আনুগত্যই, বিভেদবুদ্ধির যুদ্ধ প্রস্তুতির মূলধন বলা যেতে পারে, কারন মানুষ নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে, চরিত্রগুনে বহু মানুষের মঙ্গল ও উন্নয়নের কাজে নিজেকে রত করতে পারে, কিন্তু নীতিহীন ব্যক্তির ‘ব্যক্তিত্বের শক্তি’ বলে তেমন কোনো বস্তু থাকে না। ফলে তারা সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপনে সহায়কের ভূমিকা পালন করে থাকে। যা সুস্থ সমাজ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। মানুষের জীবনে নীতির প্রয়োজনীয়তা ডঃ দীপক চন্দ্রের চিন্তা ও চেতনাকে প্রভাবিত করে তাঁর **‘ঘটোৎকচের প্রার্থনা’**(২০১১) উপন্যাসে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে উঠে এসেছে। নীতিহীন মানুষেরা মানুষ হয়ে জন্মে মানুষের কর্তব্য, যেমন – অন্যায়ের প্রতিবাদ, ন্যায়ের সমর্থন, ধর্মের প্রতিষ্ঠা কখনোই করেনা। নিজের অজান্তেই এরা মনুষ্যত্বহীন, বিবেকহীন মানুষ নামে পরিচিত হন সমগ্র মানব সমাজের কাছে। মানুষের মনুষ্যত্বই সমাজে, সংসারে জীবনে অশান্তির কারণ। কিন্তু মনুষ্যত্বহীন মানুষের কোন মানসিক অশান্তি থাকে না। তাই মনুষ্যত্বকে বারবার আত্মদীনতার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। নীতিহীনতার ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুই ঔপন্যাসিকই নীতিহীন মানুষের চরিত্র এবং তাদের চরিত্রের প্রকাশ, প্রায় একইরকম ভাবে তাঁদের উপরোক্ত তিনটি বিভিন্ন উপন্যাসে, ভিন্ন সময়ের আঙ্গিকে, উপস্থাপন করেছেন। সমাজের নেতিবাচক ক্ষেত্রে নীতিহীনতা ও কুসংস্কার একে অন্যের পরিপূরক এ কথা বলা যেতে পারে। তাই পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মে ধর্মীয় আচার আচরনের থেকে সমাজের মানুষের মধ্যে ধার্মিক ও ন্যায্য চিন্তার উন্মেষ ও সমগ্র মানব সমাজের ক্ষেত্রে মানবতাবোধের বিকাশই প্রকৃত ধর্মাচরণ হয়ে উঠতে পারে। আবার ঔপন্যাসিক সন্তোষ কুমার ব্রহ্মের **‘বাবুঘাটের খেয়া’**(২০১১) উপন্যাসের তথ্য বিশ্লেষণে যা প্রাপ্ত হওয়া গেল তা হ’ল, ইতিহাস সাক্ষী, ধর্ম যতদিন বৃহত্তর জনসাধারনের ও শাসকগোষ্ঠীর প্রয়োজন মিটিয়েছে, ততদিনই ধর্মের বিকাশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্ভব হয়েছে। ধর্মের প্রয়োজনের প্রসার হ্রাস হলেই, হয় ধর্মের প্রসার কমেছে, না হয় ধর্মের অবলুপ্তি ঘটেছে। আর এই দুটির কোনোটিই না হলে ধর্ম পরিমার্জিত হয়ে অন্য ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। সমাজে যখনই এই ধর্মের প্রয়োজনের প্রসার হ্রাস হয়েছে বা ধর্মের প্রসার কমেছে, তখনই নীতিহীনতার সৃষ্টি হয়েছে এবং তাতে সৃষ্ট হওয়া, সাধারণ মানুষের ধর্মবৈষম্য ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণ হ’ল, কুসংস্কারের অন্ধকার এবং অজ্ঞতার বিষয়টিকে মানুষের মধ্যে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করা। যা সুস্থ সামাজিক বিকাশের অন্তরায় বলে মনে করা যেতে পারে।

মানুষের নৈতিক জীবনের ব্যাখ্যা ও নৈতিক বাধ্যবাধকতাবোধের ব্যাখ্যার জন্য, নৈতিক যুক্তিতে ঈশ্বরকে পূর্বস্বীকৃতিরূপে স্বীকার না করলে, মানুষের নৈতিক জীবন অর্থহীন ও নিষ্ফল হয়ে পড়ে। যার অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন হিসেবে সৃষ্টি হয় ধর্ম দ্বন্দ্বের। ধর্মদ্বন্দ্বই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার জন্মদাতা। তাই সমাজে ধর্মের নামে যে ধর্মদ্বন্দ্ব দৃশ্য হয়, তা সম্প্রদায়কে বিপদগ্রস্ত করে তোলে। সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িকতার দাঙ্গা। ধর্মদ্বন্দ্ব এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গ নিয়ে বিভিন্ন ঔপন্যাসিকরা বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁদের মতামত পোষণ করেছেন। ঔপন্যাসিক আবুল বাশারের, **'আকাশলীনা'**(১৯৯৪) উপন্যাসপ্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলা যেতে পারে, ভারতবর্ষে ধর্মের বিপদের থেকেও, সম্প্রদায়ের বিপদকে অনেকক্ষেত্রেই, অনেকসময় অত্যন্ত লজ্জাজনক বিষয়বস্তুরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তাই ভারতবর্ষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণাকে কখনোই সমর্থন করা যেতে পারে না। কারণ সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতায় ধর্ম নয়, কোন একক ব্যক্তি নয়, সম্প্রদায় বিপদে পড়ে। এই ঘৃণার রাজনীতিকে সমাজ পরিত্যাগ করতে পারলেই, মানুষের আত্মবোধের যে বিকাশ হবে তা বিশ্বভাতৃত্ববোধের আহ্বান করতে উদ্যোগী হতে পারে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তীকালে, বাংলা ভাগের সময়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার যে ভয়াবহ রূপের চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাকে সমাজে সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ত প্রভাবরূপে গণ্য করা যেতে পারে। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় শুধুমাত্র মানুষকে ধর্ম নির্বিশেষে হত্যা করা হয়নি, হত্যা করা হয়েছে দুই সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের বিশ্বাসকে, মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বকে ও মানুষের নিঃসঙ্গতার অসহায়তাকে। সেই কারণেই এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক অপমান, অসম্মানের দায়ভার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দুই ধর্মের মানুষকেই সমানভাবে আজও বহন করতে হচ্ছে, ফলে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক মনে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, তা আজও দুটি সম্প্রদায় অনিচ্ছাকৃতভাবেই বয়ে চলেছে। আবার এই একই উপন্যাসে, স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে, কোন বিশেষ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে যখন মানুষ সেই ধর্মকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে উগ্রতা প্রদর্শন করে তা এবং যে কোনো ধর্ম উন্মাদনাতেই, যে কোনো সম্প্রদায়েরই মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করাকে মানবিকতাপূর্ণ কার্য বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না। তবে ধর্মের দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ ছাড়া পৃথিবীতে ধর্মের চাকা অগ্রসর হয়েছে এ কথাও স্বীকার করতে পারা যায় না। তাই বলা যেতে পারে যে, এক শিক্ষিত সুস্থ সমাজে মানুষের সাথে মানুষের রাজনৈতিক ধর্মীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা, নগ্ন করে লিঙ্গ দেখে, ধর্ম নির্ণয়ের নগ্ন ধর্ম সমর্থনকে কোনভাবেই সঠিক ধর্মভাবাপন্ন কর্ম

নামে অভিহিত করা যেতে পারে না বরং তাকে ধর্মের নামে মানবতার চরম অপমান বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই একই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের **'পরবাস'**(১৯৯৯) উপন্যাসের তথ্যানুসারে বলা যেতে পারে যে, ধর্ম আলাদা তো মানুষও আলাদা। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মনে একটা বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে ঘৃণা বা অবিশ্বাসের মানসিক দূরত্বই মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার পথের পথিক করে তোলে। আর এই অবিশ্বাসের সুযোগের সদ্ব্যবহার সমাজের যে কোনো মানুষই করতে পারে। কারণ ধর্ম মানুষের থেকে মানুষকে আলাদা করে না, কিন্তু যদি কোন বিশেষ ধর্মের পিঠে যদি কোন এক বিশেষ তকমা লেগে যায়, তাহলে তা সমাজের সেই ধর্মের সমস্ত মানুষকেই, সেই বিশেষ তকমায় চিহ্নিত করা, কোন যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়রূপে বিবেচ্য হতে পারেনা। যেমন শিখ ধর্মে বিপন্নকে রক্ষা করা ও আত্মরক্ষার কারণে অস্ত্র ধারণ করা ধর্মোচিত কর্ম রূপেই বিবেচিত হয়। প্রচুর শিখ দেশরক্ষার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন ও আছেন। কাজেই শিখ জাতি মানেই উগ্রপন্থী একথা ভেবে নেওয়া অর্থহীন বলে পর্যবসিত হতে পারে। যে জাতি দেশকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে নিজের প্রাণ পর্যন্ত অর্পণ করতে পিছুপা হয়না, সেই জাতিকে সমগ্র সমাজের কাছে সাম্যের বার্তাবাহক বা মানবিকতার বার্তাবাহক বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে **'পরবাস'**(১৯৯৯) উপন্যাস প্রাপ্ত যে অসাধারণ তথ্য প্রাপ্ত হওয়া গেছে তা থেকে বলা যেতে পারে, সাধারণ মানুষ দাঙ্গা করে না। দাঙ্গা করে নীতিহীন, অশিক্ষিত, গুন্ডা বদমাশরা। ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদারের **'মেয়েরা যেমন হয়'**(২০০০) উপন্যাসের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে যে, সমাজের মানুষের রাজনৈতিক ধর্মীয় নিরাপত্তা হারানোর ভীতির বিষয়টিকেই মানুষের অসংগঠিত ও অভাবিত কর্মকাণ্ডের প্রকাশ বলে মনে করা যেতে পারে। সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার ধ্বংসের যে চিত্র সমাজে অহরহ উঠে আসে, তা যেন উপরোক্ত উপন্যাসের বক্তব্যের সমর্থন বলেই দাবি করা যেতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতাকে 'ধর্ম' নামে কখনোই অভিহিত করা যেতে পারে না বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। তাই সাম্প্রদায়িকতাকে এক সামাজিক ব্যাধি নামে অভিহিত করা যেতেই পারে। ঔপন্যাসিক প্রফুল্ল রায়ের **'ভাগাভাগি'**(২০০১) উপন্যাসে স্বাধীনতা পরবর্তী দেশভাগের যে কষ্টকর ইতিহাসঋদ্ধ তথ্য প্রাপ্ত হওয়া গেছে তা হ'ল, হিন্দুধর্ম, হিন্দুকৃষ্টি সনাতন। এই ধর্মটিকে ধ্বংস করার জন্য এক বিশাল ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু পৃথিবীর স্বার্থে, ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের স্বার্থে, বিশুদ্ধ হিন্দুত্বকে বজায় রাখতেই হবে। মুসলমানদের জন্য আলাদা একটা সম্পূর্ণ নিজস্ব দেশের প্রয়োজন এবং সেই দেশটা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছিল। হিন্দু এবং

মুসলিম দুটি আলাদা জাতি। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে সকল জাতির সহাবস্থান বর্তমান। মুসলমানদের জন্য যদি আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান বা বাংলাদেশ হয়, তাহলে হিন্দুদের জন্যও হিন্দুস্থান হওয়াটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বিষয় হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু নানা জাতির দেশ ভারতবর্ষে এমন হওয়াটা সম্ভবপর নয়। তাই মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান, ভারতবর্ষের অঙ্গ থেকে তৈরি হওয়া সত্বেও, ভারতবর্ষে বসবাসকারী নানান জাতির মানুষের একমাত্র পরিচয় তারা ভারতবাসী। তবে এও সত্য যে, পৃথিবীর স্বার্থে, ভারতবর্ষের স্বার্থে এই সনাতন হিন্দু ধর্মের রক্ষা করার জন্য, বিশুদ্ধ হিন্দুত্বকে বজায় রাখা যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে করা যেতে পারে। দেশভাগের প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যালের **'শের-এ-শহীদদ্বীপ'**(২০০২) উপন্যাসে স্বীকার করা হয়েছে যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে ধর্মের কারণে, তিন টুকরো হয়ে যাওয়া ভারতবর্ষের মূল কারণ হিসেবে সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির বিরাট মহীরুহকেই দায়ী করা যেতে পারে। দাঙ্গা ও দেশভাগ প্রসঙ্গে কিন্নর রায়ের **'পদ্মবীজের মালা'**(২০০৪) উপন্যাসে চৌষট্টির হজরত বালদাঙ্গার যে চিত্র উঠে এসেছে, তা হ'ল – চৌষট্টির হজরত বালদাঙ্গার সময়ে পাকিস্তান থেকে প্রচুর হিন্দুর ভারতবর্ষে পালিয়ে আসার কারণ হ'ল, তারা জাতিভেদ, ধর্মবৈষম্য এবং ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে অসমর্থ হয়েছিল। দেশভাগ হলেও মানুষের যন্ত্রণার ভাগ হয় না। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর 'মার্জিনাল মেন'-এ, এ বিষয়ে সব তথ্যচিত্র পাওয়া সম্ভব হবে। ধর্ষণ, হত্যা, সম্পত্তি দখল এবং শত্রু সম্পত্তি আইন বা এনিমি প্রপার্টি বলে হিন্দু-বৌদ্ধের জমি-বাড়ি, বাগান, পুকুর হস্তগত করে, সেই ধর্মাবলম্বী মানুষগুলোকে মানসিক ও শারীরিকভাবে একেবারে সর্বস্বান্ত করা হয়েছিল। এর নঙর্থক প্রভাব দুই বাংলার হিন্দু মুসলিম আজও বহন করে চলেছে। অথচ বিশ্বভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে শত্রুতার বাতাবরণ সৃষ্টি করা একেবারেই অনভিপ্রেত বলে মনে করা যেতে পারে। সেই কারণেই তৎকালীন বেশিরভাগ লেখকেরাই তাদের কলমকণ্ঠকে সরব করে তুলেছিলেন দুর্নীতি, অত্যাচার, অপশাসন, স্বার্থপরতা ও ভোগবাদের বিরুদ্ধে। তবে আশা করা যেতেই পারে যে, এই কলমেরই হাত ধরে একদিন প্রকৃত ধর্মীয় রাজনীতির সুশিক্ষাকে সঙ্গী করে, বিশ্বভাতৃত্বের পরিচয়কে হাতিয়ার করে, ভোগবাদের, স্বার্থপরতার, সাম্প্রদায়িকতার, আত্মকেন্দ্রিকতার সমাজের বিনাশ হতে পারে। ঔপন্যাসিক তসলিমা নাসরিনের **'ফেরা'**(২০০৬) উপন্যাসের দেশভাগের মর্মবিদারক ঘটনা, যেখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ধর্মের কারণে দেশভাগের যন্ত্রণায় শুধুমাত্র মানুষের বিশ্বাস ভেঙেছে তা নয়, দেশভাগের কারণে – দেশ ভেঙেছে, স্বপ্ন ভেঙেছে, আশ্রয় ভেঙেছে। দীর্ঘদিনের চেনা-পরিচিত নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে মানুষকে বিপর্যস্ত হতে হয়েছে,

অভাবের তীব্রতার মধ্যে জীবন কাটাতে হয়েছে। ধর্মের এই নঙর্থক দিকের কারণে দুই বাংলার মানুষই তখন শারীরিক ও মানসিকভাবে রক্তাক্ত হয়েছিল। ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত দুই বাংলার মানুষের ওপর সাম্প্রদায়িকতার যে প্রভাব পড়েছিল তা কাটিয়ে উঠে সর্বহারা মানুষগুলোর জীবন সংগ্রাম, বেঁচে থাকার তাগিদে আবার নতুন করে শুরু করতে হয়েছিল। ঔপন্যাসিক ইন্দু সাহার **'গোপনপুরের উপকথা'**(২০১১) উপন্যাসে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গই প্রাধান্য পেয়েছে। ধর্ম মানুষেরই প্রয়োজনে, মানুষের দ্বারাই সৃষ্ট এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাও মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করার একটা নির্ভরযোগ্য কৃত্রিম ব্যবস্থা। দুটিকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মনে হলেও, একটি আবশ্যিকভাবে আরেকটির ওপর নির্ভরশীল। কারণ ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িকতা দুটির মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। মানুষের দ্বারা মানুষকে একত্রীকরণের প্রক্রিয়া ধর্ম, আবার মানুষের দ্বারাই মানুষকে বিভক্তিকরণের প্রক্রিয়া সাম্প্রদায়িকতা। দুটিই মানুষের প্রয়োজনে, মানুষেরই দ্বারা সৃষ্ট। সম্প্রদায়গত ধর্মের সৃষ্টি না হলে, সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হতে পারে না, আবার সাম্প্রদায়িকতার উপস্থিতিই, ধর্মের উপস্থিতি আবশ্যিকভাবে ঘোষণা করে। তাই বলা যেতে পারে যে, দুটিই যেমন পরস্পরবিরোধী তেমনি আবার দুটিই একে অন্যের ওপর সমানভাবে নির্ভরশীলও বটে। পরবর্তীকালে মানুষ ধর্মকে শাসন-শোষণের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। ঔপন্যাসিক গৌরকিশোর ঘোষের **'প্রতিবেশী'**(২০১৫) উপন্যাসে সাম্প্রদায়িকতা ও নীতিহীনতার যে মূল্যবান প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে তা হ'ল, হিন্দু-মুসলমান আর পরস্পর পরস্পরকে বোধহয় আপন ভাবে না। সাম্প্রদায়িকতার এই নীতিহীনতায় দুই পক্ষই, উভয়পক্ষকে নিজেদের শত্রু বলেই গন্য করে। তাই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এত বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে। হিন্দু-মুসলমানের এই বিদ্বেষ ও ঘৃণা উভয়েরই ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

উপরোক্ত উপন্যাসগুলিতে সাম্প্রদায়িকতা ও নীতিহীনতার কারণে সম্প্রদায়গত যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা সমাজে ঘুনপোকার মত অবিরত সমাজকে রক্তাক্ত ও নিঃশেষ করে চলেছে তার উপায় হিসেবে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন উপন্যাসিকের নানান মনোভাবের ওপর নির্ভর করে, বিভিন্ন পরিবেশের আঙ্গিকে লিখিত নিম্নোক্ত উপন্যাসগুলিতে যে সদর্থক বার্তা উঠে এসেছে তা এককথায় অনবদ্য বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বিভিন্ন ঔপন্যাসিকেরা সাম্প্রদায়িকতার পরিপন্থী হিসেবে, সমাজের তরুণ মনে ধর্মবোধ ও মূল্যবোধের বীজ অনুপ্রবেশ করিয়ে, অসাম্প্রদায়িকতাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সেই সদর্থক পদক্ষেপকে অনুসরণ করে,

সমাজে মানবঐক্য ও দেশাত্মবোধের প্রেম জাগ্রত করতে তাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন। ঔপন্যাসিক বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের **'মান্ধাতার মুখ'**(১৯৯২) উপন্যাসে যে প্রয়োজনীয় সত্যকে তুলে ধরেছেন তা হ'ল সাম্প্রদায়িকতার পরিপন্থী হিসেবে সঠিক ধর্মশিক্ষাকে গ্রহণ করা অত্যন্ত ব্যুৎপত্তিতার পরিচয় হতে পারে। তাই বিদ্যালয়স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়স্তর পর্যন্ত সঠিক উপায়ে যদি তরুণ তাজা অন্তরে, ধর্মবোধ এবং মূল্যবোধকে অনুপ্রবেশ করিয়ে তাদের অসাম্প্রদায়িকতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে, তাহলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে অপসারিত করা অনেক সহজ হয়ে যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক ডঃ দীপক চন্দ্রের **'কৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ'**(১৯৯৯) উপন্যাসের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে যে অসাধারণ সাম্যের বার্তা পৌঁছায়, তা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার এক অসাধারণ রাজনীতি বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ সাম্প্রদায়িকতার সাথে পরিচিত না হলে যেমন অসাম্প্রদায়িকতাকে ভালোবেসে গ্রহণ করা সহজ হবে না, ঠিক তেমনি, মানুষের অন্তরে অনৈক্যের ধারণা, মানুষের বিবেককে যন্ত্রণা দিয়ে, ঐক্যকে আপন করে নিতে তৎপর করে তুলতে পারে। তাই মানুষকে এই সদর্থক বার্তা দেওয়া যেতে পারে যে, বিবেকবুদ্ধিকে সম্বল করে, সমাজে মানবঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করার রাজনীতিকেই প্রকৃত ধর্ম বলে উল্লেখ করা সমীচীন হবে। কারণ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের একান্ত নির্ভরতা ও নিরাপত্তার অবলম্বন হ'ল স্বাধীনতা ও স্বাধিকার রক্ষা। ঔপন্যাসিক আব্দুল জব্বারের **'রূপবতী রাত'**(২০০০) উপন্যাসে ঈশ্বরের সম্মুখের যে কোনো ভেদাভেদকে অস্বীকার করে ঐক্য বা একতাকেই, ঈশ্বর বা ভগবানের এক অবিস্মরণীয় রূপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল রহস্যময়তার মধ্যেই, ঈশ্বরোপলব্ধির মাধ্যমে সামগ্রিক ঐক্যকেই, ঈশ্বরেচ্ছার প্রকাশ বলে গণ্য করা হয়েছে। ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর **'অশেষ'**(২০০৫) উপন্যাসে সমাজের সাম্প্রদায়িকতা সমাধানের উপায় হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দের রাজনীতি ভাবনাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে স্বামী বিবেকানন্দ এক উচ্চস্তরের রাজনীতিকজ্ঞ ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, যে ধর্ম গরিবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা সমান সম্মান করে না, যে ধর্ম বিচার সর্বস্ব, সেই ধর্ম কখনোই প্রকৃত কল্যাণকর ধর্ম হতে পারে না। তাই স্বামীজি, দেশের বীর যুবকবৃন্দকে দেশের কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর মতানুযায়ী, মানুষের প্রকৃত সেবা বা দেশের কাজে যুক্ত হওয়ার আগে, দেশকে সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে জ্ঞাত হওয়া, তারপরে দেশের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হওয়া, বুদ্ধিমান জ্ঞানী যুবকদের প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে। প্রকৃত দেশপ্রেমিক প্রকৃত ধার্মিকরূপে প্রতিভাত হতে পারেন। দেশভক্তি,

ঈশ্বরভক্তির সমার্থক এই কথাকে সমর্থন করেই প্রতিভা রায়ের **'উত্তরমার্গ'**(২০০৮) উপন্যাসে বিশুদ্ধ হিন্দুত্বে দেশ ও ঈশ্বর সমার্থক হয়ে উঠেছে। নাস্তিক অর্থাৎ যে নিজেকে বিশ্বাস করে না। আর যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সে কখনও প্রকৃতপক্ষে দেশপ্রেমী হয়ে উঠতে পারে না একথা বলা যেতেই পারে। কারণ প্রকৃত ঈশ্বর আরাধনা হ'ল, মানুষের সেবা করা। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক সায়ন্তনী পুততুন্ডের **'একদিনের ঈশ্বর'**(২০১৬) উপন্যাসে ঈশ্বর অনুভূতি আর দেশ একাকার হয়ে গেছে। মানুষ যখন প্রতিদিন উদার আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যোদয় দেখে, দিগন্তবিস্তৃত মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যায়, তখন মানুষ অবশ্যই অনুভব করে যে, কেউ একজন আছেন, যিনি সমস্ত প্রকৃতিকে নিখুঁতভাবে তৈরি করেছেন। তখনই মানুষের কাছে এই মহান বৃহৎ দেশ, ঈশ্বরের নামান্তর হয়ে ওঠে। ঈশ্বর এবং দেশ কোথাও যেন একাকার হয়ে যান। এভাবেই মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে দেশাত্মবোধ। এই দেশাত্মবোধ নানান ধর্মের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে সরব হতে সাহায্য করে। মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তোলে নীতিবোধ, মূল্যবোধ এবং সামগ্রিকভাবে কর্মের প্রতি একাত্মতা। যা প্রকৃত সনাতন ধর্মের সংস্কৃতি বা কৃষ্টি যা কুসংস্কারকে দূর করতে দ্রুত ব্যাপক গণশিক্ষার মাধ্যমে মানুষের বিবেক, বুদ্ধিতে, মননশীলতায়, বিজ্ঞানশক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়ক হতে পারে। ঔপন্যাসিক সৌরভ মুখোপাধ্যায়ের **'প্রথম প্রবাহ'**(২০১৭) উপন্যাসে ধর্মের রাজনৈতিক বিবর্তনের সুদীর্ঘ সরণি লঙ্ঘন করার কালে, ধীরে ধীরে ধর্মের আধ্যাত্বিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকটিত হয়, এই বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের সূচনাকাল থেকেই ধর্ম প্রচ্ছন্নভাবে আধ্যাত্বিক একথা স্বীকার করা যেতেই পারে। বাইরের জগতের আত্মিকতাকে মানুষ যখন নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারে, তখনই ধর্ম আধ্যাত্মিকতায় পর্যবসিত ও উন্নীত হয়। তাই যে কোন ধর্মের সঙ্গে সঠিকভাবে আত্মিক সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকলেই মানুষ উদার হতে পারে। ফলে সেই উদার মানুষ সাম্প্রদায়িকতাকে অগ্রাহ্য করতে পারে বলে মনে করা যেতে পারে।

বর্তমান গবেষণাকর্মে গৃহীত বিশ্বায়নের পরবর্তী ১৯৯১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়পর্বকে যে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে সেগুলি হ'ল, প্রথম পর্ব (১৯৯১-২০০০), দ্বিতীয় পর্ব (২০০১-২০১১) ও তৃতীয় পর্ব (২০১২-২০১৭)। এই তিনটি পর্বের গৃহীত উপন্যাস প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সত্য প্রাপ্ত হওয়া গেল তা হ'ল, তিনটি পর্বেই – ঔপন্যাসিকেরা নীতিহীনতাকেই প্রকৃত ধর্মবোধের পরিপন্থী বলে মনে করেছেন। জাতিভেদ, ধর্মবৈষম্য এবং ধর্মান্ধতাই

সাম্প্রদায়িকতার জন্মদাতা। মানুষের দ্বারা মানুষকে একত্রীকরণের প্রক্রিয়া ধর্ম, আবার মানুষের দ্বারাই মানুষকে বিভক্তিকরণের প্রক্রিয়া সাম্প্রদায়িকতা। প্রাচীনকালে রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যেই রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। কারণ তৎকালীন শাসন ব্যবস্থা ছিল ধর্মভিত্তিক। তাই ঐশ্বরিক মতবাদ অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রের পরিকাঠামো গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক হওয়ার কারণে ধর্মভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা গ্রাহ্য হওয়ার সঙ্গত নয়। সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শক্তির সার্বভৌমত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। উশৃঙ্খল জীবনে যেমন শান্তি আনার ক্ষেত্রে এবং সামাজিক জীবনে নিয়ম-শৃঙ্খলা কায়েম করার ক্ষেত্রেও শক্তির সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করতেই হয়। এই শক্তির সদর্থক রূপ এবং নঙর্থক রূপ দুটিই বর্তমান। মানুষের অন্তরের অন্তস্থলের প্রেম ও ভালোবাসার শক্তির সদর্থকরূপ দ্বারা অসাম্প্রদায়িকতাকে আবাহন। আর নঙর্থক রূপ হিসেবে বলা যেতে পারে, যখন বল প্রয়োগের দ্বারা একটি ধর্ম সম্প্রদায়, আর একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের ওপর নিজস্ব মতামতকে চাপিয়ে দিতে চায় অথবা সাম্প্রদায়িকতাকে আবাহন করে, এমন এক অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ তৈরি করে যা অনেক সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ নিতে পারে। গবেষণার প্রতিটি পর্বেই ঔপন্যাসিকদের প্রতিবাদী কণ্ঠ বারবার প্রতিটি উপন্যাসেই এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে সমাজের সকল স্তরের, সকল সম্প্রদায় নির্বিশেষে, সকল মানুষের কাছে অত্যন্ত অনভিপ্রেত বিষয় বলেই চিহ্নিত করেছেন। তবুও এই সাম্প্রদায়িকতায়, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মানুষকে অংশগ্রহণ করতে হয়। কারণ সাম্প্রদায়িকতা কোন একক ব্যক্তি নির্ভর নয়। সাম্প্রদায়িকতা একাধিক সম্প্রদায় নির্ভর বিষয়। যে কোন সাম্প্রদায়িক মতানৈক্যের দাঙ্গায় শ্রেণিচেতনা, ধর্মীয়চেতনা অপেক্ষা জাতচেতনা প্রবল হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ইতিহাসে, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে, ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতাকে 'ধর্ম' নামে কখনোই অভিহিত করা যেতে পারে না। অতীতের ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের 'বিভেদ এবং শাসন নীতি'-এর নঙর্থক প্রভাব হিসেবে হিন্দু-মুসলমান ও উচ্চ-নিম্ন বর্ণের মধ্যে সম্প্রদায়গতচেতনা, জাতচেতনা ও ধর্মীয়চেতনাকে গ্রথিত করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে সফল রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, যার আবহে সৃষ্ট হিন্দু-মুসলিম ও উচ্চ-নিম্ন বর্ণের মেলবন্ধনে, বিরোধিতাকে সুতীব্র করে তুলেছিল। সাম্প্রদায়িকতার এই নীতিহীনতায় দুই পক্ষই, উভয়পক্ষকে নিজেদের শত্রু বলেই আজও গন্য করে। তাই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এত বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রমে হিন্দু-মুসলমানের এই বিদ্বেষ ও ঘৃণা উভয়েরই ক্ষতির কারণ হয়ে উঠেছে। সূচনা হয়েছিল মানুষের গৃহ-সম্পত্তি লুঠ, ধর্মান্তরিতকরণ, ধ্বংস ও ধর্ষণের নির্মম ইতিহাসের। এই জাতচেতনা

এবং ধর্মীয়চেতনার প্রবল ধারায় হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়েরই সাম্প্রদায়িক শক্তির সহিংস্রতার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দ্বিমুখী সন্দেহ, অবিশ্বাস, ঘৃণা, আত্মিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে ভারতবর্ষ তিন টুকরোয় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় উভয়েই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছিল। ঔপন্যাসিকদের কলমকন্ঠে বাংলা ভাগের সময়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার যে ভয়াবহ রূপের চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাকে সমাজে সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ত প্রভাবরূপে গণ্য করা যেতে পারে। গবেষণার প্রতিটি পর্বেই প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই একইভাবে ধর্মের কারণে দেশভাগের যন্ত্রণার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। কারণ দেশভাগের যন্ত্রণায় শুধুমাত্র মানুষের বিশ্বাস ভেঙেছে তা নয়, দেশভাগের কারণে – দেশ ভেঙেছে, স্বপ্ন ভেঙেছে, আশ্রয় ভেঙেছে। ধর্মের কারণে এই অসাম্য ও মর্যাদাহীন অবস্থান্তর সুস্থ সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে একেবারেই অনভিপ্রেত। সৌন্দর্য ও ভালবাসার প্রধান শর্ত হলো – মানুষ মানুষকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু বর্তমানে ধর্মের নামে এই বিষয়টি প্রায় অন্তর্হিত। মুক্ত ধর্মীয় পরিচালন পদ্ধতির ভিত্তিতেই শুধুমাত্র কোন সুস্থ মঙ্গলকামী সমাজ গঠন এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হতে পারে। তাই যখন কুসংস্কারমুক্ত, শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক, মানসিক সচেতনতাকে, মানুষ সাধারন মানুষের মধ্যে ধর্মের বিকল্প ব্যবস্থার সদর্থক ধারণা হিসেবে, মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে সক্ষম হবে, তখন সমগ্র মানুষের সামগ্রিকভাবে, শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে এক সুস্থ ধারনার সৃষ্টি হওয়া হয়তো সম্ভব হতে পারবে যা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সুস্থ সমাজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিপ্রেত এ কথা বলা যেতেই পারে। এই সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সুস্থ সমাজের আবাহনের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়, ডঃ দীপক চন্দ্র, আব্দুল জব্বার, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সজল মন্ডল, প্রতিভা রায়, সৌরভ মুখোপাধ্যায় ও সায়ন্তনী পুততুন্ডের উপন্যাসগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্বলিত হয়েও,সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত সুস্থ সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে তাদের সদর্থক যে মনোভাব উপন্যাসগুলিতে উপস্থাপিত হয়েছে তা অত্যন্ত যুগোপযোগী।

সমাজে ধর্মের নিরিখে নারীর প্রকৃত অবস্থান

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ আর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হ'ল, সমাজের নারী সম্প্রদায়ের এক অন্ধকারময় যুগ। এই যুগের ইতিহাসে যে সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে নারী সমাজের জীবনীশক্তি প্রায় অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু পুরুষ

শক্তির প্রতীক, সেহেতু সমাজ পুরুষের উপর বেশি নির্ভরশীল ছিল কারণ শাস্ত্রানুযায়ী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুত্রের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হতো। কারণ পুত্র পরিবারকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে সক্ষম বলে পুত্রকে পিতা-মাতার বার্ধক্যের অবলম্বন হিসেবে গণ্য করা হয় এবং পুত্রকে শাস্ত্র অনুযায়ীই বিবাহের পর তাই নিজ গৃহত্যাগ করে সাধারণত স্ত্রী-এর গৃহগমনে যেতে বাধ্য হতে হয় না। সমাজের বৃহদংশ নারীর কোন উপার্জন না থাকার কারণে, যা অতীতে শুধু নয়, বর্তমানেও সমাজের সেই বৃহদংশ নারীর ক্ষেত্রে নিজের পিতা-মাতার দায়িত্ব গ্রহণ করে, নিজ পিত্রালয়ে অবস্থান করা সম্ভবপর নয়। তাই বিবাহের পরবর্তীকালে নারী পিতৃালয়ের অধিকার তেমনভাবে ভোগ করতে সমর্থ হয় না, ঠিক সেভাবেই আবার বিবাহের পরেও শ্বশুরালয়েও নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে, সে শুধুমাত্র 'গৃহবধূ' নামকরণে ঘোষিতা হয়ে, গৃহের যাবতীয় কর্ম বিনা বেতনে সম্পাদিত করে থাকে এবং তার সাথে সন্তানের জন্ম প্রদান করে ও সেই সন্তানকে মানুষ করার যাবতীয় কায়িক কার্য, সন্তানস্নেহে উদ্বেলিত হয়েই সম্পাদন করে, সমস্ত জীবন পরমুখাপেক্ষী হয়ে কাটিয়ে দিতে বাধ্য হয়ে থাকে। নারীর অর্থনৈতিক অক্ষমতার ওপর নির্ভর করেই তাই সৃষ্টি হয়েছিল, বিভিন্ন সামাজিক কু-প্রথার। যেমন সতীদাহপ্রথা, কৌলিন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, সহমরণ, বিধবাদের প্রতি কঠোর ধর্মীয় আচার-বিচারের নামে অবিচার, ধর্মের রীতি অনুসারে বিধবাদের বৃন্দাবন ও বেনারসের আশ্রমপ্রেরণ ও এক নারকীয় জীবন-যাপনে বাধ্য করা, কন্যাবিক্রয়, উপপতি-উপপত্নী রাখার ব্যবস্থা, স্ত্রী বিনিময়, তৎকালীন সমাজে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই অনুষ্ঠিত হতো। মননের সঙ্গে চিন্তা করলে দেখা যাবে উপরোক্ত প্রথাগুলির উদ্ভবের কেন্দ্রবিন্দুতে কিন্তু নারীর অর্থনৈতিক অক্ষমতাই অবস্থান করছে। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের বিষয় ছাড়াও, অতীতে যে কোন নারীর কন্যা সন্তান হওয়ার দায়-দায়িত্ব সমাজ সেই নারীর উপরেই ন্যস্ত করত। যা বর্তমানেও আংশিকভাবে দৃশ্যমান হয়ে থাকে। একাধিক কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার কারনে তাই আজও বহু নারীকে গঞ্জনা ও অনেক ক্ষেত্রে অনেক অপমান-অসম্মানের সম্মুখীন হতে হয়। সমস্ত ধর্ম নির্বিশেষেই সমাজে মেয়েদের বিবাহের পরে, বাধ্যতামূলকভাবে স্বামীর কৌলিন্যের পরিচয় হিসেবে, স্বামীর উপাধি ধারণ করার মধ্যেও সমাজে নারী সম্পর্কে হীন মানসিকতার ভাবনা প্রতীয়মান হয়।

ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যালের **'মান মানে কচু'**(১৯৯২) উপন্যাসে মুসলিম সমাজের তালাক প্রথা নিয়ে যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে উল্লেখ করা আছে। ইসলাম ধর্মের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা

হয় তাকেই ‘তালাক’ বলা হয়। ‘তালাক’ শব্দের অর্থ ‘বন্ধনমুক্ত করা’। কিন্তু কার্যত তালাক প্রথাকে মুসলিম পুরুষ সমাজে নারী নির্যাতনের এক হাতিয়ার রূপে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। এই তালাক প্রথার জন্যই মুসলিম সমাজে নারীর সম্মান, স্বপ্ন, নিরাপত্তাবোধ ক্ষতবিক্ষত হতে পারে। মুসলিম সমাজের, নারীসমাজের পরিস্থিতি অত্যন্ত অনুন্নত। সাধারণত তারা ভোট দিতেও আসেন না। তাই পুরুষদের তুলনায় নারী ভোটারের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যালের **‘হিন্দু না ওরা মুসলিম’** উপন্যাসের **‘সন্তান মোর মার’**(১৯৯৫) উপন্যাসটিতে ভারতবর্ষের ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভোটারদের মধ্যে পুরুষ ভোটার সংখ্যা আশি-নব্বই শতাংশ ও বাকি দশ-বিশ শতাংশ মাত্র মহিলা বলে স্বীকার করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে মুসলমান নেতারা মুসলমান পুরুষদের একসঙ্গে চারটি বিবি রাখার অনুমতি দাবি করেন কারণ এই প্রথা শরীয়তী আইনের অপরিহার্য নির্দেশ। যদিও সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি এই তালাক প্রথার বিরুদ্ধে শাহবানুর পক্ষে রায় দিয়েছেন। কারণ মুসলমান পুরুষেরা স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-মুক্তি, স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী। এ বিষয়ে সমাজ সচেতন ঔপন্যাসিক আফসার আমেদের **‘বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা’**(১৯৯৫) উপন্যাসে এমনই একটি মুসলিম সমাজের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যেখানে মুসলিম পুরুষেরা নিজেদের স্ত্রীদের নিজেদের হাতের খেলনা মনে করে এবং ইচ্ছামত তালাক দিয়ে থাকে। ধর্মের নামে সেই তালাকপ্রাপ্ত নারীকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে বারবার ধর্ষিতা হতে হয়। বারংবার শারীরিক এবং মানসিকভাবে সেই নারী ক্ষতবিক্ষত হয়। তাই সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে যে উপরোক্ত উপন্যাসে, ধর্মের আড়ালে থাকা অধর্মের শিকার নারীদের আত্মিক সংকটের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম সমাজে নারীদের এই ধারাবাহিকভাবে অসম্মানের বিষয়টিকে কিছুতেই সমর্থন করা যেতে পারে না। ঔপন্যাসিক নিমাই ভট্টাচার্যের **‘রুদ্রাণী’**(১৯৯৫) উপন্যাসে হিন্দু ধর্মের বাল্যবিধবাদের মর্মবিদারক অবস্থা ও বিধবাবিবাহ বিষয়টিকে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে তুলে ধরা হয়েছে। তৎকালীন হিন্দু সমাজের পুরুষেরা যে সর্বদা বিধবাবিবাহ, বিধবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে, তাদের উদ্ধার করার মানসিকতা নিয়ে এমনটা করতেন তা হয়তো নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে সমাজের অনেক অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করেও, ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিয়ে, আর পাঁচজন অবিবাহিতা কন্যার মতোই সেই নির্দিষ্ট বিধবাটিকে মান্যতা দিয়েই, তাঁকে নিজের ঘরনী করতেন। এক্ষেত্রে তৎকালীন সেই পুরুষদের বিধবাবিবাহের মতো সমাজ সংস্কারের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, মানবিকতাকে প্রাধান্য দিয়েই, ভালোবেসে অংশগ্রহণ করাকে অবশ্যই সাম্মানিক

স্বীকৃতি দিতে হয়। তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সমস্ত পুরুষেরাই যে সর্বদা নারীকে অসম্মান ও হীনদৃষ্টিতে দেখতেন, একথা সর্বৈব সত্য বলে মানা যেতে নাও পারে। কারণ তৎকালীন সময়ে বিধবাবিবাহ বিষয়টিকে সমাজবহির্ভূত কাজ বলেই গণ্য করা হতো এবং যিনি এই কাজে অগ্রসর হয়ে, সমাজের বিধবাদের একটা সাম্মানিক পরিচয় দিতে আগ্রহী হতেন, সমাজ তাঁকে সচেতনভাবেই অনেকসময় বর্জন করার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিয়ে থাকতো। তবু সেই বিশেষ ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিত্বের মানদণ্ডে সমাজকে মান্যতা দিতেন। সমাজের মানদন্ডে কখনোই নিজের সিদ্ধান্তকে পরিমাপ করতেন না। ঔপন্যাসিক আশাপূর্ণা দেবী তাঁর **'প্রেম ও প্রয়োজন'**(১৯৯৫) উপন্যাসে তৎকালীন সমাজের বিধবাদের মানসিক অবস্থার কথা অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে বুনেছেন। তিনি বিধবাদের মানসিক অবস্থার কথা অনুভব করে বলেছেন, স্বামীর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী যে সবসময় সেই স্বামী বিরহে কাতর হতেন তেমনটা নয়, কারণ বিধবা হওয়ার পরে যে সংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে বিধবাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাটাতে হতো, তাতে তাদের পার্থিব সমস্ত রকম আনন্দ এবং সুখকে বর্জন করতে হতো। মানুষের জীবনে জীবনধারণের জন্য শুধুমাত্র প্রাথমিক চাহিদাগুলোই গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষের জীবনে, জীবনকে ভালোলাগার চাহিদাও এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে। এই প্রাথমিক চাহিদার সঙ্গে যখন জীবনের ভালোলাগার চাহিদা, একসাথে মানুষের মননকে সমৃদ্ধ করে, তখন তা হয়ে ওঠে – প্রকৃত জীবন যাপন। এই প্রকৃত জীবন যাপন, তৎকালীন বিধবাদের জীবনে একেবারেই গ্রাহ্য ছিল না। ঔপন্যাসিক নবনীতা দেবসেনের **'মায়া রয়ে গেল'**(২০০০) উপন্যাসে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তনের হাল পুরুষই বহন করতে সক্ষম হতে পারে, কারণ পরোক্ষভাবে পিতা-মাতার শিক্ষায় শিক্ষিত নারী-পুরুষ উভয় সন্তানেরই ব্যবহারের প্রতিচ্ছবিই, তাদের মাতা-পিতার ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতিবিম্বের দর্পণ। তাই একজন পুরুষের ব্যবহার যা নারীর সন্মানের ক্ষেত্রে পরিপন্থী তা পরোক্ষে তার পিতা-মাতার থেকে প্রাপ্ত শিক্ষারই প্রতিনিধিত্ব করে। এই একই বিষয় নারীর ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। ভারতবর্ষীয় সমাজের পরিকাঠামোয় সাধারণত নারীকেই অসম্মানের শিকার হতে হয়। কারণ শিক্ষার সঙ্গে নীতিবোধের বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর নীতিবোধের স্তম্ভের উপর এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। তাই যে গৃহে নারীর সম্মান অনুপস্থিত, সেই গৃহে প্রকৃত ধার্মিকতাও ব্রাত্য হয়ে ওঠে। কারণ প্রকৃত ধর্ম গোষ্ঠী নির্বিশেষে, জাতি নির্বিশেষে ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে থাকে। তাই নারীর অসম্মান প্রকৃত ধর্মবোধের অপমান। ঔপন্যাসিক সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'এক বর্ণও মিথ্যা নয়'**(২০০১)

উপন্যাসে ইসলাম ধর্মে একসঙ্গে চারটি বিবি রাখার বিষয়টিকে একইরকমভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামিক ধর্মাবলম্বী পুরুষদের যত খুশি দাসী রাখার বিষয়টিকেও নারীর অসম্মানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে তুলে ধরা যায়। নারীর অসম্মানের প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক নজরুল ইসলামের **'ভূমিপুত্র (১)'** (২০০২) উপন্যাসে মনুসংহিতার প্রসঙ্গকে তুলে ধরে বলা যেতে পারে যে, মনুসংহিতা অনুযায়ী অতীতে ধর্মের অজুহাতে হিন্দু মহিলাদের অবস্থাও মহিলাদের সম্মানের নিরিখে খারাপ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মনুর আইন পরিবর্তিত হয়ে, নববিধান তৈরি করে, হিন্দু মহিলাদের পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার বলবৎ করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমান সমাজে ধর্মের নামে নারীর অসম্মানের বিষয়টি আজও অনেক ক্ষেত্রেই সমানভাবে বর্তমান। কারণ মুসলমান সমাজে নারীসম্মানের পক্ষে কোন নববিধান তৈরি হয়নি, তিন তালাক প্রথা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সদর্থক রায় বেরোনো সত্বেও, বাস্তবিকভাবে মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে তা কতখানি কার্যকর হয়েছে, তা আজও এক প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে। মুসলমান সমাজেরও নারীর অবস্থার সময়োপযোগী পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকেও যুগোপযোগী বলে মনে করা যায়। সমাজে মুসলিম নারীদের অবস্থার বিষয়টি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যালের **'কনকলতার সন্ধানে'**(২০০৩) উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। দুই বাংলাতেই মুসলিম নারীসমাজ অত্যন্ত অধিক মাত্রায় নির্যাতিতা। বর্তমানে পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে, আইন পরিবর্তনের ধারায় নারীদের অবস্থারও পরিবর্তন হচ্ছে। সেই কারণেই বর্তমানে নারীরা জীবনের কোন বিষয়েই আর উদাসীন থাকার প্রয়োজনীয়তা মনে করেন না। ঔপন্যাসিক সমরেশ মজুমদারের **'জীবনটাকে চেখে দেখুন'**(২০০৭) উপন্যাসে সমাজে নারীর পরিস্থিতি বর্ণনায়, বর্তমান নারী স্বাধীনতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে, সকল মানুষের মধ্যে সমতা আনার জন্য ধর্মের অনুশাসন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করা হয়েছে। এখন এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। যার ফলে এখন নারীর কাছে পূজা-অর্চনার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কর্মের ধর্ম। নারীর চিন্তাধারা এখন শুধুমাত্র ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হয় না, নারী মননে এখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতার চিন্তার কারণে স্ব-উপার্জনের ধারণাটি প্রাধান্য পেয়েছে। নারী ভাবনার এই বিষয়টিকে নারী স্বাধীনতার আহ্বায়ক বলা যেতে পারে। নারী শোষণের প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক গৌতম রায়ের **'বিষকণ্ঠী সুলোচনা'**(২০০৭) উপন্যাসে অতীতের নারীশোষণ প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। অতীতে ভারতবর্ষে ধর্মীয় কার্যকলাপের মোড়কে যে অধর্মীয় কার্যকলাপ সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষতন্ত্রের নারীশোষণ বলা যেতে পারে। বৃন্দাবনের ও বেনারসের বিধবা আশ্রম তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কৌলিন্য প্রথা প্রসঙ্গে

ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেনের **'মৌসুমীর সমুদ্রের উপকূল'**(২০১২) উপন্যাসে তৎকালীন সমাজের নারী শোষণের বিষয়টি অত্যন্ত মর্মভেদী হয়ে উঠে এসেছে। সেকালে সমাজে কৌলিন্য প্রথার কঠোরতার কুঠার দেশের উচ্চবর্ণীয় কুলীনকুলের কন্যাদের কাছে যেন এক প্রকার মৃত্যুর পরোয়ানার মতো বিষয় ছিল। কুলীন পাত্রদের বিবাহ-ব্যবসা সমাজে একটা নৈরাজ্য তৈরি করেছিল। একজন ব্রাহ্মণের শতাধিক স্ত্রী গ্রহণও সেকালে সমর্থনযোগ্য বিষয় ছিল। এই সমস্ত বিবাহিত নারীদের কোন সুস্থ বিবাহিত জীবন থাকত না। তৎকালীন সমাজের নারী শোষণের বিষয়ে সমাজে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে পুরুষের কাছে নারীর এই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও নির্ভরশীলতাকে নারী নিজে কখনোই নিন্দনীয় বা মর্যাদার অবমাননা বলে মনে করতেন না। বরং নারীর নিজস্ব প্রকৃতিগত মূল্যবোধের সঙ্গে সেই অমর্যাদার সহাবস্থান ঘটিয়ে তাকে নারী নিজের কাছে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মীয় প্রতিমূর্তিরই প্রতিফলন বলে মনে করতেন। পুরুষতান্ত্রিকতার প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক হাসান আজিজুল হকের **'সাবিত্রী উপাখ্যান'**(২০১৪) উপন্যাসে তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায় তা হ'ল, তৎকালীন পুরুষেরা, নারীদের নারীত্বকে কখনোই সম্মানের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতো না। পুরুষতন্ত্র নারীর অস্তিত্বের ক্ষেত্রে কোনো রকম নীতিবোধের কার্যকারিতাকে সাধারণত স্বীকার করত না। নারীর বিবাহ তার সামাজিক জীবনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঔপন্যাসিক তাপস রায়ের **'পোড়া মাটির দেউল'**(২০১৬) উপন্যাসে মনুর প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে যে, ভারতবর্ষে মনু হলেন সবচেয়ে আলোচিত শাস্ত্রকার। 'মনুসংহিতা' ভারতবর্ষের ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান শাস্ত্র। মনুর নিদানে তৎকালীন বাংলার উচ্চ সমাজে 'গৌরীদান'-এর বিষয়টি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। 'গৌরীদান' অর্থাৎ অষ্টমবর্ষীয়া শিশু কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার রীতি। মনুর নিদানে 'কন্যাপণ' বিষয়টিকেও অত্যন্ত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। যার নঙর্থক পরিণতি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আজও দৃশ্যমান। তাই পিতা-মাতার শিক্ষা ভাবনার সাথে সাথে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই, তার নিজস্ব স্বাধীন সদর্থক চিন্তাভাবনায় প্রতিনিয়ত স্নাত হতে হবে। তাহলেই এই সমাজের প্রকৃত সচেতন, শিক্ষিত নারী-পুরুষ হিসেবে সমাজের সামাজিক পরিবর্তনে অগ্রগতি আনয়ন সহজ হয়ে যেতে পারে।

বর্তমান গবেষণাকর্মে গৃহীত বিশ্বায়নের পরবর্তী ১৯৯১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়পর্বকে যে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে সেগুলি হ'ল, প্রথম পর্ব (১৯৯১-২০০০), দ্বিতীয় পর্ব (২০০১-২০১০) ও তৃতীয় পর্ব (২০১১-২০১৭)। সমাজে

ধর্মের নিরিখে নারীর প্রকৃত অবস্থান-এর ক্ষেত্রে এই তিনটি পর্বের বিশ্লেষণের পর যে সত্যদর্শন উঠে এসেছে তা হ'ল, প্রত্যেক সমাজেই শৈশব থেকেই নারী-পুরুষের তারতম্য করা হয়ে থাকে। পুত্র পরিবারের সম্পদ ও কন্যা পরিবারের দায়িত্ব রূপেই পরিচিত হয়। পাশ্চাত্য সমাজে সাধারণত এই পুত্র-কন্যার বিভাজন সমাজসম্মত নয়, তার কারণ বিবাহের পর উভয়েই পরিবার থেকে পৃথক হয়ে নিজস্ব সংসার প্রতিষ্ঠা করে। ভারতবর্ষের সমাজে সাধারণত পিতা-মাতা পুত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে তাকে বার্ধক্যের অবলম্বনে পরিণত করে। তার একমাত্র কারণ পুত্রের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। বর্তমানে নারী জাতি স্ব-উপার্জনে সক্ষম হওয়ার কারণে, বর্তমানে বিবাহের পূর্বে এবং পরে অনেক কন্যাসন্তানও সম্পূর্ণভাবে পুত্রের ন্যায় পিতা-মাতার অবলম্বন হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্যরকম। সেখানে সাধারণত পিতা-মাতা কখনোই পুত্র বা কন্যার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকেন না।

সেকালে সমাজে নারী শোষণের বিষয়টি নানান সামাজিক রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার দ্বারা পরিচালিত হতো। বর্তমান গবেষণায় সমাজে ধর্মের নিরিখে নারীর প্রকৃত অবস্থান বিষয়ে বিভিন্ন ঔপন্যাসিক, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ধর্মে নারীর প্রকৃত অবস্থান এর বর্ণনা প্রসঙ্গে যে সত্য তুলে ধরেছেন তা হ'ল, সেকালে নারী সম্পূর্ণভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ওপর নির্ভরশীল ছিল। সেকালে নারীর সম্পূর্ণতার সোপান ছিল বিবাহ। এছাড়াও কৌলিন্য প্রথার কঠোরতায় বিবাহিতা নারীদের বিবাহিত জীবনের কোনো সুস্থতা থাকত না। কারণ কৌলিন্য রক্ষার্থে বৃদ্ধের সঙ্গে বালিকার আবার পৌঢ়ার সঙ্গে বালকের বিবাহ দেওয়া হতো। তারা অনেক ক্ষেত্রেই সারা জীবন নামমাত্র বিবাহিতা থেকে নারীর স্ত্রীধর্মপালনে বাধ্য হতো। কৌলিন্য প্রথা ও বিবাহিতা নারীদের সংসারে দাসী পরিচয়েই জীবন নির্বাহ করতে হতো। নারীদের শুধুমাত্র পুত্রোৎপাদক যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছিল। বাল্যবিবাহ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েই অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাদানের পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় গৌরীদান প্রথা সেকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। নারী শোষণের নামে আর একটি হৃদয়বিদারক প্রথা ছিল, সতীদাহ প্রথা। সতীদাহের নামে জীবন্ত নারীকে তার মৃত স্বামীর সঙ্গে, একই চিতায় বেঁধে পুড়িয়ে মারা হতো। এই প্রথাকে 'সহমরণ' নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছিল। নারীর শোষণের এই উপরোক্ত বিষয়গুলির সাথে 'ধর্ম' বিষয়টিকে জুড়ে দিয়ে, তাকে মাহাত্ম্যব্যঞ্জক করে তোলা হতো। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে আচরণের ক্ষেত্রেও নৈতিক মানের বিরাট পার্থক্য দেখা যেত। হিন্দু ধর্মে বাল্যবিধবাদের অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে দিনাতিপাত করতে হতো। সেই কারণে যখন বিধবাবিবাহ সমাজসম্মত বিষয়রূপে গণ্য

হলো, তখনও সংস্কারমুক্ত না হওয়ার কারণে সমাজ তাকে সেভাবে মান্যতা দেয়নি। ফলে যে সমস্ত মুক্তমনা পুরুষেরা বিধবা বিবাহে সম্মত হতেন, সমাজ তাঁদের এক প্রকার বর্জনই করতো। বিভিন্ন সময়ের আঙ্গিকে বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের লেখা উপন্যাসগুলিতে দেখা যাচ্ছে নারী শোষণের এই দিকগুলি কমবেশি উঠে এসেছে। উপন্যাসের তিনটি পর্বেই সেকাল-একালের সমাজে নারী পরিস্থিতির যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে ধর্মের ধ্বজা ধরে 'নারীশোষণ' নামে অভিহিত করা যায়। ঔপন্যাসিকেরা সমাজের ধর্মের মোড়কে মোড়া নারীশোষণের দিকটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন। নারী শোষণের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ওপর নারীর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষা, প্রতিবাদহীনতা, নারীর শোষণের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে তুলে ধরা যায়। সেকালে নারী শিক্ষার প্রচলন সেভাবে ছিলনা। সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবার ছাড়া সাধারণ পরিবারে, নারী শিক্ষার বিষয়টিকে শীঘ্র বৈধব্য প্রাপ্তির সাথে যুক্ত করে, নারীকে শিক্ষার সাথে সংযুক্ত হতে দিতো না। ফলে অশিক্ষা নারীকে করে তুলেছিল পরমুখাপেক্ষী। মুসলমান সমাজের নারীর শোষণের দিকটিও গবেষণার তিনটি পর্বেই কমবেশি উঠে এসেছে। ঔপন্যাসিকেরা মুসলমান সমাজের বিবাহ, তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ, তালাকের পর নারীর যে অত্যন্ত মর্মভেদী অসম্মানের চিত্র পাওয়া যায় তা বিস্তারিতভাবে উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। একাধিক ঔপন্যাসিক এই বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। পুরুষপ্রধান ইসলাম ধর্মে, মেয়েদের শিক্ষা, আর্থিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরাধীনতা, বধূনির্যাতন, পণপ্রথা সম্পর্কে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ঔপন্যাসিকরা প্রায় সকলেই সহমত পোষণ করেছেন। মুসলমান সমাজের পুরুষেরা ইসলাম ধর্মানুযায়ী চারজন বিবি রাখতে পারেন, নারীর জীবনে এ এক চরম অপমান বা অসম্মানের পর্যায়ভুক্ত বিষয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। মুসলমান সমাজ স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীমুক্তি বিরোধী হবার সত্বেও, ইসলামী দেশ পাকিস্তানে বহু বিবাহ ও তালাক প্রথা নিষিদ্ধ। সেই কারণে পাকিস্তানকে মৌলানা সাহেবরা মুসলিম রাষ্ট্র হলেও, তাকে ইসলামিক আখ্যা দিতে নারাজ। ঔপন্যাসিক আফসার আমেদ, আবুল বাশার, নারায়ণ সান্যাল, সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তসলিমা নাসরিন মুসলিম তালাকপ্রাপ্তা নারীদের, তালাকের নামে ধর্মীয় দিকের আড়ালে বলপূর্বক বহুবিবাহের বিষয়টিকে, নারীর সম্মান ধর্ষণের হাতিয়ার রূপে তুলে ধরেছেন। এই অধার্মিক অবস্থা থেকে নারী মুক্তির উপায় হিসেবে ঔপন্যাসিকেরা শিক্ষার আলো, মানবিকতা, ধর্মীয় যৌক্তিকতা ও ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন।

প্রকৃত ধর্মবোধ

মানুষের সামাজিকতার একটি শ্রেষ্ঠ উপকরণ হ'ল ধর্ম। সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ধারনা হ'ল – প্রাজ্ঞ, স্থিতধী ও সৎ মানুষের ধারণা। কারণ সমাজ যেমন ধর্মকে প্রভাবিত করে থাকে, তেমনই ধর্মও সমাজকে সর্বাংশে প্রভাবিত করার শক্তি রাখে। মানব সভ্যতার মর্মে ধর্ম অবস্থিত। সেই কারণে মানুষের মননের ধর্মবোধ ব্যর্থ হলে মানব সভ্যতা বিপন্ন হতে পারে এ কথা বলা যেতেই পারে। মানব সভ্যতার বিকাশের অগ্রগতির শর্ত হ'ল মানুষের বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান – এই ভাবনায় ভাবিত হওয়া যেতে পারে। জ্ঞান মানুষের সংস্কৃতি বা কৃষ্টির ও সভ্যতার মধ্যে সমন্বয় করতে সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে। সমাজ, সংস্কৃতি, আদর্শ, উপলব্ধি, এসবই সাধারণ মানুষের ধর্মভাবনাকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। সঠিক সংস্কৃতি বা কৃষ্টির আভিজাত্যকে অনুশীলন বা অভ্যাসের দ্বারা মানুষকে আয়ত্ব করতে হয়। সভ্যতাকে সংস্কৃতির বাস্তবায়ন বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। মানব সভ্যতা কখনোই কোন একক মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে না, এ কথা বলা যেতে পারে। সভ্যতা মানুষের সম্মিলিত ভাবনার ফল। 'সভ্যতা' ও 'সংস্কৃতি' শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক এবং পরস্পর সম্পর্কিত। মানুষের রুচি, বিশ্বাস, শিল্পবোধ, মূল্যবোধ, জীবনযাত্রার আদর্শ, ভাবনার নীতি, শিষ্টাচার, জ্ঞান ও মননশীলতার প্রকাশ হ'ল সংস্কৃতি। অর্থাৎ সংস্কৃতি মানুষের মননে পালিত হয়। আর সভ্যতা সংস্কৃতির বহিরঙ্গের পোশাক বলে মনে করা যেতে পারে। সভ্যতাকে সংস্কৃতির বাহন হিসেবেও গণ্য করা যেতে পারে। সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলোই সভ্যতার ভিত্তি ও গতির নির্ণায়ক বলা যেতে পারে। সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হিসেবে সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপকে গণ্য করা যেতে পারে, যার ধারক হিসেবে ধারাবাহিকভাবে পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, সম্প্রদায়, দেশ ও সারা বিশ্বের উল্লেখ করা যেতে পারে। সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতির শাস্ত্রীয় ভিত্তি যা মানুষের মননের গভীরে প্রবেশ করে, এক সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন শক্তির ভিত্তি প্রস্তুত করে, যার শক্তিতে বলা যেতে পারে – "যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।" অর্থাৎ সত্য মানবিক ধর্মই, মানুষের মানবিকতার জয়ের অস্তিত্ব ঘোষণা করে থাকে। ঔপন্যাসিক ডঃ দীপক চন্দ্রের **'উপেক্ষিতা শূর্পণখা'**(১৯৯৪) উপন্যাসে মানুষের জীবনে ধর্ম আর ঈশ্বরের প্রভাব অত্যন্ত গভীর বলে স্বীকৃত হয়েছে। মানুষের পরিচয় শুধুমাত্র তার নামের মধ্যে নিহিত থাকে না। মানুষের জাতি, ধর্ম, সামাজিক ও পিতৃপরিচয়ও থাকে। সমাজে এই সমস্ত পরিচয়গুলি একসাথে একজন মানুষের 'যথার্থ পরিচয়' হয়ে ওঠে। একজন যথার্থ মানুষ হিসেবে এই যথার্থ

পরিচয়কে রক্ষা করার জন্য, মানুষকে কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়ম নীতি অনুসরণ করে চলতে হয়। এই সামাজিক এবং ধর্মীয় নীতিগুলি মানুষের জীবনে ঈশ্বররূপ ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়। নীতিহীন মানুষ যেমন ধর্মকে আঁকড়ে বাঁচতে পারে না, ঠিক তেমনই ধর্ম কখনও নীতিহীন হতে পারে না। মানুষের প্রতিটি পরিচয়ই দেশ, জাতি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির সাথে অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। মানুষ যদি যথার্থ পরিচয়ের হাত ধরে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে চায়, তাহলে তাকে নিয়ম-নীতির সাথে গাঁটছড়া বাঁধতেই হবে। নিয়ম-নীতি সম্পন্ন মানুষ ঈশ্বরের সাথে পরিচিত হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে, কারণ নিয়ম-নীতি সম্পন্নতাকে ঈশ্বরের ঐশ্বরিক গুণরূপে মানুষই স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই নীতিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক অংশ হিসেবে মানবতার বাস একথা স্বীকার করাই যেতে পারে। মানুষের মধ্যেই মানবতার প্রকাশকেই 'মানবিক ধর্ম' রূপে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এই মানবিক ধর্ম মানুষের মনুষ্যত্বের দ্বারা প্রতিটি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। যা বিশ্বভাতৃত্ববোধের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা অর্জন করতে সক্ষম হতে পারে। প্রকৃত ধর্ম কি, এর কোনো প্রকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক সমর্থন অন্বেষণে সমর্থ হওয়া, মানুষের পক্ষে অনেক সময়ই সম্ভব হয়না। কিন্তু যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ধর্মকে আশ্রয় করেই মানুষের জীবন অতিবাহিত হয়। কারন সমাজের মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের ক্ষেত্রে মানুষের অন্তঃস্থ নৈতিক ধর্মবোধ মানুষের কাছে ধর্মকে যুক্তিপূর্ণভাবেই উপস্থাপিত করে থাকে। যদিও এর বিজ্ঞানসম্মত যথার্থতা হয়তো তেমন ভাবে উপস্থিত করা সম্ভব হয় না, তবুও মানুষের নীতিবোধ, হৃদয়সত্তা, নিঃস্বার্থপরতা, অহিংসা, মানুষের প্রতি মানুষের সম্মানবোধ, সেবাবোধ, এইসব সদর্থক গুণগুলিকে মানুষই মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক গুণের অস্তিত্ব হিসেবে নামকরণ করেছে। কারণ এই সদর্থক গুণগুলি মানুষের সৃষ্ট ঈশ্বরের ধারণার শ্রেষ্ঠ গুণ বলে মানুষই স্বীকৃতি দিয়েছে। যদিও ধর্মকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ, অত্যাচার, রক্তপাত হচ্ছে এবং হয়তো হবেও, তবুও মানুষের জীবন থেকে জাগতিক দুঃখ, কষ্ট, হতাশা দূর করার জন্যে, মানুষের অন্তঃস্থ শক্তির উৎস সেই মনুষ্যসৃষ্ট পরমাত্মা বা ঈশ্বরের ওপরেই, ঐশ্বরিক গুণরূপ ধর্মের হাত ধরেই মানুষ নির্ভরশীল হয়ে থাকে। মানুষের প্রকৃত ঈশ্বরবোধ বা প্রকৃত ধর্ম প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহের **'পর্ণমোচী'**(২০০৪) উপন্যাসে প্রায় একই সুরে, অভিব্যক্তি হ'ল, ঈশ্বরবোধহীন মানুষ, ধর্মরহিত মানুষ সাধারণত ন্যায়-অন্যায় বোধহীন হতে বাধ্য হয়। তাই মানুষ সেই অবস্থায় 'মনুষ্য' পদবাচ্যের পরিবর্তে 'মনুষ্যেতর জীব' রূপে প্রতিপন্ন হতে পারে, কারণ পশু বা জানোয়ারের কোন ঈশ্বরবোধ বা ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকেনা। কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্বপূর্ণ মানুষের ঈশ্বরবোধ

এবং ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকে যা অন্তত থাকা প্রয়োজন। কারণ পৃথিবীর সমস্ত ধর্মেরই মূল উদ্দেশ্য মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের যোগ্য করে তোলা এবং অবশ্যই তাকে মনুষ্যেতর জীব হতে না দেওয়া। মানুষের জীবন, পার্থিব জীবন প্রবাহের বিচিত্রতার দর্পণ। ধর্মভীরুতা মানুষের মধ্যে মানুষের ব্যক্তিত্বের হন্তারক হয়ে উঠতে পারে। মানুষের স্বাভাবিক ও সুন্দর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয় ঐশ্বরিক গুণসমৃদ্ধ নৈতিকতাকে অবলম্বন করে। যেখানে সত্য, সুন্দর ও প্রেমের যথার্থ বিকাশ হয়ে থাকে। সেই ব্যক্তিত্বে ভীরুতার কোন স্থান থাকেনা, এ কথা বলা যেতে পারে। তাই ধর্মভীরুতা ধার্মিকতার পরিচয় নয় বরং ঐশ্বরিক গুণসমৃদ্ধ নৈতিকতার সততায় ও প্রেমে মানুষের প্রকৃত ধর্মবোধ সুন্দর হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'জনগণ'**(২০০৫) উপন্যাসে ধর্মবিপ্লবী বিবেকানন্দ বলেছেন, নিজের উপর বিশ্বাসই ঈশ্বরত্বের প্রকাশ। তিনিও আনুষ্ঠানিক ধর্মের থেকে মনুষ্যত্বের ধর্মকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম বলে মনে করেছেন। ধর্ম হ'ল, মানুষের ধর্ম – এই কথার অর্থ বলা যেতে পারে, মানুষের অন্তঃস্থ মনুষ্যত্ব যখন প্রতিটি মানুষের সেবার ক্ষেত্রে জেগে ওঠে এবং প্রতিটি মানুষ যখন প্রতিটি মানুষের সঙ্গে প্রকৃত মনুষ্যত্বের তাগিদে একে অন্যের সহায় বা অবলম্বন হয়ে ওঠে, তখনই তাকে প্রকৃত 'মানবিক ধর্ম' নামে নামাঙ্কিত করা যেতে পারে। কারণ মনুষ্যত্বের ধর্ম মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হলে ধর্মীয় মৌলবাদের অবসান হওয়া হয়তো সহজ হয়ে যেতে পারে। মানুষের জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্ম আর মানুষের মনুষ্যত্বরূপ ঐশ্বরিক ধর্ম দুটি পৃথক। জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্ম মানুষকে নিজে থেকে অর্জন করতে হয় না, কিন্তু মনুষ্যত্বরূপ ঐশ্বরিকধর্ম মানুষকে স্ব-হৃদয়ে নৈতিকতারূপ ঐশ্বরিক গুণগুলিকে আশ্রয় করেই, প্রতিমুহূর্তে অনুশীলনের মাধ্যমে, অর্জন করতে হয়। হিন্দুধর্মের বেদান্তদর্শনে ব্যক্তিসত্ত্বার সঙ্গে বিশ্বসত্ত্বা এক ও অভিন্ন। কারণ প্রতিটি জীবের আত্মাই সেই পরম ব্রহ্মাত্মার অংশ বলেই স্বীকৃত। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এই অভিন্নতাবোধ যদি জাগ্রত হয়, তাহলে বলা যেতে পারে, মানুষের অন্তর্বাহিত বিরাজমান সেই পূর্ণশক্তির প্রতি মানুষের পূর্ণাস্থা বা ভরসা জ্ঞাপনই প্রকৃত মনুষ্যত্বের ধর্ম হয়ে উঠতে পারে। আর একেই 'মানবিকতার ধর্ম' রূপে পরিচিত করা যেতে পারে। তাই মানুষের জীবনে প্রেমের গুরুত্ব অপরিসীম। একমাত্র প্রেমই মানুষের অন্তর্বাহিত পূর্ণশক্তির বহিঃপ্রকাশ। ঔপন্যাসিক পরেশ ভট্টাচার্যের **'রামী চন্ডীদাস'**(২০০৮) উপন্যাসে প্রেম সম্বলিত সহজিয়া ধর্মের, ধর্মীয় সমাজের যে ইতিহাস অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে, তা বর্তমান গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গ্রাহ্য হয়েছে। মানুষের অন্তরেও একটি শাশ্বত

সুন্দর স্বরূপ বর্তমান। এই শাশ্বত স্বরূপই 'সহজ'। জগতের যাবতীয় সুন্দর উপলব্ধি জগতের যাবতীয় প্রাণী ও বস্তুর সুন্দর উপলব্ধির মধ্যেই বর্তমান থাকে। সহজপথ মানে প্রেম, যা মানুষের সহজধর্ম। এই সহজ ধর্মের প্রবর্তক কবি বড়ু চন্ডীদাস। চন্ডীদাসের মত কবিরাই আলোর পথ দর্শান। অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত না হ'লে, সেই অচেনা ঈশ্বরকে চেনা যায় না। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকীর্তনের মধ্যে দিয়ে তিনি মানুষের জাগরন চেয়েছিলেন। সহজিয়া ধর্মমত, পরোক্ষে 'মানবতার ধর্ম'-কেই প্রকৃত ধর্মরূপে স্বীকৃতি দান করেছে। সহজিয়া ধর্মমতে মানুষের মনই ঈশ্বরের আবাসস্থল। তাই মানুষ যখন মানুষের সাথে প্রকৃত প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয় ও মানবসেবাকে প্রাধান্য দেয়, তখনই মানুষের প্রকৃত ঈশ্বরোপলব্ধি সম্ভব হতে পারে। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক গৌতম রায়ের **'বিষকণ্ঠী সুলোচনা'**(২০০৯) উপন্যাসে, মানুষের সেবাকেই মানুষের পরম ধর্ম রূপে গণ্য করা হয়েছে। মানুষকে ভালবাসলেই ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয়। কারণ মানুষের হৃদয়েই নীতিজ্ঞান স্বরূপ ঈশ্বরের বাস। মানুষের হৃদয়ে প্রকৃত নৈতিকবোধের জাগরন হলে, একজন মানুষ আর একজন মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পান না। তাই প্রতিটি মানুষের কাছে তখন প্রতিটি মানুষের একটাই পরিচয় প্রধান হয়ে ওঠে, যার নাম মনুষ্যত্বপূর্ণ মানুষ। আর এই মনুষ্যত্বপূর্ণ মানুষই ঈশ্বরের নামান্তর। প্রতিটি মানুষ যখন মনুষ্যত্বের তাগিদে মানুষের সেবার কাজে উদ্যোগী হয়ে ওঠে তখন তা ঈশ্বর সেবারই নামান্তর হয়ে, বিশ্বভাতৃত্বের পথকে সুগম করে। জন্ম হয় বিশ্বজনীন ধর্মের। উদারনৈতিক ধর্মতাত্ত্বিকদের মতে, 'অসীম'-রূপ বিশ্বাত্মার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের মাধ্যমে এক হয়ে যাওয়ার অনুভূতিকে 'ধর্ম' নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। মানুষের মধ্যেই বাস করে মানুষের অনন্ততত্ত্ব। কারন মানুষ বিশ্বাত্মার অনন্ততত্ত্বের এক অংশবিশেষ, একথা বিজ্ঞানসম্মতভাবেই বলা যেতে পারে। কারণ মানুষ জগতের পঞ্চতত্ত্ব দ্বারাই সৃষ্ট আবার মৃত্যুর পর সেই পঞ্চতত্ত্বেই বিলীন হয়। সাংখ্য দর্শন মতে, এই পঞ্চতত্ত্ব হ'ল, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম। অর্থাৎ মাটি, জল, তাপ, বায়ু ও মহাকাশ এগুলি বিশ্বাত্মারও প্রকৃত উৎস পরিচয়। এভাবেই মানুষ বা প্রতিটি জীবই বিশ্বাত্মার অংশবিশেষ তা বলা যেতেই পারে। মানুষ মানুষের অন্তঃস্থ অনন্ততত্ত্বের নির্দেশিত ঐশ্বরিক গুণের পথেই বিশ্বাত্মা অথবা পরমেশ্বরের সাথে, ইচ্ছে করলেই এক হওয়ার অনুভূতি অনুভব করতে সক্ষম হতে পারে। একেই 'ঈশ্বরদর্শন' রূপে নামকরণ করা যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে কোনো বিশেষ ধর্ম প্রাধান্য পাওয়ার প্রয়োজন নাও পরতে পারে, কারণ মানুষের ঐশ্বরিক গুণগুলিকে ধারণ করাই মানুষের প্রকৃত ধর্মরূপে গণ্য হতে পারে। মানুষের ঐশ্বরিক গুণগুলির উপর বিশ্বাস অর্থাৎ মানুষের

নিজের অন্তঃস্থ সদর্থক শক্তির উপর বিশ্বাসই, মানুষকে 'আস্তিক' নামে আখ্যায়িত করতে পারে। এই আস্তিকতাই প্রেমরূপ মানবিকতার প্রকাশ্য ধর্মরূপ। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক ইন্দু সাহার **'গোপনপুরের উপকথা'**(২০১১) উপন্যাসে প্রেমের ধর্মই সত্যের রূপ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। সব ধর্মের মূল কথাই প্রেম। মানুষের অন্তরের এই প্রেম বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে, সমাজের মানুষের মনুষ্যত্বের নৈতিক গুণাবলী সম্বলিত ঈশ্বরত্ব, যা মানুষের মূল্যবোধ ও আদর্শের মোড়কে মোড়া এক ধর্মীয় পরিস্থিতি, তা সমাজের মঙ্গলার্থে প্রকাশিত হওয়া, সুস্থ সমাজের ক্ষেত্রে এক সদর্থক পদক্ষেপ হয়ে উঠতে পারে। এই বিষয়ে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর **'দুনিয়াদারি'**(২০১৫) উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের মতে, সুস্থ সমাজব্যবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সমাজে সামাজিকতারূপ ধর্মীয় পরিস্থিতি এবং সঠিক মূল্যবোধের ধারকরূপ মানুষের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে। সমাজের সামাজিক ও মানবিক প্রয়োজনে, মানুষের মূল্যবোধের ও আদর্শের বিকাশে ধর্ম এক বিশেষ স্থান গ্রহণ করে থাকে এ কথা বলা যেতে পারে। এই মূল্যবোধের অন্তরেই স্নেহ, প্রীতি, প্রেম-ভালোবাসার আদর্শ অবস্থান করে। এই প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতায় ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর **'লালবাঈ'**(২০১৫) উপন্যাসে ধর্মের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতায়, ধর্মে শুধুমাত্র স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসা ও অনুরাগের অনুভূতিকেই 'প্রকৃত ধর্ম' বলে উল্লেখ করা যায়। ধর্মের আধ্যাত্মপ্রবাহই মানবাত্মাকে দেবত্বে উন্নীত করতে সহায়কের ভূমিকা পালন করে থাকে। এই কথার সুর ধরেই ঔপন্যাসিক রঞ্জন বন্দোপাধ্যায়ের **'প্রাণসখা বিবেকানন্দ(৩)'**(২০১৫) উপন্যাসের যে আধ্যাত্মপ্রবাহের তথ্য প্রাপ্ত হওয়া গেল তা হ'ল, হিন্দুধর্ম প্রধানত বিশ্বাস করে মানবত্মার স্বাভাবিক দেবত্বে। আত্মা পূর্ণস্বরূপ। আর ধর্মের লক্ষ্য হ'ল, মানুষের এই সহজাত পূর্ণতার বিকাশ ঘটানো। সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত সমাজপ্রাপ্তির এক গুরুত্বপূর্ণ, আলোকোজ্জ্বল সরণীর নাম – 'ধর্ম'। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত ঔপন্যাসিকদের মহামূল্যবান উপন্যাসপ্রাপ্ত তথ্য দ্বারা, বিশ্বায়নের পরবর্তী সময়ের ধর্মের সত্যানুসন্ধান, নীতিবোধ ও মূল্যবোধের মাধ্যমে, মানুষের মধ্যে প্রকৃত ধর্মরূপ মানবিকতা বা মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে ঔপন্যাসিকেরা সচেষ্ট হয়েছেন। তাই সমাজে একমাত্র ধর্ম – 'মানবিকতা' বা 'মনুষ্যত্ব'। যা সাম্প্রদায়িকতা দূর করে, মানুষ মানুষে ভাতৃত্বভাব প্রকাশিত করার চাবিকাঠি। এভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঔপন্যাসিকেরা কলমকণ্ঠের দ্বারা উপন্যাস সৃষ্টির মাধ্যমে সুস্থ ও সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা ও প্রকৃত ধর্ম – 'মনুষ্যত্ব'-এর প্রচার নীরবে করে চলেছেন।

বর্তমান গবেষণাকর্মে গৃহীত বিশ্বায়নের পরবর্তী ১৯৯১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়পর্বকে যে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে সেগুলি হ'ল, প্রথম পর্ব (১৯৯১-২০০০), দ্বিতীয় পর্ব (২০০১-২০১০) ও তৃতীয় পর্ব (২০১১-২০১৭)। প্রকৃত ধর্মভাবনার বিষয়ে ঔপন্যাসিকেরা পৃথকভাবে কোন বিশেষ নামাঙ্কনের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেননি। কিন্তু প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই, ঔপন্যাসিকেরা অত্যন্ত সচেতনভাবে মানুষের নৈতিকতাবোধ, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে যথার্থ ধার্মিকতার বিষয় বলেই উল্লেখ করেছেন। মানুষের নৈতিকতাবোধ ও মূল্যবোধের বিষয়টি প্রাগৈতিহাসিককালে তেমনভাবে উপস্থিত না থাকলেও পরবর্তীকালে মানুষের মনুষ্যত্বের প্রধান বিষয়রূপে মানুষের মননে স্থান করে নিয়েছে। এই নৈতিকতাবোধ ও মূল্যবোধের ভাবনা মানুষের মননে গ্রথিত হওয়ার ইতিহাসকে জানতে হলে, সমাজের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসকে জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে বলেই গণ্য করা যেতে পারে। সেই কারণেই যে কোন বিষয়েই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত ইতিহাস চর্চায় দুই ধরনের ইতিহাসের সন্ধানে পাওয়া যায়। প্রথমত – বর্ণনামূলক ইতিহাস, দ্বিতীয়ত – এমন ইতিহাস যা প্রকৃতপক্ষে ঘটেছে। বর্ণনামূলক ইতিহাসের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের তিনটি প্রধান কাজ হ'ল, বিষয়ের উপস্থাপন, ব্যাখ্যা ও পুনর্ব্যাখ্যা। এই ধরনের ইতিহাসে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এর মধ্যে যোগসুত্র তৈরি করে, ঐতিহাসিক বা বর্ণনাকারীর জ্ঞানের মাধ্যমে অতীত থেকে বর্তমান এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে পৌঁছে যাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের ইতিহাসের কখনো পুনরাবৃত্তি হয় না। তাই একে ঐতিহাসিক বাস্তবতা নামে নামকরণ করা যেতে পারে। যেকোনো বিষয়ের প্রকৃত বাস্তব ইতিহাস, সেই বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতাকে, সাধারণত সাধারণ মানুষের কাছে, এক প্রশ্নচিহ্নরূপে উপস্থিত করে থাকে। তাই সেকালের সম্পূর্ণ বাস্তব রাজনৈতিক ইতিহাসকে জানতে পারলে তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়টিও স্বচ্ছতার মোড়কে মোড়া হতে পারে। কিন্তু তা সম্ভবত পরিস্থিতির চাপে সম্ভব হয়নি। কারণ সেকালের সাহিত্যিকেরা রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে, সাহিত্যে অত্যন্ত সচেতনভাবেই এড়িয়ে চলতেন। কারণ রাজনৈতিক বিষয়গুলি সাধারণত তৎকালীন রাজা-রাজরা অথবা তাঁদের নিজেদের স্বধর্মীয়দের সাথে সম্পর্কিত হতো। তাই সাহিত্যিকেরা রাজা-রাজরা অথবা তাঁদের নিজেদের স্বধর্মীয়দের বিপক্ষে যেতে না চাওয়ার কারণেই, সাহিত্যে রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করতে চাইতেন না। তা না হলে সেকালের রাজনীতির ইতিহাসের প্রচুর উপাদান সাহিত্য থেকেই সংগ্রহীত হতে পারত। রাজনীতির সাথে সামাজিক ও ধর্মীয় দিক ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। কিন্তু সেকালের সঠিক রাজনীতির সঠিক ইতিহাস

না জানার কারণে সঠিক সামাজিক ও ধর্মীয় দিককে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয় না। ফলে সেকালের সম্পূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস জ্ঞাত না হওয়ার কারণে, বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে একেবারে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ যেকোনো বিষয়ের ঐতিহাসিক জ্ঞান মানুষের পরবর্তী সঠিক পদক্ষেপের অঙ্গীকার হয়ে উঠতে পারে। ঔপন্যাসিকেরা সমাজে অনেক সময়ে ঐতিহাসিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের উপন্যাস রচনার মাধ্যমে সমাজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলিকে তুলে ধরে, উপন্যাসগুলিকে সমাজের সদর্থক অগ্রগতির প্রয়োজনে, এক সুন্দর ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ দলিল করে তোলেন, যা বর্তমান সমাজের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে, ভবিষ্যৎ সমাজের ক্ষেত্রে এক সদর্থক পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

ধর্মের সনাতন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পরধর্মসহিষ্ণুতা। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের অনেক জায়গায় খ্রীষ্টান ধর্মের কথা উল্লেখ না থাকলেও, হিন্দু-ইসলাম উভয় ধর্মকেই সমশ্রদ্ধার যোগ্য এবং ঈশ্বর হিন্দুকে ও মুসলমানকে সমদৃষ্টিতেই দেখেন ও পুরাণ ও কোরানের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য এক, এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কারণ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 'পাকিস্তানি' ভাব ছিল না – ভাষায়ও না, ভাবেও না। বর্তমান গবেষণায় উল্লেখিত উপন্যাসিক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের **'করোয়ার পানি'(১৯৯৭)** উপন্যাসে যে যবন হরিদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি 'যবন হরিদাস' বা 'বৈষ্ণবসাধু হরিদাস', শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। তিনি আজও বৈষ্ণব সমাজে গভীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সঙ্গে প্রণম্য ব্যক্তি হয়ে আছেন। তিনি যবনকুল বা মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে, তাঁকে 'যবন হরিদাস' নামে খ্যাত করা হয়েছে। আবার 'ব্রহ্ম হরিদাস' বলেও তিনি খ্যাত হয়ে আছেন। এভাবে বলা যেতে পারে তৎকালীন সময়ে কোনও কোনও ইসলাম ধর্মাবলম্বীর কাছে, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবে হিন্দুধর্ম অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। সেকালের এই যবন হরিদাস হিন্দু-মুসলিমের ঈশ্বর এবং আল্লাকে এক একেশ্বরে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এবং অসাম্প্রদায়িকতাকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি কৃষ্ণপ্রেমের মূল মন্ত্র মানবিকতা বা প্রেমকে সমগ্র মানবজাতির কাছে এক মানবিক ধর্মরূপে তুলে ধরেছিলেন। এভাবে তিনি সমাজে মানবিকতার সদর্থক ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের ক্ষেত্রে এক সদর্থক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

ভারতবর্ষ এক বিচিত্র মহান দেশ। এখানে নানা ধর্ম, নানা মত, নানা রাজনীতি। এখানে রাজনীতির নামে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে বৈষম্য দেখা যায় তাকে বলা হয় – মতাদর্শগত লড়াই। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে ধর্ম বৈষম্যের থেকে উৎপন্ন মতবিরোধজনিত মারামারিকে বলা হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। অর্থাৎ গান্ধী, লেনিনের নামে মারামারি, খুনোখুনি হতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের নামে কেউ কাউকে আঘাত করতে পারবে না। কারণ সরকার কোনো ধর্মের ঈশ্বর বিশ্বাসীকেই চটাতে চায়না। কারণ তাতে নির্বাচনে তার প্রভাব পড়বে। আর বিভিন্ন ঈশ্বর বিশ্বাসীরাও এর সম্পূর্ণ সুযোগ দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করে। কারণ রাজনৈতিক দলগুলোর মতই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ আরাধ্যকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। দুই বা ততোধিক সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ দেশভাগের মত বিষয়কেও সহজেই মেনে নেয়। মানুষ বিস্মৃত হয়, মানুষের একমাত্র পরিচয় যে – সে মানুষ। বাকি সব অর্থহীন, অনাবশ্যক। আসলে ধর্মের বহুরূপী রূপ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। কারণ সব ধর্মের সব রূপই সত্য ও গ্রাহ্য। তাই সত্যের ও ন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণই অধর্মাচারণ। যা কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। ন্যায় ও সুনীতিকে আশ্রয় করেই আদর্শবাদীরা অগ্রসর হন। আর আদর্শবাদীরা সমস্ত মানুষকেই সাম্যের দৃষ্টিতে দেখেন। জাতিভেদ, বর্ণভেদ তাঁদের কাছে প্রাধান্য পায়না। প্রত্যেক মানুষেরই নিজ ধর্ম ছাড়া একটি বিশেষ ধর্ম বর্তমান। তা হ'ল – দেশপ্রেম। মানুষ জাতি, ধর্ম, ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে একজন আরেকজনের থেকে আলাদা হলেও, এক দেশে বসবাসকারী হিসেবে, সমদেশীয়তার ভিত্তিতে যে একাত্মতা অনুভব করে, তা মানুষের মনকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়মুক্ত করে, এক মানুষকে আরেক মানুষের কাছে করে তোলে – এক দেশের মানুষ এবং অত্যন্ত আপনজন। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, দেশকে 'দেশমাতৃকা' বলে অভিহিত করে। ঈশ্বর ও দেশ সমার্থক। মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সেবাই ঈশ্বর আরাধনার নামান্তর। দেশকে, সমাজকে অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ থেকে মুক্ত করায় ব্রতী হওয়াও ঈশ্বর পূজা। দেশের ও দশের উন্নতিকল্পে বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা মানুষকে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে। বিজ্ঞানীরা কার্যকারণ সম্পর্কে বিশ্বাসী। সমগ্র বিশ্বসংসার এক চৈতন্য পরিব্যাপ্ত। সেই চৈতন্যই প্রতিনিয়ত জগতের অণু-পরমাণুগুলি ভাঙছে, গড়ছে, নিয়ন্ত্রণ করছে। চৈতন্যই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশকে ঈশ্বর প্রণীত সময়ে বেঁধেছে। অনন্ত মহাশূন্যে প্রত্যেক গ্রহ-উপগ্রহ নিজ নির্দিষ্ট কক্ষপথে কোনো সহায়তাবিনা, দোদুল্যমান অবস্থায় নির্দিষ্ট সময় মেনেই ঘুরছে। এই চৈতন্যের বিজ্ঞানের কাছে বৈজ্ঞানিক যুক্তিও অনেকসময় পরাভূত হয়। বিজ্ঞান অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধিই ব্রহ্ম।

প্রতিটি জীবের প্রাথমিক চাহিদা হ'ল নিরাপত্তা। এই নিরাপত্তার চাহিদা অভিযোজনের মাধ্যমে প্রকট হয়। এই নিরাপত্তার চাহিদা আনুবিক্ষণিক প্রাণী থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সকলেরই। এই নিরাপত্তার তাগিদেই, চলমান জাগতিক শক্তির কাছে তারা আশ্রিত। জীব ও চলমান জাগতিক শক্তি একই শক্তি থেকে উদ্ভূত। তাই চলমান জাগতিক শক্তির সঙ্গে জীবের একটা আত্মিক শক্তির সম্পর্ক বর্তমান। ধর্মীয় মতবাদানুযায়ী মানুষ নশ্বরতাজনিত নিরাপত্তাহীনতার শিকার। তাই সে দ্বারস্থ হয় প্রাচীন দার্শনিক মতবাদের। হিন্দু ধর্ম সনাতন। তবে সনাতনের অস্তিত্ব, মানবঅস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়। এই সনাতন চিন্তাধারায় মানবহিতের বার্তা কিন্তু অনুক্ত থাকে। সনাতন আসলে একধরণের নিরাপত্তার আশ্রয়। আর এই নিরাপত্তার আশ্রয় ভারতীয় দর্শন সম্যকভাবে গ্রহণ করেছে। মানবকল্যাণ বা জীবকল্যাণ সবই নিরাপত্তার অন্বেষণ। কাজেই জীবকে নিরাপত্তা প্রদান ধর্মের আর এক রূপ। বস্তু, জীব সকলেই, নিজেই তার নশ্বরতার কারণ। তাই মানুষ সৃষ্ট ঈশ্বর ও ঈশ্বরসৃষ্ট জীব পরস্পর নিরপেক্ষভাবে একে অন্যের নিরাপত্তার কারণ। এখানে কোনো জাত-বর্ণ বা ধর্মের বিভেদ ক্রিয়াশীল হতে পারে না। তাই সমদর্শীর সমন্বয়ই ধর্মের মূল বিষয়। মানুষের রক্ষক শুধুমাত্র মানুষই। আর কেউ নয়। মানুষকে নিজেই নিজের আশ্রয় হতে হবে। এ হ'ল নাবালক অবস্থা থেকে সাবালকত্বে উত্তরণ। অর্থাৎ মনুষ্যত্বে দীক্ষালাভ। ইতিহাসের গতিময়তা কখনই ধর্মের বেড়াজালে মানুষকে আটকে রেখে মানুষের অজ্ঞানতার সুযোগ নেওয়া নয়। বরং প্রকৃত ধর্মের গতি মানুষকে এক সম্পূর্ণ মানবিক পৃথিবী উপহার দেয়। যা এক-পৃথিবীর মানুষের ভেদাভেদের বেড়াজাল ভেঙ্গে এক সুস্থ ভাবনা বা চেতনার জয়রথের জয়যাত্রায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলো। এখানেই প্রকৃত ধর্মের সার্থকতা। সচেতন সুবুদ্ধির ঐশ্বর্যে মানবিক ধর্ম আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে মানবের কাছে। প্রত্যেক দেশ, জাতি, বর্ণের ধর্ম পৃথক হওয়া সত্ত্বেও মানবিকতার ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে যেদিন এক বসুন্ধরা ও একটাই জাত – তা হচ্ছে মানুষ, এই নীতি প্রধান হয়ে উঠবে, সেদিন প্রতিটি পৃথক ধর্মই নিজস্ব মানিয়ে নেওয়া ও মেনে নেওয়ার স্বকীয়তার উজ্জ্বল উপস্থিতিতে, মানবিকতার আলোকে, নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব গৌরবময় করে তুলতে সমর্থ হবে। এই প্রত্যাশাই, যেদিন পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে কল্পনাবিলাস না হয়ে বাস্তবসম্মতভাবে সত্য হয়ে উঠবে, সেদিন ধর্মবিরোধিতার অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়ে, সেই একেশ্বরবাদের সূর্যের আলোকে মানুষ একটি ধর্মকেই সবার উর্ধে অধিষ্ঠিত করে, নির্ভীক কণ্ঠে স্বীকার করতে পারবে যে মানুষের জন্য কেবলমাত্র একটিই ধর্ম বর্তমান আর সেই ধর্মের নাম – 'মানবিকতা' বা 'মনুষ্যত্ব'। মনুষ্য হৃদয়ে যে পরমেশ্বরের বাস, তাঁর কথায় মধু, তাঁর

সান্নিধ্য মধুর। মানুষের অন্তর সেই ঈশ্বরের প্রতিভূ। সেই কারণেই একজন মানব, আরেকজন মানবের মঙ্গল কামনা করে ধর্মেকর্মে সুন্দর হয়ে ওঠে। মানুষের মধ্যে যা কিছু মহৎ, সত্য আর শুভ – তাই তার চরিত্রের শক্তি, অন্তরের সৌন্দর্য, নৈতিক বল, মানসিক স্থৈর্য। এভাবেই মানবাত্মার মধ্যে ঈশ্বরের ঐশীশক্তি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে সক্ষম হতে পারে। মানবাত্মার এই ঐশীশক্তি সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে জাগ্রত হলে, ধর্মে ধর্মে যে সাম্প্রদায়িকতা তা দূরীভূত হতে পারে। সমাজ ব্যবস্থায় তার ব্যাপক সুফল দৃশ্য হতে পারে। সাম্প্রদায়িকতার বিনাশ হতে পারে। ধর্ম, মানুষের মধ্যে এই ঐশ্বরিক শক্তি জাগাতে সক্ষম একথা বলা যেতে পারে। ধর্মের দ্বারা মানুষকে 'এক-পৃথিবী'র মানুষে পরিণত করার প্রচেষ্টার প্রস্তুতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এক পদক্ষেপ। মানুষের চৈতন্যকে জাগিয়ে তুলতে ধর্মই শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃত ধর্মের গুণাবলী সর্বধর্মেই সমার্থক। তাই মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির স্বার্থে, এমন এক নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্ম দিতে হবে যা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের অন্তরে সর্বধর্মসমন্বয়ের বীজ বপন করতে সক্ষম হতে পারে। যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেও সমস্ত ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ ও সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। সর্বধর্মের প্রতিটি মানুষকেই বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও 'এক পৃথিবী'র পরিবারের সদস্যে পরিণত করতে সক্ষম হতে পারে – যেখানে নিরাপত্তা, নির্ভরতা ও প্রতিটি মানুষই প্রতিটি মানুষের কাছে, সার্বিকভাবে প্রকৃত ঈশ্বর হয়ে উঠবে। কোনো মানুষের প্রতি কোনো মানুষের ধর্মের ভিত্তিতে মিত্রবেশী ভক্ষক না হয়ে উঠে, এমন এক সর্বজনীন ধার্মিক প্রতিনিধি হয়ে উঠতে হবে, যিনি ধর্মের মোড়কেই মনুষ্যত্বকে উপহার দিতে পারবেন। মানুষ তো সৃজনশীল। মানুষ ইতিহাস তৈরী করে। তাই মানুষই পারে এই দ্বান্দ্বিক ধর্মের অন্ধকার দূর করতে। প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার, সংস্কৃতির প্রসার এই দ্বান্দ্বিক ধর্মের অবসান ঘটানোর এক আন্তরিক প্রচেষ্টা হয়ে উঠতে পারে। অসাধারণ সর্বধর্মসমন্বয়ের পথের সন্ধান দিতে মানুষই তখন অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। ধর্মের নানা পথ বর্তমান। প্রতিটি মানুষকে শুধু মনুষ্যত্বের হাত ধরে, সেই সর্বধর্মসমন্বয়ের পথে, আত্মিক উপলব্ধিকে পাথেয় করে, এগিয়ে যেতে হবে নতুন এক ধর্ম গড়ার আকাঙ্ক্ষায়, যার নাম – 'মনুষ্যত্ব'। ধর্মের প্রধান বক্তব্য হ'ল – বিশ্বসত্ত্বার সঙ্গে ব্যক্তিসত্ত্বা অভিন্ন। মানব কল্যাণের স্বার্থে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এমন এক সার্বভৌম ধর্মের প্রয়োজন যে ধর্মে কোন কৃপণতা নেই, যে ধর্ম সহানুভূতি ও পরম সহনশীলতার নিদর্শন। সমাজচেতনায় মানুষের এই শুভবোধ, যাকে প্রকৃতপক্ষে 'ধার্মিক' নামে অভিহিত করা যায়, তা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে, প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজের

নাগরিক হয়ে উঠতে পারবে। সবার আগে মানুষ, মানুষ। তাই মানুষ হিসেবে মানুষের প্রকৃত সাম্মানিক অস্তিত্বকে সম্মান করাই হ'ল, প্রতিটি মানুষের প্রধান ধর্ম। সমাজের পুস্তকপ্রেমীরা উপন্যাস পাঠকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, এই কারণে যে – উপন্যাস পাঠের মাধ্যমে লোকশিক্ষা হয়। একটি উপন্যাসের মাধ্যমে সমাজের নানান দিক ঔপন্যাসিকেরা অত্যন্ত ব্যুৎপত্তিতার সঙ্গে তুলে ধরেন। তাই উপন্যাস পাঠের মাধ্যমে সমাজ এবং ধর্ম সম্পর্কে সত্যানুসন্ধান, পাঠকের কাছে অত্যন্ত সহজ হয়ে ওঠে। সাধারনত ধর্মপুস্তকের প্রতি প্রেম একটি বিশেষ বয়ঃক্রমে দৃশ্য হয়। কিন্তু উপন্যাস পাঠ যেকোনো বয়সের পাঠকের কাছেই অত্যন্ত অভিপ্রেত। তাই উপন্যাস পাঠের মাধ্যমে যেকোনো বয়ঃক্রমের মানুষই ধর্ম এবং সমাজ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারেন, যা সমাজ সংস্করনের ক্ষেত্রে এক সদর্থক পদক্ষেপ।

ধর্মের উৎপত্তি মূলত দ্বন্দ্ব থেকে। যেকোনো ধর্মে 'দ্বন্দ্ব' – ই নতুন ধর্মের স্রষ্টা। সমগ্র পৃথিবীতেই এক ধর্মের অধঃপতন আরেক ধর্মের আমন্ত্রক। এমনকি একই ধর্মের মধ্যেও দ্বন্দ্ব থেকেই সৃষ্টি হয় একাধিক সম্প্রদায়ের। বর্তমান গবেষণায় বারবার হিন্দু-মুসলমান এই দুই ধর্মের দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, তার কারণ ভারতবর্ষে এই দুই ধর্মের ধর্মাবলম্বীরাই, অন্যান্য ধর্মের ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি মাত্রায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও বিশেষভাবে ধার্মিক ক্ষেত্রে সমাজে সহাবস্থানের কারণে সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছে। দ্বন্দ্ব প্রসূত সাম্প্রদায়িকতার বর্ষণে সমাজ প্রতিনিয়ত স্নাত হচ্ছে। সমাজের মানুষ অহরহ সাম্প্রদায়িকতারতার শিকার হওয়ার কারণে সমাজে যে অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে, তা মানুষ ও সমাজকে সমানভাবে নঙর্থকতায় প্রভাবিত করছে। তাই সমাজে এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক ঘটনাগুলো ঘটছে বলেই, সেগুলোর প্রভাব ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসকে প্রভাবিত করছে, কারণ উপন্যাস শুধুমাত্র কল্পকাহিনী তা নয়, উপন্যাসের মধ্যে সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বাস্তবতার দিকগুলো ধরা পড়ে। একদিকে বিশ্বায়ন, যেখানে ধর্মীয় বিশ্বায়নের অর্থই হচ্ছে – অন্যন্য ধর্মকেও আরো বেশি সম্মানের দৃষ্টিতে বরণ করে নেওয়া, সব ধর্মীয় সমাজ সম্পর্কে উৎসাহের সঙ্গে জ্ঞাত হওয়া, সমস্ত ধর্মীয় সংস্কৃতিকেই এক প্রকৃত সংস্কৃতিবানের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা। বিশ্বায়নের সেই ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে দেখা যায় যে – এই ধর্মীয় বিভাজনরেখাটা, উপরোক্ত অসাম্প্রদায়িকতার পথে না গিয়ে, বরং একটা বিরাট ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার সৃষ্টি করছে, যা বিশ্বজনীন ধর্ম গড়ে তুলে এক বিশ্বভ্রাতৃত্বের বার্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যতই সমাজ অগ্রসর হোক না কেন, মানুষ যতই

সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলুক না কেন, সমাজের বুদ্ধিজীবীরা ও সাধারন মানুষেরা সকলে একসাথেই, মানবধর্মের প্রসঙ্গকে প্রাধান্য দেওয়া সত্ত্বেও, কোথাও যেন একটা সূক্ষ্ম মানসিক বিভাজনরেখা সুতোর মতো সমাজের মানুষের মাঝখানে অবস্থান করছে, সেই কারণেই বিশ্বায়নের পরবর্তীকালের যুগেও পারস্পারিক বিভেদের অভিযোগটা অনেকক্ষেত্রেই এখনও মারাত্মক আকার ধারণ করছে। তাই মনে রাখতে হবে যে, সবার আগে মানুষ, মানুষ। তাই মানুষ হিসেবে মানুষের প্রকৃত সাম্মানিক অস্তিত্বকে সম্মান করাই হ'ল, প্রতিটি মানুষের প্রধান ধর্ম। ধর্মের সত্য মানুষের আত্মিক বিকাশের সহায়ক। ধার্মিকতা মানুষের অস্তিত্বের শিকড় যা মানুষকে ধারণ করে। মানুষকে ধর্মের ধারণার, ধারণা প্রদান করে। জীবন জড়ানো থাক ধর্মের ধারণার চিরন্তন সত্য অন্বেষণে। মঙ্গল হোক সমৃদ্ধ প্রকাশের, জয় হোক জীবনের প্রতিটি ক্ষণের।

গবেষণার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

বর্তমান গবেষণার শিরোনাম হ'ল – **'বাংলা উপন্যাসে ধর্ম : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'**। সামাজিক বাস্তব অবস্থাকে বুঝতে হলে তা মানুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বোঝা সম্ভব হতে পারে। কারন সমাজের যেকোনো পরিস্থিতি বর্তমান গবেষকের দৃষ্টিগোচর হওয়ার পূর্বেই, কোন না কোনভাবে উপরোক্ত পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত সম্মানীয় ব্যক্তিত্বদের অভিজ্ঞতায় তা প্রতিফলিত হয়ে থাকে। তাই বর্তমান গবেষক সেইসব সম্মানীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে অনুধাবন করে, তাঁদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করে, গবেষণার কার্যপ্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করার ওপর জোর দিয়েছেন এবং সমাজের সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়ায় সেই অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্লেষণকে গবেষণার চালিকাশক্তি রূপে গ্রহণ করে, গবেষণাকে বাস্তবসম্মতভাবে অর্থপূর্ণ করে তুলতে চেয়েছেন। বর্তমান গবেষণাটি উপন্যাস নির্ভর। তাই সম্মানীয় সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের ধর্ম সম্পর্কে মতামতের সাথে, গবেষণায় গৃহীত বিভিন্ন ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসপ্রাপ্ত ধর্ম সম্পর্কে মতামত যেভাবে দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে, তা সামাজিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধর্মকে বিশ্লেষণ করে, তার যথার্থ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ দুর্খাইমের মতে – সকল ধর্ম বিশ্বাসের মূলে একটি ধারণাই আছে, একটি রহস্যময় নৈর্ব্যক্তিক শক্তির ধারণা যা মানব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ

করে। এই শক্তির ধারণার মূলে আছে ব্যক্তির উপর সামাজিক কর্তৃত্বের বাস্তবতা। ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ দুর্খাইমের মতই ঔপন্যাসিক প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় তাঁর **'কথা'** (২০০৬) উপন্যাসে বলেছেন যে মনুষ্যত্বই যখন সবচেয়ে বড় ধর্ম তাহলে সমাজের অজস্র মানুষের মনে কিভাবে এমন ভাবনা প্রবাহিত হতে পারে যে, যে আমার ধর্মের নয়, সে বিধর্মী! এই মনোভাব সমস্ত ধর্মেই বর্তমান। এই ধর্মদ্বন্দ্বই ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন এবং তীব্রভাবে এই ধর্মবিদ্বেষকে নিন্দা করেছেন। এই ধর্মবিদ্বেষ বিষয়টি সমাজের এক নিন্দনীয় সত্য। যে সত্য মানুষকে ব্যথাতুর করে তোলে। ঔপন্যাসিকও অত্যন্ত ব্যথাতুর মানসিকতায় বিষয়টি উপন্যাসের মাধ্যমে উপস্থাপন করে পাঠককে জ্ঞাত হতে সাহায্য করেছেন। সমাজের বহুস্তরীয় ব্যবস্থাপনায় সমাজ বহু প্রাচীনকাল থেকেই পরিবর্তিত এবং পরিচালিত। ধর্মদ্বন্দ্বকে বা ধর্মবিদ্বেষকে নিন্দা করার মাধ্যমে কোথাও যেন ঔপন্যাসিক প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ দুর্খাইমের মতানুযায়ী ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তির উপর সামাজিক কর্তৃত্বের বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছেন। যেখানে ধর্ম মনুষ্যত্বকে অবলম্বন না করে সামাজিক সাম্প্রদায়িকতার আবাহনকারী হিসেবে প্রতিপন্ন হচ্ছে।

সমাজতত্ত্ববিদ কার্ল মার্কস মনে করেন ধর্ম সাধারণ মানুষের কাছে আফিম সেবনের মতো যা মানুষকে কল্পনাবিলাসী, নিরুদ্যম, নিস্পৃহ করে দেয়। মানুষকে ভাগ্যাশ্রয়ী করে যেকোনো অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তি হরণ করে নেয়। "সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা" এইমতে বিশ্বাসী হয়ে মানুষ হীনমন্য হয়ে পড়ে। এই মতের সাথেই যেন একমত হয়ে ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর **'একলা চলো রে'** (২০১৬) উপন্যাসে বলেছেন, মানুষের নিরাপত্তাবোধের অভাব, উৎকণ্ঠা সমাজব্যবস্থার মধ্যেই মানুষের দ্বারাই সৃষ্টি হয়। মানুষের এই নঙর্থক সৃষ্টিশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা একমাত্র ধর্মবোধেরই থাকে। মানুষের ধর্মান্ধতা বহু কুসংস্কারের জন্ম দেয় যা প্রগতির পথ রুদ্ধ করে। ফলে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে তা এক প্রাচীরস্বরূপ হয়ে ওঠে। তাই বলা যেতে পারে, সমাজে ধর্মে সাম্প্রদায়িকতার প্রবেশ ধর্মান্ধতারই ফল। নিপীড়িত, অবহেলিত, শোষিত মানুষ সমাজের উচ্চ শ্রেণীর বিরুদ্ধে কোনো রকম বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ না করে, ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করাকেই জীবনধারণের সহজ উপায় বলে মনে করে। সেই কারণেই ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীও যেন সমাজতত্ত্ববিদ কার্ল মার্কসের মতানুযায়ী, ধর্মকে দলিত শ্রেণীর আফিম এবং মানবমুক্তির প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ নিরাপত্তাহীন মানুষ ধর্মের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। বিষয়টা অনেকটা শৈশবকালের পিতা-

মাতার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের সাথে সমার্থক মনে করা যেতে পারে, কারণ সমাজের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ, বয়সের ভারে অশক্ত বা মৃত পিতামাতার কাছ থেকে শৈশবপ্রাপ্ত নিরাপত্তা পেতে পারে না। তবে সমাজতাত্ত্বিক কার্ল মার্কসের উপরোক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য এ কথা হয়তো সর্বৈব সত্য নয়। কারণ ধর্ম প্রসূত নিষ্ক্রিয়তা বা হীনমন্যতা যেমন আছে তেমন ধর্মান্ধ ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির ধর্ম প্রসঙ্গে অতিশয় তৎপরতাও বর্তমান। যার কারণে ধর্মের জন্য প্রচুর রক্তপাত, যুদ্ধ ইত্যাদির অবস্থান ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানুষ মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি রক্ষার জন্য প্রচুর জীবন বিসর্জন দিয়েছে, তাই ধর্মকে আফিমের সঙ্গে বোধহয় তুলনা করা সঠিক পদক্ষেপ বলে গণ্য নাও হতে পারে। অনেক সময় ধর্মকে 'আদর্শ' নামকরণ করে ধর্মের জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তা সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত অনভিপ্রেত বলেই গণ্য করা যেতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরু-পান্ডবের যুদ্ধে অর্জুনকে ক্লীব না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবতগীতায়, এই ধর্মরক্ষার নামে এভাবেই ধর্ম ও কর্মের এক সুন্দর সহাবস্থানের পথনির্দেশ করেছিলেন। কর্মরূপ ধর্ম ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার ও আরাধনা করার এক পথ মাত্র। ধর্মের এই বাণী বিশ্বমানবিকতার প্রসঙ্গে বিশ্বমানবের বাণী। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর **'একলা চলো রে'** (২০১৬) উপন্যাসে দলিত শ্রেণীর মানুষদের নিজের হাতে তৈরি করা সৃজনশীল কর্ম, অর্থাৎ গরু ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র সহকারে হরিনাম সংকীর্তনের বিষয়টিকে তাদের দারিদ্র্যের ও সামাজিক পরিচিতির যন্ত্রণাকে বিস্মৃত হয়ে, আত্মনির্ভরতার হাত ধরে জীবন চলার চাবিকাঠি রূপে তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি তাঁর উপন্যাস রচনার মাধ্যমে সমাজের সকল মানুষকে যেন সামাজিকভাবে মানবিকতার ধর্মে অনুপ্রাণিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, যা বিশ্বভাতৃত্বের ক্ষেত্রে 'সকল মানুষ সমান সম্মানের অধিকারী' – এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার এক সদর্থক পদক্ষেপ হয়ে উঠেছে।

সমাজবিজ্ঞানী কান্ট-এর মতে, নীতি বা মরালিটি অবধারিতভাবে মানুষকে যে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেয়, তাই হ'ল ধর্ম। সমাজবিজ্ঞানী কান্ট-এর মতানুযায়ী ঔপন্যাসিক গৌরকিশোর ঘোষের লেখা **'প্রেম নেই'** (২০১৬) উপন্যাসে ঔপন্যাসিকও নীতি বা আদর্শবাদকেই তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি তাঁর উপন্যাসে বলেছেন, মৃত্যুর পরে মানুষের দেহ পঞ্চভূতে লীন হয়ে যাওয়ার পরে, মানুষের ধর্মের আর আলাদা করে কোন অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু মৃত্যুর পরেও মানুষের যে অস্তিত্ব বজায় থাকে তা হ'ল – মানুষের আদর্শ বা নীতি। মৃত্যুর আগে মানুষের আদর্শ মানুষের মধ্যে, মানুষের মন বা আত্মা হিসেবে অবস্থান করে। বিভিন্ন

ধর্মগ্রন্থানুযায়ী আত্মা অবিনশ্বর। তাহলে আদর্শও অমর। হয়তো সেই কারণেই আজও প্রাচীনকালের মহানুভব মুনি-ঋষিদের ধর্মীয় আদর্শ প্রাসঙ্গিক ও বর্তমান। এভাবে বলা যেতে পারে, মানুষের মৃত্যু মনুষ্যত্ব বা আদর্শের মৃত্যু নয়। মৃত্যু শুধু দেহ থেকে দেহান্তরে স্থানান্তরণ। মানুষের সদর্থক আদর্শ বা নীতি মানুষকে সেই পরমাত্মার এক অংশ করে তুলতে সাহায্য করে। কারণ এই সদর্থক আদর্শবান নীতির হাত ধরেই মানুষে মানুষে গড়ে ওঠে সৌহার্দ্যতার ও বিশ্বভাতৃত্বের সম্পর্ক। এভাবেই মানুষের সদর্থক আদর্শ মানুষকে মানুষের কাছে প্রকৃত ধার্মিক করে তুলছে। এখানেই লেখক গৌরকিশোর ঘোষ নিজের অজান্তেই হয়তো সমাজবিজ্ঞানী কান্ট-এর ধর্ম সম্পর্কে মতবাদের অনুসরণকারী হয়ে উঠেছেন।

আবার অস্তিত্ববাদী দার্শনিক টিলিশ বলেছেন, মানুষের নিজেকে অতিক্রম করে পরমের দিকে যাত্রাই হচ্ছে ধর্ম। অস্তিত্ববাদী টিলিশের এই মতকে সমর্থন করেই যেন ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর **'অনলপ্রভ বিদ্যাসাগর'** (২০০৫) উপন্যাসে ঈশ্বরের আরাধনাকে মানুষের অন্তঃস্থিত অভিলাষের বহিঃপ্রকাশ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যা মানুষ অনন্তে অস্তিত্বের অনুসন্ধান করে, একমাত্র অদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী নিত্য সত্য 'পরমাত্মা'-কেই, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম' রূপে স্বীকার করে, নিজেকে অতিক্রম করে, সেই পরমব্রহ্মে যেন লীন হতে চায়। প্রকাশ আর অপ্রকাশের মাঝে যে কালের উপস্থিতি আবিষ্কার করা যায় তাকেই 'অস্তিত্ব' নামকরণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ যতক্ষণ, ততক্ষণ। এই জগতের সমস্ত কিছুর সৃষ্টির মূলে প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর। এইজন্যেই সেই 'পরম'-কে 'সৃষ্টিকর্তা' বলে নামকরণ করা হয়। এই অসাধারণ সত্যে, ঔপন্যাসিক ধর্মের সঙ্গে প্রাকৃতিক ও মহাজাগতিক বিজ্ঞানের যোগাযোগের অনুভূতির অনুভবকে অত্যন্ত সহজ করে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। ধর্মের অর্থ – বিচার। ধর্মের অর্থ সদর্থক আদর্শের পথে থাকা। এই সদর্থক নীতি ও আদর্শের পথই পরমের সাথে মিলনের পথ। মানুষের অন্তঃস্থ নীতিবোধ, হৃদয়সত্তা, নিঃস্বার্থপরতা, সততা, অহিংসা, মানুষের প্রতি মানুষের সম্মানবোধ, সেবাবোধ, দয়া, মায়া, মমতা, এই সদর্থক গুণগুলিকে মানুষই মানুষের সৃষ্ট ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ গুণ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এই প্রকৃত মানবিক ধর্মের অস্তিত্বই, অস্তিত্ববাদী দার্শনিক টিলিশের মতানুযায়ী মানুষের নিজেকে অতিক্রম করে পরমের দিকে যাত্রা, যা ঔপন্যাসিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর **'অনলপ্রভ বিদ্যাসাগর'** (২০০৫) উপন্যাসে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের মধ্যের এই মানবিক গুণগুলিই মানুষে মানুষে যে মানবিকতার বন্ধনরূপ ধর্মের সৃষ্টি

করে তা মানুষকে সমাজের প্রকৃত ধর্মের ধারনার ধারণা প্রদান করে। মানুষের মধ্যে ধর্মের এই প্রকৃত ধারণাই মানুষকে বিশ্বভাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে।

সমাজতত্ত্ববিদ হারবার্ট স্পেনসারের মতে, মানুষের নীতিবোধকে বিশুদ্ধভাবে বিচার করতে গেলে তাকে ধর্মের প্রভাব মুক্ত করতে হবে। যদিও মানুষের নীতিবোধ যুক্তিনির্ভর আর ধর্ম যুক্তির সীমা অনেক সময়েই লঙ্ঘন করে থাকে। এই বিষয়টিকে সমর্থন করেই যেন ঔপন্যাসিক আবুল বাশার তাঁর **'ধর্মের গ্রহণ'** (১৯৯২) উপন্যাসে বলেছেন পৃথিবীর সকল ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা বড় হ'ল – ভালোবাসা। ধর্ম ও নীতি উভয়ই মানুষের অন্তরের উপলব্ধি। যদিও সমাজের আইন সমাজের নীতি ও ধর্মের আদর্শকে রক্ষা করে। কোনো মানুষের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম যদি সেই মানুষের ভালো না লাগে, তাহলেও তার মানসিক বৃত্তিগুলির বিকাশে ঘাটতি নাও হতে পারে। কারণ জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্ম মানুষের মধ্যে মানসিক সদর্থক বৃত্তিগুলির যথা – অহিংসা, সহিষ্ণুতা, দয়া, মায়া, মমতা ইত্যাদির জন্ম নাও দিতে পারে। আবার কোন এক বিশেষ ধর্মকে না মেনেও মানুষের মধ্যে মানসিক সদর্থক বৃত্তির উপস্থিতি বর্তমান থাকলেও থাকতে পারে। কারণ হিসেবে মানুষের মনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। **'ধর্মের গ্রহণ'** (১৯৯২) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আদিগন্ত, আকাশপ্রমাণ, শূন্যতার নিরাকার বিশালতাকে ঈশ্বরেরই নামান্তর বলে স্বীকার করেছেন। কোন ব্যক্তির জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্ম এই বিশাল ব্যপ্তির আনন্দকে সর্বদা যে অনুভব করতে সক্ষম হবে, তা নাও হতে পারে। কারণ এই নিঃসীমতার অনির্বচনীয় আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নাও হতে পারে। শুধুমাত্র মানুষের মন তা শক্তিশালী প্রেমানুভূতির সাহায্যে অনুভব করতে পারে, যা যেকোনো সাধারণ জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্মের অনেক উর্ধ্বে। এই বিশাল ঈশ্বর অনুভূতিকে অনুভব করতে কোন বিশেষ জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্মবোধ কার্যকর নাও হতে পারে বরং জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্মের প্রভাবমুক্ত, সহজ-সরল, প্রেমানুভূতি সম্বলিত মন মানুষের মধ্যে এই সুন্দর ধর্মবোধ জাগাতে সক্ষম হতে পারে যা মানুষের মনকে সুন্দর মানবিক সম্পর্কের নীতিবোধে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সেই গভীর মানসিক নীতিবোধ বিশ্বপ্রেমের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে যুক্তিনির্ভর আবার যুক্তিহীনরূপেও প্রতিপন্ন হতে পারে যা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে মানবিকধর্মের সমর্থক হয়ে উঠে, ধর্মের বিশ্বায়নে বিশ্বভাতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

<u>**গ্রন্থপঞ্জি**</u>

অগ্নিহোত্রী, অনিতা, (২০০৩), ‘‘অকালবোধন’’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাঃলিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৫৭, ৫৮, ISBN : 81 - 7293 - 767 - 9

__________, (১৪১৫), ‘‘অববাহিকা’’, শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন, প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাঃলিঃ, কলকাতা, পৃঃ ২৫৬

আমেদ, আফসার, (ডিসেম্বর, ১৯৮৮), ‘‘বসবাস’’, বাকশিল্প, কলকাতা, পৃঃ ২১-২২

__________, (জানুয়ারী ২০০৪), ‘‘প্রেমপত্র’’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১২, ১৯,২০, ৫৭, ISBN : 81 - 295 - 0231 – 3

__________, (জানুয়ারী, ১৯৯৫), ‘‘বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা’’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১১, ১২, ৩৯, ৪৬, ৪৭, ৬৪ – ৬৬, ৮০, ৮৪, ৮৭, ISBN: 81 - 7079 - 644 - X

__________, (জানুয়ারী, ২০০৩), ‘‘মেটিয়াবুরুজে কিসসা’’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১১, ১২, ৪০, ৭১, ৭২, ১৫৪, ১৫৫, ১৬০, ১৬৩, ISBN: 81 - 295 - 0064 -7

__________, (জানুয়ারী, ১৯৯২), ‘‘খণ্ডবিখণ্ড’’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১৯,৭২, ৭৩, ISBN : 81 - 7079 - 080 - 8

__________, (জানুয়ারী, ১৯৯৭), ‘‘দ্বিতীয় বিবি’’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৮৭, ISBN: 81-7612-002-2

__________, (এপ্রিল, ১৯৮২), ‘‘ঘরগেরস্তি’’, স্বরলিপি, কলকাতা, পৃঃ ৩৪, ৬২, ৬৩, ৬৭, ৬৯, ৭০, ১২৩ - ১২৯

__________, (জানুয়ারী, ২০১৪), ‘‘একটি মেয়ে’’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১৩৮, ১৮৮, ১৮৯, ১৯৬, ISBN: 978 - 81 - 295 - 2130 - 9

__________, (জানুয়ারী ১৯৯০), ‘‘আত্ম পরিচয়’’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১১২, ১১৩

_________, (জানুয়ারী, ১৯৯৪), “সঙ্গ নিঃসঙ্গ”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১৭, ৭৬,৯৯, ISBN: 81 - 7079 - 478 - 1

_________, (জানুয়ারী, ১৯৯৩), “অন্তঃপুর”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ২৮, ২৯, ISBN: 81 -7079 - 284 - 3

আলি, একরাম, (ডিসেম্বর, ২০১৫), “দিগন্তের একটু আগে”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৯০-৯৫, ISBN: 978 – 81 – 295 – 2425 - 6

আলি, সৈয়দ মুজতবা, (১৩৮৬), “দেশে বিদেশে”, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১২২

_________, (প্রথম (বি) সংস্করণ আষাঢ় ১৩৭৭), “অবিশ্বাস্য”, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা - ৯, পৃঃ ১০২ - ১০৫, ১১০ - ১১৩

_________, (বৈশাখ ১৩৮১), “তুলনাহীনা”, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা - ৯, পৃঃ ১৪৩ - ২০৭

_________, (আগস্ট ১৯৬৯), “শহর-ইয়ার”, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা - ৯, পৃঃ ২৯ - ৩৯, ১০৭ , ১০৮, ১৩৭ - ১৪৯, ২০৩ - ২৪৮

_________, (মাঘ, ১৩৬৫), “জলে-ডাঙ্গায়”, বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৪৫

আজাদ, সালাম, (শ্রাবণ, ১৪১২), “অনুপ্রবেশ”, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পৃঃ ৬০-৬৭

ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, (এপ্রিল, ১৯৯৬), “খোয়াবনামা”, পার্থশঙ্কর বসু কর্তৃক নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃঃ ৯৯, ISBN: 81 - 8596 - 23 - 4

_________, (জানুয়ারী ২০১৫), “চিলেকোঠার সেপাই”, প্রতিভাস, কলকাতা, পৃঃ ৪১, ISBN: 978 - 93 - 84265 - 96 - 0

ইসলাম, নজরুল, (মে, ১৯৯৫), “আয়ান”, ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, পৃঃ ৫৪, ৬৪, ৬৫

_________, (নভেম্বর, ১৯৯৫), "সম্পর্ক, ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, পৃঃ ১৫, ISBN: 81-86581 – 06 – 5

_________, (মার্চ, ২০০৯), "বকুল", ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, পৃঃ ২৩৬, ISBN: 81- 86581-19 - 7

_________, (অক্টোবর ২০০২), "ভূমিপুত্র (১)", ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, পৃঃ ৩৬ – ৪০, ৬৬, ৬৭, ৭০ – ৭২, ISBN: 81- 86581 – 55 - 3

_________, (২০০৬), "ভূমিপুত্র (২)" ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, পৃঃ ১০৯, ১১০, ১৩১ – ১৩৩, ISBN: 81-86581-58-8

ওয়ালীউল্লাহ, সৈয়দ, (১৯৯৫), "চাঁদের অমাবস্যা", চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ১২, ISBN 81- 85696 – 20 - 9

_________, (১৯৯৫), "কাঁদো নদী কাঁদো", চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ১৭, ISBN: 81 - 85696 - 19 - 5

কালকূট, (১৩৯৮), "পৃথা", মন্ডল বুক হাউজ, কলকাতা, পৃঃ ১১, ১৭, ২৫, ৪৫

_________, (মার্চ, ১৯৮২), "চলো মন রূপনগরে", দে'জ পাবলিশিং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৬৭, ১৬৮

_________, (মাঘ, ১৩৮৯), "কোথায় সে-জন আছে", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৩৪, ৫৮, ৫৯, ৬২

_________, (মে, ১৯৮৮), "কোথায় পাব তারে", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃঃ ১৩৪ - ১৩৭.

_________, (আগষ্ট, ১৯৯৪), "জনক", সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, পৃঃ ২৬

_________, (সেপ্টেম্বর ১৯৭৭), "আরব সাগরের জল লোনা", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ২৬

কুদ্দুস, গোলাম, (শ্রাবণ, ১৩৮৮), "বাঁদী", নিউ মহামায়া প্রেস, কলিকাতা, পৃঃ ৪৩, ৪৫, ৯৬

খান, আবদুর শুকুর, (২০০১), "শিকড়ের ঘ্রাণ", করুণাময়ী, হাওড়া, পৃঃ ৫০, ৫১, ৫৫, ৫৬, ১১৭, ১১৮

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ন, (১৩৮৪), "মহানন্দা", পাত্র'জ পাবলিকেশন, কলিকাতা, পৃঃ ২, ৩, ১০৭

গঙ্গোপাধ্যায়, মানব, (১২ই মার্চ, ১৯৯৮), "ছেঁড়া পোস্টার", সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, পৃঃ ৪৯ - ৫০

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, (১৩৯৪), "পারুলেডাঙার লাল রাখাল", অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার, কলকাতা, পৃঃ ১৮, ২৩

__________, (১৪০৫), "কহেলগাঁও", শারদীয়া আজকাল, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৭২

__________, (জানুয়ারী, ১৯৯৯), "আলো নেই (১)", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৯৪, ৯৫, ISBN: 81 – 7612 - 440 - 4

__________, (এপ্রিল, ২০০২), "আলো নেই (দ্বিতীয় খণ্ড)", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৩১৮, ISBN: 81 – 7612 - 956 - 9

__________, (জানুয়ারি, ১৯৯০), "শাহাজাদা দারাশুকো (প্রথম খন্ড)", দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৯, ১০, ISBN: 81 - 7079 - 514 - 1

__________, (ডিসেম্বর ১৯৯১), "শাহাজাদা দারাশুকো (দ্বিতীয় খণ্ড)", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৬৭০, ৬৭১, ISBN: 81 – 7079 - 015 – 8

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (১৪০৭), "রানু ও ভানু", শারদীয় দেশ, এবিপি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৫৩৯, ৫৫৯

__________, (১৪০৪), "প্রবাসী পাখি", শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, এবিপি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩৭০

__________, (১৪০৮), "বিজনে নিজের সঙ্গে", শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, এবিপি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩৪৪, ৩৪৫

__________, (জানুয়ারী, ১৯৮৮), ‘‘জয়াপীড়’’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৮৭, ৮৮

__________, (১৩৯৫), ‘‘রূপালী মানবী’’, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ৫, ৬

__________, (সেপ্টেম্বর ১৯৮০), ‘‘নিজের চোখে দেখা’’, কসমো স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, পৃঃ ৩

__________, (জানুয়ারী ২০১২), ‘‘কমলিকা’’, অঞ্জলি প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ৮১ - ৮৩, ৮৬ - ৯০, ৯৪ - ৯৬, ১০১ - ১০৩, ISBN: 978 – 81- 922567 - 7-1

__________, (সেপ্টেম্বর, ২০০৬), ‘‘প্রথম আলো (দ্বিতীয় পর্ব)’’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৯১, ২৩৭ - ২৩৮, ২৭১ -২৭২, ৩০৩, ৩১০, ৩৩৮ - ৩৩৯, ৩৫১, ৩৫৪, ৩৮২, ৩৮৪ -৩৮৫, ISBN: 81 - 7215 - 546 - 4

__________, (১৪১১), ‘‘নিঃসঙ্গ সম্রাট’’, শারদীয় দেশ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৪৩৩

__________, (১৪১৩), ‘‘হে মহাজীবন’’, শারদীয় দেশ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৪০৬, ৪০৮

__________, (১৯৮৪), ‘‘শ্যামসাহেব’’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৯, ২০, ২৩

__________, (বৈশাখ, ১৩৯৯), ‘‘টান’’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৫৯, ISBN: 81 - 7215 - 070 - 9

__________, (১৩৮০), ‘‘অগ্নিপুত্র’’, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১৫ - ১৬

__________, (১৩৮৭), ‘‘শকুন্তলা’’, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, পৃঃ ৭৩, ৭৪

__________, (জানুয়ারী, ২০০০), ‘‘এর বাড়ি ওর বাড়ি’’, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৪৬

__________, (এপ্রিল, ২০১৪), ‘‘মনের মানুষ’’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ২৭, ৫০, ৫৬-৬১, ৭৭, ৭৮, ISBN: 978 - 81- 7756 - 781 - 6

গায়েন, পার্থসারথি, (৯ ডিসেম্বর, ২০১৩), "যাযাবর ও জারোয়া রমনী", প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ২৫, ২৬

গুপ্ত, নীহারঞ্জন, (কার্তিক, ১৪০৬), "অস্তি ভাগীরথী তীরে", মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পৃঃ ২৫, ISBN: 81 – 7293 - 585 - 4

গুপ্ত, শৌভিক, (২০০৯), "কানীনপুত্র কর্ণ", সৌদীপ, বালী, হাওড়া, পৃঃ ৭ - ৯২

গুহ, বুদ্ধদেব, (জানুয়ারী, ১৯৯২), "ঋভু", দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, পৃঃ ১০৭, ১০৯, ১১১, ISBN: 81 - 7079

__________, (জানুয়ারী ১৯৯৫), "ঋভু (দ্বিতীয় পর্ব)", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১০৭, ১০৯, ১১১, ISBN: 81 - 7079

__________, (জানুয়ারী, ২০০০), "ঋভু (তৃতীয় পর্ব)", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১৫১, ISBN: 81 - 7079 - 301 - 7

__________, (জানুয়ারী ২০০৪), "ঋভু (চতুর্থ পর্ব)", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৬২, ৬৪, ISBN: 81 - 295 - 0195 - 3

__________, (১৪১০), "অদ্ভুত লোক", শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন, প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩১, ৪২

__________, (১৪১১), "যমদুয়ারে", শারদীয় আজকাল, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৬০, ৬১

__________, (১৪০৭), "ঋজুদার সঙ্গে, রাজডেরোয়ায়", শারদীয় আজকাল, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৫০, ৬০, ৬৫

__________, (জানুয়ারী ২০০৯), "বাজে চন্দনপুরের কড়চা", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৫৩, ৫৪, ISBN: 978 - 81 - 2950900 - 0

__________, (জুলাই, ২০০৪), "পর্ণমোচী", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৭৯, ৮০, ISBN: 81 - 7612 - 737 - X

__________, (জানুয়ারী ১৯৯২), "সারেং মিঞা", মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩, ৪, ৩২, ৪৮, ৪৯, ৭৮, ৮০, ISBN: 81 - 7293 - 027 - 5

_________, (১৪১৩), "কুরুবকের দেশে", শারদীয় প্রতিদিন, প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃঃ ৩৫

_________, (জানুয়ারী ১৯৯৯), "সমুদ্রমেখলা", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৩৫, ৬৪, ISBN: 81 - 7612 - 355 - 2

_________, (২০০৩), "স্বপনে, নিভৃত স্বপনে", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৩৯, ১৬৯ - ১৭১, ১৭৪ - ১৭৭, ১৮০ - ১৮২

_________, (১৪২২), "স্পর্শস্বর", শারদসংখ্যা আজকাল, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ২২ - ২৫ ঘ

ঘোষ, খগেন, (আগস্ট ১৯৯৭), "পারিজাত", প্রকাশক নিরঞ্জন কুমার বোস, কলকাতা, পৃঃ ৫০, ৫৪

ঘোষ, গৌরকিশোর, (জুন, ২০১৬), "প্রেম নেই", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩৮, ২৪৭, ISBN: 978 - 81 - 7066 - 324 - 9

_________, (মে, ২০১৫), "প্রতিবেশী", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১১২, ১২২, ১২৪, ১৬৮, ১৬৯, ISBN: 81 - 7215 - 453 - 4

_________, (জুলাই, ২০১৫), "জল পড়ে পাতা নড়ে", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১২৮, ১২৯, ISBN: 978 - 81 -7756 - 933 -9

ঘোষ, সুবোধ, (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯), "তিলাঞ্জলি", প্রয়াস, কলকাতা, পৃঃ ১১৭

ঘোষ, নবেন্দু, (১৪১১), "আমি ও আমি", সৃষ্টির একুশ শতক, গীতা প্রিন্টার্স, কলকাতা, পৃঃ ১৩৩, ১৩৫, ১৩৯, ১৪০

ঘোষ, বাদল, (ডিসেম্বর ২০০৭), "উদাসের নৌকা", বর্ণালী, কলকাতা, পৃঃ ৫৪

ঘোষ, চঞ্চল কুমার, (জানুয়ারি, ২০০৫), "জগন্নাথ তোমাকে প্রণাম", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা পৃঃ ১২, ISBN: 81 - 7756 - 459 - 5

ঘোষ, সুধাংশুরঞ্জন, (সেপ্টেম্বর, ১৯৭২), "রক্তের মূল্যে মুক্তি", তুলি-কলম, কলকাতা,পৃঃ ১, ২

ঘোষ, সুজিত কুমার, (ডিসেম্বর ২০১৩), "ব্রজেশ্বরী", সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, পৃঃ ৮৭ - ৮৯, ১৫৩, ১৫৪, ISBN: 81 - 86386 - 12 - 2

ঘোষাল, ধনঞ্জয়, (নভেম্বর ১৯৯৪), "তোমার বসন্ত দিনে", রৈবতক, সোনারপুর, ২৪ পরগণা (দঃ), পৃঃ ৪৪, ISBN: 81 - 86388 - 03 - 6

ঘোষাল, নীলকণ্ঠ, (মে, ২০০৬), "ভূমিকন্যা", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ২০০, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ISBN: 81 - 7756 - 587 - 7

চক্রবর্তী, অমলেন্দু, (জুলাই, ১৯৮৯), "আকালের সন্ধানে", দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পৃঃ ১৬

চক্রবর্তী, ডাঃ কমলেন্দু, (জুন, ১৯৯৩), "স্তব্ধ হও নিঃশব্দ মৃত্যু", ভস্তক, কলকাতা, পৃঃ ১৩৫, ISBN: 81 - 85547 - 41 - 6

চক্রবর্তী, দেবাঞ্জন, (মাঘ, ১৪১৩), "কালদন্ড", মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ১৪৯-১৭৭, ISBN : 81 - 7293 - 929 -9

চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন, (ডিসেম্বর ১৯৮৪), "কতরূপ", ভোলানাথ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১০৭

চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, (১৪২৩), "একলা চলো রে", শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন, প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১২৬, ১২৭, ১২৮

__________, (সেপ্টেম্বর ২০০৮, vol ১ No. ৫), "পরবাসী", আমার সময়, বেনেট কোলম্যান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, কলকাতা, পৃঃ ১৩২, ১৬৮, ১৭২, ১৭৪, ১৮০

__________, (১৪২২), "দুনিয়াদারি", শারদীয়া সংবাদ প্রতিদিন, প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৮৮, ৯৬, ১০১, ১০৭

চক্রবর্তী, চিরঞ্জয়, (১৪০৬), "বোকা প্রপিতামহ কথা", পূর্বা, কলকাতা, পৃঃ ৩৫, ৩৬, ISBN: 81 - 7694 - 007 - 0

চক্রবর্তী, শ্রীসুবোধকুমার, (আশ্বিন ১৩৯২), "দেবযানী", এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৫৭, ৫৯, ৬০, ৭১, ৭৫ – ৭৭

চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯), “ইছরী গোয়াই”, গনমন প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ১২৩, ১২৫

চট্টোপাধ্যয়, অসীম, (এপ্রিল, ১৯৯১), “করুণা তোমায় কুন্তি”, মর্ডান কলাম, কলকাতা, পৃঃ ৯৯ - ১০০

চট্টোপাধ্যায়, দুলালেন্দু, (৬ই অক্টোবর, ১৯৮৩), “ওরা আজও উদ্বাস্তু”, শরৎ পাবলিশিং হাউজ, কলিকাতা, পৃঃ ১

চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ, (এপ্রিল, ২০০৬), “কথা”, প্রতিভাস, কলকাতা, পৃঃ ২৬, ২৭, ৪৩, ৪৭ - ৪৯, ১৩৩ - ১৩৭

চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ, (মে, ১৯৯৯), “গভীর গোপন”, মায়া প্রকাশনী, কোন্নগর, হুগলী, পৃঃ ১২১, ১২২

চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ, (১৪১২), “অমৃতং গময়”, শারদীয়া নবকল্লোল, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, পৃঃ ৩১৫, ৩১৬, ৩২০, ৩২১, ৩২৪, ৩২৬, ৩২৭

চট্টোপাধ্যায়, হরিনারায়ন, (৪ ডিসেম্বর, ২০০০), “নক্ষত্রের জাল”, প্রভাব প্রকাশনী, কলিকাতা, পৃঃ ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮ ISBN: 81 - 86964 - 26 - 6

চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, (ফেব্রুয়ারি, ২০১৫), “সাধের ময়না”, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ২৫ - ২৮, ৭২, ISBN: 81 - 7215 - 310 - 4

__________, (১৪১০), “তারা”, শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন, প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৭

__________, (পৌষ ১৪১০), “উজান বেয়ে যাই”, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃঃ ১৫ - ১৮, ৪১ - ৪৩, ৫০ - ৫৩, ৬৮, ISBN: 81 - 7293 - 820 - 9

__________, (২০০৮), “পায়ে পায়ে পথ চলা”, শারদীয়া বর্তমান, বর্তমান, কলকাতা, পৃঃ ১৯৪

__________, (ডিসেম্বর, ২০০৭), “কাঁধে কম্বল পায়ে চপ্পল”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১৬, ISBN: 81 - 295 - 0574 - 6

__________, (জুলাই, ২০০৩), “কালের কান্ডারী”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ২৩, ৫৮, ৫৯, ৯০ - ৯৬, ১১৮, ১১৯, ১২৪, ১২৫

__________, (১৪০৬), “মিত্তির বাড়ি”, শারদীয়া নবকল্লোল, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, পৃঃ ২৬৮, ২৭০

__________, (জানুয়ারী, ২০০৯), “কেবলই ছায়া (বারোটি উপন্যাস)”, পত্রভারতী, কলকাতা, পৃঃ ১৬৬, ১৬৭, ISBN: 978 - 81 - 8374 - 043 - 2

__________, (জানুয়ারী ২০০৯), “প্রতীক্ষা (বারোটি উপন্যাস)”, পত্রভারতী, কলকাতা, পৃঃ ২২৯, ২৩০, ISBN: 978 - 81 - 8374 - 043 - 2

__________, (২০০২), “হরপার্বতী সংবাদ, (আরো দশটি উপন্যাস)”, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১৪

__________, (২০০২), “আরো দশটি উপন্যাস, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩২

__________, (শ্রাবণ, ২০০৪), “আহাম্মক”, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১০৯, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ISBN: 81 - 7293 - 277 - 4

__________, (জানুয়ারী, ১৯৯৬), “একদা এক”, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার, কলকাতা, পৃঃ ৯২, ISBN: 81 - 86036 - 19 -9

__________, (জানুয়ারী ২০০৪), “ঝড়”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ২২, ২৪, ২৫, ৩৮, ৩৯, ৪৮, ISBN: 81 - 295 - 0210 - 0

__________, (মাঘ, ১৪০৪), “একা”, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃঃ ৩৭, ISBN: 81 – 7293 – 476 - 9

__________, (আগস্ট, ২০১৫), “ভৈরবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ”, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৬, ২৪, ২৭, ২৮, ৩৪ - ৩৬, ১৪২, ১৪৪, ISBN: 81-7215 - 901 - 3

__________, (কার্তিক, ১৪১২), “অশেষ”, শারদীয় নবকল্লোল, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, পৃঃ ৬৪, ৬৫

_________, (মাঘ ১৪০৫), “ফাস”, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃঃ ৫২, ৬৭, ১৬৫, ১৬৭, ISBN: 81 - 7293 - 550 - 1

_________, (১৪১১), “একটি মেয়ের আত্মকাহিনী”, শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন, প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩৮৭, ৩৯৩

_________, (১৪০৯), “চোখ”, শারদ সাহিত্য তথ্যকেন্দ্র, উত্তর পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃঃ ৩২,৩৩

_________, (জানুয়ারী ২০০৫), “অনলপ্রভ বিদ্যাসাগর”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৫৪, ৭০, ISBN: 81 - 295- 0342 - 5

_________, (জানুয়ারী, ২০০৩), “আরোহী”, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ২০ -২৬, ISBN: 81 - 295 - 0005 -1

_________, (১লা আগস্ট, ১৯৯১), “শয়নে স্বপনে”, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃঃ ৩১-৩৬

_________, (জানুয়ারী, ২০০০), “শ্রীরামকৃষ্ণের গিরিশচন্দ্র”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১৩-১৫, ISBN: 81 - 7612 - 555 - 5

চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন, (১৪০৫), “ভারতবর্ষ”, শারদীয় আজকাল, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৪২৪

চট্টোপাধ্যায় (গোস্বামী), নন্দিতা, (গ্রন্থমেলা ১৯৯৩-৯৪), “অনন্যা”, চতুর্মুখ প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ২৬

চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার, (নভেম্বর, ২০০৯), “স্পার্টাকাস (হাওয়ার্ড ফাস্ট)”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ২০৬, ২০৭, ISBN: 81 - 7079 -355 -6

চন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, (২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬), “জাত জমিন জেনানা”, শারদীয়া সংবাদ দর্পণ, পৃঃ ১৩৫

চন্দ্র, ডঃ দীপক, (১৮ই মে, ১৯৮১), “বিষন্ন শ্রীকৃষ্ণ”, সাহিত্য সংস্থা, কলিকাতা, পৃঃ ১২, ১৬, ২৯, ৩০, ৭১, ৭২, ১২৩ - ১২৯, ১৩২, ১৩৩

__________, (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮), "কৃষ্ণস্তু ভগবান", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ২৫, ২৬, ৬৭, ৬৮, ৭১, ৮৮, ৮৯

__________, (জানুয়ারি, ২০১১), "ঘটোৎকচের প্রার্থনা", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১৪৪, ১৪৫, ISBN: 978 - 81 - 295 - 1121 - 8

__________, (এপ্রিল, ১৯৮৮), "উর্বশী জননী", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৫৩, ৫৪, ৫৭

__________, (আগস্ট, ১৯৮৮), "এবং অশ্বত্থামা", নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৬৪-৬৮, ১৩৪-১৩৬

__________, (ডিসেম্বর ২০০৫), "বিভীষণ", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৬৩, ISBN: 81 - 295 - 0470 -7

__________, (ডিসেম্বর ২০০৫), "সুভদ্রা অনন্যা", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৩২, ৩৩, ISBN: 81 - 295 - 0495 - 2

__________, (১৫ এপ্রিল, ১৯৯১), "মহাভারতের শকুনি", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৮৩, ২২২

__________, (জানুয়ারি, ১৯৯৬), "অচেনা ভরত", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১২০, ISBN: 81 - 7079 - 829 -9

__________, (আগস্ট, ১৯৮৭), "গান্ধারী কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৭৭, ১৫০, ১৬৪

__________, (এপ্রিল, ১৯৯০), "রামের অজ্ঞাতবাস", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ২৯, ২৭৫

__________, (জানুয়ারি, ১৯৯৯), "কৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ২২, ৩৮, ৪৪, ৪৫, ৬৯, ISBN: 81 - 7612 - 368 - 4

__________, (১৯৮৫), "দ্রৌপদী চিরন্তনী", সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, পৃঃ ৮৪, ৮৫

__________, (জন্মাষ্টমী ১৯৮৫), "যদি রাধা না হতো", সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, পৃঃ ১০৭, ১০৮

__________, (জন্মাষ্টমী ১৩৮৭), "শ্রীকৃষ্ণ এলেন দ্বারকায় (দ্বিতীয় খন্ড)", সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, পৃঃ ৯৮, ১২৯

__________, (অক্টোবর, ১৯৮৯), "পিতামহ ভীষ্ম", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৩৯

__________, (মে, ১৯৮৫), "রাবণ বহে নিজ নাম", সঞ্জয় প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ১২৩

__________, (১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৪), "উপেক্ষিতা শূর্পনখা", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৪৩, ৬১, ISBN: 81 - 7079 - 593 - 1

__________, (জানুয়ারি, ১৯৯২), "কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন", নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১১৮, ১১৯

__________, (ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯), "তোমারই নাম কর্ণ", মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা, পৃঃ ১৩৭

__________, (১৩ই আগস্ট ১৯৯০), 'কাশ্যপেয়', নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩৩, ৩৪, ৩৬

__________, (১৯৮৩), মহাবিশ্বে মধুকৈটভ, সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, পৃঃ ১০

চাকী, জ্যোতিভূষণ, (২০১১), 'গদ্যে বাল্মিকী রামায়ণ', দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃঃ ৬

চৌধুরী, অভিজিত, (জানুয়ারি, ২০১৬), "ধর্মান্তর", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৭-৯, ২২, ২৩, ৪১, ৫৭, ৮২, ৮৩, ISBN: 978 -93 -5040 - 578- 9

__________, "আলোর পথিক", দে বুক স্টোর, কলকাতা, পৃঃ ৮, ১০, ১০০-১০৩

চৌধুরী, ঘনশ্যাম, (জানুয়ারি, ২০০০), "অবগাহন", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১৪, ১৫ ISBN: 81 - 7612 - 552 - 0

চৌধুরী, দানেশ আলম, (ডিসেম্বর, ১৯৯৫), "গ্রাস", উবুদশ, কলকাতা, পৃঃ ৬৯, ১০১, ১০২

চৌধুরী, রমাপদ (২০১৫), ‘‘লালবাঈ’’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৪৪,৪৫, ১৮৬, ISBN: 978 - 81- 7215 - 690 - 9

__________, (১৪০৪), ‘‘তিনকাল’’, শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৪১৭

জব্বার, আব্দুল, (ডিসেম্বর, ২০০৬), ‘‘মোহিনী’’, আধুনিক পুস্তক প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ৫৪

__________, (ডিসেম্বর, ২০০০), ‘‘রূপবতী রাত’’, অঙ্কুর পুস্তকালয়, কলকাতা, পৃঃ ১১৮-১২২, ১২৭, ১৩০-১৩২

__________, (জানুয়ারি, ১৯৯৮), ‘‘ভরাকোটাল’’, আধুনিক পুস্তক প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ৭, ১৯, ২০

__________, (জানুয়ারি, ১৯৯৬), ‘‘সবুজ নক্ষত্র’’, পাত্র’জ পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃঃ ৯৪-৯৫

__________, (জানুয়ারি, ১৯৯৬), ‘‘স্বপ্নের পরকলা’’, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ৫৩ - ৫৫, ৬৮, ৬৯

__________, (জানুয়ারি, ১৯৯৬), ‘‘আগুনের সাঁকো’’, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮১

জরাসন্ধ, (ভাদ্র, ১৩৮১), ‘‘চলতি মেঘের ছায়া’’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পৃঃ ৬

তাতান, সিস (৬ই ডিসেম্বর, ২০০১), ‘‘ত্রাস’’, উবুদশ, কলকাতা, পৃঃ ২৬, ২৭, ১৩১, ISBN: 81 - 87487 - 13

দত্ত, কালীপ্রসন্ন, (১৪০৯), ‘‘বিজয়’’, শারদীয় কলেজ স্ট্রীট, পৃঃ ১২৯

দত্ত, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ, (জানুয়ারি,২০১৯), ‘স্বামী বিবেকানন্দ’, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, পৃঃ ২০৫, ISBN 978-81-937720-4-1

দত্ত, হারাধন, (২৫ শে জানুয়ারি, ২০০০), ‘‘বাঙালের বিলেত যাত্রা’’, সেরা প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পৃঃ ১৫৭

দাস, অমরেন্দ্র, (৪ জুলাই, ১৯৬৫), ‘‘রমনাবাঈ’’, শ্রীগুরু পাবলিকেশন, কলিকাতা, পৃঃ ১৫

দাসগুপ্ত, ভাস্কর, (২০১৪), ‘‘শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাধন্য বিজয়কৃষ্ণ’’, এম. সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি:, কলকাতা, পৃঃ ৪০, ৪১, ISBN: 978 - 81 -7157 - 137 - 6

দে, অরবিন্দ (ডিসেম্বর, ১৯৮৬) ‘‘আমি স্বীকার করছি’’ খ্রাইস্টস্ ডিসাইপলস মিডিয়া, কলকাতা, পৃ: ১৭ - ১৯, ২২, ২৩, ৩১, ৪০, ৪৫ - ৪৭, ৫১

দেবসেন, নবনীতা, (আষাঢ়, ১৪০৫), ‘‘দেশান্তর’’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পৃঃ ৪, ৮, ISBN: 81 - 7293 - 505 - 6

__________, (আশ্বিন, ১৪০৬), ‘‘মায়া রয়ে গেল’’, শারদীয়া নবকল্লোল, দেব সাহিত কুটীর প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩০৪, ৩০৬, ৩০৯, ৩১০,

__________, (জানুয়ারি, ১৯৯৭), ‘‘বামা-বোধিনী’’, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩৭, ৩৮

দেবী, আশাপূর্ণা, (নভেম্বর, ১৯৯৫), ‘‘প্রেম ও প্রয়োজন’’, গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, পৃঃ ৫৩, ৬৩, ৮০, ISBN: 81 - 7332 - 116 - 0

__________, (জৈষ্ঠ্য, ১৩৭২), ‘‘সুখের চাবি’’, শ্রী গোপাল প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১৫

__________, (আষাঢ়, ১৪২২), ‘‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১২৬, ৩২৩, ISBN: 81 - 7293 - 206 - 5

দেব, হরিদাস, (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৯১), ‘‘জাগরণে যায় বিভাবরী’’, ডায়মন্ড (ইন্ডিয়া) কলিকাতা, পৃঃ ৭৪

দেবী, মহাশ্বেতা, (২০০২), ‘‘দশটি উপন্যাস ‘মনে মনে’’’, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১৯০

__________, (৯ই মে, ১৯৬৭), ‘‘কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্রির জীবন ও মৃত্যু’’, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ৫

__________, (আগস্ট ১৯৯৮), ‘‘আঁধারমানিক’’, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ২০

__________, (২৬শে মে, ১৯৮৩), “পলাতক”, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ৮৮, ৮৯, ১০২, ১২৯

__________, (মাঘ, ১৮৮৭ শকাব্দ), “অমৃত সঞ্চয়”, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৭৫, ২১৮ - ২২১, ২২৪ - ২২৭

দেবী, শ্রী, গিরিবালা, (১৫ই আগস্ট, ১৯৭৪), “রায়বাড়ী”, গ্রন্থবিকাশ, কলিকাতা, পৃঃ৭৫, ১৩৮

দেবী, মৈত্রেয়ী, (১৯৯০), “ন হন্যতে”, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলিকাতা, পৃঃ ৭৩ - ৭৫

দ্বৈপায়ন, (২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৮), “সম্রাজ্ঞীর শেষ দিন”, অক্ষর প্রকাশন, কলিকাতা, পৃঃ ৩৫

__________, (২২ শে নভেম্বর, ২০০১), “অগ্নিগর্ভ বরেন্দ্র”, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ৮, ১৪৩, ১৪৮, ১৬৩

__________, (জানুয়ারি ২০০৫), “বেগম উদিপুরী”, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ৭, ISBN: 81 - 8093 - 041- 6

নটরাজন, (আশ্বিন, ১৪০৪), “মোগল-বধূর দুর্গাপূজা”, শারদীয়া নবকল্লোল, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৪৫৬ - ৪৫৯

নাসরিন, তসলিমা, (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩) “লজ্জা”, পার্ল পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃঃ ৯, ১০, ১২, ১৯, ২১, ২৫, ২৬, ৩০, ৪০, ৭০

__________, (এপ্রিল, ২০০৬), “ফেরা”, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৫২, ৬৮, ISBN: 81-7215 - 280 - 9

পাল, শিবানন্দ, (ডিসেম্বর, ২০০৩), “পটভূমি মহিশূর”, আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ২৪, ৩৮, ৪৯, ISBN: 81 - 87665 - 65 - 3

পালিত, দিব্যেন্দু, (জানুয়ারী, ২০১৫), “প্রথম পাঁচটি উপন্যাস”, প্রতিভাস, কলকাতা, পৃ: ৯৯ - ১৫৮, ISBN: 978 - 93 - 84265 - 80 - 9.

পূততুন্ড, সায়ন্তনী, (জানুয়ারী, ২০১৬), “শিশমহল”, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ২৩, ২৪, ৩৩, ৪৪, ৪৫, ১৮৭, ISBN: 978 - 93 - 5040 - 594 - 9

__________, (১৪২৩), “একদিনের ঈশ্বর”, শারদীয়া পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, এবিপি প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ১৮৬, ১৮৭

ফিরদাউস, শাহাযাদ, (জানুয়ারি, ২০০০), “মৃত্যুর জন্ম ও মৃত্যু”, শিলীন্দ্র, কলকাতা, পৃঃ ১০

বসু, অসীমকুমার, (ডিসেম্বর, ১৯৯৫), ‘রাণীর অন্তর্ধান’, শিবরানী প্রকাশনী, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১৭-১২১

বসু, নবকুমার, (সেপ্টেম্বর, ২০১৪), “শ্রীময়ী মা”, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১০৪, ISBN: 978 - 81 - 7756 - 824 - 0

বসু, প্রতিভা, (জুলাই, ১৯৯৫), “সকালের সুর সায়াহ্নে”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৪৪, ৬৬, ৬৭, ISBN: 81 - 7079 - 893 - 9

__________, (নভেম্বর, ১৯৯২), “সমুদ্রহৃদয়”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৫২ - ৫৫, ৭৫, ৮২, ISBN: 81 - 7079 - 216 -9

__________, (১৫ই এপ্রিল ১৯৮৬), “গণ আদালত”, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃঃ ৪৫, ৫৭

বসু, বানী, (মার্চ, ২০১৬), “মৈত্রেয় জাতক”, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ২০৯, ২১০, ISBN: 81 - 7215 - 480 - 1

__________, (১৪২২), “কৃষ্ণ”, শারদীয়া সংবাদ প্রতিদিন, প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ২০৮ - ২১১, ২১৯, ২২০

__________, (জুন, ১৯৯৭), “একুশে পা”, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৪৭, ৪৮, ISBN: 81-7215 - 315 - 5

__________, (জানুয়ারি ১৯৯০), “পঞ্চম পুরুষ”, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১০৯, ১১০, ISBN: 81 - 7066 - 263 - X

__________, (২০১৬), ‘‘ক্ষত্তা’’, শারদীয়া বর্তমান, বর্তমান, কলকাতা, পৃঃ ২৪৬, ২৫৩

__________, (১৪২৩), ‘‘ক্ষত্রবধু’’, শারদীয়া সংবাদ প্রতিদিন, প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩১৯, ৩২৮, ৩২৯

বসু, রমাপতি, (১৯৯৪), ‘‘মতিমঞ্জিলের আমীরজান’’, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, পৃঃ ২৫

__________, (১৩৯৪), ‘মেম বোষ্টমী’, ত্রয়ী c/o সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা, পৃঃ ১১-১৩

বড়ুয়া, আনন্দময়, (৬ ই পৌষ, ১৪০১), ‘‘অন্বেষণ’’, অনামিকা পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃঃ ৬ - ৮, ১৮৯ - ১৯১

বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, (২০১১), ‘‘বাসযাত্রা’’, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১৮, ১৯, ISBN : 81 - 8437 - 088 - 1

__________, (২০০১), ‘‘জনগন (১ম পর্ব)’’, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ৬০, ১০০

__________, (ডিসেম্বর, ২০০৫), ‘‘জনগন (২য় পর্ব)’’,করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১০৮, ১০৯, ১৪৪

__________, (১লা বৈশাখ ১৩৮৯), ‘‘ঈশ্বরের বাগান (১ম খন্ড)’’, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ৩৫৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক,(১লা বৈশাখ, ১৩৯৯), ‘‘স্বাধীনতার স্বাদ’’, অঙ্কুর পুস্তকালয়, কলকাতা, পৃঃ ৭৩, ৭৪, ১৫৪, ১৫৬

বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, (আশ্বিন, ১৩৭১), ‘‘সপ্তপদী’’, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পৃঃ ৫৪ - ৫৬, ৭৬ - ৮৮

__________, (১৩৭৪), ‘‘রাধা’’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা,

__________, (১৩৭৪), ‘‘শঙ্করবাঈ’’, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, পৃঃ ১৩৪

__________, (চতুর্থ মুদ্রণ), ‘‘ইমারত’’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৃঃ ১৮, ১৯, ২৯

__________, (১লা বৈশাখ, ১৩৭৮), ‘‘ফরিয়াদ’’, বুক হাউস, কলকাতা, পৃঃ ৩৩, ৫৩, ৫৪

__________, (২৪ শে জুলাই, ১৯৮৬), ‘‘মনি বউদি’’, বাক সাহিত্য, কলকাতা, পৃঃ ২, ৩

__________, (বৈশাখ, ১৩৭৮), ‘‘কালবৈশাখী’’, প্রাইমা পাবলিকেশন্স, কলকাতা, পৃঃ ২৭, ২৯, ৩০

__________, (আগস্ট, ১৯৭৬), ‘‘পদচিহ্ন’’, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৬০ - ১৮৩, ২০৮

__________, (ঝুলন পূর্ণিমা ১৩৭৫), ‘‘পাষানপুরী’’, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ২৯

__________, (দোল পূর্ণিমা ১৩৭৬), ‘‘রাই-কমল’’, কল্লোল পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৩৯

__________, (অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৯৭), ‘‘বৈষ্ণবের আখড়া, সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ১৩৮

__________, (জৈষ্ঠ্য, ১৩৯৫), ‘‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’’, গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা, পৃঃ ১৩২, ১৩৩

__________, (১৩৭২), ‘‘গন্না বেগম’’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৃঃ ৩১, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৬৯

__________, (ডিসেম্বর ১৯৬৮), ‘‘মহানগরী’’, তুলি-কলম, কলকাতা, পৃঃ ৭৭

__________, (২০০১), ‘‘বিপাশা’’, জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃঃ ৫১, ৬৯, ৮৯

__________, (বৈশাখ, ১৩৬৯), ‘‘কান্না’’, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, পৃঃ ৮ - ১২, ৩৭

__________, (১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৩), ‘‘তারাশঙ্করবীথিকা’’, অনির্বাণ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১৭, ১৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, (২০১২), "আরণ্যক", পাঞ্চজন্য, কলকাতা, পৃঃ ১০৫, ১০৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন, (১৪১৫), "রামানুজ গণিত ও নিয়তি", শারদীয়া সংবাদ প্রতিদিন, প্রতিদিন প্রকাশনী প্রা: লি:, কলকাতা, পৃঃ ৯১, ৯২, ৯৫, ৯৬, ১১২

_________, (ফেব্রুয়ারী, ২০১৭), "প্রাণসখা বিবেকানন্দ", পত্রভারতী, কলকাতা, পৃঃ ৩৫-৩৭, ৬৬, ৬৭, ৮৫, ৮৬, ১১৮, ১১৯, ১৩২, ১৫৫, ১৫৬, ২৩১, ২৩২, ISBN: 978 - 81 - 8374 - 268 - 9

_________, (জানুয়ারি, ২০১৬), "প্রাণসখা বিবেকানন্দ (দ্বিতীয় খন্ড)", পত্রভারতী, কলকাতা, পৃঃ ১৩, ৩১, ৩২, ৬৩ - ৬৮, ১০৩, ১০৪, ১১৮, ১২৫, ১৩৩ - ১৩৫, ১৮২ - ১৮৭, ISBN: 978 - 81 - 8374 - 350 - 1

_________, (ডিসেম্বর, ২০১৫), "প্রাণসখা বিবেকানন্দ (তৃতীয় খন্ড), পত্রভারতী, কলকাতা, পৃঃ ৮৭, ৮৮, ১২০, ১২২, ISBN: 978 - 81 - 8374 -372- 3

_________, (১৪২৩), "গিরিশ ও বিনোদনী", শারদীয়া সংবাদ প্রতিদিন, প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩৬২, ৩৬৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, (চৈত্র, ১৪২১), "শরদিন্দু অমনিবাস (তৃতীয় খণ্ড)", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৪৩, ২৭৪, ISBN: 81 - 7215 - 759 - 2

বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ (নভেম্বর, ১৯৯৪), "পশ্চিম আকাশ যখন লাল", অমৃতধারা, কলকাতা, পৃঃ ১১৭

বন্দোপাধ্যায়, শান্তিপ্রিয়, (১৪১২), "প্রহর গোনার পালা", শারদীয়া নবকল্লোল, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, পৃঃ ২৬১, ২৬৫ - ২৬৯

_________, (১৪০৯), "হিয়ার মাঝে", শারদীয়া নবকল্লোল, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, পৃঃ ২৫৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষ, (১৪২২), "শার্দুলসুন্দরী", শারদীয় দেশ, এবিপি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ২৯৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী রমেশ চন্দ্র, (২০১৮), 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান', খড়ি প্রকাশনী, পৃঃ ১৩৬, ISBN : 978-81-934351-3-7

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলকুমার, (১৯৭০), "বাঙালিনী", রুবী প্রকাশনী, কলিকাতা, পৃঃ ১, ৩, ১৬, ৮৬ - ৮৯

_________, (চতুর্থ মুদ্রণ ১৩৭৮), "পুতুল নিয়ে খেলা", রুবী প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ৪, ১৬৬ - ১৬৮

_________, (১৩৭৮), "জীবন নিয়ে খেলা", রুবী প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ৯ - ২১

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুস্মিতা, (জানুয়ারি, ২০০১), "এক বর্ণও মিথ্যা নয়", ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, পৃঃ ৪৩,৫৪, ৫৫, ৮৬, ১২৩-১২৮, ISBN: 81 - 86581 - 54- 5

বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতা, (১৪১৩), "প্যান্টি", শারদীয়া দেশ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৯৮, ১৯৯

বসু, অসীমকুমার, (ডিসেম্বর, ১৯৯৫), "রাণীর অন্তর্ধান", শিবরানী প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১৯, ২০, ১১৯-১২১

বাশার, আবুল, (১৪২৩) "নতুন মনসামঙ্গল", শারদীয়া সংবাদ প্রতিদিন, প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাঃলিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৮, ৯৭, ৯৮

_________, (১৪০৩), "রাজাবলি", শারদীয় দেশ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ২১৮

_________, (ডিসেম্বর, ২০০১), "সিমার", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৪, ISBN: 81 - 7066 - 130 - 7

_________, (নভেম্বর ১৯৯৫), "স্পর্শের বাইরে", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৪০, ৪১, ৪৩, ৯০, ISBN: 81 - 7215 - 432 -1

_________, (১৯৯৩), "অগ্নিবলাকা", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৪৬, ১৮৬, ISBN: 81 - 7215 - 215 - 9.

_________, (জানুয়ারি ১৯৮৯), "সঙ্গদাবাঈ", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৪০, ৪১, ৫২

_________, (১৪২০), "বকুলের হাসি বকুল মুসকান" শারদীয় আজকাল, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,কলকাতা, পৃঃ ২০০, ২০৪

_________, (১৪১৫), "আমি লালন কবীর", শারদীয় আজকাল, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৮৩

_________, (জানুয়ারি ১৯৯৪), "আকাশলীনা", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৯ - ২১, ৭০ - ৭২, ৯১, ISBN: 81-7215 - 327 -9

_________, (জানুয়ারি ১৯৯২), "ধর্মের গ্রহণ", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৬১, ১১৯, ১২০, ১২১, ISBN: 81 - 7215 - 068 - 7

_________, (জানুয়ারি, ২০১৫), "ঋষি ও খুকুর উপাখ্যান ও অন্যান্য", অভিযান পাবলিশার্স, বারাসত, কলকাতা, পৃঃ ৯ - ৮৩, ISBN: 978 - 93 - 80197 - 57 -7

_________, (জুলাই ১৯৯৭), "ফুলবউ", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ২৮-৩৫, ISBN: 81 - 7066 - 301 - 6

বিশ্বাস, সুধীর কুমার, (নভেম্বর, ২০১১), " ছোট্ট একটি আশা", জে.এন. চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, পৃঃ ৬৭, ১১১, ১১৮, ১১৯ ISBN: 978- 93- 80411-07-1

বেদুইন, (আষাঢ়, ১৩৯৩), "তৃতীয় পক্ষ বনাম চতুর্থ পক্ষ", অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ৪০ - ৪১

_________, (বইমেলা ১৯৯৮), "মির্জা গালিব", অভিজাত প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ২২, ২৩, ৪৮, ৫১

বেরা, নলিনী, (জানুয়ারি, ২০১৩), "অমৃত কলস যাত্রা", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৪৬ - ৪৮, ১৩৯, ISBN: 978 - 81 - 295 - 1795 - 3

বেরা, শ্রীশম্ভুনাথ, (বইমেলা ১৯৯৮), "রাঙামাটির ময়না", গৌরী প্রকাশনী, কলিকাতা, পৃঃ ২, ৯, ৬৪, ৬৯, ৮৬

বিশী, প্রমথনাথ, (বৈশাখ, ১৪১৯), "কেরী সাহেবের মুন্সী" মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা পৃঃ ২১ - ২৩, ISBN: 81 - 7293 - 013 - 5

ব্রহ্মচারী, তারাপ্রণব, (জানুয়ারী, ২০০২), ‘‘অনঙ্গা’’ দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১০৪ -১০৫, ISBN: 81 - 7612 - 863-5

__________, (জানুয়ারি, ২০০৩), ‘‘শুনি কার বাণী’’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৭৮, ISBN: 81 - 295 - 0075 - 2

__________, (জানুয়ারি, ২০০৫), ‘‘আশমানজমিন’’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৫১, ISBN: 81 -295-0385 -9

__________, (জানুয়ারি, ১৯৯৯), ‘‘অনজান’’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৩২, ISBN : 81 - 7612 - 383 - 8

ব্রহ্ম, সন্তোষ কুমার, (২০১১), ‘‘বাবুঘাটের খেয়া’’, দেশ প্রকাশন কলকাতা, পৃঃ ২০, ২১

ভট্টাচার্য, চিত্ত, (১৯৭৩), ‘‘কামমোহিতম’’, বি, ঘোষ, বারাকপুর, ২৪ পরগনা পৃঃ ৬৪

ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্রনাথ, (জুন ২০১৫), ‘ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃঃ ১১ - ১৫, ৩৮, ৪৫, ১৩১, ISBN 81-7215-550-6

ভট্টাচার্য, নিমাই, (সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭), ‘‘আকাশ-ভরা-সূর্য-তারা’’, দে’জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পৃঃ ৫৭, ৫৯, ISBN: 81 - 7612 - 128 - 2

__________, (১৯৯৫), ‘‘রুদ্রাণী’’, সাহিত্যম, কলকাতা, পৃঃ ১৬ - ২০, ISBN: 81 - 7267 - 034 - 6

__________, (জানুয়ারি, ১৯৮৯), ‘‘ভবঘুরে’’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৩৫, ৮৪, ৮৫, ৯৭, ৯৮, ১১৯, ১২০, ১৩৭, ১৩৮

ভট্টাচার্য, নীতিশ, (আগস্ট, ১৯৮৯), ‘‘যম যমুনা’’, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, পৃঃ ৫১, ৯৯

ভট্টাচার্য, পরেশ, (জানুয়ারি, ২০০৮), ‘‘রামী চন্ডীদাস’’, মর্ডান কলাম, কলকাতা, পৃঃ ১৭, ২০, ২১, ২৮, ২৯, ৩৫-৩৮, ৫৮, ৭৮

ভট্টাচার্য, পাপড়ি, (২০১০), ‘‘কদম কিশোরী’’, সূচীপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ৩৭

ভট্টাচার্য, মলয়শঙ্কর, (সেপ্টেম্বর, ২০১১), "অন্তপ্রহর", বাংলার মুখ প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ৪১, ১৯৩, ২০৫, ২০৬, ISBN: 978 - 81 - 921186 - 4 - 2

ভট্টাচার্য, শঙ্করলাল, (১৯৯৯), "প্রথম পুরুষ", মডেল পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা, পৃঃ ২৮, ৯৭, ৯৮, ১০৫, ISBN: 81 - 7616 - 034 - 2

ভাদুড়ী, শিবনাথ, (২রা নভেম্বর, ১৯৮৫), "জীবন এক সমুদ্রমন্থন", জে.এন. চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলিকাতা, পৃঃ ৩০, ৩১

ভট্টাচার্য, সুবীর, (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৬), "বিষ অমৃত কুম্ভে", সৃষ্টির দ্বিমাসিক একুশশতক, অরুণ কুন্ডু, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা, পৃঃ ২৯৮,৩০৩,৩১১

ভট্টাচার্য, সুহাস, (১লা জানুয়ারী, ২০০২), "পরবাসে-সহবাসে, (দ্বিতীয়-সংস্করণ)", সহজ কথা ও সমাচার, নসীবপুর, হুগলী, পৃঃ ১৫, ১৬

ভট্টাচার্য, সুচিত্রা (১৪১৩), "আয়নামহল", শারদীয় দেশ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৯৫

__________, (জানুয়ারি ১৯৯৯), "পরবাস", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৬, ১৭, ৬২, ৮৬, ৮৭, ISBN: 81 - 7215 - 907 - 2

ভৌমিক, শ্রীজিতেন্দ্রমোহন, (দোল পূর্ণিমা ১৩৭২), "তন্ত্রকন্যা", তপতী পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃঃ ১৭ - ১৯, ৪৩, ৪৪, ৬৩, ৭০, ৭১, ৯১, ৯২, ৯৮

__________, (১৩৮৭), "তন্ত্রকন্যা", তাপসী পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃঃ ৫, ৬, ৫১, ১৮৩

মজুমদার, অমিয়ভূষণ, (ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮), "নয়নতারা", অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১০১, ১২৮, ১২৯

মজুমদার, কমলকুমার, (১৩৯৫), "অন্তর্জলী যাত্রা", শ্রী ইন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, পৃঃ ৪২ - ৫০

মজুমদার, তিলোত্তমা, (ডিসেম্বর ২০১৪), "ঈশ্বরের বাসা", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৫৭, ৫৮, ISBN: 978 - 93 - 5040 - 450 -1

_________, (এপ্রিল, ২০০৪), "প্রহাণ", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১০২ - ১০৪, ISBN: 81 - 7756 - 422 - 6

মজুমদার, সমরেশ, (জানুয়ারি, ২০০৭), "জীবনটাকে চেখে দেখুন", পত্রভারতী, কলকাতা, পৃঃ ১৯, ২০, ২৩, ISBN: 81 - 8374 - 026 -X

_________, (জুন, ২০০৭), "কালপুরুষ", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩৮৫, ৩৮৬, ISBN: 81 - 7066 - 481 - 0

_________, (সেপ্টেম্বর, ১৯৯১), "কালাপাহাড়", মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা, পৃঃ ১৭- ১৯

_________, (১৯৮৬), "শরণাগত", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৬, ৩৩, ৩৪, ৬৩, ৬৪

_________, (১৪১০), "উৎসারিত আলো", শারদীয় দেশ. আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৮৩

_________,, (বইমেলা ২০০১), "আকাশকুসুম", উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃঃ ৫৫ - ৫৯

_________, (ফাল্গুন, ১৪০৬), "মেয়েরা যেমন হয়", মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩৭, ৪১, ISBN: 81 - 7293 - 538 - 2

_________, (১৪০৮), "এত রক্ত কেন", শারদীয়া দেশ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ২২০

_________, (১৪২৩), "যার যেমন জীবন", শারদীয়া আনন্দবাজার, আনন্দবাজার পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৫৯

_________, (ডিসেম্বর ১৯৯০), "জীবন যাপন", সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, পৃঃ ৫৯

মন্ডল, গোপীকৃষ্ণ, (আগস্ট, ২০০৩), "চোখে দেখা", ভোলানাথ প্রকাশনী, কলিকাতা, পৃঃ ১৬, ১২১ - ১২৩, ১৫৩, ১৭২

মাইতি, চিত্তরঞ্জন, (আশ্বিন ১৪০৬), "সোনিয়া আগ্নিহোত্রী", শারদীয়া নবকল্লোল, দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, পৃঃ ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭

__________, (আশ্বিন, ১৪০৯), "ভগ্নভাস্কর্য", শারদীয়া নবকল্লোল, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, পৃঃ ১০৮, ১১১, ১১২

মাইতি, মৃত্যুঞ্জয়, (নভেম্বর, ১৯৯৮), "যখন বৃষ্টি নামল", আনন্দ প্রকাশন, কলিকাতা, পৃঃ ১০৩, ১০৪

মন্ডল, সজল, (জানুয়ারি ২০০৭), "চর শীলাবতীর সেরেঙ্গ", মান্না পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃঃ ২৪, ১৯৯, ISBN: 81 - 87648 - 42 - 2

মুখোপাধ্যায়, অমরজ্যোতি, (১৯৯৯), "শ্রীকৃষ্ণের শেষ প্রহর", বিজয়ন প্রকাশনী, কলিকাতা, পৃঃ ৩৫, ৪৫, ৪৬, ৬৫, ৬৬, ১২০, ১৫৭

__________, (অক্টোবর ২০১১), "মহাপ্রস্থানে যুধিষ্ঠির", মান্না পাবলিকেশন, কলকাতা,পৃঃ ২১, ২২, ৪৭, ৪৮, ৬২, ISBN: 81 - 87648 - 68

মুখোপাধ্যায়, ফাল্গুনী, (নভেম্বর, ২০১৩), "জ্যোতির্গময় ও সুনয়নী", কিশোর প্রকাশন, কলিকাতা, পৃঃ ৫, ৭০, ৭১, ১৬৩ - ১৬৬

__________, (জানুয়ারি, ২০১২), "মধুযামিনী", আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ১২৮, ISBN: 81 - 86966 - 18 - 8

মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ, (১৪০৪), "কারোয়ার পানি", বর্তমান একাদশ শারদ সংখ্যা, বর্তমান কলিকাতা, পৃঃ ৩৭৫, ৩৭৭, ৪০৫, ৪১২, ৪৩১, ৪৩২

__________, (১৪০৮), "বহ্নিশিখা রূপমতী", বর্তমান শারদ সংখ্যা, বর্তমান কলকাতা, পৃঃ ৩৬২

__________, (১৪০১), "শাহজাদার নাম ভূমিকায়", বর্তমান অষ্টম শারদ সংখ্যা, বর্তমান কলকাতা, পৃঃ ৪৪০

__________, (১৪০৩), "গোধুলি বেলায়", মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৭৯, ISBN: 81 - 7293 - 393 - 2

মুখোপাধ্যায়, রাসমোহন, (২০০৯), "পিরালী", সহযাত্রী, কলিকাতা, পৃঃ ১৩, ১৬, ১৮, ২৪ - ২৭, , ৮০, ৮১, ১৫৬, ১৫৯, ২৮৮, ২৮৯, ২৯৯, ৩৩০

মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমার, (অগ্রাহায়ণ ১৪১২), "গাছ একটি চরিত্র", মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পৃঃ ৭২, ৭৩, ISBN: 81 - 7293 - 886 -1

মুখোপাধ্যায়, সর্বানী, (১৪০৬), "হে নিরূপমা", শারদীয়া নবকল্লোল, দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, পৃঃ ৪৬৮, ৪৬৯

মুখোপাধ্যায়, সৌরভ, (২০১৭), "প্রথম প্রাবহ", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১০৭, ১২১, ১২২ ISBN: 978 - 93 - 5040 - 745 - 50

মিত্র, অমর, (২০০১), "ধুলোগ্রাম", করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭

মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, (মাঘ, ১৩৯০), "কান্তাপ্রেম", মিত্রও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১২৮, ১২৯, ১৩৬, ১৩৯

__________, (আষাঢ়, ১৩৮৬), "পাঞ্চজন্য (দ্বিতীয় পর্ব)", মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৪০, ৪৯, ৯৩, ৯৪

__________, (১লা বৈশাখ, ১৩৭৮), "তবু মনে রেখো", মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৃঃ ১২০, ১২১

__________, (ভাদ্র, ১৪১৫), "রাত্রির তপস্যা", মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১১৩

__________, (চৈত্র, ১৪০৬), "পৌষ ফাগুনের পালা", মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ২, ISBN: 81 - 7293 - 007 - 0

মিত্র, দীনবন্ধু (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪), "নীলদর্পন", আদিত্য প্রকাশালয়, কলকাতা, পৃঃ ৫১, ৫৬

মিত্র, জয়া, (জানুয়ারি, ২০১০), "সোনার বরনী", পুষ্প, কলকাতা, পৃঃ ৪৪, ৪৫

মিত্র, শৈবাল, (১৪০৬), "ধর্মযুদ্ধ", শারদীয় আজকাল, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা,পৃঃ ২৯৯, ৩০৭

মিশ্র ভগীরথ, (জানুয়ারি, ১৯৯৫), "জানগুরু", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৮৭-৮৯, ISBN : 18 - 7079

__________, (১৪১২), "স্বয়ং সিদ্ধা", শারদীয়া তথ্যকেন্দ্র, উত্তর পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ২২১

__________, (১৪১৩), "ডালিমতলা", শারদীয়া তথ্যকেন্দ্র, বিশাল বুক সেন্টার, কলকাতা, পৃঃ ১৯৭, ২১০

__________, (১৪১১), "জন্মান্তর", সৃষ্টির একুশশতক, গীতা প্রিন্টার্স, কলকাতা, পৃঃ ৮৪, ৮৫

মৈনাক, (শ্রাবণ, ১৩৭৪), "সুবর্ণরেখার তীরে", মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৃঃ ১০৬-১০৮

মৈত্রেয়, বোধিসত্ব, (বৈশাখ, ১৩৯০), "ঝিনুকের পেটে মুক্তো", অভিব্যক্তি, কলকাতা,পৃঃ ৫৪,৫৫

__________, (মাঘ, ১৩৯৮), "মান্ধাতার মুখ", অভিব্যক্তি, কলকাতা, পৃঃ ৩১, ১৫৯-১৬১

মৌর্য, চন্দ্রগুপ্ত, (ফাল্গুণ, ১৩৭৪), "ইষ্ট বাক্‌ল্যান্ড রোড", মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৃঃ২১১, ২১৩

__________, (১৯৮৩), "কালিন্দ্রী", ত্রয়ী, কলকাতা, পৃঃ ১০২, ১০৪

যাযাবর, (মাঘ ১৩৮৯) "দৃষ্টিপাত", যাযাবর অমনিবাস, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা পৃঃ ৩২,৩৩, ৪৯, ৫০

রামসুখদাস, স্বামী, (১৩০৯), 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা', গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, পৃঃ ix, ISBN 81-293-0053-2

রায়, অসীম, "দেশদ্রোহী", সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, পৃঃ ২, ৩

রায়চৌধুরী, ভবানী, (জানুয়ারি, ২০০৬), "নাম তার প্রজাপতি", মান্না পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃঃ ১৫, ১৯৩, ১৯৪, ISBN: 81 - 87648 - 33 - 3

রায়, কল্পনা, (এপ্রিল, ২০১২), "সেই সময় পেরিয়ে", প্রয়াগ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১৪, ১৫, ৩০, ISBN: 81 - 89820 - 42 - 8

রায়, কিন্নর, (অক্টোবর, ২০০৫), "তুষিত স্বর্গের আলো", দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পৃঃ ১২, ১৩, ১৪, ৬০, ৬৩, ৬৬ - ৬৮

_________, (অগ্রহায়ণ, ১৪১০), "ক্রুশবন্দি", মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃঃ ৪৪, ৮৭, ISBN: 81 - 7293 – 804 - 7

_________, (জানুয়ারি, ২০০৪), "পদ্মবীজের মালা", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১৮, ১৯, ISBN: 81 - 295 - 0203 - 8

রায়, গৌতম, (নভেম্বর, ২০০৭), "বিষকন্ঠী সুলোচনা", নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৭, ৮, ১৮, ISBN: 81 - 8093 - 097 - 1

_________, (জুলাই, ২০০২), "জ্বলন্ত আগুন", চিরঞ্জীব প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ৫৬

রায়, তাপস, (জানুয়ারি, ২০১৬), "পোড়ামাটির দেউল", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩০, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ISBN: 978 - 93 - 5040 - 592 - 5

রায়, দেবেশ, (১৪২০), "স্বপ্নপুরুষের খোঁজে জুলেখা", শারদীয় আজকাল, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৪১

_________, (১৪১৫), "বরিশালের যোগেন মন্ডল", শারদীয় আজকাল, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৪৬

_________, (১৪১১), "আঙিনা", শারদীয়া আজকাল, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৩৭

রায়, প্রফুল্ল (১৯৯২), "দায়-দায়িত্ব", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১২১, ১২২, ISBN: 81 - 7079 - 158 - 8

_________, (জুন, ১৯৮৬), "ধর্মান্তর", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৬৪ - ৭০, ১১৩, ১১৪

_________, (আষাঢ়, ১৩৮৫), "করুণাধারায় এসো", নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

_________, (জানুয়ারি, ২০১২), "বয়ে যায়", করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১০০, ১১৭, ১১৮, ISBN: 81 - 8437 - 085 - 7

_________, (এপ্রিল, ২০০১), "ভাগাভাগি", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ২৯, ৩১, ISBN: 81 - 7612 - 797 - 3

_________, (১৪০৮), "কেয়াপাতার নৌকা (তৃতীয় পর্ব)", বর্তমান শারদ সংখ্যা, বর্তমান কলকাতা, পৃঃ ৩০৭, ৩০৮

_________, (ডিসেম্বর, ২০১৪), "পায়ের ছাপ ফেলতে ফেলতে মানুষের যুদ্ধ", পত্রভারতী, কলকাতা, পৃঃ ৮৪, ৮৫, ISBN: 978-81-8374-324 - 2

রায়, প্রতিভা, (অনুবাদ-ভারতী নন্দী), "শিলাপদ্ম", নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, পৃঃ ১২, ৩৫, ৬২, ১২৪, ১২৭

_________, (ডিসেম্বর ২০০৭), "যাজ্ঞসেনী", প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১২, ১৩, ২৮, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৫

_________, (ডিসেম্বর, ২০০৮), "উত্তরমার্গ", প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ৭, ৮, ৯, ১৯৭ - ১৯৯, ২১৩

রায়, রমানাথ, (১৪১২), "দেশপ্রেমিক", শারদীয়া তথ্যকেন্দ্র, উত্তর পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৮৯ - ৯১

রায়, শচীন, (ডিসেম্বর, ২০০৭), "মা" মান্না পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃঃ ৩৭-৫২, ISBN: 81 - 87648 - 46 - 5

রাজগুরু, শক্তিপদ, (নভেম্বর, ২০১৩), "জনম অবধি", কিশোর প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ১১, ১২, ৩১

_________, (২০০০), "রূপান্তর", এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, পৃঃ ১১১, ISBN: 81- 87657 – 05 - 7

লাহা, জগৎ, (১৯৮৪), "দ্বৈপায়নে দুর্যোধন", কল্পনা বুক হাউজ, কলকাতা, পৃঃ ২১, ৩৬, ৩৭, ৮৮

শংকর, (১৪০৭), ‘‘অবসরিকা’’, শারদীয়া আনন্দবাজার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩৩০

শ্রীপারাবত, (ফেব্রুয়ারি ১৯৯০), ‘‘মুর্শিদকুলী খাঁ’’ দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১৬, ১৯

__________, (অক্টোবর, ১৯৯৪), ‘‘মমতাজ-দুহিতা জাহানারা’’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১৩৫, ১৬৬ - ১৭৩, ISBN: 81 - 7079 - 276 - 2

__________, (আষাঢ় ১৩৭৮), ‘‘বাহাদুর শাহ’’, আনন্দধারা প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ৬০, ৬১, ১২৯, ১৩২, ১৪৩, ১৮৪ - ১৮৬

__________, (মে, ১৯৯০), ‘‘মগধ যুগে যুগে’’, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, পৃঃ ১৪৪, ১৫১ - ১৫৩

__________, (ডিসেম্বর ২০০২), ‘‘আলাউদ্দীন খিলজী’’, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, পৃঃ ৭৯, ১১৫, ISBN: 81 - 86036 - 71 - 7

__________, (জানুয়ারি ২০০৭), ‘‘বিজয়নগর’’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১০, ১৩৪, ISBN: 81-295- 0766 - 8

শ্রীধরন, (জুলাই, ২০০৬) ‘‘চালান চক্র’’ একুশশতক, কলকাতা, পৃঃ ১২-১৩

সরস্বতী, প্রভাবতী দেবী (নভেম্বর, ২০১৩), ‘‘দানের মর্যাদা, কিশোর প্রকাশন, কলকাতা, পৃঃ ৫৪, ৯৯

সারগী, দেবর্ষি, (১৪১১), ‘‘ভ্রমণসঙ্গী ঈশ্বর’’, শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন, প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ২১৩ - ২৩৬

সাহা, অরুণোদয়, (জুন, ২০১৬), ‘‘নিদ নাহি আঁখিপাতে’’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৬২, ISBN: 978 - 93 - 5040 - 403 - 4

সাহা, ইন্দু, (ডিসেম্বর, ২০১১), ‘‘গোপনপুরের উপকথা’’, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১২, ২০৩, ২০৪, ISBN: 81 - 88186 - 01 - 5

__________, (জানুয়ারি ২০০৩), ‘‘লম্পট’’, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, পৃঃ ২৯৬-২৯৮, ISBN: 81 - 87657 - 39 - 1

সিদ্দিকি, জাহান আরা, (জানুয়ারি, ২০১০), “সবুজ অরণ্যে জ্বলে হায়েনার চোখ”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৯৮ – ৯৯, ISBN: 978-81-295-1000- 6

সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, (১৯৯৬), “স্বর্ণচাপার উপাখ্যান”, দে’জ পাবলিশিং,কলকাতা,পৃঃ ১৬, ৪৪, ৪৫, ১৩৮, ১৩৯, ১৯০, ISBN: 81-7079-703- 9

__________, “আসমান তারা”, রামায়নী প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পৃঃ ৭, ৮, ৪৫, ৪৬, ৬৯, ৭০, ১২৬, ১২৭, ১৩৬, ১৩৭, ১৮৯ - ১৯১

__________, (জানুয়ারি ২০০৩), “সীমান্ত বাঘিনী”, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, পৃঃ ১১৫, ১৪৫, ISBN: 81 - 87657 - 37 - 5

__________, (জুন, ১৯৭২), “মায়ামৃদঙ্গ”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৩৩, ৬১, ৯২

__________, (আগস্ট, ১৯৮২), “স্বপ্নের নীচে দাঁড়িয়ে”, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ১০৩, ১০৪

__________, (নভেম্বর, ১৯৯৪), “অলীক মানুষ”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ২১ - ১৬৪, ISBN: 81-7979 - 674 - 1

সাঁতরা, রামকৃষ্ণ, (নভেম্বর, ২০০০), “ভরাকোটাল”, প্রকাশক-মুজিবর রহমান, কলকাতা, পৃঃ ৬৫ - ৬৭

সাহা, অবণী, (অক্টোবর, ১৯৭২), “অন্য বিবর”, নয়া প্রকাশ, কলিকাতা, পৃঃ ৮৫, ৮৬

সেন, অভিজিত, (১৪১৫), “সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল”, শারদীয় আজকাল, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৭২

__________, (জানুয়ারি, ২০১২), “মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল”, প্রতিভাস, কলকাতা, পৃঃ ২৯, ৩০, ৩৭, ৪৮, ৪৯, ১৩৫, ১৩৬

__________, (১৪২২), “দিদারগঞ্জের যক্ষী”, শারদ সংখ্যা আজকাল, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১১৬

__________, (১৪২০), “নাগকেশর অক্ষবাট”, শারদীয় আজকাল, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৪৮, ১৪৯

_________, (জানুয়ারি, ২০০৮), "রাজপাট-ধর্মপাট", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ২০-৬৭, ISBN: 978 - 81 - 295 - 0767 - 9

সেন, মন্দাক্রান্তা, (১৪১১), "অত্যাক্ষরী", শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন, প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেড, কলকাতা, পৃঃ ১৫৯, ১৮৯

সেন, চানক্য, (জানুয়ারী, ১৯৯৬), "পিতা পুত্রকে", প্রকাশভবন,কলকাতা, পৃঃ৫৩-৫৫

_________, (ভাদ্র, ১৩৮৪), "পুত্র পিতাকে", প্রকাশভবন, কলকাতা, পৃঃ ২৩-২৫

_________, (আগস্ট, ১৯৬৬), "রাজপথ জনপথ", নবভারতী, কলকাতা, পৃঃ ৫৭

_________, (অক্টোবর, ২০০৮), "প্রতিবেশীঃ যুগল উপন্যাস", দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, কলকাতা, পৃঃ ২৪-১৩০, ISBN: 81 - 7079 - 042 - 5

সেন, সম্রাট, (জুলাই, ১৯৭৬), "সপ্তদূর্গার উদয়াস্ত (প্রথম খন্ড)", বর্ণালী, কলিকাতা, পৃঃ ১৫১, ১৫৩

সেনগুপ্ত, অঞ্জন, (জানুয়ারি, ২০০৬), "ভূমিতল", এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, পৃঃ ১৩, ১৫৫, ISBN: 81 - 87657 - 55 - 3

সেনগুপ্ত, মিহির, (ডিসেম্বর, ২০০৯), "হেমন্ত শেষের পাখিরা", জে.এন. চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, পৃঃ ৩১, ISBN: 978 - 93 - 80411 – 05 - 7

_________, (১৪১২), "বিষাদ বৃক্ষ", সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পৃঃ ৬৫ - ১৮৬

সেনগুপ্ত, সুব্রত (১৪০৩), "ভোগ", শারদীয় আজকাল, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, কলকাতা, পৃঃ ২৯৩

_________, (১৪১১), "নষ্টগ্রহ", শারদীয় আজকাল, আজকাল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩৬৫

সোম, দেবকুমার, (১৪১৩), "ত্বকচর্চার গোপন কথা", শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন, প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেড, কলকাতা, পৃঃ ১১৫

সান্যাল, নারায়ণ, (১৪০৯), "শের-এ-শহিদদ্বীপ", শারদীয়া নবকল্লোল, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, পৃঃ ১৮৮, ১৯৬, ২০০

__________, (জানুয়ারি, ১৯৯২), “মান মানে কচু”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ২২, ২৩

__________, (জানুয়ারি ২০০৩), “কনকলতার সন্ধানে”, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৩৩, ৩৪, ৫০, ৫৩, ৬৯, ৭৬, ৭৭

__________, (জানুয়ারি, ১৯৯৩), “এমনটা তো হয়েই থাকে”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৩৫, ৩৬, ১২০, ১২১, ISBN: 81 - 7079 - 273 - 8

__________, (১৪০৪), “প্রসঙ্গঃ নরক/দান্তে অনুসরণে”, শারদীয়া নবকল্লোল, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ৪১৬, ৪৩২

__________, (নভেম্বর, ১৯৯৫), “সন্তান মোর মার”, “হিন্দু না ওরা মুসলিম’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৭০ - ৭২, ISBN: 81 - 7079 - 774 - 8

__________, (ডিসেম্বর, ২০০৫), “রূপমঞ্জরী (তৃতীয় খন্ড)”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৭৮, ২৫৭ - ২৫৯, ২৬১ - ২৬৪, ২৬৭, ISBN: 81 - 295 - 0547 -9

__________, (এপ্রিল, ১৯৮৩), “অশ্লীলতার দায়ে”, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, পৃঃ ৯১, ৯২, ১৮২, ১৮৩

__________, (জানুয়ারি, ১৯৯৫), “দ্বি-বৈবাহিক কাটা”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৪২, ৪৩, ISBN: 81 - 7079 - 670 - 9

__________, (জুন ১৯৭২), “আবার যদি ইচ্ছা কর”, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃঃ ২৩, ৭৮, ৭৯, ৮২

হক, আজিজুল, (জানুয়ারি, ১৯৯৬), “ছুটন্ত সময়, ফুটন্ত মানুষ (প্রথম পর্ব)”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৪০, ৪৯, ৫০, ৫২, ISBN: 81 - 7079

হক, হাসান আজিজুল, (মে, ২০০৮), “আগুন পাখি”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ৭৫-৭৭, ২২৪, ২২৫, ISBN: 978 - 81 - 295 - 0820 - 1

__________, (জানুয়ারি, ২০১৪), “সাবিত্রী উপাখ্যান”, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃঃ ১৭২, ১৭৩, ISBN: 978 – 81 - 295 - 2149 - 1

হোসেন, সেলিনা, (ডিসেম্বর, ২০১২), “সোনালী ডুমুর”, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা, পৃঃ ৮৬, ১৩৮, ১৩৯, ISBN: 978 - 93 - 5040 – 198 - 9

__________, (ফেব্রুয়ারী, ২০০৩), “দীপান্বিতা”, হাতে খড়ি, ঢাকা, পৃঃ ৬৮ - ৯৭

হোসেন, মীর মশার্‌রফ, (জানুয়ারি, ২০০০) “বিষাদ-সিন্ধু” হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ৫৬

হোসেন, সোহরাব, (১লা বৈশাখ, ১৪১৭), “মহারণ” করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃঃ ৮৬ - ৮৮, ISBN: 81 - 8487 - 060 – 1

Mahua Bhattacharya

Candidate

Dated: 12.01.2022